বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

বাংলা
মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

বিবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম. এ
প্রণীত

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, এম. এ; বি, এল;
পি. আর. এস্; ডি. লিট (লণ্ডন) পরিচায়িত ও অধ্যাপক
ডক্টর মুহম্মদ্ শহীদুল্লাহ এম. এ; বি. এল; ডিপ্লো,
ফোন্ (প্যারিস্); ডি. লিট্ (প্যারিস)
লিখিত প্রবেশিকা সম্বলিত

কলিকাতা বুক হাউস
১১ কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

১৩৪৬

মূল্য চারি টাকা মাত্র

প্রকাশক
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র পাল বি, এ
কলিকাতা বুক হাউস
১।১ কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

ঢাকা
নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে
শ্রীকালাচাঁদ বসাকদ্বারা মুদ্রিত

পরিচায়িকা

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের রসজ্ঞ ও রসানুসন্ধানী পাঠকের অভাব আছে কিনা জানি না, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু অন্বেষণ বা আলোচনা হইয়াছে, তাহা পর্য্যাপ্ত বা প্রচুর বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন বাঙ্গালা দেশ বুঝিতে হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য না বুঝিলে চলিবে না; কিন্তু এই সাহিত্যের একটি সুসংযত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। উদাসীনতার কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই কাজের যোগ্যতা ও অধিকার সকলের নাই; যাঁহাদের আছে তাঁহাদের হয়ত সুবিধা ও সময়ের অভাব, অথবা আন্তরিক অনুরাগ ও অধ্যবসায়ের একাগ্রতা নাই। যে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত পুস্তক বা প্রবন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাও সব সময়ে সকলের নজরে পড়ে না; এবং অনেক সময়ে এই সকল অসম্পূর্ণ এবং সাময়িক তাগিদের খাতিরে কোনও প্রকারে লেখা বৃত্তান্তগুলি তথ্য ও অতথ্যের নির্ব্বিচার সমাবেশে অথবা শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে, নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ হইয়া উঠিতে পারে নাই।

বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করা হয় নাই। তাহা লিখিবার সময় বোধ হয় এখনও আসে নাই। এরূপ ইতিহাস সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া লিখিতে হইলে যে-সকল তথ্যের উপাদান নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হয় নাই। সহজপ্রাপ্য সাধারণ কয়েকটি তথ্য ও ঘটনা লইয়া, এবং বাকিটুকু সুলভ কল্পনা দ্বারা পরিপূরণ করিয়া, এই যুগের বা সাহিত্যের একটি চমকপ্রদ বিবরণ রচনা করা কঠিন নয়; কিন্তু নিরপেক্ষ নিখুঁত ইতিবৃত্ত লিখিতে হইলে যে তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন, তাহা অশেষ পরিশ্রম ও যত্ন সাপেক্ষ।

ঐতিহাসিক সাধনার এই কঠিন পথ অবলম্বন করিবার ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও অনুরাগ সকলের নাই; থাকিলেও, সহজ পথ গ্রহণ করা বোধ হয় মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এবং সহজ পথ অনেক সময় ক্ষিপ্র ও আপাতফলদায়ী।

সুখের বিষয় যে, আমাদের উৎসাহী ও পরিশ্রমী গ্রন্থকার এই সহজ পথ ও সুলভ উপায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং এরূপ চমকপ্রদ, কিন্তু পরিণাম-নিষ্ফল, রচনার লোভ সংবরণ করিয়াছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র ও বর্ত্তমান সুযোগ্য অধ্যাপক; প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা করিবার উপযুক্ত শিক্ষা, অধিকার ও রসিকতা তাঁহার আছে এবং বর্ত্তমান গ্রন্থে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, তথ্যানুরাগ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি বুঝিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার শেষ নাই; সুতরাং ইহার বিভিন্ন অংশের উপকরণ সংগ্রহ সম্পূর্ণ না করিয়া, সমগ্র বিবরণ লিখিতে যাওয়া বাতুলতা বা সৌখীনতা মাত্র। মুটে-মজুরের কাজ সকলে করিতে চাহে না। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐতিহাসিক সৌধ-নির্ম্মাণে মুটে-মজুরের কাজই এখন একমাত্র কাজ। আপাতদৃষ্টিতে এই কাজ তুচ্ছ ও সামান্য হইলেও, বর্ত্তমান সময়ে ইহারই একমাত্র আবশ্যকতা ও উপকারিতা আছে। বড় বড় সৌখীন বই লিখিয়া গৌরব অর্জ্জন করিবার সহজ উপায় অনেকেই খুঁজিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত অনুসন্ধানীর অকিঞ্চিৎকর অথচ নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও শ্রমসাধ্য ব্যাপারে আত্মনিবেশ করিবার উৎসাহ ও একাগ্রতা সেরূপ সুলভ নয়। বর্ত্তমান লেখকের সেই উৎসাহ ও একাগ্রতা রহিয়াছে বলিয়াই, আমি তাঁহার প্রথম বিস্তৃত ও সারগর্ভ রচনাটিকে সাহিত্যসমাজে পরিচিত করিয়া দিতে সাহসী হইয়াছি।

আমাদের লেখক বড় বই লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু সৌখীন বই লেখেন নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের যে-বিষয়টী তিনি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন,

তাহা চিত্তাকর্ষক হইলেও সহজসাধ্য নয়। শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, প্রাচীন সাহিত্যের অন্যান্য কীর্ত্তির মধ্যে মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি একটি প্রধান কীর্ত্তি। এই বিচিত্র রচনাগুলির ধারাবাহিক বৃত্তান্ত পাঠকের একেবারে অজ্ঞাত না হইলেও খুব সুস্পষ্ট নয়। এ সম্বন্ধে যে-সকল মূল্যবান্ উপাদান সাহিত্যের ভিতরে ও বাহিরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে, সেগুলি একত্র ও নিপুণভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, লেখকের বহু প্রযত্নসাধ্য রচনা যে সরস ও তথ্যপূর্ণ বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা শুধু বিশেষজ্ঞের নয়, সাধারণ পাঠকেরও আদরণীয় হইবে।

প্রাচীনকালে ধর্ম্মবিপ্লব ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবিরোধের সংঘর্ষে ও সামঞ্জস্যে বাঙ্গালা সাহিত্য কিরূপ পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, তাহা মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট ধারার মধ্য দিয়া লেখক অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একদিকে শৈব সম্প্রদায়ের শিব-মঙ্গল বা শিবায়ন, শাক্ত সম্প্রদায়ের চণ্ডী-মঙ্গল ও কালিকা-মঙ্গল, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-মঙ্গল, অন্যদিকে লৌকিক দেবদেবীর উপলক্ষ্যে রচিত মনসা-মঙ্গল, শীতলা-মঙ্গল, বাশুলি-মঙ্গল, রায়-মঙ্গল, প্রভৃতির অন্তর্ভূক্ত রচনাশ্রেণীর ও তৎপ্রতিপাদ্য দেবতাদিগের উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বহু যত্নের সহিত অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে তাহাদের কবি, কাব্য ও কাহিনীর বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ণিত পুস্তকসমূহের অনেকগুলি এখনও অমুদ্রিত, এবং যেগুলি বটতলা বা অন্যান্য অপ্রখ্যাত স্থান হইতে কোনও রূপে মুদ্রিত হইয়াছে, সেগুলি সাধারণ পাঠকের সুলভ নয়। তাহা হইতে গ্রন্থকার যে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মূল্যও যথেষ্ট। এই সকল রচনার মধ্যে কতটা পরিকল্পনার বৈচিত্র্য, চরিত্রাঙ্কনের নৈপুণ্য অথবা কাব্যরসের সৃষ্টি রহিয়াছে, এবং কতটা তৎকালীন সমাজ ও ধর্ম্মের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহারও যথাসম্ভব আলোচনা গ্রন্থকার করিয়া-

ছেন। এই আলোচনায় তিনি সাহিত্যের অন্তর্গত উপকরণের দ্বারাই তাঁহার বক্তব্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, নিজের মতবাদ, অত্যুক্তি বা কল্পনার দ্বারা তাহা অতিরঞ্জিত করেন নাই। সুতরাং ইহার মধ্যে যে কেবল লেখকের অধ্যবসায়, অনুসন্ধিৎসা ও তথ্যনিষ্ঠার প্রমাণ আছে তাহা নয়, চিন্তাশীলতা, রসগ্রাহিতা ও লিপিকৌশলের যথেষ্ট পরিচয়ও রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার যে-সকল সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক সমস্যার উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার সমাধান সম্বন্ধে হয়ত সকলে সব বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইবেন না। তথাপি তাঁহার প্রয়াস ও যত্ন যদি ভবিষ্যৎ চর্চ্চা ও সমালোচনার সহায়তা করে, এবং তাঁহার সংগৃহীত উপাদান যদি ভবিষ্যৎ পূর্ণতর বিবরণের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তাঁহার চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। এ-দাবী বোধ হয় গ্রন্থকার নিজেও করিবেন না যে, এই দুরূহ বিষয়ের সকল সমস্যার তিনি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন। আরও অনুসন্ধান ও আলোচনার প্রয়োজন আছে; কিন্তু তিনি সমগ্র বিষয়টির যে সুচিন্তিত ও সুনির্দ্দিষ্ট খসড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে যদি এই ক্ষেত্রে আরও অনুরাগী কর্ম্মীর শুভাগমন হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার সৌভাগ্যের বিষয় হইবে।

বর্ত্তমান ভাষা-বিকৃতি ও সাহিত্যিক আত্মভ্রষ্টতার যুগে এইরূপ প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা হয়ত আদৃত হইবে না, কিন্তু ইহার প্রয়োজন ও উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। আজকালকার দিনে যাঁহারা সাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তক বা যুগন্ধর সমালোচক বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের বহু সাধনালব্ধ প্রতিষ্ঠিত ধারা সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না, বা রাখিতে চাহেন না। পরম্পরাগত সাহিত্য-প্রচেষ্টার সহিত ইহাদের যোগ নাই। কিন্তু জাতির আত্মচেতনার

যাহা বৈশিষ্ট্য তাহারই দৃঢ়ভিত্তিমূলে তাহার ভাষা ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের এই সনাতন স্বরূপটি ইঁহারা আমাদের প্রাচীন সাহিত্য হইতে আয়ত্ত করিবার কোনও সাধনা করেন নাই। ইহাকে অস্বীকার করিয়া কেবল নিজেদের অজ্ঞতা নয়, জাতীয় ভাবধারা হইতে বিচ্ছিন্নতাও প্রমাণিত করেন। বিংশ শতাব্দীটিই নাকি একমাত্র শতাব্দী; ইহার পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য ছিল, ইহা তাঁহারা জানেন না, বা মানেন না। কিন্তু যে-অতীতের মগ্ন চেতনা ও অনুভূতির উপর বর্ত্তমান আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে না। সেইজন্য বলিতেছি যে, বর্ত্তমান পুস্তকের একটি সময়োপযোগী সার্থকতা রহিয়াছে।

গ্রন্থের ভালমন্দের বিচার এই ভূমিকার উদ্দেশ্য নয়। সে ভার বিশেষজ্ঞের উপর দিয়া, এখানে এইটুকু নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তরলোকে প্রবেশ করিতে উৎসুক, তাঁহারা এই বইখানি হইতে যথেষ্ট উপকার ও আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। করিবারই কথা, কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালী পাঠক সম্বন্ধে কোনও কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীসুশীল কুমার দে

৫ই আশ্বিন, ১৩৪৬

নিবেদন

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম. এ ও অনার্স শ্রেণীতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যাপনা করিতে যে সমস্ত উপকরণ একত্র সংগ্রহ করিয়াছিলাম, মূলতঃ তাহারই কতকাংশের উপর ভিত্তি করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। তথাপি যাহাতে ইহা কেবল নীরস পাঠ্যবস্তুর তথ্যালোচনায় পর্য্যবসিত না হয় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখিয়াছি। ইহা স্বীকার্য্য যে, মধ্যযুগের বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে ইদানীং বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইলেও সেই যুগের এই একটি অতি বিরাট কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটি বিক্ষিপ্ত আলোচনা ব্যতীত সমগ্রভাগে ঐতিহাসিক আলোচনা আজ পর্য্যন্তও হয় নাই। এই পুস্তকখানির কলেবর দেখিয়াই মধ্যযুগের এই উপেক্ষিত বিশিষ্ট একটি সাহিত্য-বস্তুর গুরুত্ব সম্বন্ধে কতক আভাস পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান সময়ে এই পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য সম্বন্ধে এই পুস্তকের 'পরিচায়িকা' ও 'প্রবেশিকা'য় যাহা উক্ত হইয়াছে তদতিরিক্ত আমার বক্তব্য আর কিছুই নাই; ইহা রচনা করিয়া আমি যদি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি অতি প্রয়োজনীয় অথচ এ যাবৎ উপেক্ষিত বিষয়-বস্তুর উপর সামান্যও আলোকপাত করিতে পারিয়া থাকি তাহা হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

এই পুস্তকখানি রচনা করিতে গিয়া যে কতকগুলি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। গ্রন্থভাগে উল্লেখ করিয়াছি, মঙ্গল-সাহিত্য প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িক প্রেরণা হইতে জাত, সেইজন্য ইহাদের উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনা করিতে ইহাদের সহিত সম্পৃক্ত ধর্ম্ম ও লোকাচারগুলির আলোচনা করিবার

প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বাংলার লৌকিক ধর্ম্মের কোন ধারাবাহিক প্রামাণ্য ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন লৌকিক ধর্ম্মাচার ও দেবতার অস্তিত্ব রহিয়াছে, ইহাদের সহিত পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই, ইহারা প্রাক্-আর্য্য সমাজ-সম্ভূত। ইহাদের আলোচনা দ্বারা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি অতি মুল্যবান্ অধ্যায় সংযোজিত হইতে পারে। বাংলার নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়ও ইহার মূল্য অপরিসীম। কিন্তু একমাত্র সংক্ষিপ্ত জিলা 'গেজেটিয়র', আদম শুমারির বিবরণ ও স্থানে স্থানে সামান্য কয়েকটি বিক্ষিপ্ত আলোচনা ব্যতীত এই বিষয়ের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধারাবাহিক ইতিহাস আজ পর্য্যন্তও রচিত হয় নাই। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের অনেক অঞ্চলেই খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের অনুগ্রহে এই জাতীয় স্থানীয় লৌকিক ধর্ম্মের বিবরণ কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা দেশের পক্ষে এই সৌভাগ্যও হয় নাই। বাসুলী, শীতলা, জড়াজড়ি, ডরাই, বিষহরী, গারসী, সুবচনী, বনদুর্গা, ঘেটু, ভাদু, ওলাঝোলা, করমপুরুষ, ঘাগরবুড়ি, কালাঝড়ে প্রভৃতি অসংখ্য স্থানীয় দেবতা বাংলার নানাস্থানে আজিও পূজিত হইতেছে। পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মের ব্যাপক প্রভাবকে অস্বীকার করিয়া ইহাদের অস্তিত্ব প্রাচীনতম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবেই রক্ষা পাইয়া আসিতেছে। ইহাদের ইতিহাস দূরের কথা, ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত হয় নাই। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-বৈষ্ণব-নিষেবিত সমাজই বাংলার সমাজের সম্পূর্ণ পরিচয় বহন করিতে পারে না, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের রচয়িতৃগণ এই একটি অতি মূল্যবান্ কথা এ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। সেইজন্য উচ্চতর বর্ণের সমাজের বাহিরে তাঁহারা আর দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পান নাই। এই উপেক্ষা

হইতেই বাংলার সমাজের একটা অতি মৌলিক দিক্ উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। এই গ্রন্থে যথাসাধ্য বাংলার সেই প্রাচীনতম লৌকিক ধর্ম্মগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কারণ, মধ্যযুগের সাহিত্যকে মধ্যযুগের এই লৌকিক ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করা যায় না। সেইজন্য মধ্যযুগের সাহিত্যের আলোচনায় তৎকালীন সমাজের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনাও অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এই বিষয়ে আমাদের বাঙ্গালার ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ব-জাতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা যদি অগ্রসর হইয়া সহায়তা করেন তাহা হইলেই সেই যুগের সাহিত্যের ইতিহাসও তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সম্পূর্ণরূপে গঠন করা যায়।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনার আর একটি প্রধান অসুবিধা এই যে এই সম্বন্ধে অধিকাংশ পুস্তকই আজ পর্য্যন্ত অমুদ্রিত। এমন কি যাহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিতও হইয়াছে তাহাও উপযুক্ত সম্পাদনার অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এমন কি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, মধ্যযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমঙ্গলের একখানি নির্ভরযোগ্য সংস্করণ আজিও প্রকাশিত হয় নাই। অথচ সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান হইতেও এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মুদ্রিত পুস্তকে চিত্রসংযোগ করিয়া কিম্বা বাঁধাই ও কাগজের উৎকর্ষদ্বারাই প্রাচীন কোন গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না। প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনায় যে অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন তাহা কেহ স্বীকার করিতে সম্মত না হইয়া আপাতরমণীয় রূপে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা সাধারণের মধ্যে গ্রন্থ প্রচারের সহায়তা হইলেও এই শ্রেণীর মুদ্রিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কোন মৌলিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় না। অতএব এই গ্রন্থরচনায় আমি

তথাকথিত মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে বিশেষ কিছুই সাহায্য লাভ করিতে পারি নাই। অমুদ্রিত পুঁথির উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই নিজস্ব যথাসম্ভব সতর্ক বিচার-বুদ্ধি লইয়া অগ্রসর হইয়াছি।

অনেক স্থলেই কবিদিগের বংশধরেরা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু তাঁহারাও কবিদিগের সম্বন্ধে সাধারণ অপেক্ষা অধিক সংবাদ রাখেন না। মনসা-মঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি বিজয়গুপ্তের বংশধরগণ আজিও বরিশাল জিলার গৈলাগ্রামে বসবাস করিতেছেন। বিজয় গুপ্তেরই বংশধর বলিয়া পরিচিত প্যারীমোহন দাস মহাশয় বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বলিয়া যে পুস্তক মুদ্রিত করিয়া নানাচিত্রে সুশোভিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার এক তৃতীয়াংশ পদই স্বতন্ত্র কবির ভণিতাযুক্ত, অধিকাংশ পদে কোন কবিরই ভণিতা নাই। সামান্য কয়েকটি পদে বিজয়গুপ্তের ভণিতা পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্তের অমুদ্রিত পুঁথিগুলিরও একই অবস্থা। বংশধরদিগের গৃহে রক্ষিত কবির গ্রন্থখানি এত বিকৃত হইবার কি কারণ থাকিতে পারে বুঝিতে পারা যায় না। পদ্মাপুরাণের অন্যতম প্রধান কবি নারায়ণ দেবেরও বংশধরেরা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহাদের গৃহেও সন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহাদের কাছে নারায়ণদেবের যে পুঁথি রক্ষিত আছে তাহার মধ্যেও অনেক স্বতন্ত্র কবির ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন কবির ভণিতাযুক্ত এই প্রকারেরই একটি পুঁথি নির্ব্বিচারে মুদ্রিত করিয়া দিয়া নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই সম্পর্কে উল্লেখ করিতে পারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার বিশ্বাস এম. এ. মহাশয় কবির জন্ম-ভূমির অনতিদূরে এক স্থানে নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের একখানি সম্পূর্ণ পুঁথির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। তাহার

প্রতিলিপিও তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে এমন কোন স্বার্থত্যাগী প্রতিষ্ঠান নাই যাহা হইতে এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে। ময়মনসিংহের প্রবীণ উকিল আজন্ম-সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার মজুমদার বি. এল. মহাশয়ও নারায়ণ দেবের একখানি সম্পূর্ণ পুস্তক উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু একই কারণে তাহাও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে পারিতেছেনা।

এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও এই পুস্তকখানি রচনা করিবার পক্ষে আমার বিশেষ কতকগুলি সুবিধা লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। প্রথমতঃ পদ্মাপুরাণ বা মনসা-মঙ্গল কাব্যের উদ্ভব-ক্ষেত্র পূর্ব্ব ময়মনসিংহের গীতি-ভূমিতে আমার জন্ম। আশৈশব নারায়ণ-দ্বিজবংশীর পদ্মাপুরাণ গান শুনিয়া আসিতেছি। স্থানীয় সামজিক জীবনের উপর যে ইহাদের প্রভাব কত ব্যাপক তাহা শুধু পুস্তক পাঠের অভিজ্ঞতা ব্যতীতও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেও অনুভব করিয়াছি। সেইজন্য এই সমস্ত বিস্মৃত-প্রায় কবিদিগের পরিচয় সংগ্রহ ও সাহিত্যের বিচারে তাহাদের কাব্যের মুল্য নিরূপণ করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনেক দিন হইতেই মনের মধ্যে জাগিয়াছে। অতঃপর কর্ম্মব্যপদেশে ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যের উদ্ভব-ভূমি রাঢ়দেশের কেন্দ্রস্থলে চারি বৎসর কাল বাস করিবার সুযোগ লাভ করি। ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্ম-সাহিত্য ও পশ্চিম রাঢ়ের ধর্ম্ম-পূজা সম্বন্ধে পুঁথিপত্রে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম ব্যক্তিগত ভাবে তাহাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সার্থক করিবার সুযোগ পাই। ইহা হইতেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত এই মঙ্গলকাব্যগুলির বিস্তৃত বিবরণ রচনা করিবার ইচ্ছা দৃঢ়তর হয়। চারি বৎসর রাঢ়ভূমিতে বাস করা কালীন যখনই যেখানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরের কথা শুনিতাম তখনই তাহা দেখিবার জন্য ছুটিয়া

যাইতাম; বিগ্রহটিকে সর্ব্বত্রই গভীর ভাবে লক্ষ্য করিতাম, ইহার পূজা ও আচারের প্রত্যেকটি অঙ্গ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি করিয়া পূজারী পণ্ডিতের নিকট নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত জানিয়া লইতাম। এই পুস্তকে আমার এই প্রকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলই বর্ণনা করিতে পারিয়াছি বলিয়া ইহা এই বিষয়ের নির্ভর-যোগ্য প্রামাণ্য তথ্য বলিয়া দাবী করিতে পারি;

ধর্ম্মমঙ্গল সম্বন্ধে আমার বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার অধিকার ইহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পূর্ব্বেও কতক লাভ করিয়াছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ শ্রেণীতে পাঠ করিবার কালীন এই বিষয়ে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তির পাদমূলে বসিয়া অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। "ধর্ম্মপূজা-বিধানে"র সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ, "শ্রীধর্ম্মপুরাণের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ. ও "শূন্য-পুরাণের" সম্পাদক স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ মহোদয়গণ আমার অধ্যাপক। তাঁহাদের সাহচর্য্যে আসিয়া এই বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাহা এই সম্পর্কে কখনও উপেক্ষণীয় নহে। আমার এই পুস্তক প্রকাশ করিবার মূলে তাঁহাদের প্রেরণা গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি।

এই বিরাট গ্রন্থ রচনায় যাঁহারা আমাকে বহু মূল্যবান্ উপকরণ ও উপদেশাদি দ্বারা সর্ব্বদা উৎসাহিত করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একপ্রকার অসম্ভব। অনেকের কাছেই আমার ঋণ এত গভীর যে, তাঁহাদের শুধু নামোল্লেখের লৌকিকতায় ধৃষ্টতারই মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

নারায়ণদেবের বংশধর বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার গৃহে রক্ষিত পদ্মাপুরাণের পুঁথিখানি দেখিবার সুযোগ দিয়াছিলেন।

তিনি আমার অনুরোধে তাঁহাদের বংশলতার অনুলিপি আমাকে পাঠাইয়া দেন। তাহাই গ্রন্থভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ পল্লীগীতি-সংগ্রাহক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের নিকট হইতে কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর বা 'পীরের পাঁচালী' ও দ্বিজবংশী সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি। কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু মহাশয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার হইতে আমাকে কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আলোচনার সুযোগ দিয়া পরম উপকার করিয়াছেন। এমন কি দীর্ঘ দিনের জন্য এমন দুষ্প্রাপ্য পুস্তকও তিনি ঢাকাতে আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমার কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষের নিকট এইজন্য আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ঢাকা মিউজিয়মের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার বহুমূল্য পুস্তকাগারখানিই যে সর্ব্বদা আমার জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন তাহা নহে তিনি তাঁহার এই বিষয়ে ব্যক্তিগত বহু অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা আমার বহু সংশয় দূর করিয়া দিয়াছেন। বাংলার মধ্য যুগের ঐতিহাসিক জ্ঞানের উপর তাহার তৎকালীন সাহিত্যের জ্ঞান সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই গ্রন্থ রচনায় তাঁহার সান্নিধ্য লাভ আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছে। বিশেষতঃ এই পুস্তকের আলোচনায় অধিক স্থলেই বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্য্যের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এই সম্বন্ধেও তাঁহার সহায়তা আমার পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান্ হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালার গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ মহোদয় আমাকে সর্ব্বদা নানা পুঁথির সন্ধান বলিয়া দিয়া ও নিজে সন্ধান করিয়া আমার প্রয়োজনীয় অংশ পুঁথি হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়া আমার অনেক শ্রম লাঘব করিয়াছেন। বিশেষতঃ হরিদত্ত সম্বন্ধে তাঁহার একটি অপ্রকাশিত
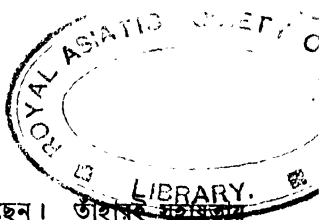
প্রবন্ধও আমাকে ব্যবহার করিবার সুযোগ দিয়াছেন। তাঁহারই সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালার পদ্মাপুরাণের বিরাট সংগ্রহ হইতে হরিদত্ত ও ষষ্ঠীবর সম্বন্ধে অনেকগুলি নূতন তথ্য আবিষ্কার করা গিয়াছে।

এই গ্রন্থ রচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহোদয় ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের নিকট হইতে যথেষ্ট উপদেশ ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি। আমার এই পুস্তক রচনায় যদি কোন কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মূলে তাঁহাদেরই নিকট হইতে লব্ধ শিক্ষার কথা চিরদিন গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিব। এতদ্ব্যতীত বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ননীলাল সেনগুপ্ত এম. এ, বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমোদলাল পাল এম. এ'র নিকট হইতেও বহু পরামর্শ ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি।

এই পুস্তক রচনায় আমি আমার ছাত্রদিগের নিকট হইতেও যে পরিমাণ সাহায্য লাভ করিয়াছি তাহাও নিতান্ত নগণ্য নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কৃতী ছাত্র আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ মথুরেন্দ্রনাথ নন্দী বি. এ ও শ্রীমান্ বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী এম, এ, প্রুফ সংশোধন ও কাপি তৈয়ার কার্য্যে আমাকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। এই সম্পর্কে আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মুহম্মদ আলি বি. এ, হবিবুর রহ্‌মান ও শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার সেন শর্ম্মার নিকটও যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। এইভাবে দশ জনের সহায়তায় এই কার্য্য অপেক্ষাকৃত অল্প দিনেই সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রমণা, ঢাকা
আশ্বিন, ১৩৪৬ সাল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

অভিমত

Dr. Nalini Kanta Bhattasali, M. A ; Ph. D. Curator, Dacca Museum, Dacca :—"It is a hopeful sign of the times that we are at last rising above the sentimental, slothful and woefully undiscriminating method of research in Old Bengali Literature inaugurated by some enterprising and fortunate pioneers towards the end of the last century. Dr. Sukumar Sen's well-written articles in the periodicals gave the first promise of the dawn of sense in the field. I am very glad to find that my young friend Mr. Asutosh Bhattacharyya M. A. in his "History of the Bengali Mangala Kavyas" just published has followed the same scientific, discriminating and sobre method with very considerable success·········it speaks volumes for the author's industry, discrimination and ability and I wish the young author greater and greater success in his future endeavours."

Sd/- N. K. **Bhattasali.**

মায়ের হাতে
দিলাম

প্রবেশক

মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য এখনও অনেকটা অজ্ঞাত-ভূমি। মাত্র বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। এইরূপ স্থলে শ্রীমান্ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের "বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস" একটি চির অনুভূত অভাবের অনেকটা পূরণ করিবে, আশা করা যায়।

আমরা কৃত্তিবাসের রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে দেখিতে পাই, শিবদুর্গার বিবাহ উপলক্ষে—

"নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে।
কেহো বেদ পড়ে কেহো পড়এ মঙ্গলে॥
নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে।
পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে॥"

(সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ পৃঃ ৬)

ইহা হইতে বুঝিতে পারি, খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতকে উৎসব উপলক্ষে মঙ্গলকাব্য পড়ার রীতি ছিল। মঙ্গল গানও হইত। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে আমরা পাই,

"ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জনে।
পুত্তলি পূজয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে॥"

পুনশ্চ, "বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহলে।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে॥"

—আদিখণ্ড

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, বাংলায় মধ্যযুগের আদিতে চণ্ডীমঙ্গল ও মনসা-মঙ্গল ছিল। হয়ত বাসুলী-মঙ্গলও ছিল। হয়ত আরও লৌকিক দেবতার মঙ্গল ছিল।

মধ্যযুগের সাহিত্যে আমরা প্রধানতঃ ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও মনসা-মঙ্গল কাব্য গতানুগতিকভাবে একের পর আর এক কবির রচনায় দেখিতে পাই। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে একই সময় বিভিন্ন কবি একই মঙ্গলকাব্য লিখিতেছেন তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। পরে চৈতন্য-মঙ্গল, অন্নদা-মঙ্গল, শীতলা-মঙ্গল, কালিকা-মঙ্গল, দুর্গামঙ্গল প্রভৃতি রচিত হয়। এই মঙ্গলকাব্যগুলির অন্ততঃ কয়েকটির সূত্রপাত বাংলা দেশের মুসলমান-পূর্ব্ব যুগেই হইয়াছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হয়ত ইহাদের কোন কোনটি প্রাগৈতিহাসিক। কোল-সাঁওতাল জাতিদের ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনায় এই বিষয়ে কিছু আলোক-পাত হইতে পারে।

"বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে" অতি বিস্তৃতভাবে এই মঙ্গল কাব্যগুলির ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। পাঁচ শত পৃষ্ঠাধিক পুস্তকে শ্রীমান্ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মধ্যযুগের এই সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা ও মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়াছে। যাঁহারা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক প্রধান অংশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চান তাঁহাদের নিকট পুস্তকখানি উপাদেয় এবং মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৫।৯।৩৯ ইং

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

সূচী

প্রথম ভাগ

ভূমিকা

উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশ

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

বাংলার শৈব সাহিত্য

দ্বিতায় অধ্যায়

সর্পপূজার ইতিহাস—পদ্মাপুরাণ

তৃতীয় অধ্যায়

মঙ্গলচণ্ডী পূজার ইতিহাস—চণ্ডীমঙ্গল

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্ম্মপূজার ইতিহাস—ধর্ম্মমঙ্গল

তৃতীয় ভাগ

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য সমূহ

পরিশিষ্ট

পরিবর্দ্ধন ও সংশোধন

পৃঃ ৩৩এ প্রথম অনুচ্ছেদের পর এই অংশটুকু পড়িতে হইবে,—কোন শুভকর্ম্ম উপলক্ষে গীত যে গান তাহাই মঙ্গলগান, যেমন মঙ্গল বাদ্য, মঙ্গল শঙ্খ ইত্যাদি। ব্যাপক অর্থে দেব-মহিমা প্রচারক কাব্যমাত্রই মধ্যযুগের সাহিত্যে মঙ্গল নামে অভিহিত হইত। তুলনীয়, "প্রভু কন গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল। মুকুন্দ গায়েন প্রভু শুনিয়া বিহ্বল॥"—চৈতন্য ভাগবত, ২৫ অধ্যায়, মধ্যখণ্ড। ইহাতে মঙ্গল শব্দের অর্থ হয়, দেবমাহাত্ম্যসূচক গীত। মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম নাম পাঁচালী, এখনও শনির পাঁচালী নাম প্রচলিত আছে। প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্যগুলিও পাঁচালী নামেই অভিহিত হইত। এই পাঁচালী যখন আসরে গীত হইতে লাগিল, তখন ইহার নাম হইল গীত।) মনসার গীত, মঙ্গলচণ্ডীর গীত ইত্যাদি। পদ্মা বা মনসার গীতের উপর সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব বশতঃ ইহার নাম হয় পদ্মাপুরাণ। মঙ্গল নামটিও পুরাণেরই প্রভাব-জাত। ইহা এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যযুগে মঙ্গলচণ্ডীর গীত সম্পর্কেই সর্ব্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। পরে পদ্মাপুরাণ প্রভৃতিতেও সংক্রামিত হয়। তাহাতে পদ্মাপুরাণ মনসা-মঙ্গল নামে পরিবর্ত্তিত হয়। অতএব পাঁচালী, গীত ও মঙ্গলকাব্যের ভিতর দিয়া এইভাবে এই জাতীয় কাব্যের ক্রমবিকাশ সম্পাদিত হয়।

পৃঃ ৩৪এ প্রথম অনুচ্ছেদের পর এই কথা কয়টি যোগ করিয়া লইতে হইবে,—পশ্চিম বঙ্গের কবি ক্ষেমানন্দ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার রচিত পদ্মাপুরাণকে 'মঙ্গল' নামে অভিহিত করিতেছেন, যথা, মনসা স্বপ্নাদেশ কালে তাঁহাকে বলিতেছেন, "ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ, কবিত্বে কর প্রবন্ধ, আমার 'মঙ্গল' গাইয়া বোল।" কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বিপ্রদাসও তাঁহার কাব্যকে পাঁচালী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, মঙ্গল বলেন নাই।

পৃঃ ৩৫ এ 'মঙ্গল' শব্দের প্রাচীন অর্থ ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে উল্লিখিত 'মঙ্গল' শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র। এখানে ঘট পাতিয়া মঙ্গল চাওয়া অর্থে জলপূর্ণ ঘটদ্বারা শুভাশুভ নিরূপণ করা। অতএব শব্দটি "আশীর্ব্বাদ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে" কথাগুলি পরিত্যজ্য।

পৃঃ ৩৬ এর ১ম চরণে বলা হইয়াছে, মঙ্গল গানের আর এক নাম অষ্ট মঙ্গলা, কিন্তু ইহা ভুল। পরিশিষ্টে (পৃঃ ৫২৬) অষ্টমঙ্গলা কথার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৮ পৃষ্ঠায় তান্ত্রিক বৌদ্ধ জাঙ্গুলী ও মনসার অভিন্নতা সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহার সমর্থন-কল্পে আরও একটি যুক্তি পাওয়া গিয়াছে। বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গলে মনসা দেবীর আর এক নাম জাগুলি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন, "জাগিয়া জাগুলি নাম সীজ বৃক্ষে স্থিতি।" [১] ধর্ম্মপূজা-বিধানেও মনসা বা বিষহরীর স্তোত্রে বিষহরীর নাম জাগুলি (পৃঃ ৯৭)। অতএব বৌদ্ধ তান্ত্রিক জাঙ্গুলী ও এই জাগুলি বা মনসা যে অভিন্ন এই বিষয় সুনিশ্চিত। ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ধর্ম্মপূজা-বিধানের বিষহরীর ধ্যানোক্ত 'জাগুলি' শব্দটিকে জাঙ্গুলীর লিপিকর প্রমাদ বলিয়াছেন, কিন্তু বিপ্রদাসের উক্তি হইতে জানা যায়, বিষহরীর নাম জাগুলি, জাঙ্গুলী নহে; বৌদ্ধ তান্ত্রিক জাঙ্গুলী তখন জাগুলি নামেই পরিচিত হইত। জাঙ্গুলী শব্দের প্রকৃত অর্থ 'জঙ্গল' বা অরণ্যের অধিবাসিনী।

১৩৫ পৃঃ ২য় অনুচ্ছেদে উল্লিখিত রাজার নাম শ্রীশচন্দ্র দেব নহে, শ্রীচন্দ্র দেব।
১৫৭ " সর্ব্বশেষ চরণটি "আর কতদিনে স্বপ্ন দেখাইলা মনসা॥" হইবে।
১৬৬ " " চারিটি চরণের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত চরণগুলি পড়িতে হইবে,

---

১ বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গল (শ্রীসুকুমার সেন) সা-প-পত্রিকা, ৪৩ ভাগ, পৃঃ ৬৮

"ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন শাহ্ নৃপতি তিলক॥
সংগ্রামে অর্জ্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিলা পৃথিবী॥"

১০৭ পৃঃ বিজয়গুপ্তের পরিচয়-প্রসঙ্গে এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে,—বিজয়গুপ্তের সমস্ত পুঁথিতে তাঁহার গ্রন্থ-রচনার কাল-জ্ঞাপক পদটি অভিন্ন নহে, কোন কোন পুঁথিতে পাওয়া যায়,

"ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।"

ইহার অর্থে ১৪০০ শকাব্দ বা ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কাব্য রচিত হয়; কোন পুঁথিতে আবার পাওয়া যায়,

"ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।"

ইহাতে কাব্য-রচনার কাল হয়, ১৪০৬ শক বা ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন, "শ্রাবণ মাসের রবিবারে মনসা পঞ্চমী" দিন দেবী স্বপ্নাদেশ করেন। দেখা যাইতেছে, "১৪১৬ শকাব্দে মনসা-পঞ্চমী ২২শে শ্রাবণ রবিবার কয়েক দণ্ড পরে আরম্ভ হয়"। উদ্ধৃত অন্য কোন শকাব্দে এই উল্লেখানুযায়ী তিথি ও বার পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ হুসেন শাহ্ ও ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব এই ঐতিহাসিক নির্দ্দেশের সহিত প্রাচীন পঞ্জিকার সঙ্গতি দেখিয়া "ঋতুশশী বেদ শশী পরিমিত শক" অর্থাৎ ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দই তাঁহার গ্রন্থ রচনার কাল বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্বিজ বিপ্রদাসের পরিচয়-জ্ঞাপক পদ কয়টিতে পাঠ-ত্রুটি আছে, তাহা শুদ্ধ করিয়া এইভাবে পড়িতে হইবে,

"মুকুন্দ পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি বাদুড়্যা বটগ্রাম॥
বাৎস্য গোত্র পিপিলাই পঞ্চ প্রবর।
সাম বেদ কৌথুম শাখা চারি সহোদর॥"

* বিপ্রদাসের বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৩ ভাগ, পৃঃ ৬৪ হইতে ৭৩ ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখিত 'বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গল' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১৮১তে দ্বিজ বংশীর সময় আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে, "১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে এই দেশে পরগণার সৃষ্টি হয় নাই।" কিন্তু ময়মনসিংহ জিলার পরগণা বিভাগ মোগল আমলের পূর্ব্ববর্ত্তী। (ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রণীত Independent Sultans of Bengal গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) অতএব দ্বিজ বংশীর সময় আলোচনা-প্রসঙ্গে এই যুক্তিটি পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু ইহাতে আমাদের মূল সিদ্ধান্তের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

পৃঃ ৩৬৪তে লাউসেনের আশ্রয়দাতার নাম এক তামুলি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু তাহা কর্ম্মকার হইবে।

৩৭২ পৃষ্ঠায় প্রথম অনুচ্ছেদের পর এই অংশ যোগ করিতে হইবে,—তাম্রশাসনের ঈশ্বর ঘোষ ও ধর্ম্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহার আর একটি প্রমাণ এই,—তাম্রশাসনে আছে যে ঈশ্বর ঘোষ "জটোদায়াং স্নাত্বা" (Inscriptions of Bengal Vol. III. p 154), অর্থাৎ জটোদা নদীতে স্নান করিয়া এই তাম্রশাসন দান করিতেছেন। এই জটোদা নদী জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত; ইহার বর্ত্তমান নাম ঝড়দা। কালিকা পুরাণেও এই জটোদা নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কামরূপ প্রদর্শন সম্পর্কে তাহাতে উক্ত হইয়াছে, "জটোদ্ভবা তত্র নদী হিমবৎ-প্রভবা শুভা। যস্যাং স্নাত্বা নরঃ পুণ্যমাপ্নোতি জাহ্নবী সমম্॥ গৌরীবিবাহসময়ে সর্ব্বৈর্মাতৃগণৈঃ কৃতঃ। জলাভিষেকো ভর্গস্য জটা-

জটেষু যঃ পুরা ॥ তৈস্তোয়ৈরভবদ্ যস্মাজ্জটোদাখ্যা নদী ততঃ।" (কালিকা-পুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৪৯৭) অতএব যে নদী হিমালয় হইতে উৎপন্ন ও কামরূপের নিকটে অবস্থিত তাহার সহিত রাঢ়ের কোন সম্পর্ক থাকিবার কথা নহে।

৪০২ পৃষ্ঠায় রূপরামের রচনা-কালজ্ঞাপক পদটিতে পাঠদুষ্টি আছে, তাহা এইভাবে পড়িতে হইবে,

সাকে সনে জড় হৈলে কত সক হয়।
তিন বাণ চারি যুগে বেদে যত রয়॥

তাহার পর দুই চরণ ঠিক আছে। তাহা হইলে অর্থ হইতেছে,—শক আর সন জড়াইয়া যুগপৎ বলিতেছি। তিন বাণ চারিযুগ=১৫১৬, বেদ দ্বারা হীন করিলে যত থাকে তত শক=১৫১২, আর রস+রস+রস=৯৯৯ হিজরী সন। (বাঙ্গালা সন তখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই) ৯৯৯ হিজরীতে ১৫১২ শকাব্দ পাইতেছি। অতএব রূপরামের গ্রন্থরচনার কাল ১৫১২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ। এই মীমাংসাটির জন্য আমি ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের নিকট ঋণী।

৪০৭ পৃষ্ঠায় মাণিকরামের গ্রন্থরচনার কালজ্ঞাপক পদটির অর্থ এই প্রকার হইবে, ঋতু ৬, বেদ ৪, সমুদ্র ৭ অর্থাৎ ৬৪৭ তাহার সহিত সিদ্ধ ৮৪, যুগ ৪ অর্থাৎ ৮৪৪ যোগ করিয়া ১৪৯১ শক বা ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দ পাইতেছি। এইভাবেই ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব মাণিকরামের কাল নিরূপণ করিয়াছেন (পৃঃ৪০৯)। অতএব দক্ষ শব্দটিকে পক্ষ সিদ্ধ শব্দটিকে ৮ বা ৭ পড়িবার যুক্তি পরিত্যজ্য। দক্ষ শব্দের অর্থ এখানে দক্ষিণ বা ডাইন, অর্থাৎ ৮৪ (সিদ্ধা) র দক্ষিণে বা ডাইনে, ৪ স্থাপন করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীতও বহু মুদ্রাকর প্রমাদ স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইবে, তাহা শুদ্ধ করিয়া পড়িবার ভার পাঠকের উপরই ন্যস্ত রহিল, ইহার একটি বিস্তৃত তালিকা দিয়া পুস্তকের কলেবর আর বৃদ্ধি করিতে চাহিনা।

UTTARAYAN
SANTINIKETAN, BENGAL

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস রচনায় লেখক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য যে অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষ শ্রদ্ধার যোগ্য। দুর্গম ও বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে তিনি প্রভূত তথ্য সংগ্রহ এবং সতর্কতার সঙ্গে প্রমাণ বিশ্লেষণ করে তার ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করেছেন। এই মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেই বাংলা কাব্যভাষার প্রথম আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের পরিণতি আলোচনা-কার্যে এই বইখানি বিশেষ সহায়তা করতে পারবে, এ জন্যে লেখক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধানকারীদের কৃতজ্ঞতা ভাজন।

১।১২।৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস

প্রথম ভাগ

ভূমিকা

উৎপত্তি বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশ

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত বঙ্গ সাহিত্যে যে বিশেষ একপ্রকার সাম্প্রদায়িক (Sectarian) সাহিত্য প্রচলিত ছিল তাহাই বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গল-কাব্য নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সংস্কৃত-সাহিত্যে বিবিধ মহাপুরাণ ও উপপুরাণগুলি যে উদ্দেশ্যে রচিত হয় এই বাংলা মঙ্গল-কাব্যগুলিও সেই উদ্দেশ্যেই সর্ব্বপ্রথম রচিত হইতে আরম্ভ করে। মহারাজ অশোকের সময় হইতে সমগ্র ভারতময় যে বৌদ্ধধর্ম্মের একাধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহারই প্রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্যে এতদ্দেশীয় সাধারণ জনগণের অবলম্বিত ধর্ম্মবিশ্বাস ও হিন্দুধর্ম্মের মূলগত আদর্শ এই উভয়ের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভারতে এক নব সংস্কারপ্রবুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের উন্মেষ হইয়াছিল। সেই যুগে বেদ-উপনিষদোক্ত ব্যক্তিসত্ত্বাহীন ভাব-সর্ব্বস্ব দেবতাগণ নিজেদের কল্পিত গুণাবলীর উপর বাস্তবরূপ আরোপ করিয়া লইয়া ভারতের কর্ম্মভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন।

সংস্কৃত পুরাণ ও মঙ্গল কাব্য

কারণ, ইতিপূর্ব্বে বুদ্ধদেব নিজের জীবনের ব্যক্তিগত কর্ম্মসাধনার ভিতর দিয়া একটা প্রতিকূল সমাজের বুকে নিজের ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন ; দুঃখময় সংসারের ধূলিজালে নিজের দেহ মলিন করিয়া মানবের দুঃখ-বেদনাকে ব্যক্তিগত জীবনে অনুভব করিয়াছেন। অতএব এই যুগে বৈদিক হিন্দুধর্ম্মের যখন সংস্কারের প্রয়োজন হইল তখন হিন্দুর দেবতাদিগকেও আর কল্পনার স্বর্গলোক-বিহারী করিয়া রাখা চলিল না। তাঁহাদিগকেও স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যের সমাজে মানবের মেলায় নিজেদের কর্ত্তব্য সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হইল। এই বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়াই খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে সংস্কৃত পুরাণগুলি রচিত হইতে থাকে ; এবং প্রত্যেক পুরাণেই এমনই এক একজন কল্পিত কর্ম্মশক্তিমান দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে পৌত্তলিকতার জন্ম যে দিনই হইয়া থাকুক পৌরাণিক যুগেই যে তাহার প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

সমাজে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা

বঙ্গদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলেও জানিতে পারা যায় যে, এই দেশ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ প্রভাবে একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া ছিল। ইহার পূর্ব্বে বৌদ্ধ পালরাজগণ প্রায় এইদেশে চারিশত বৎসর রাজত্ব করেন। মধ্যভারতে যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল বঙ্গদেশে সেই বৌদ্ধধর্ম্মেরই শাখা-বিশেষ নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতেও অধিক দূর অগ্রসর হইতে হয় না। বঙ্গদেশের অনতিদূরবর্ত্তী বিহার প্রদেশই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম উদ্ভব-ভূমি এবং মধ্য ভারতের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার বহুকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের এই প্রথম উদ্ভব-ভূমি

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্ম

বিহার প্রদেশ অতিক্রম করিয়া বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে নাই। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে আর্য্য ভাষার সহিত আর্য্য সংস্কারও কিছু কিছু এ'দেশে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিতেছিল। এমন কি, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান্ চুয়াঙ উত্তর বঙ্গে মহাযান-হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম ইত্যাদির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকেও বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী ধর্ম্ম বলিয়াই লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তথাপি ইহাও স্বীকার্য্য যে, পরবর্ত্তী বৌদ্ধ পালরাজগণের চারিশত বৎসর রাজত্বের ফলে এদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিস্তৃতি অনেকটা প্রতিহত হইয়াছিল কারণ, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই তাহা পুনরায় রাজশক্তির সহানুভূতি-বঞ্চিত হইল। এই পাল রাজগণের সময় হইতেই বঙ্গদেশে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মমতের সহিত পশ্চিম ভারতের নাথ সম্প্রদায় মিলিত হইতে আরম্ভ হয়। তাহারই ফলে পূর্ব্ববঙ্গ ও বরেন্দ্রভূমিতে এই উভয় সম্প্রদায়ের মিশ্র কতকগুলি লৌকিক ধর্ম্মমতের উদ্ভব হয়। রাঢ় (পশ্চিম বঙ্গ) ও সুহ্ম (দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ) দেশে সেনরাজদিগের বহুকাল পর পর্য্যন্তও অনার্য্য ও দ্রাবিড় প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সেনরাজদিগের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এই দেশের সামাজিক জীবনের উপর পুনরায় ক্রমে ক্রমে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম তৎকালীন বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার সম্মুখীন হইয়া বিভিন্ন আদর্শের দিক্ হইতে আবার নূতন সংস্কৃতি লাভ করিতে লাগিল। তাহাতেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন লৌকিক ধর্ম্মমতগুলির সৃষ্টি হয়। ক্রমে সমাজের উপর মূল হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব যতই প্রবল হইতে আরম্ভ করিল

বাংলার সমাজে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব

প্রাচীন বঙ্গের বিভিন্ন ধর্ম্মমত

ততই এই বিভিন্ন-মুখী লৌকিক ধর্ম্ম সম্প্রদায়গুলি এক কেন্দ্রগত আদর্শের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহারই ফলে বর্ত্তমান বাংলার হিন্দু সমাজে পঞ্চোপাসক হিন্দু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

সেনরাজদিগের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইতেছিল সত্য কিন্তু এতকালের একটা দেশীয় ধর্ম্ম-সংস্কৃতিও—যাহা জাতির একেবারে মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল—মুখ্যতঃ না হউক গৌণতঃ হইলেও এই সমাজ-দেহেই রহিয়া গেল। সেকালের বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক জীবনের এই সন্ধিযুগে, দেশীয় প্রাচীন সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নূতন আদর্শ এই উভয়ের সংঘাত-মুহূর্ত্তে বাংলা পুরাণ বা মঙ্গলকাব্যগুলি সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সমাজে ক্রমে পুরাতন ধর্ম্ম বিশ্বাসের মূল শিথিল হইতে লাগিল, নবাগত আদর্শের প্রতি তাহার আশা ও আশ্বাস স্থাপিত হইল সত্য, তথাপি রক্ষণশীল এই সমাজ পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিল না; তাহারা নূতনকে যে ভাবে গ্রহণ করিল তাহা পুরাতনেরই রূপান্তর মাত্র হইল; এই দেশীয় প্রচলিত ধর্ম্ম-সংস্কারই যুগোচিত পরিমার্জ্জনা মাত্র লাভ করিয়া সমাজের অন্তস্তলে প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজ করিতে লাগিল।

সেন রাজদিগের আমলে বাংলার সমাজ

মঙ্গলকাব্যের পরিকল্পনা

মঙ্গলকাব্যগুলি এই নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিয়া পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটি সংস্কারকে এক সূত্রে গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সহিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কি ভাবে এক দেহে লীন হইয়া আছে মঙ্গল কাব্যগুলি পাঠ করিলে তাহাই জানিতে পারা যায়। এইজন্য এদেশের সামাজিক ইতিহাস রচনায় এই জাতীয় সাহিত্যের মূল্য অপরিসীম বলিতে হইবে।

প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্যের সময়নির্দ্দেশ স্পষ্টতঃ সম্ভব না হইলেও ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত বাংলার সমাজের উপর যখন সর্ব্বপ্রথম হিন্দু রাজত্বের ও তাহার অনতিকাল ব্যবধানেই মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইল তখনই এই শ্রেণীর সাহিত্যেরও জন্ম সূচিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী নবদ্বীপের অবস্থা বর্ণনায় চৈতন্য ভাগবতের কবি বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন যে, নবদ্বীপের লোক,

মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবকাল

"মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জনে॥"—চৈতন্যভাগবত, আদি।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বেই এই মঙ্গলচণ্ডীর গীত ও বিষহরীর গান দেশে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের কথা। অতএব এই পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে সাহিত্য সমাজে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে তাহার জন্ম অন্ততঃ নিশ্চিতই দুই শতাব্দী পূর্ব্বে সম্ভব হইয়াছিল, এমন কল্পনা করা অযুক্তিসঙ্গত হইবে না। এই ত্রয়োদশ শতাব্দীকেই মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব-যুগ বলিবার আর একটা কারণ, এই সময়েই বঙ্গদেশে মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির প্রথম প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই রাষ্ট্রপোষিত মুসলমান ধর্ম্মমতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেশের আপামর জনসাধারণ আপনাদিগকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিতেছিল। "তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব-পীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায়, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্য্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল এবং দুঃখক্লেশকে

তৎকালীন সামাজিক অবস্থা ও মঙ্গলকাব্য

ভাঙ্গাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল। এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ—কিছু সান্ত্বনা আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না। এই চেষ্টা সাহিত্যকে তাহার বিশেষ দেশকালের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না।”*

এই অসহায় পর-পীড়িত জাতি অল্পকাল মধ্যেই জীবনের সর্ব্বপ্রকার উচ্চতর আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল, নিজের মধ্যে নিজের পরিত্রাণের পথ খুঁজিতে গিয়া সকল রকমে দৈব-সহানুভূতির উপর আত্মসমর্পণ করিয়া রহিল। সামাজিক জীবনের এই অবস্থা হইতেই বাংলা মঙ্গল-কাব্যগুলির জন্ম হইয়াছিল।

ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনও এই সম্পর্কে বলিয়াছেন,—

মঙ্গলকাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য

“লৌকিক দেবতাগণের পূজাপ্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। যেখানে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, সেইখানেই একটি দুর্ব্বলের সহায় দেবতার আবশ্যক হয়। শিশুদিগের রক্ষা করিবার জন্য চিন্তিতা মাতা কিম্বা পিতামহীর দুর্ব্বলতাসূত্রে ষষ্ঠী কল্পিত হইলেন। চণ্ডিকা ও হরি চির-প্রসিদ্ধ দেবতা; কিন্তু বিপদনিবারণার্থ ও আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে এই দুই দেবতা ঈষৎ নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দুর্ব্বলের সহায়রূপে উপনীত হইলেন; একজনের নাম হইল মঙ্গলচণ্ডী, আর একজনের নাম হইল সত্যনারায়ণ। এই চণ্ডী শুধু বিপদত্রাণকারিণী; ইনি বসন্তকালে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যে মধু মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, কিম্বা যে বেশে ব[illegible] [illegible]আলয়ে আগমন করেন, [illegible]খানে সে বেশে আসেন নাই—এখানে ইনি শুধু বরাভয়দাত্রী, [illegible]। সত্যনারায়ণ বালগোপাল কিম্বা কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ দেবতা; [illegible] সম্পদদাতা কুবেরস্থানীয়।”১

---

* সাহিত্য—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১ [illegible] গাথা ও সাহিত্য।

আর্য্যসভ্যতা এদেশে স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এই দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে যে ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। একটি প্রবল নূতন ধর্ম্মমতের সম্মুখীন হইয়া এই সমস্ত লৌকিক ধর্ম্মোক্ত দেবতারা যুগোচিত নব নব কলেবর ধারণ করিতেছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া লৌকিক শিব, মনসা, চণ্ডী, কালিকা, শীতলা, ধর্ম্মঠাকুর, দক্ষিণরায় প্রভৃতি দেবতারা উচ্চবর্ণের হিন্দুর সমাজে একটুকু আসন লাভের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাঁহাদের এই লক্ষ্য-সাধনপথে তাঁহারা মানবেরও অধম সমস্ত নীতির অনুসরণ করিতেছিলেন। একমাত্র বঙ্গদেশের পক্ষেই যে এমন ঘটিয়াছিল তাহা নহে। আর্য্যগণ যেদিন তাঁহাদের নিজস্ব প্রবল শক্তি ও সংস্কার লইয়া ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশ লাভ করেন প্রকৃতপক্ষে সেইদিন হইতেই এই দেশে এই সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল। আর্য্য ও অনার্য্যের দ্বন্দ্ব, আর্য্যদেবতা ও অনার্য্যদেবতার দ্বন্দ্ব, তাহাদের পরবর্ত্তী মিলন এই সমস্ত কাহিনীই যেমন ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্য বহন করিতেছে, বাঙ্গলার মঙ্গল কাব্যগুলিও তেমনি পৌরাণিক দেবতা ও এতদ্দেশীয় লৌকিক দেবতার দ্বন্দ্ব ও মিলনের কাহিনী লইয়া রচিত।

আর্য্য ও বাংলার লৌকিক সংস্কার

লৌকিক ধর্ম্মের উপর একটা পৌরাণিক আভিজাত্য আরোপ করাই এই জাতীয় সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই লৌকিক ধর্ম্মগুলিই বাংলার নিজস্ব প্রাচীন ধর্ম্মমত। এই সমস্ত লৌকিক ধর্ম্মমতের উদ্ভবের ইতিহাস পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

লৌকিক দেবতাদিগের মধ্যে শিব সর্ব্বপ্রাচীন। এই শিব বাঙ্গালীর নিজস্ব সৃষ্টি,—এক সম্পূর্ণ আভিজাত্যহীন লৌকিক দেবতা। বাংলা কৃষি-

প্রধান দেশ; বাংলার প্রাচীনতম প্রবচনগুলি, যাহা খনার বচন বলিয়া পরিচিত, যেমন কৃষি-বিষয়ক তেমনি বাঙ্গালীর প্রাচীনতম দেবতাও কৃষিকার্য্যেরই সহায়ক। বাংলা সাহিত্যে শিব এই কৃষকেরই দেবতা, নিতান্ত সাধারণ-বুদ্ধি গ্রাম্য-কবির স্থূলসৃষ্টি। শিবের সম্বন্ধে এই ধারণা বাঙ্গালীর হৃদয়ে এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, পরবর্ত্তী কালে শিবের পৌরাণিক আদর্শ যখন এই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে গেল তখনও তাহারা এই পৌরাণিক শিবকে তাহাদের নিজস্ব দেবতার সহিত একেবারে অভিন্ন করিয়া ফেলিল।

বাংলার প্রাচীনতম লৌকিক দেবতা

এমন কি, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য কৃত 'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গল' কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৌরাণিক শিব এদেশে আসিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া তাহার হাতের ত্রিশূল ভাঙ্গাইয়া কৃষিকার্য্যের উদ্দেশ্যে জোয়ালি, কোদাল, ফাল ইত্যাদি চাষের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া লইতেছে,—

কৃষকের দেবতা শিব

"ঈশ্বরীর ইচ্ছায় বিশাই পায় পড়ে।
লাঙ্গল জুয়ালি মই সত্ত দিল গড়ে॥
পূর্ব্বে পরামর্শ ছিল পার্ব্বতীর সাথে।
শূলে হ'তে শূলী শূল দিল তার হাথে॥
শাল পাতি শূল ভাঙ্গি সজ্জা কর বসি।
জোয়ালি কোদাল ফাল দা উখুন পাশী॥
তুলে করে শূলে ধরে তৌলিল তখন।
ঠিক সারা হৈল থারা দু'শ দশ মণ॥
কায় কত দিব? দিবে যায় যত সয়।
বিবরিয়া বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বনাথে কয়॥
পাঁচ মনে পাশী করি আশী মোণে ফাল।
দু মোণের দু জলুই অর্দ্ধেকে কোদাল॥

দশ মোণের দা অষ্ট মোণের উখুন।
দু'শ দশ মোণে দেখ করিয়া একুন॥
বুঝে পশুপতি অনুমতি দিলা তারে।
বিশাই বসাইল শাল শিবের গোচরে॥

এই ভাবে কৈলাসেশ্বর শিব শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিয়া কৃষিবৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইহার অর্থ এই যে, পৌরাণিক আদর্শের উপর বাঙ্গালীর জাতীয় আদর্শ জয়লাভ করিল।

মঙ্গল-কাব্য ও নাথ সাহিত্য

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রধানতঃ বৌদ্ধ পালরাজদিগের রাজত্ব-সময়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নাথ-সাহিত্য নামে যে এক বিরাট সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল তাহার সহিত মঙ্গল কাব্যের কোন সংশ্রব নাই। কিন্তু শিব দেবতাটির এই লৌকিক রূপের সহিত নাথ-সাহিত্যেও পরিচিত হওয়া যায়। নাথধর্ম্ম বাঙ্গালা দেশের বাহিরের ধর্ম্ম। এই নাথধর্ম্ম এই দেশে প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গীয় সমাজে এই কৃষিরূপী লৌকিক শিব-দেবতার অস্তিত্ব ছিল।* যাই হউক, নাথ-সাহিত্য ও পূর্ব্ববর্ত্তী লৌকিক সংস্কার হইতে এই শিব মঙ্গলকাব্যে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিল। ক্রমে এই দেবতার উপর পৌরাণিক প্রভাব বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইল এবং সমাজে শিবের পৌরাণিক শান্ত সমাধি মূর্ত্তিরই প্রতিষ্ঠা হইল।

বৌদ্ধযুগে শিব বাঙ্গালী কৃষকের সাহচর্য্যে আসিয়া যে কর্ম্ম তৎপরতা দেখাইয়াছেন তৎপরবর্ত্তী যুগেই তাহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতে লাগিল। তাহারই ফলে ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই বাংলা সাহিত্যে শিবের প্রাধান্য হ্রাস পাইতে থাকে। এই যুগে রাজনৈতিক কারণে বাংলার সামাজিক জীবনের উপরও যে তীব্র এক বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল

* পরবর্ত্তী অধ্যায়ে 'লৌকিক শৈব-ধর্ম্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য

তাহারই জন্য বাঙ্গালী তাহার সামাজিক জীবনের আদর্শকে পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এই মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য,—"বস্তুত সাংসারিক সুখ দুঃখ বিপৎ সম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবতার বিচার করিতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিঁকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ তখন চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন যে দেবতা ইচ্ছা-সংযমের আদর্শ তাঁহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দুর্গতি হইলেই মনে হয়, আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ সমস্ত ভুলিয়া বসিয়া আছেন। চণ্ডীর উপাসকেরাই কি সকল দুর্গতি এড়াইয়া উন্নতি লাভ করিতেছিলেন? অবশ্যই নহে। কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তি পূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। আমারই প্রতি বিশেষ অকৃপা, ইহার ভয় যেমন আতঙ্ক, আমারই প্রতি বিশেষ দয়া ইহার আনন্দও তেমনি অতিশয়। কিন্তু যে দেবতা বলেন, সুখ-দুঃখ, দুর্গতি সদ্গতি ও কিছুই নয়, ও কেবল মায়া, ও দিকে দৃক্‌পাত করিও না, সংসারে তাহার উপাসক অল্পই অবশিষ্ট থাকে;—সংসার মুখে যাহাই বলুক, মুক্তি চায় না, ধনজনমান চায়! ধনপতির মত ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না, বহুতর নৌকা ডুবিল, ধনপতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা ছাড়িয়া শক্তি-উপাসক হইতে হইল।"—সাহিত্য। এই নিশ্চেষ্ট, ভক্তের ঐহিক দুঃখে উদাসীন শিবের বিরুদ্ধে শক্তির প্রতিষ্ঠা লইয়াই মঙ্গলকাব্যগুলির জন্ম হয় সত্য, কিন্তু পরিণামে সমাজে না হউক অন্ততঃ

শক্তি-দেবতার পরিকল্পনা

শিবের নিশ্চেষ্টতা ও তাহার পরিণাম

সাহিত্যে শিবের আদর্শেরই জয় লাভ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্য ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা মঙ্গলে' আমরা পৌরাণিক শিবেরই প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই।

প্রথম যুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে লৌকিক দেবতারই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে কিন্তু পরবর্ত্তী মঙ্গল-কাব্যগুলিতে সংস্কৃত পুরাণোক্ত দেবতারা আসিয়া লৌকিক দেবতাদিগের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন। সেইজন্য পরবর্ত্তী মঙ্গল কাব্যগুলি মৌলিকতা বর্জ্জিত এবং সংস্কৃত পুরাণগুলিরই অন্ধ অনুকৃতি মাত্র। 'অন্নদা-মঙ্গল', 'গঙ্গা-মঙ্গল', 'দুর্গা-মঙ্গল', 'ভবানী-মঙ্গল' প্রভৃতি এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত।

মঙ্গলকাব্যে লৌকিক দেবতা

প্রথমোক্ত শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের দেবতাগণ সকলেই অনার্য্য নিম্নশ্রেণীর দেবতা। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় সর্ব্বপ্রথম প্রমাণ করিলেন, পশ্চিম বঙ্গে বর্ত্তমানে উচ্চবর্ণের হিন্দুর গৃহেও পূজিত এবং ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যসমূহে কীর্ত্তিত ধর্ম্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ দেবতা—বৌদ্ধ ত্রিশরণের অন্তর্গত 'ধম্ম' বা 'ধর্ম্ম'।* ডোম জাতীয় লোকই এই দেবতার সর্ব্বপ্রথম পূজারী। এতদ্ব্যতীত মঙ্গলচণ্ডী বা চণ্ডী, মনসা বা বিষহরী, ষষ্ঠী প্রভৃতিও সমাজের উচ্চস্তরে কদাচ পূজিত হইতেন না। ব্যাধ-সন্তান কালকেতু চণ্ডী পূজার প্রচারক, সমাজে যাহার প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব ছিল এমন চাঁদ সদাগরকে দিয়া পূজা করাইয়া নিজের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবার জন্য মনসার চেষ্টার আর অবধি নাই। জল অনাচরণীয় নীচ জাতি ব্যতীত উচ্চবর্ণের হিন্দুগৃহে এই দেবতাদিগের কেহ কেহ একমাত্র স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতেই পূজা

সমাজে লৌকিক দেবতার স্থান

* Discoveries of Living Buddhism in Bengal—Mm. Haraprasad Sastri.

পাইতেন। "মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, সত্যনারায়ণ, দক্ষিণের রায়—ইহারা বাঙ্গালীর ঘরের দেবতা। ইহাদের শাস্ত্র বঙ্গভাষায় লিখিত, বঙ্গীয় গৃহস্থ বধূগণই ইহাদের পূজার উৎকৃষ্ট পুরোহিত; ইহাদের ছড়া পাঁচালী মুখস্থ করা গৃহস্থ বধূগণের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণিত ছিল; ইহারা কেহ সপ্তাহান্তে কেহ মাসান্তে খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে এখনও পূজা পাইয়া থাকেন"।* পুরুষ-সমাজ ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে লৌকিক দেবতার পূজা পরিত্যাগ করিয়াছিল কিন্তু রক্ষণশীল স্ত্রীসমাজের মধ্যে তাহাদের অস্তিত্ব রহিয়া গেল। ইহার আর একটা বিশেষত্ব এই যে, লৌকিক দেবতার মধ্যে একমাত্র ধর্ম্মঠাকুর ও দক্ষিণরায় ব্যতীত সকলেই স্ত্রী-দেবতা, সেইজন্যও কতকটা স্ত্রীসমাজের মধ্যে তাহাদের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। এই লৌকিক স্ত্রীদেবতাগণ যদি স্ত্রীলোকের পূজা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন তাহা হইলে বাংলার মধ্যযুগের সাহিত্য এই মঙ্গলকাব্যের নিদর্শন হইতে হয়ত সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইত। তাহারা ক্রমে স্ত্রীসমাজে শঙ্কটতারিণী বরাভয়দাত্রীরূপে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া স্ত্রীসমাজেরই সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়া পুরুষের নিকট নিজেদের পূজার দাবী উপস্থিত করিল। কারণ, সমাজে পুরুষই শ্রেষ্ঠ এবং পুরুষ কর্তৃক স্বীকৃত না হইলে সমাজের মধ্যে তাহাদের চিরদিনের জন্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না।

লৌকিক দেবতার বৈশিষ্ট্য

কিন্তু নব আর্য্যসংস্কার-দীক্ষিত পুরুষ স্ত্রীদেবতার পূজা স্বীকার করিতে চাহিল না। মনসা মঙ্গলের চাঁদ সদাগর এই মঙ্গল কাব্যসমূহের দেবদ্রোহী পুরুষ-চরিত্রের প্রতিনিধি স্বরূপ। তাহার সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচিত হইবে। এই যে দৈব ও পুরুষ-কারের দ্বন্দ্ব, এবং পরিণামে দৈবের নিকট বিরাট পুরুষ-শক্তির শোচনীয় পরাজয় ইহারই উপর মঙ্গল কাব্যসমূহের কাহিনী-ভাগ প্রতিষ্ঠিত।

পুরুষ ও স্ত্রী-দেবতা

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই জল এবং অরণ্যাকীর্ণ বাংলার নিম্নভূমিতে যেমন সর্পভীতি নিরাকরণের জন্য সর্পদেবতা বিষহরী বা মনসার কল্পনা করা হইয়াছিল তেমনই স্মরণাতীত কাল হইতেই এদেশে ব্যাঘ্রভীতি নিবারণের জন্য ব্যাঘ্রেরও দেবতা, কালুরায় দক্ষিণরায় প্রভৃতির কল্পনা করা হইয়াছিল। প্রায় অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যের নায়ককেই সর্প কুম্ভীর ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জন্তুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। তারপর, বসন্ত-ওলাওঠা বঙ্গ-দেশের নিত্যব্যাধি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই ব্যাধির প্রতিষেধকও কয়েকটি দেবতার কল্পনা করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে শীতলা, ওলাঝোলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত লৌকিক দেবতা বাংলার মাটিতে এখনও বাস করিতেছেন সত্য কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে এখন পর্য্যন্ত পূজা লাভ করিতে পারেন নাই। নিম্নশ্রেণীর, নবশাখ সম্প্রদায়ের জল অনাচরণীয় পুরোহিতগণ ইঁহাদের পূজার কার্য্য সম্পন্ন করেন। কোন কোন মঙ্গলকাব্যে ইঁহাদেরও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে কিন্তু এই সমস্ত দেবতার মঙ্গলকাব্য রচনায় কোন শক্তিমান কবি হস্তক্ষেপ করেন নাই বলিয়া তাহাদের পূর্ণ স্বরূপ আজ পর্য্যন্তও লোকচক্ষুর অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছে।

বাংলার প্রকৃতি ও লৌকিক দেব-কল্পনা

বাংলার বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী হইতে এই সমস্ত লৌকিক দেবতা পরিকল্পিত হইয়াছিল। সেইজন্য পরবর্ত্তী কালে বাঙ্গালীর সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্ম্মের সমুচ্চ মন্দিরেও ইঁহাদের জন্য কিঞ্চিৎ স্থান দান করিতে হইল।

এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর উদ্ভবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই গ্রন্থের যথাস্থানে বিবৃত করা হইয়াছে এবং প্রাচীন বাংলা ও অন্যান্য সাহিত্য হইতে তাহাদের সম্বন্ধে যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহারও যথাসম্ভব উল্লেখ করা হইয়াছে। একটি কথা ইঁহাদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রণিধানযোগ্য

এই যে, এই সমস্ত লৌকিক দেবতার স্বাতন্ত্র্য বাংলার সমাজে বহুকাল স্থায়ী হয় নাই। কারণ, এই সমস্ত সঙ্কীর্ণতামূলক সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের উপর দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের কুলপ্লাবিণী বন্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে এই সমাজের প্রায় সমগ্র সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের মূল শিথিল হইয়া পড়ে।

লৌকিক দেবতার পরিণাম

বৈষ্ণব সাহিত্যে কল্পিত রাধিকার মাধুর্য্য শাক্ত চণ্ডীর উগ্রতাকে নমনীয় করিয়া দিয়া ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর মনে আগমনী বিজয়া প্রভৃতির করুণ ঝঙ্কার তুলিয়া দিয়াছে। নৃমুণ্ডমালিনী খর্পরধারিণী কালিকামূর্ত্তি ভক্ত রাম-প্রসাদের ভাব-কল্পনায় অপূর্ব্ব স্নেহশালিনী মাতৃমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই জন্য পরবর্ত্তী মঙ্গলকাব্য সমূহে বাংলার সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাসের কোন ইঙ্গিত অপেক্ষা একটা চিরাচরিত পর্য্যুষিত প্রথারই নিয়মিত অনুকৃতি মাত্র দেখিতে পাই। যে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য লইয়া খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে এই মঙ্গল-কাব্যগুলির রচনা আরম্ভ হইয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই প্রায় সেই উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হইয়া যায়। তাহারই ফলে দেখিতে পাই, ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী নিজে বৈষ্ণব* হইয়াও শাক্তের দেবতা চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া মঙ্গলকাব্য লিখিতেছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তখন হইতেই মঙ্গলকাব্য-রচনা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত হইয়া একটা বিশিষ্ট সাহিত্য-রচনার আদর্শ মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী মঙ্গলকাব্যগুলির একটা বিশেষ স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গল-কাব্য

পরবর্ত্তী মঙ্গলকাব্য সমূহের বিশেষত্ব

---

* 'মুকুন্দরামের ধর্ম্মমত'—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সন। অবশ্য এই সম্বন্ধে মতভেদও দৃষ্ট হয়,—'Religion of Kavikankan Mukundaram ChakraBarty,' Basanta Kumar Chatterjee, I. H. Q. Vol. VI.

এই মঙ্গলকাব্যগুলি হইতে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যে কোন কোন পুরাণের যেমন ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করিতে পারা যায় না তেমনি বাংলার প্রাচীনতম মঙ্গল-কাব্য গুলিও এমন অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের আধার। তাহা এই গ্রন্থের স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক ইহা স্বীকার্য্য যে, বৈষ্ণবের জীবন চরিত ও পদাবলী সাহিত্য এদেশে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে দুই একখানি রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের অনুবাদ ব্যতীত মঙ্গলকাব্যই এই দেশের একমাত্র সাহিত্য-বস্তু ছিল। প্রত্যেক দেশের মতই বঙ্গদেশেও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সেইজন্যই এই জাতীয় প্রাচীনতম সাহিত্য সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার ফলে সেই ভাব যখন মঙ্গলকাব্যগুলি হইতে কতকটা হ্রাস পাইয়া আসিল তখনই ইহাদের প্রকৃত সাহিত্যিক মূল্যও রসিক-সাধারণের কাছে ধরা পড়িল। বঙ্গদেশে এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুকাল পর পর্য্যন্তও এই মঙ্গল-কাব্যই এই জাতির হিন্দু সম্প্রদায়ের কবি-প্রতিভা বিকাশের একমাত্র ক্ষেত্র ছিল। সেইজন্যই পরবর্ত্তী মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে আমরা বাংলার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবি-মনের পরিচয় পাই।

মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য

বাংলার মধ্যযুগের প্রথম ভাগে বৈষ্ণব ও শাক্তের মিলন পরবর্ত্তী সময়ের মত এত ঘনিষ্ঠ ছিল না। শাক্তেরা বৈষ্ণবদিগকে যে কতদূর অবজ্ঞা ও ঘৃণার চক্ষে দেখিত তাহার প্রমাণ বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয়ের গ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া যায়। এই সমস্ত সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাস ব্যতীতও এই মঙ্গল-কাব্যগুলি হইতে তৎকালীন দেশের রাজনৈতিক অবস্থারও কতক আভাস পাওয়া যায়। মনসা-মঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হাসান

হোসেনের পালা, চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্গত অনার্য্য ব্যাধকর্ত্তৃক শৈবরাজ্য কলিঙ্গ আক্রমণের কাহিনী, ধর্ম্মমঙ্গলের অন্তর্গত ডোম সেনাপতির সাহায্যে লাউসেনের ঢেকুর-বিজয় ইহাদের মধ্যে সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসেরও একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মঙ্গল কাব্যগুলিই এক কালে বাংলার সমগ্র হিন্দু-সম্প্রদায়ের সাহিত্য-রচনার একমাত্র আদর্শ ছিল। সেইজন্য সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ মৌলিক সাহিত্যও এক কালে এই জাতীয় কাব্যের মধ্য দিয়াই রচিত হইয়াছিল। মুকুন্দরাম, ঘনরাম, ভারতচন্দ্রের মত প্রথম শ্রেণীর কবি-কল্পনা এই জাতীয় কাব্যের মধ্যেই সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, কালক্রমে মঙ্গলকাব্যগুলি একটা নির্দ্দিষ্ট বিশেষত্ব-বর্জ্জিত বাঁধা-ধরা নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যে গিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যেও প্রকৃত কবি-প্রতিভা বিকাশের অন্তরায় কোন দিনও ঘটে নাই। তাহা হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ভারতচন্দ্রের মত সত্যিকার প্রতিভা-সম্পন্ন একজন কবির সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটিত না; এই মঙ্গলকাব্যের বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যেই ভারতচন্দ্রের সহিতও আমাদের পরিচয় হয়।

মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিক মূল্য

প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িকতার নিম্নস্তর হইতে উদ্ভূত হইলেও কালক্রমে যখন এই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গল কাব্যগুলি সাহিত্যের উচ্চতর আদর্শের সেবায় নিয়োজিত হইল তখনই এই শ্রেণীর কয়েকখানি কাব্য জাতীয় মহাকাব্য (National Epic) হিসাবে স্থান পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিল। পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিই তাহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। একটা বহু সম্প্রদায়-বিশিষ্ট বিরাট জাতির বিভিন্নমুখী চিন্তাধারার সুন্দর

মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিক সার্থকতা

ন্বয় সাধন করিয়া এই জাতীয় মঙ্গলকাব্যগুলি বিশৃঙ্খল সমাজের মধ্যে ক ঐক্যের সন্ধান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। তাহারই ফলে দেখিতে ই, উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ-কবি অস্পৃশ্য ব্যাধ-সন্তানকে তাঁহার কাব্যের নায়ক রিয়া তাহাকে শৌর্য্যে বীর্য্যে মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন; 'জাতি যায়', ই আশঙ্কা সত্ত্বেও অস্পৃশ্য ডোম পুজিত প্রচ্ছন্ন বুদ্ধদেবতা ধর্ম্ম ঠাকুরকে জের আরাধ্য বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন করিয়া কল্পনা করিতেছেন। পরবর্ত্তী ঙ্গল-কাব্যগুলির এই যে মঙ্গল আদর্শ তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষম কবিদিগের ীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া বাঙ্গালী কবির ঙ্গল-কাব্যের পরিকল্পনাকে 'পরিণাম-রমণীয়' করিয়া দিয়াছে।

কোন জাতীয় মহাকাব্যে সেই জাতির সমসাময়িক সংস্কৃতির সহিতই আমরা পরিচয় লাভ করি তাহা নহে, তাহাতে জাতীয় জীবনের নিত্য কালের যাহা বিশেষত্ব তাহারও সন্ধান পাওয়া যায়। এই জাতীয় মহাকাব্যের (National Epic) অভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে এই মঙ্গল-কাব্যগুলিই কতক রিমাণে পূরণ করিয়াছে। এই কাব্যগুলির মধ্যে সুন্দর সুসঙ্গত জাতীয় রিত্র সৃষ্টির প্রয়াসও দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা, ভাঁড়ু ত্ত, মুরারি শীল, ধর্ম্মমঙ্গলের কর্পূর সেন, মহামদ পাত্র, মনসামঙ্গলের নকা, ইঁহারা বাঙ্গালী গৃহের নিত্য-কালের চিত্র। এই সমস্ত চরিত্র াত্রণে মঙ্গল কাব্যের কবিরা সুদূর দেব-লোকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া খেন নাই, বাঙ্গালীর নিত্য পরিচিত গৃহাঙ্গন হইতে ইঁহাদিগকে তুলিয়া ইয়া সাহিত্যে অমরতা দান করিয়াছেন। এই চরিত্রগুলির সহিত রিচিত হইয়া আমরা প্রাচীন কালের সহিত আধুনিক কালের যোগ ত্র রচনা করিতে পারি এবং সেই সুদূর অতীতেও পরিচিত পদধ্বনি

বাংলার জাতীয় মহাকাব্য

শুনিয়া চমকিত হই। এই হিসাবে ইহাদিগকে বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য বলা যাইতে পারে।

এই সমস্ত মঙ্গল-কাব্যের বিষয়-বস্তুগুলির উপর যখন বৈষ্ণব পদাবলীর স্নিগ্ধ মধুর রস বর্ষিত হইতে লাগিল তখনই তাহা খণ্ড খণ্ড গীতি কবিতায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। বাংলা কাব্যের ধারা তখন হইতে এক স্বতন্ত্র প্রবাহে আপনার পথ খুঁজিয়া পাইল। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেও একবার উল্লেখ করিয়াছি। এই সমস্ত খণ্ড গীতি-কবিতার মধ্যেও বাঙ্গালীর চিরন্তন ভাব-গতি অপ্রতিহত রহিয়া গেল। আগমনীর গানে বাঙ্গালী কবির যে একটি অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যেই তাহার প্রথম স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। এইজন্য দেখিতে পাই মঙ্গলকাব্য ও তাহার পরবর্ত্তী গীতি-কবিতাগুলি এক যোগসূত্রে আবদ্ধ।

মঙ্গলকাব্যের পরিণতি

রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত-পুরাণ অনুবাদের ভিতর দিয়া বাংলা সাহিত্যের জন্ম সূচিত হয়; এই মৌলিকতাহীন বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত অনুবাদ কার্য্যের মধ্যেই বাংলার কয়েকজন প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ কবিকে নিজেদের শক্তি নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইয়াছে। তাহার ফলে তাঁহাদের মৌলিক কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইবার পথে দুরপনেয় বাধার সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে। অতঃপর বৈষ্ণব সাহিত্যে যখন জীবন-চরিত কাব্য রচনার সূত্রপাত হইল তখনও তাহা হইতে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব মুক্ত করিয়া বৈষ্ণব কবির সহজ কবি-প্রাণতার পরিচয় উদ্ধার করা গেল না। সেইজন্য এই জাতীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্পূর্ণ এক-দেশ-দর্শী সাম্প্রদায়িক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া রহিল। তারপর পদাবলীর খণ্ড কাব্যেও ব্যক্তি-অনুভূতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশ করা হইতে লাগিল, তাহাতেও বাঙ্গালীর কোনও সমাজেরই

অনুবাদ সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য

জাতীয় বৈশিষ্ট্য সমগ্রভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতে পারিল না। তাহা হইলে মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে আর বাকি রহিল মাত্র মঙ্গলকাব্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলার জাতীয় মহাকাব্যের অভাব পূর্ণ করিয়াছে।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিকে পশ্চিম বঙ্গের জাতীয় মহাকাব্য (National Epic) বলা যাইতে পারে।[১] এখানে কি ভাবে যে একটা জাতীয় ঐতিহাসিক কাহিনী মঙ্গলকাব্যের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহার পরিচয় দিব। বহু প্রাচীনকাল হইতেই রাঢ়ভূমিতে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল হইতে স্বতন্ত্র একটা সামাজিক জীবনের আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি বিশেষ করিয়া রাঢ়ভূমিরই বস্তু। সেইজন্য এই কাব্যে চরিত্র সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য বিষয়বস্তুতেও একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

ধর্ম্মমঙ্গল—পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় মহাকাব্য

পশ্চিম বঙ্গ বা রাঢ়দেশ বহু প্রাচীনকাল হইতেই প্রবল অনার্য্য জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। বিহার প্রদেশ হইতে আর্য্য-সভ্যতা সর্ব্বপ্রথম উত্তরবঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছিল, এই উত্তর বঙ্গ-পথেই আর্য্যসভ্যতা য়ুয়ান্ চুয়াঙের সময়েই কামরূপ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। সেইজন্য বহুকাল পর্য্যন্ত রাঢ় প্রদেশ অনার্য্য জাতিরই বাসভূমি রহিয়া গিয়াছিল, এমন কি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্য্যন্ত লিখিত মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ব্যাধ কালকেতু নিজের সম্বন্ধে এই প্রকার পরিচয় দিতেছে,—

পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক বৈশিষ্ট্য

"অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়ার।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়॥"—কবিকঙ্কণ চণ্ডী

তারপর আরও বলিতেছে,—

"ব্যাধ গোহিংসক রাঢ়, চৌদিকে পশুর হাড়"—ঐ

এই সমস্ত হইতেই জানা যাইবে যে, বাঙ্গালার কেন্দ্রীয় যে সভ্যতা তাহার সহিত ঐ অনার্য্য-অধ্যুষিত রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীর প্রায় কোনই যোগ ছিল না। তাহারা দৈবশক্তি-অপেক্ষা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিল বেশী, কারণ কোনও দৈব প্রলোভন তাহাদিগকে বহুকাল পর্য্যন্ত প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। রাঢ় অধিবাসীর চরিত্রগত এই যে স্বাতন্ত্র্য ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ রক্ষা করা হইয়াছে। রাঢ়ভূমি চিরদিনই বীরের ভূমি,—বীরভূম, মল্লভূম, সেইজন্যই তাহার নামকরণও সার্থক। ব্যক্তিচরিত্রের এই যে মহান আদর্শ তাহা হইতে স্খালিত করিয়া দুর্ব্বল দেবতার পাদমূলে মানুষকে আনিয়া বলি-উপহার অর্পণ করা হয় নাই, মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব মনুষ্যত্ব লইয়া দেবতারও যে উর্দ্ধে উঠিতে পারে এই কাব্যগুলিতে তাহারই নির্দ্দেশ রহিয়াছে। অবশ্য ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যসমূহের নায়ক লাউসেন এই জাতীয় মনুষ্য নহে। লাউসেন স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা কিন্তু কবির কল্পনায় সাধারণ মনুষ্য চরিত্রগুলির নিকট এই কল্পিত দেব-চরিত্র ম্লান হইয়া গিয়াছে, দেবতা যে মানুষের বুদ্ধি ও পরাক্রমের নিকট কত অক্ষম, মানুষকে ছলনা, মিথ্যা ভয় প্রবঞ্চনা করিয়া যে দেবতার দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় লাউসেনের ভিতর তাহাই দেখিতে পাইয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা অপেক্ষা সমবেদনায়ই আমাদের অধিক হয়। অতএব আমাদের এই আলোচনার প্রসঙ্গে দেবতার ছায়াচ্ছন্ন এই লাউসেনকে ত্যাগ করিয়াই লইতে হয়।

রাঢ়দেশ বীরের ভূমি

পশ্চিম বঙ্গই মধ্যযুগে বাংলায় প্রবেশের দ্বার ছিল। পাঠানের আক্রমণ, মুঘলের আক্রমণ, বর্গীর আক্রমণ সমস্তই পশ্চিম বঙ্গের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। উপর্য্যুপরি এই সমস্ত বিপদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া এই প্রদেশের অধিবাসীরা আত্মরক্ষায় সর্ব্বদা সচেষ্ট রহিয়াছে। শুধু পুরুষ নয়, স্ত্রীলোককেও তাহার মান মর্য্যাদা সতীত্ব রক্ষার জন্য বলসঞ্চয় করিতে হইয়াছে; নির্ভীক ভাবে পুরুষের সম্মুখীন

রাঢ়ের জাতীয় চরিত্র

হইয়া সম্মুখ সমরানলে আত্মাহুতি দান করিতে হইয়াছে। সেইজন্য স্ত্রীচরিত্রেরও একটা বিশেষ দিক্ আমরা ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য সমূহে লক্ষ্য করি। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এই সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, "অশ্বে আরোহণ করিয়া, কোমলাঙ্গে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া বাঙ্গালী রমণীর ধনুর্ব্বাণ হস্তে যুদ্ধে গমন—কোন কাব্যে এ নয়ন-মনোহর দৃশ্য আছে? ধর্ম্ম-মঙ্গলের ন্যায় মৌলিক মহাকাব্য বঙ্গের ভাষা-ভাণ্ডারে আর কি আছে? কাব্যের গল্প উপকথা নহে, আকাশ-কুসুম নহে, মস্তিষ্কের বিকৃতি নহে,—বাস্তব ঘটনা ঐ কাব্যের একাংশীভূত। ঐ কাব্য ঐতিহাসিক, তবে কবি-কল্পনায় ইতিহাস কাব্যরসে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালা তখন স্বাধীন ছিল,—পালবংশীয় রাজগণ তখন গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, যখন বাঙ্গালী বীরের পদভরে বঙ্গভূমি কাঁপিত, সেই সময় বঙ্গের সেই শুভ সময় এ কাব্যের উৎপত্তি কাল।"*

ধর্ম্মমঙ্গলে স্ত্রীচরিত্র

ইহা হইতেই প্রমাণিত হইবে যে, কি ভাবে এই মঙ্গলকাব্যের বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া একটা বিশিষ্ট জাতীয় মনোভাব সাহিত্যের ভিতর এককালে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। মঙ্গলকাব্য এখানেই জাতীয় মহাকাব্যের গৌরব লাভ করিয়াছে।

মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যগুলিতেও এইভাবে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের একটা নিত্যকালের চিত্রের সহিত আমাদের সহসা মুখোমুখী হইয়া যায়। জামাতা শিবের দারিদ্র্য কল্পনায় বাঙ্গালী পিতা চিরদিন নিজের কন্যারই দুর্ভাগ্যের বিভীষিকা কল্পনা করিয়াছে, সপ্তবিধবা পুত্রবধূ-বেষ্টিতা শোকাতুরা সনকার মাতৃহৃদয়ের হাহাকার অকালবৈধব্য পীড়িত এই সমাজে নিত্য কালেই ধ্বনিত হইতেছে।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্য ও বাঙ্গালীর জাতীয় মনোভাব

* ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল, ভূমিকা।

একজন আধুনিক সমালোচক বলিয়াছেন, "এই সমস্ত চিত্র এত জীবন্ত এবং এমন নিখুঁত বলেই এগুলো উপেক্ষিত হবার নয়। সত্যকে আশ্রয় ক'রে এ'দের জন্ম বলেই রচনার সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও এগুলো সুখপাঠ্য—কিন্তু এ'র ভেতর থেকে কোন আধ্যাত্মিকতা আবিষ্কার করতে গেলেই বিপদ্ ঘটবে—কারণ, তা' এতে নেই।" * এই দিক দিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শ হইতেও ভ্রষ্ট হয় নাই, দেখিতে পাই।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা গেলেও খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মঙ্গলকাব্যগুলি বিশিষ্ট একটা রূপ লাভ করিতে পারে নাই। ষোড়শ শতাব্দী হইতেই মঙ্গলকাব্যগুলি একটা বিশেষ গতানুগতিক রচনা-প্রথার অনুকরণ আরম্ভ করে। তখন বিষয়-বস্তুর পরিকল্পনার দিক হইতে এই জাতীয় কাব্য সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত হইয়া পড়ে। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের নায়কই স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু; বিশেষ কোন দেবতার পূজা-প্রচারের উদ্দেশ্যেই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য অভিশাপগ্রস্ত হইতেছে। তারপর স্পৃশ্য অস্পৃশ্য নির্ব্বিচারে যে কোন মানবীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়া মর্ত্ত্যের ধূলিমাটিতে ভূমিষ্ঠ হইতেছে। এই পূজা প্রচার-সম্পর্কে যতপ্রকার বাধাবিপত্তি সমস্তের হাত হইতেই সেই মঙ্গলকারী দেবতা তাহাকে রক্ষা করিবেন, সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকিয়াই মহা-বিপদ্‌সঙ্কুল পথেও সে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। সেই উদ্দিষ্ট দেবতার ছায়ায় তাহার পার্থিব মনুষ্যত্বটুকু সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু এবং ধর্ম্মমঙ্গলের লাউসেন। একটা মহীয়সী কবি-কল্পনাকে কী নির্দ্দয় ভাবে যে বিধি-নিয়মের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া যাইতে পারে তাহা উক্ত দুই মঙ্গলকাব্যের দুই কবি

পরবর্ত্তী মঙ্গলকাব্যের বৈচিত্র্যহীনতা

---

* শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত।

দেখাইয়াছেন। অতঃপর নানা বাধাবিঘ্ন অবিশ্বাস অপ্রত্যয়ের পর যখন উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা মর্ত্ত্যধামে প্রতিষ্ঠিত হইল তখন কাব্যোক্ত দেবচরিত্রগণ ইন্দ্ররথে স্বর্গারোহণ করিতেছেন।

এই কাহিনী কবির স্বকপোলকল্পিত বলিয়া পাছে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ না হয় সেইজন্য কবি গ্রন্থারম্ভেই গ্রন্থোৎপত্তির একটা দৈব কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কাব্যোক্ত দেবতা কাব্যরচনায় কবিকে স্বপ্নাদেশ করিয়াছেন, নতুবা তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবির যশ লোপ করিবার উদ্দেশ্যে নিজে এই কাব্যে কখনও হস্তক্ষেপ করিতেন না।

এই দৈবাদেশে কাব্যরচনার রীতি প্রাচীন কালে প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক দেশেরই মানুষের স্বভাব-সুলভ মনোবৃত্তি হইতে এই দৈবভীতির স্বতন্ত্র ভাবে জন্ম হইয়াছে, এই বিষয়ে কোন সাহিত্য যে অপর কোন জাতির সাহিত্যের নিকট ঋণী তাহা বলিতে পারা যায় না। কোন কাব্যের মূলে দেবতার ইচ্ছা যদি নির্দ্দেশ করা যায় তাহা হইলে সেই যুগে সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা সহজ হইত। সমাজে তখনও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, অতএব যে কেহ যদি কোন কথা বলিত তাহা কেহ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিত না। ব্যক্তি-প্রতিভাকে সর্ব্বদাই সেই যুগে কল্পিত দৈব-শক্তিতে আচ্ছন্ন রাখিতে হইত। পুরাণ, উপপুরাণ, সমগ্র মহাভারত সমস্তেরই রচনা-গৌরব একমাত্র বেদব্যাসে আরোপ করিবারও ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। "বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্ব্বম্" এই দেশের সমগ্র সাহিত্য-কীর্ত্তির মূলেই এই নীতি বর্ত্তমান। সেইজন্যই মঙ্গল কাব্যগুলির রচয়িতা হিসাবে একজন মানব দেহধারী কবিকে স্বীকার করিয়া লইলেও তাহার মূলে যে দেবতার প্রেরণাই একমাত্র জিনিস এই বিশ্বাস পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া

দৈবাদেশে কাব্যরচনা

লওয়া প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল। সেইজন্য কাব্যরম্ভেই দৈবাদেশের অবতারণা করা হইত।

মনসা-মঙ্গল

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে প্রথমেই দেখিতে পাই,—

"শ্রাবণ মাসের রবিবারে মনসা পঞ্চমী।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি নিদ্রা যায় স্বামী॥
নিদ্রায় ব্যাকুল লোক না জাগে একজন।
হেনকালে বিজয়গুপ্ত দেখিল স্বপন॥
গৌর বর্ণ শরীর এক ব্রাহ্মণের নারী।
রত্নময় অলঙ্কার দিব্য বস্ত্রধারী॥
তপ্ত কাঞ্চন যেন শরীরের জ্যোতি।
ইন্দ্রের শচী কিম্বা মদনের রতি॥
চাঁচর মাথার কেশ জিনিয়া চামর।
সর্ব্বাঙ্গেতে বেড়িয়াছে সর্প অজগর॥
নাগরথ এড়িয়া দেবী বসিলা হেম ঘটে।
উঠ উঠ পুত্র বলি হাত দিলা পিঠে॥
গা তোল আরে পুত্র কত নিদ্রা যাও।
শিয়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও॥
মোর পায়ে ভক্ত তুমি সেবক প্রধান।
স্বপ্ন উপদেশ বলি না করিও আন॥
আজু নিশি অবসানে এড়িয়া বসন। *
গীত ছন্দে রচ কিছু আমার স্তবন॥

—পদ্মাপুরাণ, স্বপ্নাধ্যায় পালা।

* এড়িয়া বসন—বাসি বস্ত্র ত্যাগ করিয়া।

অতঃপর মনসাদেবী তাঁহার আত্মকাহিনী কবির নিকট সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়া গেলেন। কবি দেবীর নির্দ্দেশ মত কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

চণ্ডীমঙ্গলের কবিও যখন ডিহিদার মাহ্‌মুদ শরিফের অত্যাচারে তাঁহার পৈতৃক বাস-ভূমি দামুন্যা ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করেন। তাঁহার কাব্যে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তাহাই বলিতেছেন,—

চণ্ডীমঙ্গল

"আশ্রয়ি পুখুর আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধায় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
হাতে লইয়া পত্র মসী আপনি কলসে বসি
নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।
পড়েছি অনেক তন্ত্র নাহি জানি কোন মন্ত্র
আজ্ঞা দিলা জপি নিত্য নিত্য॥
দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণ ছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলা পার হইয়া যাই
আরড়ায় হইনু উপনীত॥"—চণ্ডীমঙ্গল কাব্য।

মঙ্গলকাব্য রচনার এই বিধি-নিয়মের প্রতিষ্ঠা এতদূর পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' যদিও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশেই রচিত হয় বলিয়া কবি প্রথমেই স্বীকার করিয়াছেন যেমন,—

অন্নদামঙ্গল

"কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি গীতে দিলা অনুমতি
করিলাম আরম্ভ সহসা।" অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড।

কিন্তু তথাপি এই রাজাদেশের পরও একটা স্বপ্নাদেশের অবতারণা করিবার প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল। উপরি-উদ্ধৃত কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ বাক্যের পরই কবি বলিতেছেন,

"স্বপনে রজনী শেষে বসিয়া শিয়র দেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে।
সেই আজ্ঞা শিরে বহি নূতন মঙ্গল কহি
পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে॥"

অন্নদামঙ্গল, ১ম খণ্ড

দৈবশক্তি কিম্বা দেবতার স্বপ্নাদেশের প্রতি তখনকার সমাজের লোকের যে খুব একটা শ্রদ্ধাভক্তি ছিল তাহা নহে, ইহাতে সর্ব্বতোভাবেই একটা নির্দ্দিষ্ট প্রাচীন প্রথারই অনুকরণ করা হইয়াছে মাত্র।

ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়-বস্তুর মধ্যে আর নূতনত্ব একেবারেই চোখে পড়ে না। সমস্ত মঙ্গলকাব্যেরই বিষয়-বস্তুর পরিকল্পনা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। পরবর্ত্তী-কাব্যগুলি সেই কাহিনীকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়াই সেই প্রাচীন কাব্যোক্ত চরিত্রগুলিরই একটা মার্জ্জিত রস-রূপ দিয়াছে মাত্র, তাহা ছাড়াও কাহিনীকে যে কোন কোন স্থলে পল্লবিত না করা হইয়াছে অবশ্য এমনও নহে।

পরবর্ত্তী মঙ্গলকাব্য

প্রথমেই গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা, অতঃপর গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণন, সৃষ্টি রহস্য কথন, মনুর প্রজাসৃষ্টি, দক্ষ-প্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, উমার তপস্যা, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, গৌরীর বিবাহ, কৈলাসে হরগৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষাযাত্রা, পার্ব্বতী-চণ্ডী বা শিবের সম্পর্কিত অন্য কেহ, যেমন মনসা প্রভৃতির নিজেদের পূজা প্রচার-চেষ্টা, নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে পূজা প্রচার, স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশুর স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন

তাহার বিষয়বস্তু

এই সকল বিষয়েরই বৈচিত্র্যহীন আলোচনা সকল পরবর্ত্তী মঙ্গলকাব্যেরই বিষয়বস্তু। এই সমস্ত বর্ণনা-প্রসঙ্গেই বারমাস্যা, নারীগণের পতিনিন্দা চৌতিশা বা বর্ণানুক্রমিক চৌত্রিশ অক্ষরে দেবতা-স্তব, এই সবও প্রায় সকল অপরিহার্য্য বিষয়বস্তু হইয়া আছে। কেবল ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে শিব-প্রসঙ্গের স্থলে হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান ও অন্যান্য কতকগুলি স্বতন্ত্র বিষয় দৃষ্ট হয়।

সংস্কৃত পুরাণগুলি আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, কালক্রমে ইহাদের মধ্যেও একটা গতানুগতিক রচনা-প্রথা নির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারই ফলে পুরাণ-রচনায় এই পাঁচটি লক্ষণ অপরিহর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হয়,—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্॥ - কূর্ম্মপুরাণ।

পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য

সৃষ্টি, প্রজাসৃষ্টি, মন্বন্তর বর্ণনা, কোনও বিশেষ রাজবংশ ও তাহাতে জাত কোন কোন চরিত্র মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, এই সমস্ত সংস্কৃত পুরাণের লক্ষণ। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি এই বিষয়ে সংস্কৃত পুরাণগুলিরই অনুকরণ করিয়াছে।

একমাত্র উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ত্তমান থাকিলেই কোন কাব্যকে প্রকৃত মঙ্গলকাব্য বলা হইয়া থাকে। অন্যথায় বৈষ্ণব সাহিত্যেও চৈতন্য মঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহা আমাদের আলোচ্য মঙ্গল সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। কারণ, তাহাদের বর্ণিত বিষয়-বস্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র :—অধিকাংশ

বৈষ্ণবসাহিত্যে মঙ্গলকাব্য

ক্ষেত্রেই চৈতন্যদেব বা তাঁহার পার্শ্বচরগণের অলৌকিক জীবনী, শ্রীকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্য ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে এবং সমসাময়িক মঙ্গলকাব্যগুলির প্রভাব বশতঃ ইহাদিগকেও

মঙ্গল নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই মঙ্গল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিতেছি, উহা হইতেই এই জাতীয় সাহিত্যকে কেন মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

প্রসিদ্ধ চৈতন্য জীবন-চরিতকার বৃন্দাবন দাস তাহার অমর গ্রন্থ চৈতন্য ভাগবতকে সর্ব্বপ্রথম চৈতন্যমঙ্গল নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন, এমন প্রবাদ প্রচলিত আছে। চৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে চৈতন্যমঙ্গল বলিয়াই সর্ব্বদা উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি লোচনদাসের চৈতন্য-জীবনীর নামও চৈতন্য-মঙ্গল; জয়ানন্দের রচিত চৈতন্য-জীবনীও চৈতন্যমঙ্গল নামেই প্রসিদ্ধ। ইহাদের বিষয়-বস্তু হইতেই জানা যায় যে এই জাতীয় সাহিত্য মধ্যযুগের পূর্ব্বোল্লিখিত মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে ইহা বৈষ্ণব জীবনচরিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে ইহা হইতে একটি বিষয় অনুমান করা যায় যে, সেই যুগে শাক্তসম্প্রদায়ের মঙ্গলকাব্যের প্রচলন সমাজে এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে, শাক্ত বিদ্বেষী বৈষ্ণবগণও তাহাদের বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক সাহিত্য-বস্তুকে বাহ্যতঃ এইভাবে শাক্তপ্রভাব-চিহ্নিত করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

মধ্যযুগের সাহিত্যে মঙ্গল অভিধেয় কাব্যে কীর্ত্তিত তিন শ্রেণীর দেবতার সহিত পরিচিত হওয়া যায়, যেমন, (১) বৈষ্ণব (২) পৌরাণিক ও (৩) লৌকিক—

মঙ্গলকাব্যের সম্প্রদায়ভেদ

(১) **বৈষ্ণব**

চৈতন্যমঙ্গল

অদ্বৈতমঙ্গল

গোবিন্দমঙ্গল

কৃষ্ণমঙ্গল

রাধিকা-মঙ্গল

জগৎমঙ্গল
গোকুলমঙ্গল
রসিকমঙ্গল
জগন্নাথ-মঙ্গল ইত্যাদি

(২) **পৌরাণিক** সূর্য্য-মঙ্গল
গৌরী-মঙ্গল
ভবানী-মঙ্গল
দুর্গা-মঙ্গল
শিব-মঙ্গল (বা শিবায়ন)
অন্নদা-মঙ্গল
কমলা-মঙ্গল
গঙ্গা-মঙ্গল
চণ্ডিকা-মঙ্গল ইত্যাদি

(৩) **লৌকিক** মনসা-মঙ্গল
চণ্ডী-মঙ্গল
ধর্ম্ম-মঙ্গল
কালিকা-মঙ্গল (বা বিদ্যাসুন্দর)
শীতলা-মঙ্গল
বাসুলি-মঙ্গল
রায়-মঙ্গল ইত্যাদি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শেষোক্ত শ্রেণীর কাব্যই সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, এবং পরবর্ত্তী কালে তাহাদেরই প্রভাব পৌরাণিক কাব্য সমূহেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহারই ফলে পৌরাণিক আখ্যানমূলক মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমোক্ত শ্রেণীর

বৈষ্ণব বিষয়ক মঙ্গল কাব্যগুলি অন্তর্প্রকৃতি ও বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সেইজন্য ইহারা আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নহে।

বাংলার এই মঙ্গলকাব্যগুলি প্রাচীনকালেই বাংলার বাহিরেও বহুদূর পর্য্যন্ত প্রচার লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যদেবের কিছু পরবর্ত্তী কালে মনসা-মঙ্গলের একজন শ্রেষ্ঠ কবি পূর্ব্ববঙ্গে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম নারায়ণ দেব। তাঁহার সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এই নারায়ণদেবের মনসা-মঙ্গল সমগ্র আসাম প্রদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, এমন কি এখন পর্য্যন্ত আসামের অধিবাসীরা নারায়ণদেবকে তাঁহাদের দেশেরই লোক বলিয়া জানে। "মনসা-মঙ্গলের বেহুলা লখিন্দরের উপাখ্যান ছাপরা জিলায় প্রচলিত আছে। সেখানকার বুলিতে 'বিহুলা বিষহরী' নামে পুস্তক ছাপা হইয়াছে। ইহাতে চৌপাই নগরের রাজা চান্দো-সৌদাগর। তাহার স্ত্রী সোনিকা। উভয়ের পুত্র লখিন্দর। বিহুলার পিতা-মাতার নাম বাসু সৌদাগর ও মানিকো, বাসস্থান উজানী নগর। ইহাতে হাসন হোসেন পালা নাই। আসামী সাহিত্যে মনসার উপাখ্যান বাংলারই অনুরূপ।"*

মঙ্গলকাব্যের প্রচার

শুধু বাঙ্গালীর লিখিত মঙ্গলকাব্যই যে বঙ্গের বাহিরে প্রচারিত হইয়াছিল তাহা নহে, অবাঙ্গালী কবিরা পর্য্যন্ত ইহার প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া কেহ কেহ এই মঙ্গলকাব্য রচনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। "উড়িয়্যাবাসী গোপীবল্লভ দাস বিশুদ্ধ বাংলায় শকাব্দ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'রসিক মঙ্গল' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।" (১)

বাংলার বাহিরে মঙ্গলকাব্য

* ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—পূর্ব্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনী, (১১শ বার্ষিক অধিবেশন) অভিভাষণ। (১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

বিভিন্ন জাতীয় মঙ্গল কাব্যের মধ্যে মনসা-মঙ্গলই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র হইতেই ইহার প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গেই ইহার সমধিক প্রচার হইয়াছিল বলিতে হইবে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, পূর্ব্ববঙ্গই মনসা-মঙ্গল কাব্যের জন্মভূমি এবং মনসা-মঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন কবি, যেমন বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজবংশীদাস, চন্দ্রাবতী সকলেই পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী। চণ্ডী-মঙ্গলকাব্য পশ্চিমবঙ্গেই অধিক প্রচলিত ছিল কিন্তু সেখানেও ইহার মনসা-মঙ্গলের মত এত ব্যাপক প্রচার ছিল না। ইহার কারণ, পূর্ব্ববঙ্গের মনসা-মঙ্গলই একপ্রকার একমাত্র মঙ্গলকাব্য, পশ্চিমবঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের পাশাপাশি আর একটি বিরাট মঙ্গল-সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহা ধর্ম্মমঙ্গল। পশ্চিমবঙ্গে চণ্ডীদাস-লোচনদাস-গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব-কবিগণের অপূর্ব্ব-সৃষ্ট পদাবলী সাহিত্যের সম্মুখে অন্য কোন বিশেষ এক সাম্প্রদায়িক কাব্যের প্রতিষ্ঠা কষ্টসাধ্য ছিল, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে মনসা-মঙ্গল কাব্যের সহিত তেমন ভাবে প্রতিযোগিতা করিবার মত অন্য কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যবস্তু না থাকার দরুণই মনসা-মঙ্গলের প্রচারও কতকটা অধিকতর হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও একটা কথা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মনসা-মঙ্গলের চরিত্রগুলির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাহা বাঙ্গালীর অন্তস্তলে গিয়া স্পর্শ করিত। চাঁদসদাগরের মত দৈব-লাঞ্ছিত সমুন্নত পুরুষকারের চিত্র বাংলার আর কোন মঙ্গল-কাব্যে নাই। মানুষের জীবনে দৈব যে কত বলবান চাঁদসদাগরের তথাকথিত পরাজয়ে তাহাই যেন দেখান হইয়াছে। জীবনের সর্ব্বত্র এই পরাজয়ই বাঙ্গালী হিন্দুর সেই যুগে নিত্য অভিজ্ঞতার বস্তু ছিল। তাহারা চাঁদসদাগরের চরিত্রে নিজেদের পরাজয়ের সান্ত্বনা-সন্ধান করিত।

মনসা-মঙ্গলের প্রচার

মনসা-মঙ্গলের বিশেষত্ব

তারপর বেহুলা। সাংসারিক দুঃখকষ্টে চির অভ্যস্ত এই সমাজ একমাত্র নিজের আদর্শকে চিরদিন উচ্চ করিয়া ধরিয়া লইয়া পথ চলিয়াছে। পরাজয় যে জীবনে মানিয়া লইল সেইত দুর্ভাগা, নৈরাশ্যমথিত হৃদয়ে আশার একটি দীপশিখাকেও যে অনির্ব্বাণ রাখিয়া দুস্তর সংসার-গাঙ্গুরে ভেলা ভাসাইয়া দিয়াছে তাহার জীবনে বাঁচিবার মত বলের ত অভাব হয় না, এবং পরিণামে বাঁচিয়া উঠিতেও পারে সে-ই। চাঁদসদাগরের সংসার-শ্মশান অধিষ্ঠাত্রী শোকাতুরা সনকার দুর্নিবার অশ্রুধারার অনন্ত উৎস বাংলার শত শত মাতৃ-হৃদয়েই বিরাজমান। সেইজন্য তাহাদের অন্তরের যোগ ইহার সহিত অতি সহজেই স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ মনসা-মঙ্গলের কবি দ্বিজবংশী দাস একবার দুর্দ্দান্ত দস্যু কেনারামের হস্তে ধৃত হন। কেনারাম তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বৃদ্ধ কবি জন্মের শেষ একবার তাহার মনসার ভাসান গাহিবার সময় ভিক্ষা করেন, কেনারাম সম্মত হয়। যখন ভক্তি গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বৃদ্ধ কবি তাঁহার মনসা-মঙ্গল গাহিতে আরম্ভ করেন তখন,—

ইহার চরিত্র সৃষ্টি

"আকাশ চাঁদোয়া হইল শুনে পশু পাখী।
কেনারাম বসিল হাতের খাণ্ডা রাখি ॥
যখন গাহিলা পিতা মনসা-ভাসান।
ফেলাইয়া হাতের খাণ্ডা কান্দে কেনারাম ॥"

—মৈমনসিংহ গীতিকা।

ইহা কবিত্বের অতিরঞ্জন নহে, বাস্তবিকই দুর্দ্দান্ত নরহন্তা দস্যুর হৃদয়ও দ্রব করিবার মত বিষয় এই মনসা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে বর্ত্তমান আছে।

এই গুণেও মনসা-মঙ্গল অন্যান্য মঙ্গল-কাব্যগুলি অপেক্ষা অধিক
।চার লাভ করিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ ঠিক আমাদের সামাজিক
জীবনের অন্তর্ভুক্ত চরিত্র নহে, ফুল্লরাও বড় সংক্ষিপ্ত,
দুঃখ-দারিদ্র্য সহনশীলতার একটা সুন্দর সহজ চিত্র
সেখানে পাই বটে কিন্তু তাহার সমাধানের ইঙ্গিত
কাথাও পাই না। মনসা-মঙ্গলের পরিণাম শিক্ষাপ্রদ, বড় সান্ত্বনা-দায়ক,
কন্তু অন্য কোন মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে এই গুণটুকু লক্ষিত হয় না। ধর্ম্ম-
ঙ্গলকাব্য শুধু রাঢ়ভূমিতেই আবদ্ধ ছিল, সমগ্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ইহার
।চার-ক্ষেত্র সর্ব্বাপেক্ষা অল্প-পরিসর।

ন্যান্য মঙ্গল কাব্যের ত্রুটি

এই শ্রেণীর রচনাকে 'মঙ্গল' বলিবার উদ্দেশ্য কি?
অবশ্য মঙ্গলকাব্য কথাটি আধুনিক-সৃষ্টি; তবে এই
জাতীয় কাব্যকে 'মঙ্গল' বলিত তাহার প্রমাণ এই
মস্ত গ্রন্থ মধ্যেই রহিয়াছে। যেমন,—

মঙ্গলকাব্য নামের প্রাচীনত্ব

"দিবা নিশি তুয়া সেবি' রচিল মুকুন্দ কবি
নৌতুন মঙ্গল অভিলাষে।" —কবিকঙ্কন চণ্ডী

"নোতুন মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান।"—ধর্ম্মমঙ্গল (ঘনরাম)

"স্বপনে রজনী শেষে বসিয়া শিয়র দেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে।
সেই আজ্ঞা শিরে বহি নোতুন মঙ্গল কহি
পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে॥"—অন্নদামঙ্গল (ভারতচন্দ্র)

"শ্রীগুরুর পাদপদ্ম ভাবি নিরন্তর।
ভবানীপ্রসাদ বলে দুর্গার মঙ্গল॥"
—দুর্গামঙ্গল (ভবানীপ্রসাদ)

একটা বিষয় এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, মনসা-মঙ্গল কথাটি খুব প্রাচীন নহে। কোন মনসা-মঙ্গলকাব্যেই ইহাকে 'মঙ্গল' কিম্বা 'মঙ্গল গান' বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। 'মনসা-মঙ্গল' কথাটি এই জাতীয় কাব্যের জন্মভূমি পূর্ব্ববঙ্গে তেমন প্রচলিত নাই। পূর্ব্ববঙ্গে মনসা মঙ্গলকে বলা হয় 'পদ্মাপুরাণ', বা 'মনসার ভাসান'। অতএব মনসা-মঙ্গল কথাটি অত্যন্ত আধুনিক,—পশ্চিম বঙ্গের মঙ্গল কাব্যগুলি হইতেই যে ইহা আমদানী হইয়াছে সে বিষয়ে নিশ্চিত।

মনসা-মঙ্গল নাম আধুনিক

বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলের কোন স্থলে তিনি তাঁহার কাব্যকে 'মঙ্গল' বলিয়া অভিহিত করেন নাই। তিনি সর্ব্বত্রই ইহাকে 'মনসার গীত' বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন,—

"শ্রীহরি নারায়ণ ভাবিয়া এক চিত্তে।
মনসার চরণে গীত রচিল বিজয় গুপ্তে॥"

মনসাদেবী যখন তাঁহাকে স্বপ্ন দেখাইতেছেন তখন দেবীও বলিতেছেন,—

"আজু নিশি অবসানে এড়িয়া বসন।
গীত ছন্দে রচ কিছু আমার স্তবন॥"

মনসা-মঙ্গলের প্রকৃত নাম

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিও যে মনসার গীতই রচনা করিয়াছিলেন তাহারও তিনি উল্লেখ করিতেছেন,—

"মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরি দত্ত॥
হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।"

মনসা-মঙ্গলের স্ত্রী-কবি চন্দ্রাবতীও বলিয়াছেন,—

'যখন গাহিলা পিতা মনসা ভাসান।'

—মৈমনসিংহ গীতিকা

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই 'মঙ্গল' কথাটি মনসা-কাব্যের সহিত ৎতি আধুনিক কালেই যুক্ত হইয়াছে ; অন্যান্য মঙ্গল অভিধেয় কাব্যগুলির প্রভাব বশতঃই যে মনসার গীত, মনসার ভাসান বা পদ্মাপুরাণ পরবর্ত্তী গলে মনসা-মঙ্গলে পরিণত হইয়াছে এই বিষয় নিশ্চিত।' অবশ্য ইহাতে বষয়-বস্তুর কোন রকম পার্থক্য সূচিত হয় না, বিষয়বস্তু এবং বর্ণনা ীতির দিক দিয়া সবই অভিন্ন।

মঙ্গল শব্দের অর্থ কল্যাণ, শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে শব্দটি আশীর্ব্বাদ অর্থে ্যবহৃত হইয়াছে, যথা,—

মঙ্গল শব্দের প্রাচীন অর্থ

"যমুনার তীরে বড়াই কদমের তলে।
পূর্ণ ঘট পাতি বড়ায়ি চাহিত **মঙ্গলে**॥
মঙ্গল পায়িলে হয়ে চিত্তের সোআথে।
তবেসি মেলিব এথাঁ প্রিয় জগন্নাথে॥
এবে **মঙ্গল** চাহীঞাঁ দেখিলোঁ বড়ায়ি।
কাহ্নাঞি পায়িবাক তাত এক চিহ্ন নাহী॥"

—শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন, পৃঃ ৩০৭।

ব্যক্তিগত কল্যাণ কামনায় দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া যে ান রচিত হয় তাহাকেই 'মঙ্গল' বা 'মঙ্গল গান' বলে। ইহার আর এক াম অষ্টাহ গীত বা অষ্টাহ সঙ্গীত, যেমন,—

"আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃবেশে।
অষ্টাহ গীতের উপদেশ সবিশেষে॥"—অন্নদামঙ্গল (ভারতচন্দ্র)

ইহার কারণ আট দিন ব্যাপিয়া এই গান চলিত। এক মঙ্গলবারে াতঃকালে আরম্ভ হইত, দ্বিপ্রহর মধ্যেই শেষ হইয়া পুনরায় সন্ধ্যায়

মঙ্গল-গীত

আরম্ভ হইত। এই দুই ভাগ দিবা পালা ও নিশা পালায় বিভক্ত। এই ভাবে পরবর্ত্তী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত

দুই বেলা গান চলিত। মঙ্গল গান, মঙ্গলবারেই আরম্ভ হইয়া মঙ্গল বারেই শেষ হইত, সেইজন্য ইহার আর এক নাম অষ্টমঙ্গলা।*

কিন্তু মনসা-মঙ্গল ও ধর্ম্ম-মঙ্গল সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মনসা-মঙ্গল সমস্ত শ্রাবণ মাস ব্যাপিয়াই গীত হইত, এখনও পূর্ব্ব বঙ্গে তাহাই হয়। ধর্ম্ম-মঙ্গল বার মতি বা পালায় বিভক্ত। সেইজন্য ধর্ম্মমঙ্গলের আর এক নাম বারমতি বা বার্ম্মতি, সংস্কৃত প্রভাব বশতঃ পরবর্ত্তী কালে ইহা ব্রহ্মতিতে উন্নীত হইয়াছে। এই বার মতি বা পালা চব্বিশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত, প্রত্যহ এক পরিচ্ছেদ দিবা ও আর এক পরিচ্ছেদ রাত্রিতে গীত হইত, এই প্রকারে বার দিনে গীত সম্পূর্ণ হইত। এই মনসা-মঙ্গল বা ধর্ম্ম মঙ্গল ব্যতীত সকল মঙ্গল গানই আট দিনে সম্পূর্ণ হয়।

মনসা মঙ্গল ও ধর্ম্ম মঙ্গলের বিশেষত্ব

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এই জাতীয় সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য নাম হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলিয়াছেন,—"মঙ্গল কাব্যগুলি গান করিয়া দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা হইত। সেই গান একটি বিশেষ রকম সুরে হইত এবং সেই সুরকেও মঙ্গল বলিত। বাংলা যাত্রা মানে যেমন গান ও গমন উভয়ই, হিন্দীতে তেমনি মঙ্গল মানে মেলা যাত্রা বা গমন ; কাশীতে বুঢ়োমঙ্গল নামে এক প্রসিদ্ধ মেলা হয়, তাহা কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের বুড়ামঙ্গল কবিতায় বাঙালীর কাছেও পরিচিত হইয়াছে। যে গান শুনিলে মঙ্গল হয়, যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারিত, যে গান মেলায় গীত এবং যে গান একদিন যাত্রা করিয়া অর্থাৎ আরম্ভ হইয়া আট দিন ব্যাপিয়া চলে তাহাকেই মঙ্গল গান বলে।"*

'মঙ্গল' শব্দের বিভিন্ন অর্থ

---

* চণ্ডী মঙ্গল বোধিনী. (২য় ভাগ; পরিশিষ্ট) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্ত্তমান যুগে এই মঙ্গল কাব্যোক্ত দেবতাদিগের স্থান কি এই সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে মঙ্গলকাব্যগুলির রচনা আরম্ভ হয় তাহা কতক সিদ্ধ হইয়াছে। লৌকিক দেবতাদিগকে হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে সেই যুগে একমাত্র বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যগুলিই যে সাহায্য করিয়াছিল তাহা নহে, কতকগুলি পরবর্ত্তী অর্ব্বাচীন সংস্কৃত পুরাণও এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ স্বরূপ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মনসাদেবীর উপাখ্যান ও বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণোক্ত কালকেতু-উপাখ্যানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত ষষ্ঠী শীতলা ইত্যাদির উপাখ্যানও সংস্কৃত পররর্ত্তী উপপুরাণগুলির মধ্যে স্থান পাইতে লাগিল। এই ভাবে এক দিকে সংস্কৃত পুরাণ ও অপর দিকে বাংলা মঙ্গলকাব্য ইহাদের যুগপৎ প্রচেষ্টায় এই অনার্য্য দেবতা হিন্দু সমাজে এক আধটু প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া লইতেছিলেন। কিন্তু এমন সময় খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ রঘুনন্দনের স্মৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া নব হিন্দু আদর্শে দীক্ষা লাভ করিল। হিন্দুর সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন যে সমস্ত বিধি-নিয়ম আচার-সংস্কারে নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক রঘুনন্দন মনু এবং তৎপরবর্ত্তী সংহিতাকারদিগের গ্রন্থ হইতে তাহা সংকলন করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে স্থাপিত করেন। ইহা বলাই বাহুল্য যে, তাহাতে বাঙ্গালীর এই লৌকিক ধর্ম্মাচরণের প্রতি কোন সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয় নাই। তাহারই ফলে হিন্দুর বিশুদ্ধ কোন সামাজিক আচারের মধ্যে এই মঙ্গল দেবতাগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্যসহ প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। লৌকিক মঙ্গল চণ্ডী পৌরাণিক অন্নদা, ধর্ম্মঠাকুর পৌরাণিক বিষ্ণু, মনসা 'ব্রহ্মণা মনসা সৃষ্টা' এই সমস্ত কষ্টকল্পিত আভিজাত্যের সৃষ্টি দ্বারা

বর্ত্তমান সমাজে মঙ্গল দেবতার স্থান

রঘুনন্দন ও বাংলার নব্য হিন্দু সমাজ

নিজেদের উদ্ভবের অখ্যাতিকে পৌরাণিক গরিমায় সমাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। কেহ কেহ আবার তাহাও পারেন নাই। রাজা চন্দ্রকেতুর রাজ্য মহামারীতে ধ্বংস করিয়া দিয়াও শীতলা দেবী রাজার প্রসাদ লাভ করিতে পারিলেন না। এমন কি যে মহামারী রোগ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সমান সাংঘাতিক তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজাও উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণগণ কদাচ করেন না। অতএব আমরা দেখিতে পাই ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক জীবনে নব সংস্কার প্রবর্ত্তিত হওয়াতে সমাজে লৌকিক দেবতাদিগের প্রাধান্য হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। ইহার পর হইতে ভারত চন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত মঙ্গল-কাব্য রচিত হইয়াছে তাহা কোন সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া রচিত হয় নাই; ইহা সাহিত্য রচনার একমাত্র আদর্শ-রীতি ছিল বলিয়াই এ দেশের সমসাময়িক সাহিত্য-রস-বস্তুগুলি এই মঙ্গলকাব্যের রূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

লৌকিক দেবতার পরিণাম

খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীকে মঙ্গল-কাব্যের উদ্ভব-যুগ (age of origin) বলা যাইতে পারে। এই যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন প্রায় কিছুই হস্তগত হয় নাই, তবে এই যুগে মঙ্গল-কাব্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কবিগণের রচনার মধ্যে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহাতে মনে হয়, এই যুগের রচনা বিশেষত্ব বর্জ্জিত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মনসা-মঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্ত তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী মনসা-মঙ্গল রচয়িতা কাণা হরি দত্ত সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে,

মঙ্গল-কাব্যের বিভিন্ন যুগ—উদ্ভব-যুগ

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরি দত্ত ॥

হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কাণা হরি দত্ত
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥"—পদ্মা পুরাণ

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিলীয়মান স্মৃতি হরি দত্তের বৈশিষ্ট্যহীন রচনার উপর বিজয় গুপ্ত নূতন করিয়া মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি মাণিক দত্তকে যথোচিত বৈষ্ণব বিনয় সহকারে স্মরণ করিতেছেন,

মাণিক দত্ত
'মাণিক দত্তের বন্দোঁ করিয়া বিনয়।
যাহা হইতে হইল গীত-পথ-পরিচয়॥'

—কবিকঙ্কণচণ্ডী।

এখানেও দেখিতে পাই চণ্ডীমঙ্গলের প্রাচীনতম কবি মাণিক দত্ত এই জাতীয় কাব্য রচনার পথ প্রদর্শক মাত্র। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই মাণিক দত্ত সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। মধ্য যুগের ধর্ম্ম-মঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তীও ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যের আদি কবি ময়ুর ভট্টের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছেন,

ময়ুর ভট্ট "ময়ুর ভট্টেরে বন্দি সঙ্গীত আগু কবি।"

তাহাতেও দেখিতে পাই, ময়ুর ভট্টের কৃতিত্বের মধ্যে ইহাই যে তিনি এই ধর্ম্ম-মঙ্গল-কাব্যের আদি কবি। তাঁহার কাব্যের অন্য কোন বিশেষত্বের উল্লেখ নাই। বৈষ্ণব প্রভাবান্বিত সমাজে বাস করিয়া বিনয়-অভ্যাস-গুণে চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগের কবিদ্বয় তাঁহাদের পূর্ব্ব সূরিগণের কাব্য

সমালোচনার যে অপ্রিয় অংশ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাই প্রাক্ বৈষ্ণব যুগের কবি বিজয় গুপ্ত অত্যন্ত রূঢ় মন্তব্যে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার এই অসংযত উক্তি হইতেই আমরা সেই যুগের ঐ জাতীয় কাব্যের একটা মূল্য বিচার করিতে পারি।

অবশ্য একটা বস্তু উদ্ভবেই তাহার পরিপূর্ণতা আমরা আশা করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীই মঙ্গল-কাব্যের সৃজন

সৃজন-যুগ

যুগ (age of creation)। এই যুগেই প্রসিদ্ধ মনসা মঙ্গলকার বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজবংশী দাস, চন্দ্রাবতী, চণ্ডী-মঙ্গলকার মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম, ধর্ম্মমঙ্গলকার মাণিক গাঙ্গুলী, খেলারাম প্রভৃতি আবির্ভূত হন। এই সময়ে উল্লিখিত শক্তিমান কবিদিগের হাতে পড়িয়া মঙ্গলকাব্যগুলি পরিপূর্ণ অবয়ব লাভ করে সত্য কিন্তু এই পরিপুষ্ট অবয়বের উপর তখনও রঙ ও কারিকরীর কাজ যথেষ্ট বাকি ছিল। তখনও মঙ্গলকাব্যগুলি ভাষায় এবং কল্পনায় সম্পূর্ণ গ্রাম্যতা-মুক্ত হইতে পারে নাই। সেই কাজ অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘনরাম চক্রবর্ত্তী ও ভারতচন্দ্রের জন্য অবশিষ্ট রহিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীকে মঙ্গল-কাব্যের ঐশ্বর্য্য যুগ (age of glory) বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ভাষা যেমন সরল ও সহজ ছিল ভাবও

ঐশ্বর্য্য যুগ

কষ্ট-কল্পনা-প্রসূত ছিল না, সহজ কথায় প্রত্যক্ষ সত্যটি অন্তরের নিভৃততল একেবারে স্পর্শ করিত কিন্তু এই যুগে সেই একই বিষয়-বস্তুর উপরই শব্দ ঝঙ্কার ও রচনা পারিপাট্য মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে এক অপূর্ব্ব বাহ্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিল।

তাহার বিশেষত্ব

সর্ব্বপ্রথম বঙ্গ সাহিত্য কি ভাষায় কি ভাব-কল্পনায় গ্রাম্যতা-মুক্ত হইল। ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, ভারতচন্দ্র রায় ইঁহারাই এই যুগের স্রষ্টা। বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া এই যুগে বৈচিত্র্য

সৃষ্টি করিবার প্রয়াস হয় নাই, কিন্তু চরিত্রগুলিকে অভিনব রূপ দান করিয়া কাব্য-দেহের অলঙ্কার সজ্জার যে নিপুণ ব্যবস্থা করা হইল তাহা সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যের এক অতি মূল্যবান সম্পদ হইয়া আছে। এই সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণনা করা হইয়াছে।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি মঙ্গল কাব্য-রচনার মধ্যযুগে যাহাকে আমরা সৃজন-যুগ বা age of creation বলিয়া আখ্যাত করিয়াছি—লৌকিক দেবতাদিগের সমাজে প্রবেশাধিকার অনেকটা খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছিল। সেইজন্য নূতন মঙ্গলকাব্য-সৃষ্টির উপাদানের জন্য বাঙ্গালী কবিদিগকে বাধ্য হইয়া সংস্কৃত পুরাণোক্ত দেবতাদিগের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। সেই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গসাহিত্যে পৌরাণিক দেবতার মাহাত্ম্যসূচক মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইতে আরম্ভ করে। মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক দেবতাগণ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতেই আত্মপ্রকাশ করিতে থাকেন। রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' (বা 'শিবমঙ্গল') রূপনারায়ণ ঘোষের 'দুর্গামঙ্গল' ইত্যাদি এই যুগেই উদ্ভূত হয়। কিন্তু এই সমস্ত রচনায় মৌলিক কল্পনার অভাব সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, উচ্চতর রুচি অনুমোদিত কাব্যের প্রসাদ-গুণ এই জাতীয় মঙ্গলকাব্যে একেবারেই নাই।

মঙ্গল-কাব্যের পৌরাণিক দেবতা

এই মঙ্গল-কাব্যগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃত পুরাণাদির ভাষা-অনুবাদ মাত্র। রূপনারায়ণের 'দুর্গামঙ্গল' মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রায় ভাষানুবাদ এবং রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' শিবপুরাণোক্ত কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সত্যিকার মৌলিক কবিত্ববিকাশ সেই মধ্যযুগে একমাত্র লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য-সূচক মঙ্গল-কাব্যের ক্ষেত্রেই সম্ভব হইয়াছে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় এই যুগের মঙ্গল কাব্যকেই "first original poem in Bengali, apart from

songs and translation"* বলিয়াছেন। এই মঙ্গল-কাব্যগুলিকে যে কেন মধ্যযুগের সাহিত্যে একমাত্র মৌলিক সাহিত্যের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি।

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই যে বাঙ্গালা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য রচনার উপরই যবনিকা পাত হইয়া গেল তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত যে একটা বিরাট সাহিত্য প্রায় সাত শত বৎসরের সাধনার ফলে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা চিরতরে গতিশক্তিহীন হইয়া পড়িল। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বেই ইংরাজেরা পলাশীতে জয়লাভ করিয়া রাজ্যের কর্ত্তা হইয়াছেন। তারপর বাঙ্গালীর জীবনে এক আমূল পরিবর্ত্তনের যুগ আসিয়াছে। এই রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার অবসানে প্রায় একশত বৎসর পরে বাঙ্গালী জাতি যখন একটা অবস্থার মধ্যে গিয়া স্থৈর্য লাভ করিল তখন পাশ্চাত্য জগত হইতে নব সভ্যতার আলোক ধীরে ধীরে এই সমাজের উপর বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। তাহার সমুজ্জ্বল প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া জাতি ক্রমে ক্রমে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতে লাগিল।

জাতীয় সাহিত্যের পরিণতি

---

* Literature of Bengal (Chap. X) R. C. Dutta.

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

বাংলার শৈব-সাহিত্য—শিব-মঙ্গল বা শিবায়ন

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, 'ধান ভান্তে শিবের গীত' প্রমুখ বাংলা প্রবচনে একটা শৈব-সাহিত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এই শিবের গীত অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই শিবের গীত যে চৈতন্যের সমসাময়িক কাল পর্য্যন্তও সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবচরিতকার কবি বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত সমসাময়িক বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের তথ্যে পূর্ণ। তাঁহার বর্ণনায় পাওয়া যায়,

শিব-গীতিকার প্রাচীনত্ব

"একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায়—গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে॥
শঙ্করের গুণ শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর মূর্ত্তি দিব্য জটাধর॥
এক লাফে উঠে তার কান্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বোলে মুঞি সে শঙ্কর॥

প্রাচীন-সাহিত্যে শিব-গীতিকার উল্লেখ

কেহো দেখে জটা শিঙ্গা ডমরু বাজায়।
'বোল', 'বোল', মহাপ্রভু বোলয়ে সদায়॥
সে মহাপুরুষ যত শিবগীত গাইল।
পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল॥"

—চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ৮ম অধ্যায়

উপরি-উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইবে যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও এই শিব-গীতি লোক-মুখে প্রচারিত হইত। এক শ্রেণীর শৈব ভিক্ষুক এই গান গাহিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কবিয়া বেড়াইত। ইহা হইতে আরও একটা বিষয়ের আভাস পাওয়া যাইবে যে, শিব-গীতি তখন সমাজেব নিম্নস্তরে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

শূন্য-পুরাণে শিব-গীতিকা

ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্যে রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য-পুরাণ' নামক একখানি পুস্তক প্রচলিত আছে। ইহার সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তকখানি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সঙ্কলিত হয় বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। * এই পুস্তকে শিবেব সম্বন্ধে কতকগুলি ছড়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে লোকের মুখে মুখে প্রচারিত শিব-গীতি হইতেই যে এই জাতীয় ছড়া 'শূন্যপুরাণে' সংকলিত হইয়াছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহা হইতেই আমরা বাংলা প্রাচীনতম শৈব-সাহিত্যের অন্তভু্ক্ত শিবের কাহিনীর একটুকু নিদর্শন পাই। এই স্থলে তাহার কতক উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে,

"যখন আছেন গোসাঞি হুআ দিগম্বর।
ঘরে ঘরে ভিখা মাগিয়া বুলেন ঈশ্বর॥

* শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'শূন্য-পুরাণ' এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

রজনী পরভাতে ভিক্‌খার লাগি জাই।
কুথাএ পাই কুথাএ ন পাই ॥
হত্তুকী বএড়া তাহে করি দিন পাত।
কত হরস গোসাঞি ভিক্‌খাএ ভাত ॥
আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চস চাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস ॥
পুখরি কাঁদাএ লইব ভূমখানি।
আরসা হইলে ছিচএ দিব পানি ॥
আর সব কিসান কাঁদিব মাথায় হাত দিআ।
পরম ইচ্ছাএ ধান্ন আনিব দাইআ ॥
ঘরে অন্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব ॥
কাপাস চষহ পরভু পরিব কাপড়।
কত না পরিব গোঁসাই কেওদা বাঘর ছড় ॥
তিল সরিষা চাষ কর গোঁসাই বলি তব পাএ।
কত না মাখিব গোঁসাঞি বিভূতিগুলা গাএ ॥
মুগ বাটলা আর চসিহ ইখু চাস।
তবে হবেক গোঁসাই পঞ্চামৰ্ত্তর আস ॥
সকল চাস চস পরভু আর রুইও কলা।
সকল দৰ্ব্ব পাই যেন ধৰ্ম্ম পূজার বেলা ॥
এত্তেক সুবিধা হর মনেত ভাবিল।
মন পবন দুই হেলএ সিজন করিল ॥
সুনার জে লাঙ্গল কৈল রূপার যে ফাল।
আগে পিছু মাঙ্গলেত এ তিন গোজাল ॥

আজ জোতি পাস জোতি আভদর বড় চিন্তা।
দুদিগে দুসলি দিআ জুআলে কৈল বিন্ধা॥
সকল সাজ হৈল পরভুর আর সাজ চাই।
গটা দশ কুআ দিয়া সাজাইল মই॥
তাবর চুভিতে চাই দুগাছি সলি দড়ি।
চাস চসিতে চাই সুনার পাচন বাড়ি॥
মাঘ মাসে গোঁসাই পিথিবি মঙ্গলিল।
জতগুলি ভূম পরভু সকলি চসিল॥

—শূন্যপুরাণ, (চাস অধ্যায়)

এই জাতীয় শিব-গীতিকাই বাংলার প্রাচীনতম শৈব-সাহিত্য। কিন্তু বাংলার সমাজে মধ্য ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক শিবেরও একটা আদর্শ এই দেশে স্থাপিত হয়। উপরি-উদ্ধৃত কাব্যাংশ হইতে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হইবে যে, পৌরাণিক শিবের কল্পনা বাংলার নিজস্ব জাতীয় শিবের কল্পনা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রাচীনতম লৌকিক দেবতা কৃষকরূপী শিবের সঙ্গে পৌরাণিক শান্ত সমাহিত শিবের সমন্বয় সাধন করিবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস বাংলার পরবর্ত্তী সমগ্র শৈব-সাহিত্যে দৃষ্ট হয়।

পৌরাণিক ও লৌকিক শিব

লৌকিক শিব-কল্পনার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়েও কতক আলোচন করিয়াছি। এই বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। এই দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা-লাভ করিবার পূর্ব্বেই অনার্য্য সমাজে কৃষকের সহায়ক রূপে যে এক দেবতাব অস্তিত্ব ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই দেবতা সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে কোচ জাতিরই দেবতা ছিল। কারণ, পরবর্ত্তীকালে শিবের সহিত পুরাণ-বহির্ভূত কোচদিগের সংশ্রবের

লৌকিক শিবের রূপ

াহিনী জড়িত থাকিতে দেখা যায়। এই দেবতার নৈতিক রুচিদৃষ্টি যে াহার পারিপার্শ্বিক সমাজ অপেক্ষা উন্নততর ছিলনা, তাহারও পরিচয় াওয়া যায়। কুচনীদিগের সাহচর্য্যেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত, াবতীয় নেশায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, তবে সমাজের উপকারের মধ্যে তনি মধ্যে মধ্যে কৃষিকার্য্যরত কৃষকদিগের গাত্র হইতে মশা ও বর্ষার দনে জোঁক তাড়াইয়া দিতেন। ইনি সম্পূর্ণভাবেই কোচজাতীয় কৃষকেরই দবতা ছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পর ঐ দেশে গুপ্ত-অধিকার স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার কতক বিস্তৃত হইয়াছিল তাহারই প্রভাব বশতঃ ইনি পৌরাণিক শিব আখ্যা প্রাপ্ত হন। কৃষকের কল্পিত এই দেবতার সহিত পৌরাণিক শিবের চরিত্রগত কতকটা সাদৃশ্য ছিল। উভয়েই বিষয়-আসক্তিহীন, বাস্তব সংসারের সর্ব্ববিধ চেতনায় নির্বিকার। কিন্তু পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি শিবের কল্পনায় পৌরাণিক আদর্শের নিকট বাঙ্গালীর জাতীয় আদর্শ অন্ততঃ সেই যুগে জয়ী হইয়াছিল।

লৌকিক শৈবধর্ম্মে বিভিন্ন উপকরণ

ব্রাহ্মণ্য সংস্কার এই দেশে প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে এতদ্দেশে তৎকালীন প্রচলিত বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম এই নব প্রবর্ত্তিত শৈব-ধর্ম্মের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। গৌতম বুদ্ধের জীবনাদর্শ হইতে পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনা হইয়াছিল, সেইজন্য বাংলার বৌদ্ধমত পৌরাণিক শৈব ধর্ম্মমতের মধ্যেও নিজের আদর্শেরই সন্ধান পাইল। জৈন তীর্থঙ্করের জীবনাদর্শও গৌতম বুদ্ধ এবং এই পৌরাণিক শিবের আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র ছিলনা, সেইজন্য এই বিরাট জৈন সম্প্রদায়ও ক্রমে নব প্রতিষ্ঠিত শৈব-সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল। এইভাবে দেখিতে পাই, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে বাংলার শৈবধর্ম্ম এক বিরাট সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

নাথধর্ম্ম এইদেশে প্রচলিত হইবার পর তাহাও শৈব প্রভাবে আকৃষ্ট হয়। নাথ-যুগীগণ আপনাদিগকে 'শিবের গোত্র' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এমন কি নাথদিগের গুরু হাড়িফা, কানফা, পানফা প্রভৃতিও শৈব-সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'গোরক্ষ বিজয়ের' ভূমিকায় গ্রন্থ-সম্পাদক মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, "ত্রিপুরার রাজগণের আদিপুরুষগণেরও 'ফা' উপাধি দৃষ্ট হয়। মহারাজ ত্রিপুরেশ্বরের জন্ম 'শিব অংশ-সম্ভূত' বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত আছে। ত্রিপুরার রাজগণ বহুকালাবধি শৈব ছিলেন। তাঁহাদের বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা আধুনিক। হাড়িফা ও কানফার 'ফা' উপাধির সহিত তাঁহাদের কোন সংশ্রব আছে কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।"

নাথ ও শৈব-সম্প্রদায়

নাথ-সম্প্রদায়ের গুরুদিগের সহিত শৈব-ধর্ম্মমতের কি সম্বন্ধ ছিল তাহা স্পষ্টতঃ জানা না গেলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অল্পকাল মধ্যেই নাথ যুগীগণ শৈব বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। 'বল্লাল-চরিতে' নাথ-যুগীদিগের পুরোহিতগণকে 'রুদ্রজ' অর্থাৎ 'শৈব' ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বাংলার প্রাচীনতম কৃষক-দেবতা ক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, নাথ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মগত আদর্শের সহিত মিশ্রিত হইয়া এক অভিনব সঙ্কর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। বাংলার পরবর্ত্তী শৈব সাহিত্যে এই বিভিন্ন আদর্শেরই সমন্বয় চেষ্টা দেখিতে পাই। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, বৌদ্ধ-জৈন আদর্শ পৌরাণিক আদর্শের মধ্যেই আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, নাথ-সম্প্রদায়ও সামাজিক জীবনে হিন্দু সম্প্রদায় হইতে যেমন স্বতন্ত্র হইয়া ছিল শিবকেও তাহারা তেমনই হিন্দু

সঙ্কর শিব

মাজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়াই লইয়া গিয়াছিল। অতএব প্রাচীনতম ঙ্গলকাব্যের মধ্যে লৌকিক আদর্শ ও পৌরাণিক আদর্শেই চিরদিন বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর মধ্যে যেমন একটা কেন্দ্রগত ঐক্য হিয়াছে, প্রচলিত শিবের কাহিনীর মধ্যে তেমন নাই। ইহার কারণ, একই কাহিনী-ভাগের মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র সংস্কারের সংযোগ,—একটি বাঙ্গালীর নিজস্ব, অপরটি ভারতীয় পৌরাণিক। নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত শিবের আখ্যান-মধ্যে এই দুইটি দিকই লক্ষ্য করা যাইবে।

শিব-গীতির বিশেষত্ব

প্রাচীনতম শিব-গীতিকাগুলি সংগৃহীত না হওয়ার জন্যই এই জাতীয় সাহিত্যের আদি লেখকের পরিচয় আমাদের জানিবার কোন উপায় নাই। শূন্যপুরাণ' হইতে যে শিবের ছড়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহারও রচয়িতা যে কে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। এই জাতীয় শিবের ছড়াগুলি ক্রমে লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতির কবিগণ শিবের পৌরাণিক ও লৌকিক মিশ্র কাহিনীর উপরই তাহাদের বর্ণিতব্য কাহিনীরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে শিবের কাহিনীমূলক কাব্য প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে অতি অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'শিবায়ন' গ্রন্থখানাই উল্লেখযোগ্য। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পূর্ব্বে এই কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করা গেল,—

শিব-গীতিকার প্রাচীনতম কবি

শিবায়নের গল্পসার

দেবসভায় মহাদেব প্রজাপতি দক্ষকে সম্মান করেন নাই। তিনি দেবাদিদেব হইতে পারেন, তবুও তিনি জামাতা। শ্বশুর জামাতার পূজার্হ।

এই অপমানের প্রতিশোধকল্পে দক্ষ শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। এই শিবহীন যজ্ঞের আয়োজনে দেবগণ শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত ; কেননা শিবহীন যজ্ঞ অসম্ভব। কিন্তু যেদিন সতী নারদের মুখে শুনিতে পাইলেন, পিতৃগৃহে এই বিরাট অনুষ্ঠানে সবাই নিমন্ত্রিত হইয়াছে, শুধু তাঁহারাই বঞ্চিত ; তখন স্বামীর শত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াও বিনা নিমন্ত্রণে সতী পিতৃগৃহে যাত্রা করিলেন। তাঁহার স্বামীর সম্মান তিনি ক্ষুণ্ন হইতে দিবেন না, দক্ষ সতীর শত অনুরোধ সত্ত্বেও মহাদেবকে যজ্ঞভাগ দিতে স্বীকার করেন নাই, কদর্য্য ভাষায় স্বামীর নিন্দা করিয়াছেন। স্বামী নিন্দা নারার অসহনীয়। সতী দেহত্যাগ করিলেন। রুদ্র দেবতা জাগিয়া উঠিলেন। দক্ষের মহাযজ্ঞ পণ্ড হইল। প্রজাপতির রাজপুরী শ্মশানে পরিণত হইল। প্রজাপতি ছাগমুণ্ড ধারণ করিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া গেলেন।

শিবহীন যজ্ঞ

সতী গিরিরাজের ঔরসে মেনকার গর্ভে গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। শৈশবের চপলতার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার কামনার শ্রেষ্ঠধন মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। শিব নিঃস্ব, কাঙ্গাল ; ভিক্ষাই একমাত্র সম্বল। ভিক্ষান্নে কোন রকমে দিন অতিবাহিত হয়। অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে দিন যায়। তাই গৌরীর দুঃখ—তাঁহার পিতা বিশ্বেশ্বরের নিকট তাঁহার বিবাহ দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দুটি অন্ন জুটাইয়া খাইবার সামর্থ্য নাই।

হরগৌরী

একদা কৈলাস-শিখরে হর-পার্ব্বতী বসিয়া আছেন। কি কর্ম্ম অনুষ্ঠানে তাঁহার পরম তৃপ্তি হয় পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলে, মহাদেব বলিতে লাগিলেন,—ফাল্গুনের চতুর্দ্দশী তিথিতে কৃষ্ণপক্ষে যে ব্যক্তি উপবাস পালন করিয়া শিবরাত্রি ব্রত অনুষ্ঠান করে, সে সংসারের সকল দুঃখ-যন্ত্রণা হইতে

অব্যাহতি পায়। বিল্বদলই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। বারাণসীতে জনৈক ব্যাধ একদিন মৃগয়া করিয়া রাত্রের অন্ধকারে বনে পথ ভুলিয়া বিল্ব বৃক্ষের শাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেইদিন শিবরাত্রি। অনাহারক্লিষ্ট ব্যাধের দেহের কম্পনে বৃক্ষমূলস্থিত শিবলিঙ্গে বিল্বপত্র ঝরিয়া পড়িল। এই সুকৃতির ফলে মৃত্যুর পর তাহার মোক্ষ লাভ হইল।

শিবরাত্রি মাহাত্ম্য

দিন আর কাটেনা। ঘরের পুঁজি ফুরাইয়া আসিতেছে। পার্ব্বতী স্বামীকে চাষ করিবার মন্ত্রণা দিলেন। শিব চাষ করিতে রাজী নহেন; চাষের ফল অনিশ্চিত। তিনি ব্যবসা করিতে চাহিলেন। কিন্তু যাঁহার সংসারে নিত্য অনটন, তাঁহার ব্যবসায়ের পুঁজি কোথায়? রাজ-সেবা তাঁহার সাজেনা, যিনি সকলের সেব্য তিনি কি সেবকের সেবা করিতে পারেন?

সাংসারিক অস্বাচ্ছন্দ্য

মহাদেব মর্ত্ত্যে গিয়া চাষ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ইন্দ্রের নিকট চাষভূমির পাট্টাগ্রহণের ইচ্ছা জানাইলেন, বিশ্বকর্ম্মা চাষের নিমিত্ত লাঙ্গল, জুয়াল ও মই প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। চাষের যন্ত্রের সংস্থান হইল, কিন্তু বীজ ধান কোথায় মিলিবে? শিব পার্ব্বতীকে কুবের হইতে বীজ ধান ধার করিতে বলিলেন; তিনি অস্বীকার করিলেন। ধার করা মেয়েলোকের মরণ সমতুল্য। বিশ্বনাথ নিজেই কুবেরের ভাণ্ডার হইতে বীজধান কর্জ্জ করিয়া আনিলেন। মাঘমাসের শেষে ভীষণ বৃষ্টি নামিল। অনুচর ভীম ভূমিতে হাল দিল। দেখিতে দেখিতে পৃথিবী শস্য-সম্ভারে ভরিয়া উঠিল। নারদের ঢেঁকি লইয়া ভীম ধান ভানিতেছে, ভোলানাথ আজ সাফল্যের আনন্দে অধীর, পার্ব্বতীর অভাব-অনটনপূর্ণ সংসারের স্মৃতি তাঁহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে।

চাষে মনঃসংযোগ

শিবকে কৈলাসে আনিতে হইবে, নারদ পার্ব্বতীর নিকট তাহার উপায় বলিয়া দিলেন। পার্ব্বতীর আদেশে উঙানি মশা পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল; উঙানি মশার দংশনে শূলপাণি অস্থির হইয়া উঠিলেন। শিবানী মাছি, ডাঁশ প্রেরণ করিলেন। শিব সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মাখিয়া তাহাদের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। তারপর আবার মশা জোঁকের উৎপাতে শিব অস্থির হইয়া উঠিলেন। ভোলানাথ তবুও পার্ব্বতীর প্রতি উদাসীন।

ভোলানাথের আত্মবিস্মৃতি

মহামায়া অবশেষে বাগ্‌দিনীরূপে মহেশের ক্ষেতে অবতীর্ণ হইলেন। শিবের ক্ষেতে তিনি মাছ ধরিতেছেন, ধান্য ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। বাগ্‌দিনীর রূপে মহেশ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। বাগ্‌দিনীকে বিবাহ করিলে তাহার সঙ্গে জল সেঁচিয়া মাছ ধরিতে হইবে। মহেশ জল সেঁচিয়া মাছ ধরিতেছেন। পার্ব্বতী কামমুগ্ধ মহেশের নিকট প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ পিতলের অঙ্গুরী চাহিয়া লইলেন। আলিঙ্গন দিবার ছলনা করিয়া বাগ্‌দিনীরূপিণী পার্ব্বতী কৈলাসে চলিয়া গেলেন। মহেশ বৃষে আরোহণ করিয়া কৈলাস যাত্রা করিলেন। পার্ব্বতী তাঁহাকে ঘরে আসিতে নিষেধ করিলেন, তিনি বাগ্‌দিনীর সঙ্গে প্রেম করিয়াছেন; তিনি বাগ্‌দিনীকে অঙ্গুরী দান করিয়াছেন। মহেশ অপ্রস্তুত হইলেন। পার্ব্বতী নারদের উপদেশে মহেশের নিকট শঙ্খ পরিধানের বাসনা জানাইলেন, তাহা হইলে স্বামী চিরদিন তাঁহারই থাকিবে। দিগম্বর ভিখারী, শঙ্খ জোগাইবার তাঁহার সামর্থ্য নাই।

বাগ্‌দিনী বেশে পার্ব্বতীর শিবকে ছলনা

অভিমানিনী পার্ব্বতী পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেন। পিতৃগৃহে দুর্গোৎসব। তাঁহার পিতৃগৃহ আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। নারদের মন্ত্রণায় শঙ্কর শঙ্খ-বণিকের বেশে হিমালয়ে যাত্রা করিলেন। শঙ্খ দেখিয়া পার্ব্বতী উল্লসিত হইলেন। ছলনাময়ের ছলনা

দাম্পত্য কলহ

পার্ব্বতীর নিকট আজ ব্যর্থ, তিনি স্বামীকে চিনিয়াছেন। শঙ্খের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে শঙ্কর বলিলেন, এই অমূল্য শঙ্খের মূল্য আত্ম-সমর্পণ। পার্ব্বতী শাঁখারীকে উপদেশ দিলেন,—পরনারীর প্রতি প্রেম অমার্জ্জনীয় অপরাধ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত অনন্ত নরক ভোগ। শাঁখারী বলিতেছে, যে নারী স্বামীকে বৃদ্ধ মূর্খ, জড়, দুঃখী জানিয়াও সেবা করে সেই সতী। সতীর আজ দুঃখের অন্ত নাই। যাঁহার স্বামী, জগৎপূজ্য, যাঁহার সেবার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু লালায়িত, তাঁহার সেবা পত্নী হইয়া কিরূপে গ্রহণ করিবেন ? এই দ্বন্দ্বের মধ্যে স্বামীকে তিনি নিবিড় করিয়া পাইতে চাহেন। এই বৈষম্যের মধ্যে তাঁহার স্বামীপ্রেম চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, অপরূপ লাবণ্যময় হইয়া উঠিবে। কাত্যায়নী অপূর্ব্ব সাজে সাজিয়াছেন, চন্দনে চর্চ্চিত তাঁহার দেহ, শঙ্কর শঙ্করীর দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ পরাইয়া দিলেন। পার্ব্বতী করালী কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। করালবদনা মুক্তকেশী রুদ্র ভৈরবকে জয় করিলেন। মিলনে বিবাদের অবসান হইল। হরগৌরী কৈলাসে ফিরিয়া আসিলেন।

শাঁখারী শিব

উল্লিখিত কাহিনী হইতে একটি বিষয় সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, ইহার মধ্যে চরিত্র ও ঘটনা-গত ঐক্য বড় নাই। ফলে ইহার প্রধান চরিত্রগুলি বর্ণিত ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া স্বাভাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। পুরাণোক্ত কাহিনীর সঙ্গে লৌকিক কাহিনীর সংমিশ্রণই ইহার কারণ। নগাধিরাজ হিমালয়ের জামাতা ত্রিলোকেশ শিব সহসা শ্বশুর গৃহ হইতে একদিন কোঁচনী পাড়ায় গিয়া প্রবেশ করিলেন। এই ঘটনা পরস্পর সামঞ্জস্যহীন, সেইজন্য ইহা হইতে শিবের চরিত্রগত ঐক্যের সন্ধান দুষ্কর হইয়া উঠে। শুধু এইখানেই শিব-চরিত্রের অসংলগ্নতার শেষ হয় নাই, ইহার পরও একই আখ্যান-

শিবায়নে বিভিন্ন উপকরণ

ভাগমধ্যে আমরা কৃষক শিব ও শাঁখারী শিবের সহিতও পরিচয় লাভ করি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, একই কাহিনীভাগের মধ্যে একই চরিত্রের কতকগুলি স্বতন্ত্র গুণের পরিচয় রহিয়াছে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সঙ্গত সামঞ্জস্য নাই; ইহাদের প্রত্যেকেরই উদ্ভবের ইতিহাসও স্বতন্ত্র।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহোদয় রামেশ্বর রচিত শিবায়নে শিব-চরিত্রের এই সমস্ত অসংলগ্নতার রহস্য-সন্ধান করিতে না পারিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "শিবের কৃষিকর্ম্মারম্ভ, তাঁহাকে ছলিবার উদ্দেশে ভগবতীর বাগ্দিনীবেশে তথায় গমন, শিবকে ঠকান, শিবের শাঁখারী বেশে হিমালয়ে গমন এবং ভগবতীকে শাঁখা পরাইবার প্রসঙ্গে বাগ্দিনীরূপে প্রতারণার প্রত্যুত্তর দান, হরগৌরীর মিলন প্রভৃতি যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমরা অন্য কোথাও দেখি নাই, বোধ হয় ইহা কবির স্বকপোল-কল্পিত হইবে"।* অবশ্য পণ্ডিত মহাশয়ের সময়ে 'শূন্যপুরাণ' ও বিজয় গুপ্ত প্রমুখ প্রণীত পদ্মপুরাণোক্ত শিব-কাহিনীর আবিষ্কার হয় নাই। তাহা হইতে দেখা যাইত যে, কবি রামেশ্বরের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এতদ্দেশে শিবের সম্বন্ধে এই সমস্ত কাহিনী লোক-সমাজে প্রচলিত আছে।

ইহাদের উদ্ভব

এই শিব-কাহিনীর মধ্যে যে দুইটি স্থূল পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহা পৌরাণিক ও লৌকিক। পৌরাণিক অংশ বাংলার প্রাচীনতম শৈব সাহিত্যে অপ্রধান অংশ মাত্র ছিল। কিন্তু ক্রমে তাহাই প্রধান অংশরূপে পরিণত হয়। মূল লৌকিক অংশের উপর একটা পৌরাণিক আভিজাত্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই পরবর্ত্তী কালে পৌরাণিক অংশের অবতারণা করা হইয়াছে। সুপ্রাচীন শিব-

শিব-কাহিনীর লৌকিক ও পৌরাণিক বিভাগ

* 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'—পৃঃ ১৪৬-৪৭

গীতিকায় এই পৌরাণিক অংশের যে কোন উল্লেখ ছিল না তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে।

লৌকিক অংশের মধ্যেও কাহিনী ভাগে যে সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না, তাহার কথাও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে, কৃষক শিব, লম্পট শিব, শাঁখারী শিব ইহারা পরস্পর স্বতন্ত্র। বাঙ্গালার বিভিন্ন লৌকিক সংস্কার হইতে বিভিন্ন কালে স্বতন্ত্রভাবে এই সমস্ত স্থানীয় (local) দেবতার কল্পনা করা হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে যখন বঙ্গীয় বিভিন্নমুখী লৌকিক ধর্ম্ম-সংস্কারগুলি এক হিন্দুধর্ম্মের বিরাট পক্ষচ্ছায়ায় আসিয়া সমবেত হইল তখনই পৌরাণিক ও এই সমস্ত লৌকিক বিভিন্ন দেব-কল্পনার মধ্যে একটা ঐক্যের সন্ধান করিয়া লইবার চেষ্টা হইল এবং তাহারই ফলে পৌরাণিক শিব, কৃষক, লম্পট, শাঁখারী এই সমস্ত বিভিন্ন গুণের সহিত সংমিশ্রণ লাভ করিল। এই সমস্ত স্বতন্ত্র উপকরণের একত্র সংমিশ্রণের ফলে বাংলার শৈব সাহিত্য একটা নিজস্ব সুসমঞ্জস সাহিত্য-বস্তুতে পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদা-মঙ্গলের প্রথম খণ্ডেও এই জন্যই চরিত্র-সৃষ্টির সম্পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

লৌকিক কাহিনীর উদ্ভব

প্রাচীনতম বাংলায় শৈব সাহিত্য বলিয়া স্বতন্ত্র কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য চিহ্নিত করা না গেলেও শিব-কাহিনী সমস্ত প্রাচীন কাব্যেরই অপরিহার্য্য অংশরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। শৈব ধর্ম্মের ধ্বংসস্তূপের উপর যেমন পরবর্ত্তী লৌকিক ধর্ম্মের দেউল গড়িয়া উঠিতেছিল, তেমনই শিব-কাহিনীর উপরই সেই সমস্ত লৌকিক দেবতার কাহিনী-মূল প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। শুধু লৌকিক দেবতার কাহিনীচ্ছলেই যে শিব-কাহিনী বর্ণিত

মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্যে শিব-কাহিনী

হইত তাহা নহে; সমাজে এই শিব-গীতিকার প্রভাব এত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল যে কৃত্তিবাসের রামায়ণে* পর্য্যন্ত মূল কাহিনীর সহিত অবান্তর ভাবে এই শিব-প্রসঙ্গের উল্লেখ রহিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সেই যুগে সমাজে একমাত্র প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন দেবতাই ছিল শিব। এইজন্য পরবর্ত্তী লৌকিক দেবতারাও শিবের সহিত একটা কল্পিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লইত। মনসা-মঙ্গল কাব্যসমূহে মনসার জন্ম-কাহিনী হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে[১]।

চণ্ডীমঙ্গলে শিব-কাহিনী

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যেও দেখা যাইবে, শিবানী গৌরী কি আকস্মিক ভাবে সহসা লৌকিক মঙ্গলচণ্ডীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেন! কৈলাস-শিখরবাসিনী অম্বিকাকে সহচরী পদ্মা উপদেশ দিতেছেন,

"শুন গ শেখরি সুতা কহিলুঁ ভবিষ্যত কথা
তোমার পূজার ইতিহাস।
সপ্ত দ্বীপে যুগে যুগে তোমার অর্চ্চনা আগে
আপনে করহে পরকাশ॥
দ্বাপর যুগের শেষে কলিঙ্গ রাজার দেশে
বিশ্বকর্ম্ম রচিব দেহারা।
মঙ্গলচণ্ডিকা রূপে শপন কহিয়া ভূপে
পূজা লবে দৈন্য দুঃখ হরা॥" —মুকুন্দরাম

স্বামীর সংসারের অস্বচ্ছলতা ও তদুপরি তৎপ্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য ইহাকে উপলক্ষ করিয়াই পার্ব্বতী স্বামীর সঙ্গে পৃথগন্ন হইয়া গেলেন, ইহাই কবির এই স্থলে বক্তব্য বিষয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই কাহিনীটির মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনীকে সংযোগ

* রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংকলিত।

১ বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাশ সংকলিত। পৃঃ ৮

করিয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে,—একটি পৌরাণিক, আর একটি লৌকিক। এইভাবে বাংলার প্রায় সমগ্র শৈব সাহিত্যেই এই পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীর সমন্বয় করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বাংলার নাথ-পন্থীরা ক্রমে শৈব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে নাথ-সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রথম উদ্ভূত হয়। তিব্বতীয়েরা নাথ-সম্প্রদায়ের আদিগুরু মীননাথ বা "মৎস্যেন্দ্রনাথকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করে।"* কিন্তু কালক্রমে বাংলার সমগ্র ক্ষুদ্র-বৃহৎ লৌকিক সম্প্রদায়গুলি যখন শৈব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন নাথধর্ম্মও এই শৈব প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিল না। "গোরক্ষ-বিজয়" কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নাথ-সম্প্রদায়ের আদিগুরু মীননাথ যখন কদলী পত্তনে গিয়া ষোড়শ সহস্র কামিনীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া আছেন, তখন শিষ্য গোরক্ষনাথ তাঁহার উদ্ধার-মানসে তাঁহার নিকট নানা নীতিকথার অবতারণা করিতেছেন। তাহার উত্তরে মীননাথ বলিতেছেন,

নাথ-সাহিত্যে শিব-কাহিনী

গোরক্ষ-বিজয়

"মোর গুরু মোহাদেব জগত ঈশ্বর।[১]
গঙ্গা গৌরী দুই নারী থাকে নিরন্তর ॥
যার দুই নারী তার সাক্ষাতে দিগম্বর।
হেনরূপে করে গুরু কেলি নিরন্তর ॥
তান য়াছে গৃহবাস আহ্মি কোন হই।
ভবে মোর এক গতি সুন আমি কই ॥

* 'বৌদ্ধগান ও দোহা'—(মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) ভূমিকা, ১৬ পৃষ্ঠা।

১ অবশ্য ইহা হইতেই মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এমন অনুমান করা ভুল হইবে; কারণ, এই সমস্ত কাহিনী বহু পরবর্ত্তী কালে লোকপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া রচিত।

তারপর,

> এতেক কহিল যদি ঈশ্বর মিনাই।
> গোর্খনাথে স্থনি তবে কহিল বুঝাই ॥
> হর মনিস্থ নহে জান অনাদি নিধন।
> ভাবিআ দেখহ গুরু তুহ্মি কোন জন ॥"

মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় বলেন, "নেপালের বৌদ্ধেরা গোরক্ষনাথের উপর বড় চটা। উহাকে তাহারা ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া ঘৃণা করে,......" ('বৌদ্ধগান ও দোহা'—ভূমিকা, পৃঃ ১৬) ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, "বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য শৈব ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন গোরক্ষনাথ। ...... গোরক্ষ-প্রচারিত শৈব ধর্ম্মই নাথপন্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।"* অবশ্য ইহা কতদূর সত্য তাহা স্থির করিয়া নির্ণয় করা কঠিন। এই সমস্ত মতবাদ একমাত্র তৎকালীন প্রচলিত লোক-প্রবাদ সমূহের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কারণ, গোরক্ষনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী কালেও শৈব ধর্ম্মের সহিত নাথ ধর্ম্মের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়।[১] ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, বহু প্রাচীনকাল হইতেই পুরাণোক্ত শিব-কাহিনী নাথ-সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

গোরক্ষনাথ ও নাথপন্থ

গোরক্ষবিজয়-মীনচেতন পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিবানী গোরক্ষনাথের চরিত্র-বল পরীক্ষা করিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত কৌশলই ব্যর্থ হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, গোরক্ষনাথ দেবীর চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া তাহাকে রাক্ষসী করিয়া ছাড়িয়া দিলেন,

গোরক্ষবিজয়-মীনচেতনে শিব-কাহিনী

* 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস'—সম্পাদকীয় মন্তব্য পৃঃ ৬৭, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী।

(১) **Kaulajnana Nirnaya—Introduction, Ed. Dr. Probodh Ch. Bagchi**

"দিন প্রতি এক গোটা মনুষ্য আহার।
নিতি প্রতি দেবীর যে এই কর্ম্ম সার॥
ফটি দুঃখ পাই দেবী তথাতে রহিলা।
দিন প্রতি এক গোটা মনিশ্য খাইলা॥"

এদিকে শিব পত্নীর বিরহে কাতর হইয়া তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলেন। মহাদেব ধ্যানবলে গোরক্ষনাথের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া পত্নীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তথাতে না পাইল শিব দেবী অন্যাসন।
গোর্খেরে ধরিয়া শিবে করে কদার্থন॥
কথা গেল মোর নারী তুহ্মি কি করিলা।
শিবের বচন শুনি গোর্খ জে হাসিলা॥
ভাঙ্গ ধুতুরা খাও কি বলিব তোরে।
কথা ত হারাইছ নারী ধর আসি মোরে॥"

যাই হউক, অবশেষে গোরক্ষনাথের সহায়তায় শিব পার্ব্বতীর উদ্ধার সাধন করিয়া তাহাকে কৈলাসে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথের নিকট নিজের পত্নীর পরাজয়ের দুঃখ ভুলিতে পারিলেন না। এদিকে,

"গন্ধর্ব্ব রাজার কন্যা বিরহিনী নাম।
স্বামী হেতু শিব পূজে মাগে মনস্কাম॥
অমর হইতে স্বামী তান হাবিলাস।
উর্দ্ধাসনে মাগে কন্যা শঙ্করের পাশ॥
সেবক বৎসল হর কৃপাএ বলিলা।
গোর্খনাথ স্বামী করি তাকে বর দিলা॥
অমর নাহিক কেহ ভুবন ভিতর।

যতি সতী গোর্খনাথ তাকে দিলাম বর ॥
এতেক শুনিয়া গোর্খ ভাবিল সঙ্কট।
ভাল বর দিল হর করিয়া কপট" ॥—গোরক্ষ বিজয়

কিন্তু যোগবলে গোরক্ষনাথ ছয় মাসের শিশুতে পরিবর্ত্তিত হইয়া কন্যাকে মাতৃ সম্বোধন করিল—

গোরক্ষ-নাথের চরিত্র বল

"স্তন খাইতে চাহে শিশু কান্দে হোয়া হোয়া।
তা দেখিয়া রাজকন্যায় বলে আচাভুয়া ॥
ভাল স্বামী পাইল আমি দুগ্ধ খাইতে চায়।
শুনি কি বলিব মোর বাপে আর মায় ॥"—মীনচেতন

এই ভাবে গোরক্ষনাথ শিবের সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজের চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।

নাথ-সম্প্রদায়ের সহিত শৈব সম্প্রদায়ের পূর্ব্বোল্লিখিত সম্পর্কের ফলে বাংলা এবং বাংলার বাহিরের এমন কি তিব্বতী ভাষায়ও নাথ-সাহিত্যে এই প্রকার শিব-কাহিনীর প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইবে। তবে তাহাও প্রসঙ্গতঃ মাত্র। কারণ, নাথদিগের গুরু সিদ্ধাচার্য্য ও তাহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত প্রধান শিষ্যদিগের অলৌকিক জীবন-কাহিনী বর্ণনাই নাথ-সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, শিবকে তাহারা পরবর্ত্তীকালে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহার প্রসঙ্গ তাহাদের সাহিত্যে অত্যন্ত নগণ্য অংশ মাত্র অধিকার করিতে পারিয়াছে।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে বাংলার ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ধর্ম্মঠাকুর বুদ্ধের সহিত অভিন্ন ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব বশতঃ বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন হইয়া গেল। এই ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে শৈব ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্যের কোন সম্পর্ক না থাকাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। ধর্ম্মমঙ্গল বিষ্ণুমাহাত্ম্য-সূচক সাম্প্রদায়িক

ধর্ম্ম-সাহিত্যে শিব-কাহিনী

সাহিত্য ; তথাপি দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এই ত্রয়ীর মধ্যে তাহাতে শৈবোক্ত শিবকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ইহাও সমসাময়িক সমাজে শৈব ধর্ম্মমতের প্রাবল্যের ফল, বলিতে হইবে। ধর্ম্ম সাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীও এই সম্পর্কে উল্লেখ যোগ্য।

ধর্ম্মসাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্ব

ধর্ম্মের ঘর্ম্ম হইতে আদিজননী আদ্যাশক্তির জন্ম হইল। আদ্যাশক্তিকে গৃহে রাখিয়া ধর্ম্ম বল্লুকা নদীতীরে তপস্যা করিতে গেলেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর ব্যাপিয়া তিনি তপস্যায় নিমগ্ন রহিলেন। তারপর তাঁহার বাহন উল্লুকের কথায় তিনি তপস্যা ত্যাগ করিয়া গৃহে আদ্যাশক্তির সংবাদ লইতে গেলেন। এদিকে আদ্যাশক্তি যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন; দেখিয়া ধর্ম্মঠাকুর তাঁহার বরের সন্ধানে পুনরায় বহির্গত হইলেন। গৃহে এক পাত্রে মধু ও আর এক পাত্রে বিষ তাঁহার জন্য রাখিয়া গেলেন। ক্রমে যৌবন ভার তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া বিষ পান করিয়া ফেলিলেন, ফলে তিনি গর্ভবতী হইলেন। কালক্রমে তাঁহার গর্ভ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন জনের জন্ম হইল। তাঁহারা জন্মলাভ করিয়াই কারণ সমুদ্রের তীরে গিয়া তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন।

শূন্যপুরাণে শিব-চরিত্র

ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব তিন জনই জন্ম হইতেই অন্ধ ছিলেন, তাঁহাদিগের ভক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ধর্ম্ম দুর্গন্ধ শবরূপে কারণ জলে ভাসিতে ভাসিতে একে একে তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকটবর্ত্তী হইলেন,—

"দুই চক্ষু অন্ধ বহ্মা জোগে বোসে আছে।
ভাইসিতে ভাইসিতে পরভু গেলা তার কাছে॥
দুর্গন্ধ পাইয়া বহ্মা ভাইসিতে লাগিল।
তিন অঞ্জলি জল দিয়া ভাসাইয়া দিল॥

তথা হইতে মহাপ্রভু ভাইসিতে ভাইসিতে।
সবর রূপ হএ গেল বিষ্টুর আগুতে ॥
দুর্গন্ধ পাইএ তবে বিষ্টু মহাবলী।
ভাসাইআ দিলা তারে দিয়া তিন অঞ্জলি ॥
ভাসিয়া ভাসিয়া পরভু করিল গমন।
শিবের নিকটে গিয়া ভাসে নারায়ণ ॥
দুর্গন্ধ পাইয়া শিব ভাবে মনে মন।
কুথা নহি কার জন্ম মরিল কুনজন ॥"—শূন্যপুরাণ

শিব তত্ত্বজ্ঞ; তিনি বুঝিতে পারিলেন ইহা নিরঞ্জনের মায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে; কারণ, কোথাও কাহারও তখন পর্য্যন্ত জন্মই হয় নাই, অতএব শবগন্ধ কোথা হইতে আসিবে?

ধেয়ানেত জানিল এহি পরভু নারায়ণ।
বুঝিতে তিন জনার মন আনিলা সনাতন ॥
দু'হাতে ধরিআ মড়া তুলিআ লইল।
দুর্গন্ধিত শব লএ সিব নাচিতে লাগিল ॥
পচা গন্ধ মড়া হএ আইলা নারাঅন।
চিনিতে নরিল আহ্মার ভাই দুই জন ॥

ধর্ম্ম তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দৃষ্টি-শক্তি প্রদান করিলেন,—

শিবের বরলাভ

শ্রীধর্ম্ম বল্লেন তুহ্মি আহ্মারে চিনিলে।
দুহি চক্ষু অন্ধ ছিল ত্রিলোচন হইলে ॥

সংস্কৃত পুরাণাদিতে শিবের ত্রিলোচন হইবার অনেকগুলি কারণের উল্লেখ আছে, পুরাণ-বহির্ভূত এইখানে আর একটি স্বতন্ত্র কারণের সহিত পরিচয় লাভ করা যায়। যাই হউক,

চক্ষুদান পাইয়া শিব আনন্দিত মন।
চরণে ধরিয়া শিব করন্তি স্তবন॥
আর এক নিবেদন করি নারাঅনে।
চক্ষুদান দেহ তুহ্মি ভাই দুহি জনে॥
শিবের মাহাত্ম্য
এত স্থনি পরাৎপর বোলো ত্রিলোচনে।
তব মুখামৃতে চক্ষু পাইব দুহি জনে॥
মুখর অমৃত দিয়া দোহার চক্ষু দিল।
অমৃত পাইএ দুহার দিব্য চক্ষু হইল॥"

দুই ভাই শিবের কৃপায় দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া আদ্যাশক্তি ও শ্রীধর্ম্ম সন্দর্শনে চলিলেন। শ্রীধর্ম্ম ব্রহ্মাকে জগৎ সৃষ্টি করিবার আদেশ দিলেন, বিষ্ণুকে তাহা পালনের ভার দিলেন এবং

"ত্রিলোচনে দিল ভার সংহার কারণ।"

ধর্ম্ম আদ্যাশক্তিকে জীব-জন্মের জন্য মনোনিবেশ করিতে আদেশ করিলেন, তাহার উত্তরে,—

"আদ্যাশক্তি বোলে পরভু স্থন মাআধর।
কেমনে করিব ছিস্‌টি সংসার ভিতর॥
অজোনি-সম্ভবা ভোগ নাহিক আহ্মার।
কেমন উপায় করি কহ করতার॥
সৃষ্টিকর্ত্তা শিব
মহাপরভু বোলে স্থনু আহ্মার বচন।
জেরূপে করিবে তুহ্মি ছিস্‌টির সৃজন॥
এহি রূপে কর ছিস্‌টি কহি জে তুমারে।
মহেস করিব বিভা জন্ম-জন্মান্তরে॥"

মহেশের সঙ্গে আদ্যাশক্তির বিবাহ হইল এবং তাহাদের মিলনের ফলেই

জগতের প্রজাসৃষ্টি হইল। এই সব কাহিনী একমাত্র ধর্ম্মমঙ্গলকাব্য সমূহেই যে উক্ত হইয়াছে তাহা নহে। চণ্ডীমঙ্গলেও সৃষ্টিতত্ত্বের এই কাহিনী একই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মাণিক দত্তের চণ্ডীতে আছে যে, "ধর্ম্মরাজের 'হাস্যেতে জন্মিয়া আগ্যা পড়ে ভূমিতলে'। তখন আগ্যার 'স্ত্রীর আকার নাই চণ্ডিকা হবে কিসে'?

চণ্ডীমঙ্গলে সৃষ্টিতত্ত্ব

ধর্ম্ম আগ্যাকে স্ত্রীরূপে সাজাইয়া শিবকে বিবাহ করিতে বলিলেন। শিব বলিলেন, আগ্যা সপ্তবার জন্মগ্রহণ করিয়া কায়া পরিবর্ত্তন করিলে তিনি তারপর বিবাহ করিবেন। তাহাতে আগ্যা দেহত্যাগ করিয়া কর্ম্মকার কুম্ভকার প্রভৃতি শিল্পকারদের ঘরে জন্মিয়া অবশেষে দক্ষ (নিপুণ) রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, এইজন্মে শিবের সঙ্গে চণ্ডীরূপিণী আগ্যার বিবাহ হইল। এইরূপে বৌদ্ধ আগ্যা ক্রমশঃ হিন্দুর চণ্ডী হইয়া শিবের ভার্য্যা হইলেন"।*

প্রত্যেক ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেই প্রচ্ছন্ন বুদ্ধদেবতা ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনারম্ভে শিবের এই প্রসঙ্গের উল্লেখ হইয়া থাকে (১)। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মমঙ্গলের মূল কাহিনী মধ্যেও দুই একবার হরপার্ব্বতীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ধর্ম্মমঙ্গলের কবিগণ এই পুরাণোক্ত হরপার্ব্বতীকে দিয়া তাঁহাদের প্রয়োজন মত কার্য্য করাইয়া লইয়াছেন, তাহার সহিত পৌরাণিক কাহিনীর কোনই সংশ্রব নাই।

ধর্ম্ম মঙ্গলকাব্যে সৃষ্টিতত্ত্ব

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলে পর্য্যন্ত সংস্কৃত পুরাণোক্ত শিবসম্বন্ধে অন্যান্য কাহিনী বর্ণনার পূর্ব্বে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় উক্ত কাহিনীর

* শূন্যপুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৪১; পাদটীকা। মাণিকদত্তের মঙ্গলচণ্ডী—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১১ সাল দ্রষ্টব্য। (১) সহদেব চক্রবর্ত্তী প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গলে হরগৌরী বিবাহ প্রমুখ অন্যান্য শিবাখ্যানও দেখিতে পাওয়া যায়।

তারণা করা হইয়াছে। অবশ্য কতকগুলি অর্ব্বাচীন সংস্কৃত পুরাণ যেমন, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, বৃহদ্ধর্ম্ম প্রভৃতিতে অনেকটা অনুরূপ শিবকাহিনীর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা যে

ামঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব

মঙ্গলের উপরোক্ত কাহিনী হইতে পরবর্ত্তীকালে গৃহীত তাহা নিঃসন্দেহ। মঙ্গল সাহিত্য হইতেই তদ্দেশীয় অন্যতম সাহিত্য চণ্ডীমঙ্গলেও এই কাহিনী ক্রামিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নাথ-সাহিত্যেও সৃষ্টিতত্ত্বের রূপ বর্ণনাই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধান প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির ধ্য একমাত্র মনসা-মঙ্গল কাব্যেই সৃষ্টিতত্ত্বের এইপ্রকার বর্ণনার সহিত রিচিত হওয়া যায় না; কারণ, মনসা-মঙ্গলের উদ্ভবের ইতিহাস স্বতন্ত্র।

প্রাচীনতম সাহিত্যে এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ রচনা ব্যতীত শিব-হিনীর সম্পূর্ণ কোন রচনার সহিত পরিচয় লাভ করা যায় না। তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সংস্কৃত পুরাণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যে কয়েকখানি শিব-মাহাত্ম্যসূচক বাংলা কাব্য রচিত হইয়াছিল কাহিনীর দিক দিয়া

শিব-কাহিনীর অসম্পূর্ণতা

মাত্র তাহাই সম্পূর্ণতা দাবী করিতে পারে। এই স্থলে এই জাতীয় য়কখানি পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ আশ্রয়স্থল চট্টগ্রাম। তাহার অন্তর্গত নাথ এককালে বৌদ্ধ তীর্থরূপেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে সুদূর ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্তও যখন হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইল তখন এই বৌদ্ধতীর্থ

শব তীর্থ চন্দ্রনাথ

দু তীর্থে পরিণত হইল। স্থানীয় অধিষ্ঠিত বুদ্ধদেবতা হিন্দুর 'শিব' বা দ্রনাথ'এ রূপান্তরিত হইলেন। চন্দ্রনাথ তীর্থে এখনও বৌদ্ধ কীর্ত্তিস্তম্ভের সাবশেষই বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়।

এই চন্দ্রনাথ শৈব তীর্থে পরিণত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে সংস্কৃ পৌরাণিক শৈব সাহিত্যেরও প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সাধা জন-সমাজে এই নূতন ধর্ম্মমত কতক প্রতিষ্ঠিত হই সেই যুগে স্থানীয় কয়েক জন বাঙ্গালী কবি সং শৈব পুরাণগুলির অনুকরণ করিয়া বাংলায় শি মাহাত্ম্য সূচক কাহিনী রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই জাতীয় গ্রন্থ কয়খানি বাংলার শৈব সাহিত্যের সম্পূর্ণ কয়খানি গ্রন্থের অন্যতম।

বঙ্গসাহিত্যে পৌরাণিক শিব

চট্টগ্রামের প্রবীণ সাহিত্যিক মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশার এই জাতীয় চারিখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন। ইহাদের নাম 'মৃগলুব্ধ' সংস্কৃত 'শম্ভু-রহস্য' বা 'শিব-রহস্য' বর্ণিত শিবচতুর্দ্দ ব্রতকথা ও অন্যান্য শৈব পুরাণোক্ত শিব-কাহিনীর অবলম্বন করিয়া এই গল্প রচিত হয়। নিম্নে 'মৃগলুব্ধে'র কাহিনী-ভাগ সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করা গেল,—

'মৃগলুব্ধ'

মৃগলুব্ধের গল্পসার

হরপার্ব্বতী কৈলাসে বসিয়া আছেন। পার্ব্বতী মর্ত্ত্যে মহাদেবের প্ প্রচারের আখ্যান শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে পশুপতি বলিতেছেন।

হস্তিনা নগরীতে তাঁহার পরম ভক্ত মুচুকুন্দ ও তাঁহার রাণী রুক্মি শিবচতুর্দ্দশী ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। মুচুকুন্দ পূজা সমাপন করিয়াছে সারা রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে। সেইজন্য রাণী রুক্মিণী রাজা গল্পচ্ছলে শিবমাহাত্ম্য শুনাইতেছেন।—

ইন্দ্রের বিদ্যাধর চিত্রসেন একদিন ইন্দ্রসভায় নৃত্য করিতে করি ব্যাধের হরিণ শীকার লক্ষ্য করিয়া তাল ভঙ্গ করিল। চিত্রসেন শাপগ্র হইল,—মর্ত্ত্যে তাহাকে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করি হইবে। ভদ্রসেন মৃগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার শাপ মোচন হইবে

অভিশপ্ত চিত্রসেন

চিত্রসেন ব্যাধরূপে বনে জন্মগ্রহণ করিল। পশু হত্যাই তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। ক্রমে বন পশুশূন্য হইল। চিত্রসেন কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্ব, বিকট-দর্শন; তাহার মাথার কেশ পিঙ্গলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ তাহার চক্ষুদ্বয়, সে অতিশয় অনাচারী। একদিন চিত্রসেন শীকারের সন্ধানে বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন করিল। সমস্ত দিন প্রাণপণ চেষ্টাতেও কোন শীকার মিলে নাই। দিবাবসানে হঠাৎ ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিল। অনাহারে ক্লান্ত, মৃত্যুভয়ে ভীত ব্যাধ অজ্ঞাতসারে বনের এক বিল্ব বৃক্ষের শাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেই দিন চতুর্দ্দশী রাত্রে উপবাসী ব্যাধ সারা রাত্রি জাগিয়া বিল্বপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল; পাছে সে ঘুমাইলে কোন বন্য পশুর কবলে পতিত হয়। ছিন্ন পত্র বৃক্ষের পাদমূলস্থিত শিবলিঙ্গের উপর পড়িতে লাগিল। দেবাদিদেব পরিতুষ্ট হইলেন। ধর্ম্মরাজ ব্যাধকে বর দিতে চাহিলে, ব্যাধ পশু-শীকারের বর মাগিয়া লইল।

মর্ত্ত্যে ব্যাধরূপে

শিবচতুর্দ্দশী রাত্রে উপবাসী ব্যাধ

ধনুঃশর হাতে ব্যাধ বনে প্রবেশ করিল। সেইদিন ব্যাধের জালে এক মৃগ বন্দী হইল। মৃগী স্বামীর আসন্ন মৃত্যু জানিয়া শোকে দুঃখে কাতর হইল। মৃগের শত অনুরোধেও মৃগী তাহাকে ত্যাগ করিবেনা। ব্যাধের নিকট হইতে নিজকে দান করিয়া স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাহিবে। স্বামীকে আসন্ন মৃত্যুর মুখে রাখিয়া ঘরে কাহার মুখ দেখিয়া সে স্বামি-বিরহ সহ্য করিবে। স্বামীর প্রাণের জন্য মৃগী ব্যাধের নিকট কত অনুনয় বিনয় জানাইল। তাহাকে ধর্ম্ম কথা শুনাইলে ব্যাধ তাহার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া দিবে। মৃগী ব্রহ্মার সৃষ্টি-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিল। পৃথিবীতে যতপ্রকার পাপ আছে তাহার বীভৎস পরিণামের কথা কহিল। তবে যে যত পাপীই হউক সে যদি শিবচতুর্দ্দশী ব্রত

জাল-বদ্ধ হরিণ

হরিণীর দুঃখ

পালন করে তবে সে নিশ্চয় কৈলাসে গমন করিবে—তাহার সকল দুঃখ পাপের অবসান হইবে।

মৃগীর উপদেশে ব্যাধ জ্ঞান লাভ করিল, তাহার ব্যাধোচিত হীন মনোবৃত্তি দূরীভূত হইল। মৃগ ব্যাধের জাল হইতে মুক্তি পাইল। শাপগ্রস্ত ভদ্রসেন ও রত্নাবতী মৃগও মৃগীরূপে এতদিন পশুজন্ম ভোগ করিয়া শাপান্তে শিবলোকে গমন করিল।

মৃগ ও ব্যাধের মুক্তি

ব্যাধ চন্দ্রভাগা নদীর তীরে গমন করিল। তাহার ব্যাধ-জীবনের সমস্ত কলুষ দুরপনেয় কলঙ্ক দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে অর্পণ করিবে। সেই নদীর তীরে ব্যাধ বনফুলে দেবতার পূজা করিতেছে। পূজক ব্রাহ্মণ ব্যাধের শিবপূজা দেখিয়া তাহাকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিল। পূজকের প্রহারে জর্জ্জরিত ব্যাধের মিনতিতে ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ব্যাসকুণ্ডে স্নান করিয়া আসিতে আজ্ঞা করিল; ব্যাসকুণ্ডে স্নান করিয়া ব্যাধ পবিত্র হইল। পশুহন্তা শীকারী আজ পূজারী সাজিয়াছে। ভক্তিভরে দেবতার পূজা করিতেছে। দেবতা আজ তুষ্ট হইয়াছেন; তাহার ব্যাধ-জীবনের দুরপনেয় কলঙ্ক দূর হইয়াছে, শাপমুক্ত হইয়া সে কৈলাসে গমন করিল।

ব্যাধের মুক্তি

রুক্মিণীর আখ্যান সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিহগের প্রভাতী সুর বাজিয়া উঠিল। মুচুকুন্দ মনস্থ করিলেন, সেই চন্দ্রভাগা নদীতীরে তিনি দেবাদিদেবের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার জন্ম সার্থক করিবেন। নদীতীরে মহেশের মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মুচুকুন্দ ষোড়শোপচারে দেবতার পূজা করিয়া মহেশকে তুষ্ট করিলেন। তারপর রাজ্যের সমস্ত প্রজা সমেত মুচুকুন্দ কৈলাসে গমন করিলেন।

রুক্মিণী ও মুচুকুন্দের শিব-লোক প্রাপ্তি

সংস্কৃত মহাভারত, শিবপুরাণ, হরিবংশ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে মুচুকুন্দ রাজার বিবিধ গল্প বর্ণিত আছে। মুচুকুন্দ রাজা পরম শৈব ছিলেন। কাশীধামে মুচুকুন্দেশ্বর শিবলিঙ্গ এখনও বর্ত্তমান আছে।

পুরাণে মুচুকুন্দ

উদ্ধৃত গল্পসার হইতে দেখা যাইবে যে, এই কাহিনীর মধ্যে লৌকিক শিবের উল্লেখ একেবারেই নাই। ইহাতে একমাত্র পৌরাণিক শিবেরই পবিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, লৌকিক শৈব ধর্ম্মের জন্মভূমি হইতে বহু দূরবর্ত্তী স্থানে এই কাহিনী প্রচলিত হইয়াছিল, সেই জন্যই ইহার উপর লৌকিক প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

বাংলা ভাষায় এই 'মৃগলুব্ধ' নামক পৌরাণিক শিব-কাহিনীর আদি লেখক কে? এই সম্পর্কে পূর্ব্বোক্ত মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেবের মন্তব্য অনেকটা নির্ভরযোগ্য। তিনি এই জাতীয় যে পুঁথিখানির লেখককে 'আদি' কবি বলিয়া আখ্যাত করিতে চাহেন দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই পুঁথিখানি খণ্ডিত এবং তাহা হইতে লেখকের নামধাম কিছুই জানিবার উপায় নাই। তবে লেখক চট্টগ্রামের অধিবাসী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই জাতীয় পুঁথি একমাত্র চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্য কোন স্থল হইতেই বিশেষ আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সম্পর্কে উক্ত লেখকের মন্তব্য তাঁহার নিজের ভাষায়ই উদ্ধৃত করিতেছি,—

মৃগলুব্ধের আদি লেখক

"বক্ষ্যমান উপাখ্যান বিষয়ে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত চারিখানি গ্রন্থের মধ্যে দেখা যাইতেছে, তিনখানিই চট্টগ্রামের জিনিস এবং সেই তিনখানির মধ্যে একখানিকে আবার ইহার আদি গ্রন্থ বলিয়া অনুমান হইতেছে। তাহা

যদি সত্য হয়, তবে তৎকালীন শৈবধর্ম্মপ্রধান চট্টগ্রামেই সর্ব্বপ্রথম এই উপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিতে হইবে।"* এই জাতীয় কাব্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উৎপত্তি এবং চট্টগ্রামেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

চট্টগ্রামে পৌরাণিক শৈব-কাহিনী

মৃগলুব্ধ পুথির আদি রচয়িতার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাহার পরবর্ত্তী কয়েকজন কবি সম্বন্ধেও বিস্তৃত পরিচয় সহজলভ্য নহে। তাহাদের মধ্যে একজনের নাম রামরাজা। রামরাজা কৃত 'মৃগলুব্ধ' পুথিতে তাহার নিজের বিস্তৃত পরিচয় কিম্বা পুঁথি রচনার সম্যক্ সময় নির্দ্দেশ কিছুই নাই; তবে, এই জাতীয় অন্যান্য পুঁথির সহিত তুলনায় এই রামরাজা বিরচিত পুঁথিকে নানা কারণে প্রাচীন মনে হয়। রামরাজা তাঁহার পুস্তকে এই প্রকার ভণিতা দিয়াছেন,—

রামরাজ প্রণীত 'মৃগলুব্ধ'

(১) শঙ্কর কিঙ্কর শিশু রামরাজে গাএ।
মৃগলুব্ধ গাইল প্রথম অধ্যায়॥
(২) শঙ্কর-কিঙ্কর রাম রাজা ভণে।
দ্বিতীয় অধ্যায় নরক লক্ষণে॥
(৩) হরষিত হইয়া রাম রাজা গাএ।
ব্যাধের গমন শুনি তৃতীয় অধ্যায়॥

এতদ্ব্যতীত তাঁহার পুস্তকে নিজের আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক আর কোনও উক্তি নাই। অতএব এই অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর উপকরণের উপর নির্ভর করিয়া কবির সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। তবে পুঁথির অন্যান্য বিষয় বিচার করিয়া এই মনে হয় যে, রামরাজা

* 'মৃগলুব্ধ-সংবাদ'—মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত, ভূমিকা : পৃ১৮

াতিতে মগ ছিলেন। এই গ্রন্থের আবিষ্কারক মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেব বলেন, "সাধারণতঃ চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বড়ুয়া মগদের মধ্যেই নামের সহিত রাজা শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অধিক দেখা ায়। যথা,—ধর্ম্মরাজ বড়ুয়া, শুকরাজ বড়ুয়া, জয়রাজ বড়ুয়া, ইত্যাদি। ।ই সব বিবেচনা করিয়া আমার খুবই সন্দেহ হইতেছে, কবি রাম ামরাজ কোন বড়ুয়া মগ বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" যাই হউক ।ই অনুমান ব্যতীত এই কবি সম্বন্ধে অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত ওয়া সম্ভবপর নহে।

রামরাজা কি মগ ?

রামরাজের রচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ; সংস্কৃত পুরাণের ভাষার প্রতিধ্বনি তাঁহার রচনায় শুনিতে যায়। বনমধ্যে নিঃসঙ্গ ব্যাধ শিব-চতুর্দ্দশীর ঘন অন্ধকারময় রাত্রিতে যে মহাদুর্য্যোগের সম্মুখীন হইল তাহার চিত্রটি কবির ।চনায় সুন্দর ফুটিয়াছে,—

রাম রাজার রচনা-বৈশিষ্ট্য

"বিজুলি চমকে মেঘ করিল গর্জ্জন।
মুষল সমান ধার হইল বরিষণ॥
ঠাঠারের ঘায় অগ্নি পড়ে নিরন্তর।
ঘোর অন্ধকার হইল বনের ভিতর॥
দেখিআ ব্যাধের মনে ভয় উপজিল।
তরাসে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িল॥
ভয়ে আকুল ব্যাধ চিন্তিতে লাগিল।
ঘোর অন্ধকার রাত্রি বনে ত রহিল॥

* 'মৃগলুব্ধ সংবাদ'—মুন্সী আব্দুল করিম সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃঃ ২—৩
(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত)

উদ্দেশ না পাইল মোর বন্ধু পরিকর।
কেমতে গোঞাইমু মুই বনের ভিতর॥
সিংহ ব্যাঘ্র জন্তু সব বৈসে সেই বনে।
এ সবার ভয় আমি এড়াইমু কেমনে॥”

—মৃগলুব্ধ সংবাদ

রতিদেব প্রণীত 'মৃগলুব্ধ'

মৃগলুব্ধের অন্যতম কবির নাম রতিদেব। রতিদেব প্রণীত কাব্য এই জাতীয় কাব্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। ইহার পুঁথিও চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে।* রতিদেব তাঁহার পুঁথিতে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

“পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা বসুমতী।
জন্মস্থল সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি॥
জ্যেষ্ঠ দুই ভাই বন্দম রাম-নারায়ণ।
ধরণী লোটাইআ বন্দম যত গুরুজন॥
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী বন্দম মহেশ শাশুর।
মন্ত্রগুরু দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর॥

রতিদেবের পরিচয়

ইহা হইতেই জানা যায় যে, রতিদেবের পিতার নাম গোপীনাথ, মাতার নাম বসুমতী (কোন কোন পুঁথিতে মধুমতী), রাম ও নারায়ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাহার শাশুড়ী অন্নপূর্ণা, শ্বশুর মহেশ ও কুলগুরু মোক্ষদা ঠাকুর। তাঁহার নিবাস সুচক্রদণ্ডী, তাহা চক্রশালা নামে খ্যাত। চট্টগ্রামের অন্তর্গত পটিয়া থানার অনতিদূরবর্ত্তী কয়েকটি গ্রাম চক্রশালা নামে এখনও পরিচিত।

* মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের সম্পাদনায় এই পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী সংখ্যা ৪৮।

ভবানীনাথের 'লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়' গ্রন্থে এই চক্রশালার উল্লেখ আছে। পটীয়া মহকুমা-সহরের উপকণ্ঠে সুচক্রদণ্ডী গ্রামও বর্ত্তমান রহিয়াছে। রতিদেব তাঁহার পুস্তক রচনার সময় সম্বন্ধে তাঁহার পুঁথি-মধ্যেই উল্লেখ করিয়াছেন,—

রচনা-কাল

রস অঙ্ক বাউ (বায়ু) শশী শাকের সময়।
তুলামাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হএ ॥
মৃগলুব্ধ পোথারম্ভ, মহাদেবের পাএ।
ভব তরিবার হেতু রতিদেবে গাএ ॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ১৫৯৬ শকাব্দ বা ১৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এই পুস্তক রচিত হয়।*

মৃগলুব্ধের শিব-কাহিনী সর্ব্বাংশেই পৌরাণিক। শিবের যে লৌকিক রূপ সম্বন্ধে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহার সহিত এই পুস্তকে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, লৌকিক শিবের আদর্শ তখনও স্থান-বিশেষেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীন শিবের গান সম্ভবতঃ এই সুদূর চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত ছিলনা, তাহা হইলে এই পৌরাণিক শিবের পার্শ্বে তাঁহার লৌকিক চরিত্রেরও সংমিশ্রণ ঘটিয়া যাইত।

কাহিনী ভাগের উদ্ভব

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালায় রতিদেবের একখানি অসম্পূর্ণ পুঁথি সংগৃহীত আছে। তাহাতে গ্রন্থরচনার সময়-নির্দ্দেশ এইরূপ,—

"রস অঙ্গ (অঙ্ক ?) শর শশী শিবের (শাকের) সমএ।
মৃগ লোব্ধ কথা মহাদেবে গাএ ॥
ভক্ত তরিবার হেতু রতিদেবে কএ ॥" — বলা বাহুল্য, ইহাতেও উল্লিখিত সময়ই সমর্থন করিতেছে। প্রাচীন পুঁথি সংখ্যা ৮৯১।

রতিদেব সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচনায় অনেক স্থলে সংস্কৃত পুরাণগুলির একেবারে ভাষানুবাদ লক্ষ্য করা যায়। এই উপলক্ষে স্কন্দপুরাণোক্ত শিব-লিঙ্গের উৎপত্তি কাহিনীর সহিত তাহার রচনার তৎবিষয় তুলনা করিয়া পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

রতিদেবের বৈশিষ্ট্য

রতিদেবের রচনা পূর্ব্বোল্লিখিত রামরাজের রচনা হইতে সরল এবং কবিত্বপূর্ণ। ব্যাধের জালে আবদ্ধ মৃগের সম্মুখে মৃগীর কাতরোক্তির বর্ণনাটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।—

"কেনে কাল বনে আইলা ব্যাধ হাতে প্রাণ দিলা
মোকে বাম হইলো ভগবান।
বনে পাই তৃণ পানি অপকার নাহি জানি
কেনে বিধি এত বিড়ম্বন॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ অখনে আসিবো ব্যাধ
ঝাটে উঠ চলি যাই ঘর।
মোর প্রভুসঙ্গে রঙ্গ কোন বিধি কৈল ভঙ্গ
পলকে হরিল প্রাণেশ্বর॥"

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই কাব্য সর্ব্বাংশেই পুরাণের অনুকারী, অতএব ইহাতে বাঙ্গালী কবির সহজ কবিত্বস্ফূর্ত্তির বাধা হইয়াছে। ইহাতে চরিত্র-সৃষ্টির প্রয়াস নাই, দৈব-মহিমা হইতে বিমুক্ত করিয়া কোন চরিত্রের উপর জাতীয় স্বাতন্ত্র্য আরোপ করা হয় নাই। এই সমস্ত কারণে এই জাতীয় মৃগলুব্ধ নামীয় বাংলা শিবাখ্যানকে অনুবাদ-সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন।

একমাত্র চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথের শৈব তীর্থকে কেন্দ্র করিয়া এই শৈব-সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, সেইজন্য ইহার অন্যত্র প্রসার সম্ভবপর হয় নাই। চট্টগ্রাম অঞ্চলের শৈবধর্ম্ম পরবর্ত্তী-কালে বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্মুখীন হওয়াতে কতকটা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। তাহারই ফলে, এই শৈব-সাহিত্য ও ক্রমে লোকপ্রীতি হইতে বঞ্চিত হইতে থাকে।

মৃগালুব্ধের প্রচার

বাংলার এই সুদূর প্রান্তবর্ত্তী সাহিত্যের সহিত কেন্দ্রীয় বঙ্গের শৈব-সাহিত্যের কোনই যোগ ছিলনা। যে সময় চট্টগ্রামে এই পুরাণানুগ শৈব সাহিত্যের বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় তখন বঙ্গের অন্যত্র লৌকিক শৈব-সাহিত্যও বিশেষ পুষ্টিলাভ করিতেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ নামক কোন কবি একখানি 'শিব-মঙ্গল' রচনা করেন, তাঁহার উপাধি ছিল কবিচন্দ্র। এতদ্ব্যতীত শঙ্কর নামক কোন কবি 'বৈদ্যনাথ-মঙ্গল' নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। তাঁহার পিতার নাম দ্বিজ হরিহর। এতদ্ব্যতীত কবির বিস্তৃত পরিচয় পাইবার উপায় নাই। তাহার পরবর্ত্তী কালে দ্বিজ ভগীরথ 'শিবগুণ মাহাত্ম্য' নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর এই সমস্ত কবিগণের রচিত শিব-কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের প্রসিদ্ধ 'শিবায়ন' কাব্য রচিত হয়।

শৈব সাহিত্যের অন্যান্য লেখক

এই শিবায়নের গল্পসার পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। কবি ও কাব্য সম্বন্ধে এই স্থলে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

রামেশ্বর তাঁহার রচিত কাব্যমধ্যেই প্রাচীন রীতি অনুসারে নিজের পরিচয় দিয়াছেন,

'ভট্ট নারায়ণ মুনি সন্তান কেশরকণী
যতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ।

তস্য সুত কৃতকীর্ত্তি গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী
তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ ॥

রামেশ্বরের পরিচয়

তস্য সুত রামেশ্বর, শম্ভুরাম সহোদর
সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা, পরমেশ্বরী পতিব্রতা দুই নারী
অযোধ্যা নগর নিকেতন ॥

পূর্ব্ববাস যদুপুরে, হেমৎসিংহ ভাঙ্গে যারে,
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকী তটে, বরিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সংগীত ॥'

তাঁহার প্রতিপালক রাজা রামসিংহ সম্বন্ধে তিনি এই পরিচয় দিয়াছেন,

"রঘুবীর মহারাজা, রঘুবীর সমতেজা
ধার্ম্মিক রসিক রণধীর।
যাহার পুণ্যের ফলে অবতীর্ণ মহীতলে
রাজা রামসিংহ মহাবীর ॥

তস্য সুত যশোমন্ত সিংহ সর্ব্ব গুণযুত
শ্রীযুত অজিত সিংহের তাত।
মেদিনীপুরাধিপতি কর্ণগড়ে অবস্থিতি
ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ ॥

যশোবন্ত সিংহ

রাজা, রণে ভৃগুরাম, দানে কর্ণ, রূপে কাম,
প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রবি।
শক্রের সমান সভা, জ্বলন্ত পাবক প্রভা,
সুবেষ্টিত পণ্ডিত সৎ কবি ॥

দেবী পুত্র নৃপবরে, স্মরণে পাতক হরে,
দরশনে আনন্দ বর্দ্ধন।
তস্য পোষ্য রামেশ্বর তদাশ্রয়ে করি ঘর
বিরচিল শিব সঙ্কীর্ত্তন॥”

ইহা হইতেই জানা যায় যে, রামেশ্বর ভট্ট নারায়ণ বংশোদ্ভূত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস মেদিনীপুর জিলার মধ্যে ঘাটালের নিকটবর্ত্তী বরদা পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রাম।

রামেশ্বরের পূর্ব্ব নিবাস

শিবায়ন ব্যতীত সত্যপীরের পাঁচালী নামক তাঁহার আর একখানি ব্রতকথা আছে ; তাহা ঐ যদুপুর বাসকালীনই রচিত হয়। তাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,

পরে সত্যপীর বন্দি কহে কবি রাম।
সাকিন বরদাবাটি যদুপুর গ্রাম॥

হেমৎ সিংহ নামক সম্ভবতঃ কোন রাজকর্ম্মচারী তাঁহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করেন। তিনি অতঃপর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কর্ণগড় নামক স্থানের তৎকালীন রাজা রামসিংহের সভাকবি নিযুক্ত হন, রামসিংহ অল্পকাল মধ্যেই পরলোক গমন করেন ; তখন তাঁহার পুত্র যশোবন্ত সিংহ রাজা হন। এই যশোবন্ত সিংহের আদেশেই কবি রামেশ্বর শিব-সঙ্কীর্ত্তন নামক কাব্য রচনা করেন।

গ্রন্থরচনার কাল সম্বন্ধে কবি গ্রন্থ-মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন,

গ্রন্থরচনা-কাল

শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
সেইকালে শিবের সঙ্গীত হইল সারা।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় উদ্ধৃত পদ হইতে কোন সঙ্গত অর্থ আবিষ্কার করা যায় না। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন,

"রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়নের ১৭৬৩ খ্রীঃ অঃ লিখিত একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং শিবায়ন ঐ সময়ের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল।" কবির প্রতিপালক রাজা যশোবন্ত সিংহের সময় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ১৬৫৬ শকে ঢাকার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় আসেন। এই দেওয়ানি গ্রহণের পূর্ব্বে যশোবন্ত সিংহ মুর্শিদকুলী খাঁর অধীনে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি সহ চাকুরী করিতেন। অতএব ইহা অনুমান করা যায় যে, মুর্শিদকুলী খাঁর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার নিজ জমিদারী মেদিনীপুর বাসকালে এই শিব-সঙ্কীর্ত্তন গ্রন্থ রচিত হয়। তাহা হইলে ১৬৫৬ শকের ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হইবার সম্ভাবনা।* রামেশ্বরের 'শিব-সঙ্কীর্ত্তন' পুস্তক যখন প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৭৪ খ্রিঃ) সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয় তখন উপরি-উদ্ধৃত শিবায়নের রচনা-কাল নির্দ্দেশক পদটির নিম্নে তাহার টীকা স্বরূপ ১৬৩৪ শকাব্দের উল্লেখ করা হইয়াছিল। অবশ্য ইহা উল্লিখিত পদভাগের অর্থ হইতে পারে না; তবে সত্তর বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থ-সম্পাদক গ্রন্থ-রচনার কাল সম্বন্ধে যে সময়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা তিনি সম্ভবতঃ কোন অনুসন্ধানের ফলেই জানিতে পারিয়াছিলেন। এই ১৬৩৪ শকাব্দের সঙ্গে রাজা যশোবন্তের মেদিনীপুর বাসের পূর্ব্বোক্ত সময় তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই সময়েই অর্থাৎ ১৬৩৪ শকাব্দ কিম্বা তাহার সন্নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব নহে।

যশোবন্তের রাজধানী কর্ণগড় মেদিনীপুর শহর হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে যে, এইখানে যশোবন্ত প্রতিষ্ঠিত মহামায়ার মন্দির ছিল, তাহাতেই কবি রামেশ্বর যোগাসনে শিবমন্ত্র জপ করিতেন।

* 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'—পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, পৃঃ ১৪৭ দ্রষ্টব্য।

রামেশ্বরের কাব্য-পরিচয়

রামেশ্বরের কাব্যের প্রকৃত নাম শিব-সংকীর্ত্তন। গ্রন্থ-মধ্যে ইহাকে কোথাও 'শিবায়ন' বা 'শিব-মঙ্গল' বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু তথাপি ইহা মঙ্গল-কাব্যের অনুরূপ প্রত্যেক দিনের দুই পালা করিয়া আট দিনের ষোল পালায় স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বিভক্ত। অন্যান্য বিষয় বিচার করিলেও ইহাতে মঙ্গল-কাব্যের সমস্ত লক্ষণই বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ মেদিনীপুর অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত এবং সেখানে সর্ব্বত্র ইহা 'শিবায়ন' নামেই প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ রামায়ণের প্রভাব বশতঃ ইহার নাম শিবায়ন হইয়া থাকিবে।

রামেশ্বরের প্রচার

রামেশ্বরের শিবায়ন বটতলায় মুদ্রিত হইয়া বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। এমন কি অত্যন্ত আধুনিক কালের একজন কবি এই রামেশ্বরের পথানুসরণ করিয়া 'শিবায়ন' নামেই একখানি কাব্য রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে তিনি এই প্রকার ভণিতা দিয়াছেন,—

শ্রীহরি চরণ করিল রচন
রামেশ্বর পদ স্মরণে।*

কবি রামেশ্বর তাঁহার কাব্যের ভণিতায় বলিয়াছেন,

যশোমন্ত সিংহে দয়া কর হরবধূ।
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু॥

কিম্বা কোথাও

ভব-ভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর।

কিন্তু তিনি তাঁহার নিজের রচনাকে মধুক্ষরা ভদ্রকাব্য বলিয়া যে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জন করিয়াছেন, এই বিষয়ে তাঁহার কাব্যের নিম্নলিখিত আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

* 'শিবায়ন'—হরিচরণ আচার্য্য প্রণীত,—বসুমতী সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত (১৩৩১ সাল)

"লেখকের সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। তাহারই ফলে বাংলায় অপ্রচলিত বহু সংস্কৃত শব্দ যোজনা দ্বারা তিনি কাব্য মধ্যে বহুতর অনুপ্রাস সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন।

রামেশ্বরের পাণ্ডিত্য

এই সমস্ত অনুপ্রাস অধিকাংশ সময়েই কষ্ট-সৃষ্ট বলিয়া শ্রুতিসুখাবহ হয় নাই, যেমন,—

"ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বাণ।
চমৎকার চন্দ্রচূড় চণ্ডী পানে চান॥
পদ্মাবতী পার্ব্বতীকে প্রবোধিয়া আনে।
প্রাণনাথে প্রকারে ভেটিব সেইখানে॥
জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা।
ভণে রামেশ্বর ভবে ভাবি রাত্রিন্দিবা॥"

শিবের পৌরাণিক চরিত্র বর্ণনায় অনেক স্থলেই কবি সংস্কৃত পুরাণাদি এমন কি কালিদাসের কুমার-সম্ভব প্রভৃতিও প্রায় বাংলায় ভাষানুবাদ করিয়া দিয়াছেন। সেইজন্য ভাষার দিক দিয়া এই পৌরাণিক অংশ অনেকটা আড়ষ্ট এবং জড় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শিবের লৌকিক অংশ রচনায় কবিকে সংস্কৃত আদর্শের অভাবে সর্ব্বত্রই নিজের কল্পনা ও মৌলিক রচনা-শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই লেখকের একটি সরস কবিচিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। পৌরাণিক অংশ, চরিত্রসৃষ্টি ও রচনা-গুণের দিক দিয়া বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত হইলেও লৌকিক অংশ এই সকল বিষয়েই কতক কৃতিত্বের দাবী করিতে পারে। পার্ব্বতীর গৃহস্থালী বর্ণনায় একটি দরিদ্র বাঙ্গালী পরিবারের সুন্দর আলেখ্য কবি চিত্রিত করিয়াছেন। বাঙ্গালী কবির সহজ কবি-দৃষ্টিতে এই দেব-চরিত্রগুলি সম্পূর্ণভাবে দেবত্ব-বিবর্জ্জিত হইয়া সাধারণ মনুষ্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। শিবের ভিক্ষান্নে পার্ব্বতী রন্ধন

রামেশ্বরের আদর্শ

জাতীয় চরিত্র সৃষ্টিতে শিবায়ন

করিয়া উপবাসী স্বামীপুত্রকে পরিবেশন করিতেছেন। এই রচনাটির মধ্যে একটি চির দরিদ্র এবং লোভী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-পরিবারের নিত্য চিত্রই যেন অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, দেবমহিমার বিন্দু মাত্র অস্তিত্বও তাহাতে অনুভূত হইবে না,—

"তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দু'টি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি ॥
তিন জন একুনে বদন হইল বার।
গুটি গুটি দু'টি হাতে যত দিতে পার ॥
তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে থায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায় ॥
দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে ॥
সুক্ত খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্ন আন অন্ন আন রুদ্র মূর্ত্তি ডাকে ॥
কার্ত্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হয়ে খা ॥
মুষগ মায়ের বোলে মৌন হয়ে রয়।
শঙ্কর শিখায়ে দেয় শিখিধ্বজ কয় ॥
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ঈষদুষ্ণ সূপ দিল বেশরির পরে ॥
শঙ্কর বলেন শুন নগেন্দ্রের ঝি।
সূপ হইল সাঙ্গ আন আর আছে কি ॥
দড় বড় দেবী এনে দিল ভাজা দশ।
খেতে খেতে গিরিশ গৌরীর গান যশ ॥"

কোন সমালোচক উল্লিখিত চিত্র হইতে কবির হাস্যরস সৃষ্টি-নৈপুণ্যের সন্ধান পাইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে কবির একটি অস্বচ্ছল গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কণের নৈপুণ্যই অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ভিক্ষুকের গৃহে নিত্য অভাব, এবং এই অভাবকে কেন্দ্র করিয়াই দাম্পত্য জীবনেও নিত্য অশান্তি ঘনাইয়া থাকে। ইহাই হরগৌরীর কোন্দলরূপে কবি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। দরিদ্র স্বামীর গৃহ-সংসারে স্ত্রীর দীনতম আকাঙ্ক্ষাটি মিটাইবারও যে কত দুঃখ কবি রামেশ্বর পার্ব্বতীর শাঁখা পরিধানের কাহিনীটিকে অবলম্বন করিয়া তাহা অতি সহজ সমবেদনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সধবা রমণীর ক্ষুদ্রতম দাবী একজোড়া শাঁখা। তাহাও দরিদ্র স্বামীর জোগাইবার সামর্থ্য নাই। দুঃখ দারিদ্র্য-পীড়িত এই সমাজের ইহা নিত্য অনুভূতির সামগ্রী।

হরগৌরীর গার্হস্থ্য জীবনে বাঙ্গালীর জাতীয় রূপ

অসচ্ছল সংসারের একজন গৃহিনীর স্বামীর কাছে দুই গাছি শঙ্খ প্রার্থনার যে চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার সামাজিক রমণী-চরিত্র অঙ্কনের নৈপুণ্যেরই পরিচয় দেয়,—

দুঃখিনী গৃহিণী

প্রণমিয়া পার্ব্বতী প্রভুর পদ তলে।
রঙ্গিনী সে রঙ্কনাথে শঙ্খ দিতে বলে॥
গদ গদ স্বরে হরে করে কাকুর্ব্বাদ।
পূর্ণ কর পশুপতি পার্ব্বতীর সাধ॥
দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দু'টি বাই।
কৃপা কর কান্ত আর কিছু নাহি চাই॥
লজ্জায় লোকের মাঝে লুকাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই॥

স্বামী চির-দরিদ্র, স্ত্রীর এই সামান্য অথচ ন্যায্য দাবী পূরণেও অসমর্থ। স্ত্রীর এই দীনতম অভিলাষকেও তিনি শ্লেষের বাণে বিদ্ধ করিলেন,

ভিখারীর ভার্য্যা হ'য়ে ভূষণের সাধ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ॥
বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তাঁরে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥

অক্ষম স্বামীর মুখ হইতে এই অন্যায় গঞ্জনা লাভ করিয়া সর্ব্বংসহা স্ত্রীও ধৈর্য্যহারা হইয়া গেলেন,

একথা ঈশ্বরী শুনি ঈশ্বরের মুখে।
শূন্য হইল সব যেন শেল মাইল বুকে॥

তিনি তৎক্ষণাৎ সন্তান দুইটিকে সঙ্গে করিয়া দুঃখে দারিদ্র্যে বাঙ্গালী [নারী]র একমাত্র শেষ আশ্রয়স্থল পিতৃগৃহে রওয়ানা হইলেন। শিব সহসা [কিং]কর্ত্তব্য বিমূঢ়ের মত হইয়া গেলেন, তারপর "ভা'য়ের কিরা" "বাপের [কি]রা" দিয়া অপরাধী স্বামী ক্রুদ্ধা পত্নীকে পিতৃগৃহের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত [ক]রিলেন।

এই সমস্ত চিত্রের মধ্যে কবি-চিত্তের একটি সহজ আন্তরিকতার পরিচয় [পা]ওয়া যায়। বাস্তবের সহিত এই সমস্ত চিত্রের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; সেইজন্য ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়ও ইহা অতি সহজেই স্পর্শ করে। সমস্ত দিক দিয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, [রামে]শ্বরের মধ্যে একটি সরস কবি-প্রাণতার অভাব ছিল না, তবে তাহা [পৌ]রাণিক অংশ রচনায় আদর্শ ও ভাষা এই উভয়ের দিক দিয়া সংস্কৃতের [প্রভা]বেই সম্পূর্ণ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রামেশ্বরের আন্তরিকতা

পূর্ব্বে একস্থলে কবিচন্দ্র উপাধিবিশিষ্ট রামকৃষ্ণরচিত 'শিবমঙ্গলে'র উল্লেখ করিয়াছি।* কাব্যখানির প্রকৃত নাম 'শিবায়ন'—

"রামকৃষ্ণ দাস রচে গীত শিবায়ন।
দক্ষ আসি পশিলেন বিষ্ণুর শরণ॥"

পুস্তকখানি বিভিন্ন সংস্কৃত শৈবপুরাণের উপর নির্ভর করিয়া রচিত। শিব-কাহিনীর লৌকিক অংশের ইহাতে উল্লেখমাত্র নাই। ইহার রচনা-কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না; ইহার প্রাচীন পুঁথিও বিশেষ পাওয়া যায় নাই। মনে হয়, পুস্তকখানি বিশেষ প্রচলিত ছিলনা; ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় পুস্তকখানি ১৭শ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলেন, "এই কাব্যের প্রায় ২০০ শত বৎসরের হস্তলিখিত খণ্ডিত পুঁথি শ্রীযুক্ত (অধুনা স্বর্গীয়) নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট আছে।" (১) কিন্তু রচনার ভাষা দেখিয়া ইহাকে এত প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না যেমন,—

রামকৃষ্ণের শিবায়ন

'পাইলাম শিব আমি তপস্যার ফলে।
করিল কঠোর মণিকর্ণিকার জলে॥
জন্মে জন্মে পাব সেই চরণের রেণু।
না ধরিব তোমার সৃজিত এই তনু॥'

কোন অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত পুঁথির ভাষার এই প্রকার আধুনিকতা সম্পাদন এক প্রকার অসম্ভব। সেইজন্য মনে হয়, অত্যন্ত আধুনিক কালে (সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে) কোন কবি রামায়ণের আদর্শে সংস্কৃ

---

* পৃঃ ৭৫

(১) বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পৃঃ ১১৮

ব পুরাণের উপর নির্ভর করিয়া এই কাব্যখানি রচনা করিয়া থাকিবেন।

গ্রন্থের প্রামাণিকতা

ভাবের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলেও মনে হয়, শিব-চরিত্রের পৌরাণিক আভিজাত্য রক্ষা করিবার ন্য যে প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাতে ইহা রামেশ্বর ট্টাচার্য্যের 'শিবায়নে'র পরবর্ত্তী রচনা। কারণ, রামেশ্বরের পরবর্ত্তী যুগে াংলার শৈব সাহিত্যে পৌরাণিক শিব-চরিত্রেরই পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা স্থাপিত ইয়াছিল, আলোচ্য পুস্তকখানিতেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

রামেশ্বরের পরবর্ত্তী বাংলা শৈব কাব্য বলিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ার কোনও স্বতন্ত্র গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে এই যুগে

পরবর্ত্তী শৈব সাহিত্য

সংস্কৃত শৈব পুরাণ হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বিচন্দ্র প্রণীত "শিবরামের যুদ্ধ," "হরগৌরী কোন্দল," ইত্যাদি উল্লেখ-যাগ্য। কিন্তু কাহিনী ও রচনার দিক দিয়া এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য যমন একেবারেই মৌলিকতাহীন তেমনই বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে শিবের গাজন ামে এক প্রকার লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। ইহাতে

শিবের গাজন

শিবের সম্বন্ধে কতকগুলি লৌকিক ছড়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই গাজন-উৎসব প্রকৃতপক্ষে পরবর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। বাংলার পালরাজদিগের সময় র্ম্মঠাকুরের বা আদ্যের গাজন দেশে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। এই বিষয় এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলায় ধর্ম্মঠাকুরের পূজার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা-প্রসঙ্গে বিস্তৃত বর্ণনা করা হইয়াছে।

বৌদ্ধ পালরাজদিগের পতনের পর যখন বাংলায় হিন্দু শৈব সেনরাজ-দিগের প্রাধান্য স্থাপিত হইল তখন দেশে প্রচলিত বৌদ্ধ উৎসব-অনুষ্ঠান

সমুহ শৈব ছায়ায় প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। তখনই ধর্ম্মের বা আন্তের গাজন শিবের গাজন বলিয়া পরিচিত হইল। এইজন্য এই শিবের গাজনে বুদ্ধদেবতা নিরঞ্জন ধর্ম্ম ও শিব অভিন্ন ভাবে দেখা যায়, যেমন,—

গাজনে বৌদ্ধ উদ্ভব

"ধবল খাটে ধবল পাটে ধবল সিংহাসন।
ধবল খাটে ব'সে আছে ধর্ম্ম নিরঞ্জন॥
ধবল আকার গোঁসাই ধবল নৈরাকার।
ধবল চরণে তাঁরে করিল হে পার॥

শিবনাথ কি মহেশ॥

চৈত্রমাসে যে উৎসব-উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহাই শিবের গাজন নামে পরিচিত। এই উৎসবের সময় প্রথমতঃ পল্লীর শিবমন্দির বা 'গাজন-তলা'য় খুব ঘটা করিয়া ঘট স্থাপন করা হয়। তাহাকে 'ঘটভরা' উৎসব বলে। তারপর যাহারা গাজন-উপলক্ষে সন্ন্যাসী বা প্রধান পাণ্ডা হইতে মানসিক করে তাহাদিগকে বিশেষ অনুষ্ঠান সহকারে শোভাযাত্রাদ্বারা গাজনতলায় লইয়া যাওয়া হয়। সেইখানে তাহারা নৃত্যগীতদ্বারা শিবগুণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া শিবের ব্রত উদ্‌যাপন করে। 'গাজুনে বামুন' বলিয়া পরিচিত এক শ্রেণীর নীচ জাতীয় ব্রাহ্মণ ইহাদের এই শিব-পূজার পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। এই সময়ই চড়ক হইয়া থাকে; এবং এই উপলক্ষে কতকগুলি বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার যথা, বাণফোঁড়া, বঁটিঝাঁপ, কাঁটাঝাঁপ, অগ্নিদোলা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবের গাজন উপলক্ষে নৃত্যগীতবাদ্য-সহকারে গাজুনে সন্ন্যাসিগণকর্ত্তৃক শিবের বন্দনা, সৃষ্টি বর্ণনা, দেবদেবীর বন্দনা ও প্রণাম এবং শিব বিষয়ক বিবিধ গীত, যথা শিবের চাষ, শিবের শাখারি বেশ প্রভৃতির গীত হইয়া থাকে।

গাজনের অনুষ্ঠান

এই শিবের চাষ বিষয়ক গীত আদ্যের গম্ভীরাতেও গীত হয়, এবং চাষের বিষয়, ধান্যের জন্ম ইত্যাদিও উক্ত গীতান্তর্গত।"*

গাজনে লৌকিক শিব-চরিত্র

শূন্য পুরাণে ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়নে শিবের কৃষিকার্য্যের সম্বন্ধে যে উল্লেখ রহিয়াছে শিবের গাজন উপলক্ষে গীত গানগুলিতে তাহার অনুরূপ আখ্যায়িকারই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন,—

"বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিব ঠাকুর বুনিল কার্পাস॥
কার্পাস বুনিয়া শিব গেল কুচনী পাড়া।
কুচনী পাড়া হইতে দিয়ে এ'ল সাড়া॥
কার্পাস তুলিয়া। দল গঙ্গার ঠাঁই।
গঙ্গা কাটিল সূতা মহাদেব বুনিল॥
হর সমুদ্র হরের জল ক্ষীর সমুদ্রের পাণি।
উত্তম ধুইয়া দিল নিতাই ধুবিনী॥"

বৌদ্ধাচার-সম্ভূত শিব-চরিত্রের এই সমস্ত প্রাচীন লৌকিক কাহিনী হইতেই যে বাংলার মধ্যযুগের শৈবসাহিত্যে লৌকিক শিবের চরিত্র পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতন। এই সম্বন্ধে এই অধ্যায়েরই প্রথম ভাগে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

মধ্যযুগের শৈব সাহিত্যে বাংলার যে লৌকিক শিব-চরিত্র পদে পদে সংস্কৃত পুরাণাদর্শের সম্মুখীন হইয়া মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিয়াছিল, বাংলার নিম্নতন সমাজে প্রচলিত এই শিবের গাজনোৎসবের মত কতকগুলি লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে তাহাই কোনমতে আত্ম-

* 'আদ্যের গম্ভীরা'—(হরিদাস পালিত) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, পৃঃ ৫১, সাল, ১৩১৬।

স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিল। কিন্তু তাহা একমাত্র নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে একান্ত ভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শৈব ধর্ম্ম নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া বাংলার সমাজে প্রথম হইতেই প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। ক্রমে বাংলার হিন্দু সমাজে লৌকিক শৈব প্রাধান্য একেবারে লোপ পাইতে আরম্ভ করে; তাহার কারণও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, বাঙ্গালীর নৈতিক জীবনের যে স্তর হইতে লৌকিক শিবের জন্ম হইয়াছিল তাহা হইতেও বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন ক্রমে অনেক উর্দ্ধে আসিয়া উপনীত হয়। এই কারণে, বাংলার প্রাচীনতম সমাজ হইতে জাত দেবচরিত্র বাংলার পরবর্ত্তী উন্নততর সমাজের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে আর সমর্থ হইল না। এইভাবে লৌকিক শিব-চরিত্রকেও পরবর্ত্তী সমাজ হইতে একপ্রকার বাধ্য হইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। পৌরাণিক শিবের প্রতিষ্ঠা তখন সমাজে ক্রমে দৃঢ় হইতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাও যুগোচিত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের আদর্শে হরিহরের সম্মিলিত চিত্ররূপেই প্রকাশ পাইতেছে। ভারতচন্দ্র-রচিত অন্নদামঙ্গলের শিব-কাহিনীই এই আদর্শে রচিত। ইহার মধ্যে শিবের প্রাচীনতম লৌকিক এবং মধ্যযুগের তথাকথিত পৌরাণিক এই উভয় চিত্রেরই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলোক্ত শিব-কাহিনীতে কতকগুলি অর্ব্বাচীন শৈব ও বিষ্ণুমাহাত্ম্য-সূচক পুরাণের আখ্যানই অনুকীর্ত্তিত হইয়াছে। মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল ও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের শিবকাহিনীতে যেমন শিবের প্রাধান্যের উপর উক্ত লৌকিক দেবতাদিগের প্রতিষ্ঠা কল্পনা করা হইয়াছিল ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে তাহার ইঙ্গিত মাত্র নাই। ইহাতে

সমাজে লৌকিক শিবের পরিণাম

অন্নদা-মঙ্গলের শিব

দেব-চরিত্রগুলির মধ্যে ঐক্য-সন্ধান করিয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়-চেষ্টার কল্যাণ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। যে অবিশ্বাসী এক দেবতায় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিয়া অপর দেবতায় অবহেলা করে তাহার কোন দেবতার পূজাই সার্থক হয় না। পঞ্চোপাসক হিন্দু সম্প্রদায়ের ইহাই সেই যুগে ধর্ম্মগত আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিষ্ণু-ভক্ত ব্যাসকে শিব-নিন্দার জন্য বিষ্ণুই তিরস্কার করিয়া কহিতেছেন,

যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।
শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব॥
শিবের প্রভাব বলে আমি চক্রধারী।
শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী॥
শিবের যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট।
শিবের যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট॥—অন্নদামঙ্গল

বাংলার যে মঙ্গল সাহিত্য শিবের সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে উচ্ছেদ করিবার জন্যই সর্ব্বপ্রথম জন্মলাভ করিয়াছিল পরিণামে তাহাই এই শিবকেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে (১ম খণ্ড) শিব-কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করিয়া আছে। তাহাতে গীতারম্ভের সৃষ্টিতত্ত্ব অংশতঃ আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্যের অনুরূপ। এতদ্ব্যতীত দুই একটি ছত্র * বাদ দিলে সর্ব্বত্রই পৌরাণিক শিবেরই পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গলের কাহিনী-ভাগের জন্য ভারতচন্দ্র যে পুরাণকেই আদর্শ

ভারতচন্দ্রের শিব-কাহিনী

* "নিজ অঙ্গ যদি মোর সঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥"—অন্নদামঙ্গল, 'হরগৌরীর কথোপকথন'।

করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই প্রমাণ হয়। তাঁহার আদর্শ সংস্কৃত পুরাণ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,

'একমত না হয় পুরাণ মত যত;
আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্র মত॥"—অন্নদামঙ্গল

আবার কোথাও তিনি পুরাণান্তর হইতেও যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥—ঐ

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন সংস্কৃত পুরাণের উপরই ভারতচন্দ্র শিব-কাহিনীর প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া লইয়াছেন।

এইভাবে দেখা যাইবে, মঙ্গলকাব্য রচনার শেষ যুগে লৌকিক শিবের প্রাধান্য একেবারে লোপ পাইয়াছিল। দেশে ব্যাপক সংস্কৃত চর্চ্চা ও মূল হিন্দু-আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাই যে ইহার অন্যতম কারণ এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, পূর্ব্বোল্লিখিত রামেশ্বরের শিবায়ন ও শিবের গাজন প্রমুখ কতকগুলি লৌকিক উৎসব আশ্রয় করিয়া লৌকিক শিব-দেবতা বাংলার নিম্নতম সমাজে কোন প্রকারে তখন পর্য্যন্তও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়াছিল, কিন্তু সম্ভ্রান্ত হিন্দু আদর্শে তাহার কোনই স্থান ছিল না।

পৌরাণিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা

এই অধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গেই যে আমাদের শিব-কাহিনী বা শিব-চরিত্রের আলোচনার শেষ হইবে তাহা নহে। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিব-কাহিনীকে মনসা, চণ্ডী, কালিকা কিম্বা অন্য কোন লৌকিক দেবতার কাহিনী হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বিচার করিবার উপায় নাই। মনসা-মঙ্গলের সমগ্র কাহিনীর দুই তৃতীয়াংশই প্রায় শিবেরই কাহিনী; চণ্ডীমঙ্গলে এত অধিক না হইলেও শিব প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়া

আছেন। এইভাবে বাংলার প্রায় সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর সহিতই পৌরাণিক কিম্বা লৌকিক শিব কোন না কোন সম্পর্কে আবদ্ধ। অতএব তাহাদের আলোচনা প্রসঙ্গেও শিব-কাহিনীর অল্পবিস্তর উল্লেখ থাকিবে।

আগমনী-বিজয়া গান

এই গ্রন্থের ভূমিকা-ভাগে বাংলা সাহিত্যে আগমনী ও বিজয়াগানের কথা উল্লেখ করিয়াছি। বিষয় বস্তুর দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে এই জাতীয় সাহিত্যকেও প্রকৃতপক্ষে বাংলার শৈব সাহিত্যেরই অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভাবের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ইহাদের উদ্ভব

এই জাতীয় গীতি-কবিতা বাঙ্গালী কবির নিজস্ব সৃষ্টি। কোন সংস্কৃত পুরাণে এই জাতীয় কাব্য-কাহিনীর উল্লেখ মাত্রও নাই। এই সমস্ত খণ্ড গীতিকাব্য রচনায় বাহিরের আর কোনও প্রভাবও পরিলক্ষিত হয় না। বাঙ্গালী কবির সহজ ভাব-প্রবণতা হইতেই ইহাদের জন্ম। বৈষ্ণব কবিতায় ব্যক্তি-হৃদয়ের যে খণ্ড অনুভূতিগুলি সাহিত্যে অপূর্ব্ব রসস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, আগমনী ও বিজয়া-গানে তাহাই গার্হস্থ্য-সম্পর্কের বিরহ-মিলনের চিত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে আত্মধর্ম্মই প্রবল কিন্তু এই আগমনী-বিজয়ার গানে গৃহধর্ম্মকেই বড় করা হইয়াছে। যাহা হউক, তবু বৈষ্ণব কবিতার প্রেরণায়ই যে এই গীতি কাব্যগুলি সেই যুগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ। বাংলা মঙ্গলকাব্যের উপর বৈষ্ণব গীতি-কবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলেই বাংলা সাহিত্যে এই অনবদ্য কবিতাগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। মঙ্গল-কাব্যের দীর্ঘ কাহিনীকে খণ্ড খণ্ড গীতি কবিতার রূপে প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী কবি কাব্য-রচনায় প্রাচীন সংস্কারের আদর্শ-বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হইয়া গেল। বাংলার শৈব কাহিনীর সর্ব্বশেষ পরিণতি এইভাবে সম্পাদিত হইল।

বাঙ্গালীর গৃহস্থ জীবন নানা স্নেহ-সম্পর্কের দ্বারা বিজড়িত। এই সমাজের মাতাপিতা নিজেদের শিশুকন্যাকে গৌরীদান করিয়া যে ভাবে পরের সংসারে পাঠাইয়া দিত, তাহাতে এই অতৃপ্ত স্নেহ প্রবৃত্তি আরও উচ্ছল হইয়া উঠিত। অপরিণত-বুদ্ধি শিশু-কন্যাকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্বামী-গৃহের অদর্শনে পাঠাইয়া দিয়া এই সমাজের জননীরা যে চিন্তাকুল জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার আগমনী-বিজয়া গানে তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর গৃহ-সংসার চির-দারিদ্র্যের লীলা-নিকেতন। দরিদ্রের সংসারে দুঃখেরও অন্ত নাই; সেই জন্য বৎসরান্তে কিম্বা কোনদিন এই সন্তান-বিচ্ছেদের অবসানে স্নেহাতুর মাতৃ-হৃদয়ে তাহার সন্তান-সম্পর্কে এই অশুভ দারিদ্র্যের শঙ্কাই সর্ব্বপ্রথম জাগিয়াছে,

আগমনী গানে বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবন

"কেমন ক'রে হরের ঘরে
ছিলি উমা বল্ মা তাই।
চিতা ভস্ম মাখি' অঙ্গে
জামাই ফিরে নানা রঙ্গে
তুই না কি মা তারি সঙ্গে
সোনার অঙ্গে মাখিস্ ছাই।"

খৃষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন সমগ্র বাংলার ভাব-ক্ষেত্র বৈষ্ণব কবিতার বন্যায় প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল সেই যুগেই বিশেষ করিয়া এই আগমনী-বিজয়ার গানগুলি রচিত হয়। পূর্ব্বে যে বিস্তৃত শৈব সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছি তাহার মধ্যে কোথাও এই জাতীয় কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতএব ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত লৌকিক কিম্বা পৌরাণিক কোন শৈব কাহিনীরই অন্তর্ভূত নহে। প্রধানতঃ এই খণ্ড কবিতাগুলি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেই রচিত হইয়াছিল।

রচনা-কাল

আগমনী-বিজয়া গানের বিষয়-বস্তু অত্যন্ত সাধারণ। স্থূলতঃ কতকগুলি পরবর্ত্তী শৈব পুরাণের উপরই তাহার কাহিনী প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে ইহার মধ্যে কাহিনী অত্যন্ত অপ্রধান মাত্র। কিন্তু অপ্রধান হইলেও ইহা পৌরাণিক আখ্যানের উপরই প্রতিষ্ঠিত, লৌকিক শিবের আখ্যানের উপর নহে।

বিষয়-বস্তু

ইহার কাহিনী এই যে,—গিরিরাজ হিমালয় দরিদ্র ভিক্ষুক শিবের নিকট নিজের কন্যাকে বিবাহ দিয়াছেন। বিবাহান্তেই রাজকন্যা উমা ভিক্ষুক স্বামীর সঙ্গে তাঁহার দরিদ্র সংসারে চলিয়া গিয়াছেন। সন্তানের এই বিচ্ছেদে মহিষী মেনকার মন এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পাইতেছিল না; তাঁহার ঐশ্বর্য্য-ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিল। অবশেষে শরৎকালের শেষ রাত্রে একদিন মেনকা দরিদ্র স্বামীর গৃহিণী তাঁহার দুঃখিনী উমাকে স্বপ্নে দেখিলেন। দেখিয়া তিনি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না;—স্বামীর নিকট গিয়া একবার কন্যাকে আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে তাহার পিতৃ-ভবনে আনাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন।

মেনকার দুঃখ

এদিকে উমাও জননীকে স্বপ্নে দেখিয়া সহসা ভূমি-শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। মাতাপিতাকে এতকাল পরে একবার দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল। তিনি স্বামীর নিকট হইতে তিন দিনের জন্য মাত্র সময় ভিক্ষা করিয়া লইয়া পিতৃগৃহে যাত্রা করিলেন।

আগমনী

ভিক্ষুকের পত্নী তিন দিনের জন্য মাত্র পিতা গিরিরাজের গৃহে অতিথি। মেনকার এই আনন্দ-মিলন দেখিতে দেখিতে বিজয়ার বিদায়-বেদনায় ঘনাইয়া উঠিল। তিন দিন পর পিতৃগৃহ আঁধার করিয়া উমা পুনরায় দরিদ্র স্বামীর সংসারে চলিয়া গেলেন।

বিজয়া

বাঙ্গালী গৃহস্থ-জীবনের অভিজ্ঞতায় এই মিলন-বিরহের চিত্র এত বাস্তব ও করুণ যে ইহাতে প্রত্যেক গায়ক এবং শ্রোতার চক্ষুই অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিতে দেখা যায়।

আগমনী গানে রামপ্রসাদ

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন এই আগমনী-বিজয়া গানের সর্ব্বপ্রথম এবং শ্রেষ্ঠ কবি। রামপ্রসাদের একমাত্র বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত পদাবলী, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন ইত্যাদি সমস্তই প্রকৃতপক্ষে খণ্ড গীতি-কবিতারই সমষ্টি। সহজ ভাষায় গভীর ভাবমুলক গীতি-কবিতা রচনায় সেই যুগে রামপ্রসাদের সমকক্ষ আর কেহই ছিল না। আগমনী-গানে রামপ্রসাদের এই আধ্যাত্মিক ভাব-দীপ্ত সংসার-অনাসক্ত কবি-হৃদয় সহসা যেন গার্হস্থ্য-জীবনের প্রতি সমবেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, দেখিতে পাই। সন্তান-স্নেহাতুরা মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা বর্ণনা করিয়া ভক্ত কবি কি অপূর্ব্ব সংসার-চরিত্র অভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন,—

"আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে॥
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখ রাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধা রাশি ক্ষরে॥
শুনিয়া এ শুভ বাণী এলো চুলে ধায় রাণী
বসন না সম্বরে।
গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরি বরে, অমনি কাঁদে গলা ধ'রে॥
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া,
চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে, জনক তোমার গিরি,
পতি জনম ভিখারী, তোমা হেন সুকুমারী
দিলাম দিগম্বরে॥"

মিলনের আনন্দাশ্রু শুকাইতে না শুকাইতে বিজয়ার বেদনাশ্রু জাগিয়া উঠে। নির্ম্মম সংসারের নিয়মকে নিঃশব্দে মাথা পাতিয়া লইয়া অন্তরের স্নেহ প্রবৃত্তিগুলিকে অসাড় করিয়া রাখা ছাড়া আর উপায় কি? রামপ্রসাদের বিজয়া-গানে গিরিরাণীর প্রাণের অনুভূতি যেন পাষাণের মত স্পন্দনহীন, দেখিতে পাই,—

রামপ্রসাদের বিজয়া

"ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে,
ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে ব'সে মহাকাল,
বেরোও গণেশ মাতা, ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার।
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন নিরাশা সুধার॥

রামপ্রসাদের পরবর্ত্তী কত অখ্যাত ও অজ্ঞাতকুলশীল কবি যে এই জাতীয় গীতি-কবিতায় মঙ্গলকাব্যের বিলয়-যুগকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার অন্ত নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কবিওয়ালাদিগের অসংখ্য রচনায় এই আগমনী ও বিজয়ার গানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা হইতেই তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজে এই জাতীয় খণ্ডকাব্যের লোকপ্রিয়তা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইবে। আগমনী-বিজয়া লেখক কবিওয়ালাদিগের মধ্যে রাম বসু কবিওয়ালার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই

রাম বসুর আগমনী গান

জাতীয় গানের প্রেরণা সাধারণতঃ কবিওয়ালাগণ তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি রামপ্রসাদের নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন, সেইজন্য এই বিষয়ে মৌলিক কৃতিত্ব বড় একটা কেহই দেখাইতে পারেন নাই। তবে রাম বসুর কবিত্বের মধ্যে একটা অনাড়ম্বর সহজ স্ফূর্ত্তি ছিল এবং তাহাই ভাবপ্রবণ শ্রোতার হৃদয় হরণ করিত। সেইজন্য কবিওয়ালা আগমনী-বিজয়া লেখক দিগের মধ্যে রাম বসুর সমকক্ষ আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না।*

পরিণতি

কবিওয়ালা ও ভাটদিগের মুখে মুখে গীত আগমনী-বিজয়ার গানই বাংলার শৈব কাহিনীর সর্ব্বশেষ সাহিত্যিক নিদর্শন। এইদেশে ইংরেজি সভ্যতা স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট যে জাতীয় সাহিত্য উচ্চতর সমাজের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইল, তাহার মধ্যে এই জাতীয় কাব্য-সাহিত্যও অন্যতম। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত শারদীয়া পূজার প্রারম্ভে পল্লীর সাধারণ জনগণের গৃহাঙ্গিনায় ধ্বনিত এই আগমনী গানের সুর সেই প্রাচীনকালের মতই বাঙ্গালী গৃহস্থের মনে আশা ও আশ্বাসের সঞ্চার করিয়া থাকে।

---

* ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে প্রণীত Bengali Literature in the 19th. Century (পৃ· ৩৮১-৮২)তে কবিওয়ালা রাম বসুর আগমনী-বিজয়াগানের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সর্পপূজার ইতিহাস—পদ্মাপুরাণ বা মনসার ভাসান

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সহজেই অনুমিত হয় যে, মনসা-মঙ্গলকাব্যই ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন মনসা-মঙ্গলের কবির কাব্য-রচনায় আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। মনসা-মঙ্গলের বিষয়-বস্তুও মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। সমাজে তখনও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সমগ্র মনসা-মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটিও উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মণ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। বাংলা তখন বাণিজ্য-প্রধান; দেশের সমাজপতি বৈশ্য সদাগর। এমন কি, এই কাব্যোক্ত চরিত্রের নামগুলির মধ্যে পর্য্যন্ত তখনও সংস্কৃত প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। 'বেহুলা', 'সোনেকা', 'লখাই', 'সায়বেনে' প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ। সমাজে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বেই এই কাব্যের মূল কাহিনী উদ্ভূত হইয়া চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই এক সম্পূর্ণ সাহিত্য-অবয়ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মনসা-মঙ্গলের প্রাচীনত্ব

মনসা-মঙ্গলকাব্যের প্রকৃত উদ্ভব-কাল নিরূপণ করিতে হইলে বাংলায় সর্পপূজা ও মনসা-পূজার ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়। কারণ, সমাজে সর্পপূজা আশ্রয় করিয়াই এই জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। অতএব, সমাজে সর্প-দেবতার প্রতিষ্ঠার সহিত এই মনসা-মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস জড়িত আছে। এক্ষণে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

উদ্ভব-কাল

সভ্যতা উন্মেষের বহু পূর্ব্বেই মানব-হৃদয়ের ভয় ও বিস্ময়প্রমুখ জন্মলব্ধ প্রবৃত্তিগুলি হইতে সমাজের প্রাচীনতম দেবতাদিগের কল্পনা করা হইয়াছিল। সেইজন্য প্রত্যেক সমাজের প্রাচীনতম দেবতা প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত ভয় বা বিস্ময়ের বস্তু।

আদি মানবের দেবতা

প্রাচীন মানবজাতি সাধারণতঃ অরণ্য বা পর্ব্বতগুহায় বাস করিত, সেইজন্য আরণ্য জীবজন্তুর সহিত তাহাদিগের সর্ব্বদা সংগ্রাম করিতে হইত। অরণ্যচারী জীবজন্তুর মধ্যে সর্প সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ;—সম্মুখ-যুদ্ধে ইহাকে পরাজিত করিবার উপায় নাই, ইহার সন্ধান অলক্ষ্যগোচর; বিশেষতঃ ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি অন্যান্য জীবজন্তু হইতে স্বতন্ত্র;—ইহারা পাদহীন অথচ দ্রুতগতি; জীর্ণ খোলস ত্যাগ করিয়া বারবার নব-জীবন লাভ করে; সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হইত ইহারা অমর; দীর্ঘকাল নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া নিরাহারে কালযাপন করিতে পারে,—এই সমস্ত কারণে এই বিশেষ জীবটি সম্বন্ধে প্রাক্‌সভ্যতা যুগের সমাজভুক্ত মানব মাত্রেরই হৃদয়ে একটি কৌতূহল মিশ্রিত ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, এবং এই ভয় হইতেই ভক্তিরও উদয় হয়।

আদি মানব ও সর্পভীতি

পণ্ডিত-প্রবর জে, ফার্গুসন অনুমান করেন,[১] সর্পপূজা ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরবর্ত্তী তুরাণী জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উদ্ভূত হয় এবং সেখান হইতেই প্রাচীন তুরাণী জাতি পরবর্ত্তী কালে পৃথিবীর যে যে অংশে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে সেই অঞ্চলে তাহা বিস্তৃত হয়। মূলতঃ আর্য্য কি সেমিটিক জাতির সহিত এই সর্পপূজার কোন সম্পর্ক নাই। তবে প্রাচীন গ্রীস, স্কাণ্ডানাভিয়া প্রমুখ আর্য্য-প্রধান দেশে যে এই পূজা প্রচলিত থাকিতে দেখা যায় ইহার কারণ, প্রাচীন তুরাণী সভ্যতার উপর পরবর্ত্তী কালে

সর্পপূজার উদ্ভব—ফার্গুসনের অভিমত

১ Tree and Serpent worship, Pg. 3—(J. Fergusson)

ঐ সমস্ত দেশে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে আর্য্য-ধর্ম্মের মধ্যেও পূর্ব্ববর্ত্তী ঐ তুরাণী ধর্ম্মের কোন কোন রীতিনীতি বর্ত্তমান রহিয়া গিয়াছিল।২

পণ্ডিত ফার্গুসন মনে করেন, এই সর্পপূজা ভারতীয় আর্য্যদিগের উন্নত বৈদিক দেবকল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু তাহা হইলেও এই সর্পজাতির প্রতি বৈদিক আর্য্যদিগের মনে যে একটা ভয় ও শ্রদ্ধাভাবের অস্তিত্ব ছিল তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।৩ জীবজন্তুর পূজা একটু নিম্নস্তরের সমাজ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল, এবং প্রাচীন তুরাণী জাতির মধ্যেই এই জীবজন্তুর পূজা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। এই তুরাণী জাতির এক অংশ প্রাক্‌বৈদিক যুগে পশ্চিম সীমান্তপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ সিন্ধু-উপত্যকায় বসতিস্থাপন করে। এই তুরাণী জাতিই ভারতবর্ষে দ্রাবিড় নামে পরিচিত। বলুচিস্তানের ব্রাহুই নামক দ্রাবিড় জাতীয় ভাষার অস্তিত্ব এবং সিন্ধু-প্রদেশের অন্তর্গত লারকানা জেলায় মোহেন্-জো-দড়ো ও পাঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্টগোমারী জেলায় হরপ্পা নামক স্থানের প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কারসমূহ ফার্গুসনের উক্ত সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করিতেছে। মোহেন্-জো-দড়োর আবিষ্কার হইতে জানা যায় যে, সেই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে সর্পপূজার

বৈদিক দেবতা ও সর্প

ভারতে সর্পপূজার প্রাচীনত্ব

২ ..."It is like the tares of a previous crop springing up among the stem of a badly cultivated field of wheat."—ঐ

৩ "We cannot, we are afraid, altogether exonerate our Aryan fore-fathers from an early association with this strange worship, from whatever source and under whatever influence they might have imbibed the same."—A study of the Manasa cult, Calcutta Review. May 1933, Pg, 175 (J. Chakrabarty.)

বিশেষ প্রচলন ছিল।১ এই তুরাণী বা দ্রাবিড় জাতি উত্তর ভারতে আর্য্য প্রাধান্য বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে গিয়া বসতি বিস্তার করে। বর্ত্তমান তামিল-তেলেগু প্রমুখ দ্রাবিড় জাতীয় ভাষা-ভাষী দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীরাই ফার্গুসন-উক্ত এই তুরাণী বা দ্রাবিড় জাতির বংশধর। সমগ্র ভারত-বর্ষের মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই সেইজন্যই বর্ত্তমানকালে এই পূজার সমধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।২

সর্প পূজারী দ্রাবিড় জাতি

ভারতীয় সর্পপূজার উদ্ভব-সম্বন্ধে মিশরীয় প্রত্নতত্ত্বে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ইলিয়ট্‌ স্মিথ্‌ এক নূতন মতের পোষকতা করেন। তিনি বলিতে চাহেন, সর্পপূজা খৃষ্ট জন্মের ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশরে সর্ব্ব-প্রথম উদ্ভূত হয়। তথা হইতে ফিনিসীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা ভারতবর্ষে এই পূজার প্রথা সর্ব্বপ্রথম আনয়ন করে এবং তাহারাই শ্যাম, কম্বোডিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপ সমূহে, এমন কি, আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যেও এই পূজা ক্রমে বিস্তৃত করে।৩

ইলিয়ট্‌ স্মিথের অভিমত

কেহ কেহ আবার মনে করেন, ভারতীয় সর্প পূজার উদ্ভবের মূলে কোন বহির্ভারতীয় প্রভাব বর্ত্তমান নাই। ইহার উদ্ভব ভারতবর্ষেই

১ Mohen-jo-daro and the Indus civilisation, (Sir J. Marshall. Religion দ্রষ্টব্য।

২ "In no part of India is the cult more general than in Southern India"—(W. Crooke)—Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 11, Serpent worship, Pg. 399.

৩ Influence of Ancient Egyptian Civilization in the East and in America, দ্রষ্টব্য।

ইয়াছিল। কারণ, সর্প গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জীব। ভারতবর্ষ ও আফ্রিকাই পৃথিবীর মধ্যে প্রধানতঃ গ্রীষ্ম-মণ্ডলের অন্তর্গত। প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবীর মধ্যে এই দুই দেশই আদিকাল হইতে অগণিত সর্পের বাসভূমি ইয়া আছে। ভারতবর্ষে সর্পের জাতি-সংখ্যা আফ্রিকা হইতেও অধিক। ই দেশে যত বিভিন্ন জাতীয় সর্পের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় পৃথিবীর ার কোন অঞ্চলে তত নয়। এই সমস্ত কারণে কেহ কেহ মনে করেন যে, ারতবাসীকে অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই ভীষণ শত্রুর বিরুদ্ধে দ্ধ করিতে হইতেছে বলিয়া আদিম যুগ হইতেই সর্প এই দেশে ভয় এবং দ্ধার পাত্র হইয়া আছে।১ অবশ্য ইহা সত্য হইলেও সর্প পূজার ংশিষ্ট বিধি-নিয়ম বহির্ভারত হইতে আসা কিছুই অসম্ভব নহে। এই হসাবে পূর্ব্বোল্লিখিত পণ্ডিত জে, ফার্গুসনের মতবাদ অনেকটা নির্ভর-াগ্য বলিয়াই মনে হয়।

সর্প পূজা ভারতের নিজস্ব সৃষ্টি

আর্য্যগণ শীতপ্রধান দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন সইজন্য প্রাচীনতম বৈদিক সংহিতা অথবা ঋগ্বেদের দেবতাদিগের মধ্যে সর্পের কোনও স্থান নাই। তাহাদের দেব-কল্পনায় সর্পের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ঋগ্বেদের কোন কোন মন্ত্রের মধ্যে 'সর্প' 'অহি' ২ এই সমস্ত ন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমিত হয়, ভারতবর্ষে প্রবেশ

আর্য্য জাতি ও সর্প পূজা

---

১ "India is the only country in the world inhabited by all the ıown families of living snake... . on the whole, the wide distribu-on and loss of life caused by the snake in India warrent the onclusion that the cult is probably local."—(W. Crooke) Serpent orship, Encyclopaedia of Religion and Ethics Vol. II.

২ ঋগ্বেদ, ১।৩২।৫, ৮, ১৩ ; ২।৩১।৬ ; ৩।৩৩।৬, ৭

করিয়া এই জন্তুটির সহিত পরিচিত হইতে আর্য্যদিগের অধিক বিলম্ব হয় নাই। ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী সংহিতাগুলিতেই বিশিষ্ট পদ্ধতিতে সর্প-পূজার প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গেলেও ঋগ্বেদেই সর্পে দৈবশক্তি আরোপ করিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে 'অহি বুধ্ন্য' নামক এক শক্তিমান জীবের উল্লেখ রহিয়াছে। আর্য্য-সাহিত্যে বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন সর্প-চরিত্রের ইহাই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ। এই চরিত্রের উপর দেব-গুণ আরোপ করা হইয়াছে।১ কেহ কেহ মনে করেন, বৈদিক ইন্দ্রের চিরশত্রু বৃত্র অথবা অহি কোন শক্তিমান সর্প ব্যতীত আর কিছুই নহে।২

ঋগ্বেদে সর্প দেবতা

যাহা হউক, প্রকৃতপক্ষে যজু ও অথর্ব্ব বেদের যুগেই সর্পের কতকগুলি মন্ত্র রচিত হইতে দেখা যায়। তাহা হইতেই অনুমিত হয়, সর্পপূজা ইতিমধ্যেই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছে। বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী যুগ অথবা ব্রাহ্মণের যুগে 'সর্প বিদ্যা' এবং 'সর্প বেদ' দুইটি জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই যুগেই সর্পপূজা আর্য্য সমাজে বিধিবদ্ধ হয়। গৃহ্য সূত্রের মধ্যে যে গার্হস্থ্য বিধি আচারের নির্দ্দেশ রহিয়াছে তাহাতে সর্প-পূজার বিস্তৃত ব্যবস্থার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্পপূজার প্রকরণ হিসাবে আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে উল্লেখ আছে যে, কলস হইতে শক্ত একটি মৃৎপাত্রে পূর্ণ করিয়া লইয়া কোন পবিত্র স্থলে গমন করিয়া পূর্ব্বে পার্থিব, অন্তরীক্ষস্থ, দিব্য, দশদিকস্থ ও অন্যান্য পূজ্য সর্পদেবতাগণকে স্বাহা এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া নমস্কার করিবে এবং তৎপর

পরবর্ত্তী বেদে সর্প পূজা

গৃহ্য সূত্রে সর্প পূজা

---

১ "The serpent also appears as a divine being in the form of the rarely mentioned *Ahi budhnya,......*" A History of Sanskrit literature, (A. A. Macdonell) Pg. 110

২ ঐ, পৃঃ ১১০—১১১

বলি (উপহার) প্রদান করিবে।* ইহাই অধুনা প্রায় সমগ্র ভারত ব্যাপী অনুষ্ঠিত সর্প পূজা নাগপঞ্চমী ব্রতের প্রাচীনতম রূপ। অবশ্য ইহার সহিত আমাদের আলোচ্য মনসা পূজার কোন সম্পর্ক নাই। বাংলার মনসা পূজা ও নাগ পঞ্চমী ব্রত পরস্পর স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান।

মহাভারতের মধ্যে সর্প বা নাগ একটি সম্প্রদায় বা জাতি হিসাবে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা অত্যন্ত খল প্রকৃতির এবং আর্য্য-বিদ্বেষী। মনে হয়, সর্প-পূজক অনার্য্য দ্রাবিড় জাতিকেই এই স্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সর্প মাটিতে গর্ত্ত করিয়া বাস করে বলিয়া তাহাদিগকে পাতালের অধিবাসী বলিয়া কল্পনা করা হয়। সর্পের প্রকৃতিতে অন্যান্য যত দোষ বর্ত্তমান তাহাদের মধ্যেও তাহার সমস্তেরই অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়। কিন্তু এই নাগ জাতি যে আর্য্যবংশসম্ভূত তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, কশ্যপ মুনির ঔরসে কদ্রুর গর্ভে নাগ জাতির জন্ম হয়। তাহাদের জন্মের আভিজাত্য যাহাই থাকুক, অচিরকালের মধ্যেই তাহারা আচার-ভ্রষ্ট হইয়া আর্য্যদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। মহাভারতের আদিপর্ব্বের অন্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে এই আর্য্য ও নাগজাতির বিবাদের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে ;—

মহাভারতে নাগজাতি

মহামুনি কশ্যপের দুইপত্নী,—কদ্রু ও বিনতা। কদ্রুর গর্ভে শেষ, বাসুকিপ্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মা বাসুকিকে নাগজাতির অধিপতি নিযুক্ত করেন। এই বাসুকির ভগিনীর নাম জরৎকারু।

নাগপিতা কশ্যপ

যাযাবর ব্রতাবলম্বী এক ঋষিবংশে জরৎকারু নামক এক মুনির জন্ম হয়। তিনিও বয়ঃপ্রাপ্তকালে যাযাবর বৃত্তিই অবলম্বন করেন ; সংসারাশ্রমের

* আশ্বালয়ন গৃহ্যসূত্র ২।১।৯

প্রতি তিনি আজন্ম বীতস্পৃহ ছিলেন। একদিন তীর্থ-ভ্রমণ ব্যাপদেশে এক স্থলে আসিয়া উপনীত হন, এবং দেখিয়া বিস্মিত হন যে, তাঁহার পিতৃ-পুরুষগণ বৃক্ষশাখায় অধোমুখে লম্বমান রহিয়াছে। পিতৃলোকের এই দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, দারপরিগ্রহ ও সংসার ধর্ম্ম উদ্‌যাপন না করার জন্যই তাহাদের এই অবস্থা। পিতৃলোকের অনুরোধে তিনি দারপরিগ্রহ করিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু সর্ত্ত রহিল যে, তিনি নিজে উপযাচক হইয়া কাহারও কন্যা প্রার্থনা করিবেন না; কন্যা তাঁহার স্বীয় নামীয় হইবে; পত্নীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাঁহার থাকিবে না, এবং যে দিন ইচ্ছা সেই দিনই তিনি পত্নীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন।

মুনি জরৎকারু

পরীক্ষিৎকে সর্প-দংশনের পর মহারাজ জনমেজয় এক সর্পসত্রের আয়োজন করিয়া সর্পকুল নির্ম্মূল করিতে উদ্যত হইলেন। পাতালে নাগকুলের মধ্যে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। কিন্তু তাহারা এই জানিয়া আশ্বস্ত হইল যে বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর গর্ভে কোন মহাতপা মুনির ঔরসে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সে জনমেজয়ের এই অনুষ্ঠান পণ্ড করিবে।

সর্পসত্র

এদিকে মুনি জরৎকারু একদিন মহারণ্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া একাকী চীৎকার করিয়া তাঁহার বিবাহের ইচ্ছা ও তাহার সর্ত্ত ব্যক্ত করিলেন। বাসুকি শুনিয়া নিজের ভগিনীকে লইয়া গিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল।

জরৎকারুর দারপরিগ্রহ

একদিন মুনি জরৎকারু তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিবার অপরাধে পত্নীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার গর্ভে জরৎকারুর সন্তান আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। সে যথা সময়ে ভূমিষ্ঠ হইল, তাহার নাম আস্তীক। আস্তীক অপ্রাপ্ত

আস্তীকের জন্ম

বয়সেই সর্ব্বশাস্ত্রপারঙ্গম হইয়া উঠিল। তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও কৌশলে জনমেজয়ের সর্পসত্র হইতে নাগকুল রক্ষা পাইল।

মহাভারত ব্যতীত বৌদ্ধ সাহিত্যেও বিস্তৃত নাগ কাহিনীর উল্লেখ আছে। কিন্তু এই স্থলে লক্ষ্য করিবার একটি বিষয় এই যে, বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভারত কিম্বা বৌদ্ধ সাহিত্যের কাল পর্য্যন্ত সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী কোন বিশেষ স্ত্রী-দেবতার উল্লেখ নাই। মহাভারতে বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর উল্লেখ এবং বিস্তৃত পরিচয় আছে সত্য কিন্তু তাহাতে দেবত্ব আরোপ করা হয় নাই। জরৎকারুর গর্ভ হইতে আস্তীকের জন্মের পর জরৎকারুর প্রাধান্য এক প্রকার লোপ পাইয়া গেল। প্রাঙ্‌মহাভারত যুগের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এক স্থলে 'সর্পরাজ্ঞী' কথাটির উল্লেখ আছে।১ কিন্তু সর্পরাজ্ঞী অর্থে সেখানে পৃথিবী,—সর্পকুলের রাজ্ঞী নহে।২

সর্প দেবীর উদ্ভব

আর্য্য সমাজে স্ত্রী-দেবতার কোন স্থান ছিলনা। মোহেন্‌-জো-দড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কার হইতে জানা যায় যে, তৎস্থানে প্রাগ্‌বৈদিক যুগেই মাতৃকা-পূজা (Cult of Mother Goddess) বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। অতএব এই অনার্য্য সভ্যতা হইতেই যে ভারতবর্ষের আর্য্যগণ পরবর্ত্তী কালে এই মাতৃকা-পূজার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নিশ্চিত। ভারতবর্ষে আর্য্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই দেশীয় পূর্ব্বতন সভ্যতার আদর্শও যে একেবারে লোপ পায় নাই ভারতীয় পৌরাণিক

স্ত্রী-দেবতা কল্পনায় অনার্য্য প্রভাব

১ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২৩।৩৫৮

২ "In the Brahmanas they chant the verses (seen) by the queen of the serpents, (সর্পরাজ্ঞী) because the earth is the queen of the serpents, for she is the queen of all that moves (সর্পৎ)"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, Ed. M. Haug (358 f).

যুগের শক্তি-দেবতার পরিকল্পনা হইতে তাহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সর্পদেবী মনসার পরিকল্পনায় এই অনার্য্য দ্রাবিড়-ধর্ম্ম-সম্ভূত মাতৃকা-পূজা বা শক্তি-পূজারই অন্যতম বিকাশ দেখিতে পাই।

বাংলায় অনার্য্য প্রভাব

ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা ও দাক্ষিণাত্যে আর্য্য-প্রভাব বিশেষ বিস্তৃত হইতে পারে নাই। নৃতত্ত্ববিদেরা বাঙ্গালী জাতিকে মোঙ্গল-দ্রাবিড় সংমিশ্রণ-জাত বলিয়া বিবেচনা করেন। দাক্ষিণাত্যে বাহ্যতঃ আর্য্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইলেও অদ্যাপি ভাষা ও অভ্যন্তরীণ লৌকিক সংস্কারে দ্রাবিড় প্রভাবই অক্ষুণ্ণ থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে এই দুই প্রদেশই এই দেশের প্রাচীনতম কতকগুলি জাতীয় সংস্কারের অধিকারী। শক্তি বা মাতৃকা-পূজা তাহাদের অন্যতম। এই কারণে বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্য ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে সর্পদেবী (Serpent Goddess)র পূজা দৃষ্টিগোচর হয় না। আর্য্যপ্রভাবিত ভারতের সর্ব্বত্র সর্পকেও পুং দেবতা নাগরাজ রূপেই পূজা করা হয়। ভারতবর্ষের এই নাগ-পূজার সহিত বাংলার মনসা পূজার কোনই সম্পর্ক নাই।

প্রাক্‌বৈদিক যুগে সর্প দেবী

সর্প দেবীর পরিকল্পনা প্রাক্‌বৈদিক যুগেই দ্রাবিড় জাতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল। অতঃপর এই দেশে আর্য্য-প্রভাব স্থাপিত হইলে আর্য্য সংস্কারানুযায়ী পুং-দেবতারই প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইল এবং আর্য্য-প্রভাবের প্রাথমিক মোহে আকৃষ্ট হওয়াতে দ্রাবিড়গণের মধ্যেও সম্ভবতঃ মাতৃকা-পূজার আদর্শ একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিল। কিন্তু কালক্রমে পুনরায় দ্রাবিড়-প্রভাব যখন প্রবল হইয়া উঠিল তখনই এই সমস্ত অনার্য্য-কল্পিত স্ত্রী-দেবতাগণ আর্য্যসমাজের মধ্যেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া লইতে লাগিল। ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্য আর্য্য-সমাজে এই অনার্য্য দেবতাদিগের প্রতিষ্ঠা-স্থাপনের কাহিনী লইয়াই রচিত

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ আর্য্য সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও আর্য্য ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি এই দেশে যে তারপরও কখনই সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, এই দেশের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। পশ্চিম ভারতে আর্য্যদিগের আক্রমণের পর পরাজিত দ্রাবিড়গণ সর্ব্বপ্রথম পূর্ব্ব দিকে চলিয়া আসিতে থাকে। কারণ, দাক্ষিণাত্য তখনও গভীর অরণ্যাকীর্ণ ছিল। রামায়ণের কাহিনী হইতেই তাহার আভাষ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশই উত্তর ভারতের মধ্যে দ্রাবিড়দিগের সর্ব্বশেষ আশ্রয় স্থল। এই দেশে বহুকাল বসবাস করিয়া মধ্য ভারত বা আর্য্যভূমি হইতে বহুদূরে নিরুপদ্রবে তাহারা যে নিজস্ব সংস্কার সমুহ পালন করিয়া গিয়াছিল আধুনিক বাংলার সমাজে তাহারই বহু চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। সর্পদেবী বা মনসার পূজা তাহাদের অন্যতম।

বঙ্গে অনার্য্য সভ্যতা

বঙ্গদেশে সর্পদেবীর পূজা সর্ব্বপ্রথম কবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া জানিতে পারা না গেলেও এই বিষয় নিঃসন্দেহ যে, পশ্চিম ভারত হইতে আর্য্যকর্ত্তৃক বিতাড়িত দ্রাবিড়গণ যখন বাঙ্গালায় আসিয়া প্রথম পদার্পণ করিল তখনই এই দেশে এই পূজারও বীজ উপ্ত হইল।

এই দ্রাবিড়গণ পূর্ব্ব ভারতে আসিয়া ক্রমে মোঙ্গলজাতির সহিত মিশ্রিত হয় এবং এই মিশ্রণের ফলে উভয়ের মধ্যে সংস্কৃতির আদান প্রদান আরম্ভ হয়। মোঙ্গল জাতির নিকট হইতে দ্রাবিড়গণ যে সমস্ত নূতন আচারে দীক্ষা লাভ করে—তান্ত্রিক সাধনা তাহাদের অন্যতম। এই তান্ত্রিক আচার পরে বৌদ্ধধর্ম্মেরও অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বভারতীয় মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাঙ্গুলী নামে এক সর্পদেবীর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। মহাযান বৌদ্ধদিগের মতে

এই জাঙ্গুলী দেবী অত্যন্ত প্রাচীনা; এমন কি, ভগবান বুদ্ধ তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য আনন্দকে এই দেবী-পূজার গোপন মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, অত্যন্ত প্রাচীন কাল হইতেই এই পূর্ব্ব ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজে জাঙ্গুলী দেবীর পূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার সূত্রগ্রন্থ 'সাধনমালা'তে এই জাঙ্গুলীদেবীর পূজার প্রকরণ ও তাঁহার মন্ত্রের সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ রহিয়াছে। তাহা হইতে সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, এই জাঙ্গুলী দেবী বর্ত্তমান বাংলার সমাজে পূজিতা সর্পদেবী মনসা হইতে প্রায় অভিন্ন। ১

তান্ত্রিক বৌদ্ধ জাঙ্গুলী দেবী

সাধন-মালায় জাঙ্গুলীর চারি প্রকার সাধনার কথা আছে। প্রথম দুই প্রকার সাধনার মন্ত্র হইতে দেবীর যে পরিচয় পাওয়া যায়২ তাহা হইতে জানা যায়, এই জাঙ্গুলী দেবী সর্ব্বশুক্লা, চতুর্ভুজা, একমুখরা, শুক্লসর্পবিভূষিতা ও বীণাপাণি, কোন জন্তুর উপর তাঁহার আসন সংস্থাপিত, দুই হস্তে ধৃত বীণায় সুর সংযোগ করিতেছেন, এক হস্তে ধৃত সর্প ও অপর হস্তে অভয় মুদ্রা। দ্বিতীয় সাধন মন্ত্রে দেবীর যে পরিচয় রহিয়াছে তাহা অনেকাংশেই প্রথমেরই অনুরূপ তবে ইহাতে দেবী ত্রিশূল, ময়ূর পুচ্ছ (সম্ভবতঃ লেখনী) ও সর্পহস্তা এবং অপর হস্তে অভয়দাত্রী।

জাঙ্গুলীর পরিচয়

১ "The Hindu goddess Manasa or Visahari has a marked resemblance to the appearance of Janguli, and some of the Dhyanas in the Hindu Tantric works for the goddess distinctly give her the epithet of Janguli."—Buddhist Iconography (Benoytosh Bhattacharyya) Pg. 80.

২ "......... আর্য্য-জাঙ্গুলীরূপাং সর্ব্বশুক্লাং চতুর্ভুজাং একমুখাং জটামুকুটিনীং শুক্লোত্তরীয়াং সিতরত্নালঙ্কারভূষিতাং শুক্লসর্পবিভূষিতাং সত্ত্বপর্য্যঙ্কাসনাসীনাং মূলভুজাভ্যাং বীণাং বাদয়ন্তীং অপরদক্ষিণেনাভয়প্রদাং চন্দ্রাংশুমালিনীং...... —সাধনমালা

সাধনমালায় দেবীর যে আর একপ্রকার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা একটু স্বতন্ত্র; কিন্তু তথাপি মূল প্রকৃতিতে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইহাতে জাঙ্গুলী দেবী ত্রিমুখা ও ষড়্ভুজা। তিনি এখানে পীতবর্ণা। সর্পের বিস্তৃত ফণাতলে আসীনা; তিনটি দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, বজ্র, বাণ ও তিনটি বাম হস্তে পাশ, নীলোৎপল ও ধনু ধৃত, দেবী সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা ইত্যাদি।[১]

মহাযান তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ এই পরিচয় অনুযায়ী জাঙ্গুলী দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মিত করিয়া পূজা করিত। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার Archaeological Survey of Mayurabhanja নামক গ্রন্থে এই প্রকার একটি মূর্ত্তি আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[২] মূর্ত্তিটি ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত হরিহরপুরের প্রাচীন দুর্গে রক্ষিত ছিল। ইহার প্রকৃত নাম জাঙ্গুলীতারা। মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ শ্রমণগণ এই দেবীর অর্চ্চনা করিতেন। মূর্ত্তিটি দ্বিভুজা। গ্রন্থকার সাধনমালা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জাঙ্গুলীমূর্ত্তি দ্বিভুজাও হইত।[৩] এতদ্ব্যতীত তিনি ময়ূরভঞ্জের অন্যত্রও আরও বহু এই শ্রেণীর জাঙ্গুলীতারা মূর্ত্তি প্রাপ্তির আভাষ দিয়াছেন।[৪]

ভাস্কর্য্যে জাঙ্গুলীতারার মূর্ত্তি

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উল্লিখিত এই মূর্ত্তি যদি প্রকৃতই জাঙ্গুলী দেবীর মূর্ত্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে এই পূজা যে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তাহাই অনুমিত হয়। পাল রাজাদিগের সময় পর্য্যন্ত বাংলার সমাজে এই মহাযান তান্ত্রিক বৌদ্ধ

১ ...... পীতাং ত্রিমুখাং ষড়্ভুজাং নীলসিতদক্ষিণেতর বদনাং খড়্গ-বজ্রবাণ দক্ষিণ-হস্তত্রয়াং সতর্জ্জনীপাশবিষপুষ্পকার্ম্মুকবামকরত্রয়াং স্ফীতফণামণ্ডলশিরঃসর্পস্থাং দিব্যবস্ত্রাভরণ-ভূষিতাম্ কুমারীলক্ষণোজ্জ্বলাং......
সাধনমালা

২ প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৭

৩ "দ্বিভুজাং চতুর্ভুজাং বা"—ঐ

৪ Mayurabhanja Archaeological Survey. Vol II.

সম্প্রদায়ের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। অতএব, এই সময় পর্য্যন্ত বাংলার সমাজেও যে এই প্রাচীনতম সর্পদেবী জাঙ্গুলীর প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত ব্যাপকভাবেই বর্ত্তমান ছিল তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই জাঙ্গুলী দেবীই যে ক্রমে বিষহরীতে পরিণত হইয়াছেন তাহা সাধনা-মালা হইতে উদ্ধৃত জাঙ্গুলী-ধ্যানের সহিত বর্ত্তমানে এতদ্দেশে প্রচলিত মনসার নিম্নোদ্ধৃত ধ্যান-মন্ত্রের তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে,—

বৌদ্ধ সমাজে জাঙ্গুলীর প্রভাব

"কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং সুবদনাং পদ্মাননাং শোভনাং
নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরাং ফণীময়ীং দিব্যাঙ্গরাগান্বিতাং।
চার্ব্বঙ্গীং দধতীং প্রসাদমভয়ং নিত্যং করাভ্যাং মুদা
বন্দে শঙ্কর-পুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাঙ্গুলীম্॥[১]

মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই সর্পদেবীর কল্পনার জন্য বেদের নিকট ঋণী বলিয়া কেহ অনুমান করেন।[২] অথর্ব্ব বেদে এক সর্প বিদ্যা পারদর্শিণী কিরাত কন্যার উল্লেখ আছে।[৩] এই কিরাতকন্যা সর্পদংশনের প্রতিকার করিতে অভিজ্ঞ। কিন্তু অথর্ব্ব বেদে তখন পর্য্যন্তও তাহার চরিত্রের উপর দেবত্ব আরোপ করা হয় নাই। সে সাধারণ অনার্য্য কিরাত-দুহিতা তবে সর্পবিদ্যা সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী। তাহার চরিত্রগত এই অলৌকিকত্ব হইতে ক্রমে তাহার দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। অথর্ব্ব বেদে উল্লিখিত বিষনাশিনী ঘৃতাচী ও এই কিরাত কন্যা যে অভিন্ন এই বিষয়েও অনেকেই নিঃসন্দেহ।

জাঙ্গুলীর প্রাচীনত্ব

১ ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত ; Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, পৃঃ ২২৩

২ ঐ পৃঃ ২২২

৩ অথর্ব্ববেদ, ১০।৪।১৪

৪ ঐ ১০।৪;২৪

অথর্ব্ববেদে আরও দেখিতে পাওয়া যায়, দেবী সরস্বতীর একটি গুণের মধ্যে এই যে তিনি বিষনাশিনী। পূর্ব্বে সাধনমালা হইতে যে জাঙ্গুলীর স্তব-মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতেও দৃষ্ট হইবে যে, তাঁহাকে "সর্ব্বশুক্লাং শুক্লোত্তরীয়াং সিতরত্নালঙ্কারভূষিতাং বীণাং বাদয়ন্তীম্" বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অন্যত্র তাঁহাকে ময়ূরপুচ্ছ অর্থাৎ লেখনী-হস্তাও বলা হইয়াছে। জাঙ্গুলী দেবীর স্তবোক্ত এই সমস্ত গুণ বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সরস্বতীর উপরই প্রযুজ্য। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যজুর্ব্বেদের যুগেই সঙ্গীতবিদ্যার মত সর্পবিদ্যাও একটি বিশেষ বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। সেইজন্য সেই যুগে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর কল্পনার সহিত সঙ্গীত-বিদ্যার প্রতীক্ বীণার মত সর্প বিদ্যার প্রতীক সর্পেরও সংযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু বৈদিক সরস্বতীর পরবর্ত্তী কল্পনায় সর্পসংশ্রবের এই অনার্য্য অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তথাপি তাহাই যে আবার মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের বহির্দেশেও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, তাহাই জাঙ্গুলী দেবীর বৃত্তান্ত হইতে অবগত হওয়া যায়। এই জাঙ্গুলীদেবীই যে অথর্ব্ববেদোক্ত সর্পবিষনাশিনী কিরাত-কন্যা পরে সরস্বতীর সহিত অভিন্না হইয়া অতি প্রাচীনকাল হইতেই মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে জাঙ্গুলী নামে পূজিতা হইতেছেন, উল্লিখিত বিষয় হইতে তাহাই অনুমান হয়।

সরস্বতী ও জাঙ্গুলী

মহাযান সম্প্রদায়ের এই জাঙ্গুলী দেবীর পরিচয়ের সহিত পরবর্ত্তী বাংলার মনসা-স্তবটি তুলনীয়,—

"দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদন্যাং
হংসারূঢ়ামুদারামরুণিতবসনাং সর্ব্বদাং সর্ব্বদেব।
স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈ
র্বন্দেহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং যোগিনীং কামরূপাম্॥"

এই স্তবটি অত্যন্ত পরবর্ত্তী কালে রচিত বলিয়াই মনে হয়। ইহার মধ্যে মহাভারতের অষ্টনাগ[১] আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। ইহাতেও মনসাদেবীকে হংসারূঢ়া বলা হইয়াছে; বলা বাহুল্য, এই হংস সরস্বতীরই বাহন। এইভাবে মনে হয়, প্রাচীন সরস্বতী-কল্পিতা জাঙ্গুলী ও বর্ত্তমান মনসা অভিন্না।

জাঙ্গুলী ও মনসা

বাংলার প্রাচীন এবং একপ্রকার নিজস্ব সর্পদেবী এই জাঙ্গুলী যে কি উপায়ে বর্ত্তমান মনসায় রূপান্তরিত হইলেন, তাহাও কৌতূহলের বিষয় সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বাংলার আর্য্যপূর্ব্ব সভ্যতার সহিত দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সভ্যতার একমাত্র স্থানীয় পার্থক্য ব্যতীত অন্য বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। কারণ, দ্রাবিড়ের সহিত বাংলার মৌলিক (ethnic) সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সেইজন্য বাংলার সর্পদেবী জাঙ্গুলীর মত দাক্ষিণাত্যেও মুদমা, মন্‌চাম্মা প্রভৃতি সর্পদেবীর অস্তিত্ব ছিল। পরস্পর সহযোগিতার অভাবে ক্রমে উক্ত স্থানীয় পার্থক্যগুলি এমন ব্যাপক হইয়া উঠিল যে, তাহারা কোনকালে পরস্পর যে সগোত্র ছিল তাহা অনুমান করাও কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্য হইতে আগত সেনরাজবংশ যখন বাংলার রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী হইয়া বসিল তখন হইতেই পুনরায় দাক্ষিণাত্যের প্রভাব বাংলার সমাজে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিল।

দাক্ষিণাত্যের সর্পদেবী

হিন্দু সেনরাজগণ যখন আসিয়া এই দেশের সিংহাসন অধিকার করেন তখন পর্য্যন্তও পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ পালরাজদিগের ধর্ম্মসংস্কারের প্রভাব দেশে অত্যন্ত প্রবলভাবেই বর্ত্তমান

বঙ্গে দাক্ষিণ সংস্কার

১ 'অনন্ত বাসুকি পদ্ম মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কুলীর কর্কটশ্চৈব সাষ্টনাগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥'

ছিল। সেনরাজগণ রাজশক্তির সহায়তায় নিজস্ব ধর্ম্মমতগুলি এই দেশের সমাজে প্রবর্ত্তিত করিতে উৎসুক ছিলেন, রক্ষণশীল এই দেশীয় সমাজও তাহাদের নিজস্ব ধর্ম্মমত সহজে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু এই উভয় আদর্শের মধ্যে মুলগত ঐক্য ছিল বলিয়া পরস্পর সামঞ্জস্য স্থাপনও অত্যন্ত সহজেই সম্ভব হইয়াছে। তাহারই ফলে, এতদ্দেশের তান্ত্রিক মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত সর্পদেবী জাঙ্গুলী একদিকে কেন্দ্রীয় ভারতের নবপ্রবুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রভাব ও অপর দিকে নবপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি-সমাশ্রিত দাক্ষিণাত্যের লৌকিক ধর্ম্ম-সংস্কারের প্রভাব এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিল। এই অবস্থা হইতেই প্রকৃতপক্ষে মনসাদেবীর উৎপত্তি হয়।

সেন রাজদিগের বঙ্গে আগমনের সময় হইতেই উচ্চতর বাংলার সমাজে শৈবধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। এই শৈবধর্ম্ম বাংলার সামাজিক জীবনের অন্তরে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই ইহার উপর আবার কতগুলি লৌকিক ধর্ম্মের উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। এই বিষয়ে গ্রন্থের ভূমিকাভাগে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই উৎপীড়নগুলি পঙ্গপালের মত আকস্মিক ভাবেই যেন আসিয়া বাংলার সমাজের উপর পতিত হইয়াছিল। ইহারা এই দেশজ হইলে ইহাদের প্রতিষ্ঠার জন্য এত দ্রুত তৎপরতার প্রয়োজন হইত না, স্বাভাবিক নিয়মে আপনা হইতেই সমাজের মধ্যে তাহাদের আসন গড়িয়া উঠিত, কিন্তু ইহারা পরগাছার মত আসিয়া শৈবধর্ম্মের বিরাট মহীরুহ আশ্রয় করিয়া থাকিতে চাহিতেছে, সমাজের মুলে ইহাদের শিকড় গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সেইজন্যই মনে হয়, বাংলার লৌকিক ধর্ম্মগুলির একটা প্রাথমিক রূপ সর্ব্বপ্রথম বাংলার বাহির হইতে বিশেষতঃ সেনরাজদিগের সহিত এই

বাংলার লৌকিক ধর্ম্ম ও সেন রাজগণ

দাক্ষিণাত্য হইতেই আসিয়াছিল, অতঃপর এতদ্দেশীয় সংস্কারের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে, এবং যেহেতু পরস্পরের ধর্ম্মগত আদর্শের মধ্যে অনৈক্য নাই, সেইজন্য এই সামঞ্জস্য বিধানও অতি সহজেই সম্ভব হইয়াছে। সেইজন্য বাংলার লৌকিক ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে দাক্ষিণাত্যের লৌকিক ধর্ম্মের ইতিহাসেরও তুলনামূলক আলোচনা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব বশতঃ দাক্ষিণাত্যেও লৌকিক দেবদেবীর অস্তিত্ব অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তবে একমাত্র ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেই তাহাদের কতকগুলির সন্ধান পাওয়া যায়।

মহীশূরে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে মুদমা নামে এক সর্পদেবী আজ পর্য্যন্তও পূজা পাইয়া আসিতেছেন।১ উচ্চতর হিন্দু সমাজের মধ্যে আর্য্য প্রভাব বশতঃ পুংদেবতা নাগরাজেরই পূজা প্রচলিত;

মহীশূরের মুদমা দেবী

কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নতন সমাজে এই স্ত্রীদেবতার পূজার বিশেষ প্রাধান্য লক্ষিত হয়। মহীশূরের প্রাচীন ভাস্কর্য্যে এই মুদমার বহু মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।২ এই জাতীয় মূর্ত্তির নিম্নভাগ সর্পাকৃতি ও উপরের ভাগ স্ত্রী-আকৃতি। মৎস্যকন্যার মত ইহারা অর্দ্ধনাগ ও অর্দ্ধনারী মূর্ত্তি-বিশিষ্ট। বহু প্রাচীন কালে মধ্য-এশিয়ায় সাইথিয় জাতির মধ্যে এলা নামে অনুরূপ আকৃতির এক নাগকন্যা পূজিতা হইত।৩

---

১ Indian Serpent Lore. (J. Ph. Vogel.) Pg. 272.

২ ঐ Plate XXX.

৩ মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীকপর্ব্বে এলাপাত্র নামে এক নাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ময়ূরভঞ্জে পাঁচপীরের অন্তর্গত খিচিং নামক
নেও কিঞ্চকেশ্বরী বা খিচিঙ্গেশ্বরী নামে এক সর্পদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত
আছে। ৪ ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত কোপ্তিপন্দা ও রায়-
বানিয়াতে বৈরাট পাট ঠাকুরাণী নামেও এক সর্প-
দেবীর সহিত পরিচয় লাভ করা যায়। তাহার
কৃতি সম্পূর্ণতঃই মহীশূরের মুদমা মূর্ত্তির অনুরূপ। এই মূর্ত্তিগুলি দ্বিভুজা,
য় বদ্ধ-মুষ্টিতে সর্পশিশু ধৃত, মস্তকোপরি বিস্ফারিত সর্প ফণার ছত্র, মুখে
নভঙ্গি। দক্ষিণাপথের এই মুদমা-মূর্ত্তির সহিত বাংলায় প্রাপ্ত প্রাচীন
সা-মূর্ত্তিগুলির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের উপরিভাগের
াকৃতি প্রায় অভিন্ন। এই সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করা
তেছে।

মুদমা ও বৈরাট পাট ঠাকুরাণী

দাক্ষিণাত্যের লৌকিক ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়
এই মুদমা ভিন্ন অন্যান্য লৌকিক সর্পদেবীর পূজাও তথায় আজ
পর্য্যন্তও প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে কানাড়া
প্রদেশের মনে মঞ্চম্মার নাম উল্লেখযোগ্য। ১ মনে
ম্মা প্রকৃতপক্ষে কোন দেব-দেবীর নাম নহে, ইহা একটি অজ্ঞাত সর্পের
, তবে নামটি স্ত্রী-অর্থ-জ্ঞাপক বলিয়া এই দেবকল্প সর্পকেও স্ত্রী সর্প
য়া অনুমিত হয়। যাহাই হউক, এই স্ত্রী সর্পে দেবত্ব আরোপ করা হইয়া
ক এবং বৎসরে একদিন মাত্র তাহার উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করা
। তাঁহার পূজা-মন্দিরকে মনে মঞ্চীর মন্দির বলে। এই মন্দিরের
রে কোন দেবমূর্ত্তি নাই। বল্মীক স্তূপের আকৃতি একটী ক্ষুদ্র
পর সম্মুখে এই মনে মঞ্চম্মার পূজা দেওয়া হয়। সর্প সাধারণতঃ বল্মীক

মনে মঞ্চম্মা

৪ Archaeological survey of Mayurbhanja, Vol. I. Int. XXXVII.

১ The village gods of South India (H. Whitehead) Pg. 81

স্তূপেই বাস করে বলিয়া এই অদৃশ্য সর্পিণীকেও বল্মীকবাসিনী বলিয়াই কল্পনা করা হয়।

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন,[১] "মাঞ্চীদেবীকে সেখানে 'মঞ্চাম্মা' বা 'মন্চা অম্মা' অর্থাৎ মন্চা মাতা বলে। ইহারা 'চ'কে প্রায় 'স'র মত উচ্চারণ করে। কাজেই 'মন্সা অম্মা' মনসা মাতায় গিয়া দাঁড়ায়।" অধ্যক্ষ সেন মহাশয়ের এই মত সমর্থন করিয়া কেহ কেহ এই মনে মঞ্চম্মাকেই বাংলার মনসাদেবীর মূল বলিয়া কল্পনা করেন। তাঁহাদের মতে, সেন রাজদিগকর্ত্তৃক আনীত এই মনে মঞ্চম্মা দেবী বাংলার ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফলে মনসা দেবীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহার সঙ্গে তৎকালীন বিলীয়মান মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্ত জাঙ্গুলীদেবীর আদর্শও আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে।[৩] অতএব দেখা যাইতেছে, বাংলার এই মনসাদেবী দ্রাবিড় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য এই তিন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগত আদর্শের সঙ্কর সৃষ্টি। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, মনে মঞ্চম্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু স্পষ্ট ধারণা করিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ দেশান্তরে কোন দেবতার নিজের পূজা প্রচারিত হইলে এমন আশা করা সুসঙ্গত যে, সেই দেবতার নিজের দেশেও তাহার একটা বিশেষ প্রাধান্য বর্ত্তমান

মনে মঞ্চম্মা ও মনসা

১ 'বাংলায় মনসা পূজা'—প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৯, পৃঃ ৩৯১

৩ "The Senas came from Southern India and settled in Bengal in the middle of the 11th century A D. They very likely favoured the worship of the snake goddess Mancha, and their rise probably gave an impetus to her popularity. The decline of Buddhism by this time gradually transferred the honours paid to Janguli to Manansa who fast became Manasa at the hand of the Brahmin theologists."—Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum. (Dr. N. K Bhattasali) Pg. 224.

যাছে। কারণ, দেখিতে পাই, সেন রাজবংশের প্রথম রাজা বিজয় সেন খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এই দেশের রাজদণ্ড গ্রহণ করিবার অনতিকাল ব্যবধানেই মনসামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতেছেন। এই বিষয়ে পরে বিস্তৃত উল্লেখ করিতেছি। মনে মঞ্চম্মা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানা যায় যে, তাহার কোন মূর্ত্তি নাই। কানাড়া প্রদেশের তোরিয়ার, চক্র প্রভৃতি নামে পরিচিত কতকগুলি অস্পৃশ্য জাতি, বল্মীকস্তূপে এই সর্প দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা করে। মনে মঞ্চম্মা প্রকৃতপক্ষে একটি সর্পের নাম। বল্মীক-স্তূপ যে একমাত্র সর্প দেবতারই প্রতীক তাহা নহে, কোন কোন স্থলে এই বল্মীক-স্তূপেই দুর্গম্মারও পূজা হইয়া থাকে।১ অতএব অনুমান হয়, দাক্ষিণাত্যে এই মনে মঞ্চম্মার পরিচয় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু

মুদমা ও মনে মঞ্চম্মা

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ভাস্কর্য্যে মুদমা মূর্ত্তির অস্তিত্ব ও ময়ূরভঞ্জ পর্য্যন্ত তাহার বিস্তৃতি হইতে সহজেই স্থিরীকৃত হয় যে, এই মুদমা দেবীর প্রভাব তৎকালীন সমাজেও অত্যন্ত ব্যাপকভাবেই বর্ত্তমান ছিল। জাঙ্গুলীদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণের যে আদর্শ মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে তৎকালে প্রচলিত ছিল তাহার সহিত মুদমা মূর্ত্তির পরিকল্পনা মিশ্রিত হইয়া একাদশ শতাব্দীর মনসা মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মিত হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। এতদ্দেশীয় ভাস্কর-সমাজে জাঙ্গুলীর আদর্শই অধিকতর প্রভাবশালী ছিল বলিয়া সমসাময়িক কালে নির্ম্মিত মনসা মূর্ত্তিগুলির মধ্যে মুদমার বৈশিষ্ট্য রক্ষার প্রয়াস বড় একটা দেখা যায় না। বৌদ্ধতান্ত্রিক সূত্রগ্রন্থ সাধনমালায় জাঙ্গুলীর চতুর্ভুজের বর্ণনাস্থলে মুদমার অনুরূপ প্রাচীন মনসামূর্ত্তিতে দ্বিভুজের ব্যবস্থা এইভাবেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

---

১ The village gods of South India. (H. Whitehead) Pg 75.

অবশ্য ভাষাতত্ত্বের ধ্বনি-নিয়মে মনে মঞ্চম্মা হইতে সংস্কৃত প্রভাবে মনসা মাতা হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক সমর্থন পাওয়া না গেলে শুধু একটা ধ্বনি-নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া কোন মীমাংসায় আসিয়া উপনীত হওয়া নিরাপদ নহে। তাহা হইলে মনসা নামটি কোথা হইতে আসিল? সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা সন্তোষজনক নয় বলিয়াই তাহার অনার্য্য-উদ্ভবের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইতেছে। প্রাচীনতম সংস্কৃত সাহিত্য, পাণিনি, অমরকোষ প্রভৃতিতে মনসা নামের উল্লেখও নাই। ইহাতেও তাহার অর্ব্বাচীনত্বই সূচিত হয়।

মনসা নামের উৎপত্তি

পরবর্ত্তী আভিধানিকেরা (যেমন, শব্দকল্পদ্রুমপ্রভৃতি) এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি এই ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যেমন, "(কশ্যপেন) মনসা সৃষ্টা দেবী 'মনসা দেবী' অলুক সমাস নিষ্পন্ন পদ। এই ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ অত্যন্ত অসমীচীন, ইহা বলাই বাহুল্য।

মনসা নামটি আর্য্য প্রভাবে মূল দ্রাবিড় কোন নাম হইতে বিকৃত হইয়াছে এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তবে তাহা মনে মঞ্চী কিম্বা মনে মঞ্চম্মা কি না তাহা স্থির করিয়া বলিবার যথেষ্ট কারণ নাই।

সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এই কয়খানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থে এই মনসা নামটির সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। উল্লিখিত পুরাণ প্রায় কোনটি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। এই পুরাণগুলিতে মনসার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখিয়া ইহাই মনে হয়, এই দেবতার পূজা সমাজে অধিক দিন ধরিয়া প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তবে তাহার অন্ততঃ শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এমন অনুমান করা যাইতে পারে।

মনসার পূজা প্রবর্ত্তনকাল

এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন বাংলার কতকগুলি ঐতিহাসিক আবিষ্কার হইতেও সমর্থিত হইতেছে। বাংলা ও তাহার সংলগ্ন প্রদেশগুলি হইতে অসংখ্য মনসা-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের নির্ম্মাণের সময় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বলিয়া অনুমিত হয়। বিশেষতঃ একটি মূর্ত্তির নীচে সেন বংশের প্রথম রাজা বিজয় সেনের নাম খোদিত দেখিয়া ইহার সময় সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতেছে। বিজয় সেন খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভাস্কর্য্যে মনসা মূর্ত্তি

এই মূর্ত্তিটির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ইহার সময় সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়াই ইহার যে মূল্য তাহা নহে. ইহার সহিত বিজয় সেনের নাম জড়িত বলিয়াই ইহার মূল্য অপরিসীম। এই দেবী যে দাক্ষিণাত্য রাজবংশের পৃষ্ঠপোষিত, ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছান যাইতে পারে যে, এই দেবীর পূজা মুখ্যতঃ দক্ষিণাত্য হইতেই তাহাদিগকর্ত্তৃকই এই দেশে আনীত হইয়াছে।

বিজয় সেনের মনসা

বীরভূম জেলার অন্তর্গত পাইকোড় গ্রামে এই মূর্ত্তিটি আবিষ্কৃত হয়। হেতমপুরের কুমার মহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী তাঁহার "বীরভূম বিবরণে"* সর্ব্বপ্রথম এই মূর্ত্তিটির উল্লেখ করেন। কিন্তু মূর্ত্তিটির মস্তকের দিক ভগ্ন ছিল বলিয়া তিনি ইহার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারেন নাই। অতঃপর ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ১৯২১-২২ সনের বার্ষিক বিবরণীতে ইহার বিস্তৃত পরিচয় প্রকাশিত হয়।

ইহা প্রকৃতপক্ষে একটি মূর্ত্তি-লিপি (Image Inscription)। মনসা-মূর্ত্তির নিম্নভাগে প্রাচীন অক্ষরে একটি লিপি খোদিত আছে।

* বীরভূম বিবরণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০

এই লিপি হইতেই মূর্ত্তিটির সময় নির্দ্ধারণ করা গিয়াছে। প্রস্তরের একটি স্তম্ভগাত্রে এই মনসার মূর্ত্তিটি খোদিত।১

পরিচয়

মূর্ত্তিটি দ্বিভুজা, প্রফুল্ল কমলাসনা ; মাথার দিক ভাঙ্গা, ডান পাশে ক্ষুদ্রাকৃতি একটি পুরুষ মূর্ত্তি ; সম্ভবতঃ ইহা জরৎকারু মুনির মূর্ত্তি। ডান হাত হাঁটুর উপর স্থাপিত ; বাম হাতের মুষ্টিতে একটি সর্পশিশু ধৃত। মূর্ত্তির নিম্নভাগে প্রাচীন অক্ষরে এই লিপি খোদিত

·········রাজ্ঞেন শ্রীবিজয় সে (নেন)

মনে হয়, লিপির প্রথম ও শেষভাগ বিনষ্ট হইয়াছে। উল্লিখিত এই বিজয় সেন বাংলার সেন রাজ বংশের রাজা বিজয় সেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।২ সম্ভবতঃ রাজা বিজয় সেনের আদেশে এই মুর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, লিপিকর্ত্তার ইহাই বক্তব্য। বিজয় সেনের সময় নির্দ্দিষ্ট ভাবে কিছুই জানা না গেলেও ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

বিজয় সেনের মনসা-মূর্ত্তি

অতএব এই মুর্ত্তিটি একাদশ শতাব্দীতে যে খোদিত হইয়াছিল এই বিষয় নিঃসন্দেহ। এই মুর্ত্তিটি যে মনসার এই বিষয়েও কাহারও কোনই সন্দেহ নাই।৩

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের উক্ত বার্ষিক বিবরণীতে আর একটি মনসা-মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।৪ তাহার সময় সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট

১ Archaeological Survey of India, (K. N. Dikshit) Pg 78-79 and 80 Plate XXVIII, b.

২ Inscriptions of Bengal, (N. G. Majumder) Vol III, পৃঃ ১৬৮

৩ "The Vijayasena pillar clearly exhibits the headless figure of the goddess Manasa", Archaeological Survey of India, Annual Report, 1921-22 (K. N. Dikshit) Pg. 79.

৪ ঐ Pg. 80 Plate XXVIII (c)

কিছুই জানা না গেলেও এই মূর্ত্তির গঠনভঙ্গিও প্রথমোক্ত পাইকোড়ে প্রাপ্ত মনসা-মূর্ত্তির সহিত অভিন্ন দেখিয়া ইহাই বিবেচিত হয় যে, এই উভয় মূর্ত্তি অনতিকাল ব্যবধানেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। আলোচ্য মূর্ত্তিটি বীরভূম জেলার অন্তর্গত মুররৈ রেলষ্টেসনের অদূরবর্ত্তী ভদীশ্বর নামক গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিটি অক্ষতভাবেই পাওয়া গিয়াছে।

ভদীশ্বরের মনসামূর্ত্তি

দেবীর মস্তকের উপর সাতটি সর্প ফণা ধরিয়া আছে।১ বাম হাতের মুষ্টিতে ধৃত একটি সর্প; সর্প-নির্ম্মিত কাঁচুলিতে বক্ষ আচ্ছাদিত; এক পার্শ্বে তাঁহার একটি সহচরী, অপর পার্শ্বে পাইকোড় মূর্ত্তির অনুরূপ একটি পুরুষ মূর্ত্তি, সম্ভবতঃ জরৎকারু মুনি। লীলাসন-ভঙ্গিতে প্রফুল্ল কমলাসনে দেবী আসীনা, অঙ্গে অলঙ্কার-সম্ভার। আসনের নিম্নভাগে পূজা-ঘট, তাহার উপর দেবীর পদ স্থাপিত। এই মূর্ত্তিটি প্রাচীন বঙ্গের ভাস্কর-শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দান বলিয়াই মনে হয়। ইহা স্তম্ভ-গাত্রে খোদিত নহে, পাথর কাটিয়া সম্পূর্ণ মুর্ত্তির আকারে স্বতন্ত্র করিয়া গঠিত। এই মূর্ত্তির গঠন-আদর্শ সর্ব্বাংশেই পূর্ব্বোক্ত পাইকোড় মূর্ত্তির অনুরূপ। অতএব অনুমান হয়, একাদশ শতাব্দীর নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে এই মূর্ত্তিও নির্ম্মিত হইয়াছিল। কলিকাতা ও ঢাকার প্রত্নবস্তু-রক্ষণাগারে রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে এই প্রকার বহুমূর্ত্তি রক্ষিত আছে।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আদর্শে গঠিত মনসা-মূর্ত্তিও বাংলা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমুহ হইতে অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে হস্তীর উপর আসীনা এক মনসা-মুর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। মূর্ত্তিটি আসাম হইতে প্রাপ্ত। সর্প-অপেক্ষা বন্য হস্তীর উৎপীড়নই আসামে সমধিক; এইজন্য

১ দাক্ষিণাত্যের মহীশূরে প্রাপ্ত মুদমা-মূর্ত্তির ঊর্দ্ধভাগ অনুরূপ ভঙ্গিতে গঠিত। Indian Serpent Lore Plate XXX দ্রষ্টব্য।

কিম্বা হস্তীর আর এক নাম নাগ (পূর্ব্বোল্লিখিত একটি মনসা-স্তবে "নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরাম্" কথাটি তুলনীয়) এই অর্থেও মনসাকে গজাসীনা করা হইয়া থাকিবে। ইহা ছাড়াও শিশুক্রোড়া এক প্রকার মনসা-মূর্ত্তি উত্তর বঙ্গ ও ময়ূরভঞ্জ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কেহ কেহ ইহাকে ষষ্ঠীদেবী মনে করেন।

ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য

এই মূর্ত্তিগুলি আবিষ্কারের ফলে কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রধান একটি এই যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই মনসা পূজা এই দেশের সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কারণ, এই সময়ের মধ্যেই ভাস্কর্য্যে মনসার মূর্ত্তি গঠনের একটি বিশেষ আদর্শ স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে এমন কি, দেশের রাজার আদেশে পর্য্যন্ত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

বাঙ্গালীর দেবতা-সমাজে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করিয়া এই নবাগতা দেবী যে কি ভাবে এই দেশের সাহিত্যেও ক্রমে প্রবেশাধিকার স্থাপন করিল এখন তাহাই বর্ণণা করা যাইতেছে।

'একাদশ শতাব্দীর বাংলার ভাস্কর্য্যে মনসা মূর্ত্তির ব্যাপক অস্তিত্ব হইতেই জানা যাইতেছে যে, সমাজে এই দেবী ইতিমধ্যে রীতিমত আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইয়াছেন। সেইজন্য সমসাময়িক সংস্কৃত পুরাণগুলিতেও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হইবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।' অবশ্য কোন সংস্কৃত পুরাণেই বাংলা পদ্মাপুরাণের অনুরূপ চাঁদসদাগর বেহুলার কাহিনী নাই, ইহা মহাভারত ও পুরাণ নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র লৌকিক কাহিনী এবং বাংলা পদ্মাপুরাণের ইহাই মূল এবং আদি অংশ। ভাস্কর্য্যে মনসামূর্ত্তি খোদিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই মনসার এই লৌকিক কাহিনী সমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। এবং এই লৌকিক কাহিনীর সামাজিক

প্রাধান্যের জন্যই সমসাময়িক সংস্কৃত পুরাণেও অংশতঃ ইহার উল্লেখ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। তখনও লোকমুখে পল্লী-গীতিকা বা ছড়া পাঁচালীর আকারে (Ballad songs) পদ্মাপুরাণের মূল লৌকিক কাহিনী লোক মুখে গীত হইত। তারপর দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কোন কোন ক্ষমতাবান কবির নিপুণ হস্তে পড়িয়া তাহা কাব্যকাহিনীবদ্ধ হইয়াছে। তারপর ক্রমে এই লৌকিক কাহিনীর মধ্যে মহাভারতের নাগ-কাহিনীও আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। এইভাবেই প্রকৃত পক্ষে পদ্মাপুরাণ কাব্য বা মনসা-মঙ্গলের জন্ম হয়।

পদ্মা

মহাভারতের নাগ-কাহিনী ও মনসা

মহাভারতের কোন স্থলে জরৎকারু সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কিংবা সর্পমাতা বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। সর্পমাতা বলিতে মহাভারতে একমাত্র কশ্যপের পত্নী কদ্রুকেই বুঝায়, জরৎকারুকে নহে। মহাভারতের নাগকুল এই জরৎকারুকে কোন স্থলেই যে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তিও দেখাইয়াছে এমনও উল্লেখ নাই; তবে এক স্থলে মাত্র দুইটি কথায় বাসুকিকর্তৃক জরৎকারুর সম্বর্দ্ধনা করিবার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু ইহাও ভগিনীকে দেবতা ভাবিয়া নহে; তাহার গর্ভস্থ সন্তান আস্তীক কর্তৃক জনমেজয়-অনুষ্ঠিত সর্পযজ্ঞ পণ্ড হইবে, ইহা জানিতে পারিয়া ভগিনীর উপর প্রসন্ন হইয়া বাসুকি তাহাকে কালোচিত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিল।* আস্তীকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জরৎকারুর এই ক্ষণিক প্রাধান্যটুকুও লুপ্ত হয়। অতএব বাসুকির ভগিনী এই জরৎকারু সহসা মনসা নাম গ্রহণ করিয়া সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া বসিবার কোন

---

* "সান্ত্বমানার্থদানৈশ্চ পূজয়া চানুরূপয়া।
সোদর্য্যাং পূজয়ামাস স্বসারং পন্নগোত্তমঃ॥"
মহাভারত ১।৪৪।১৫

সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। এই অনার্য্য দেবী মনসা, সমাজে আর্য্য প্রভাব বশতঃ মহাভারতের কাহিনীর সহিত তাহার দেব-কল্পনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া লইয়াছেন মাত্র।

জরৎকারু ও মনসা

মহাভারতে মনসা নামের কোনই উল্লেখ না থাকিলেও এই অনার্য্য সর্পদেবী সমাজের মধ্যে তাহার পরবর্ত্তী যুগেই যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত ভাস্কর্য্যের প্রমাণ ব্যতীতও কোন কোন পরবর্ত্তী সংস্কৃত পুরাণও তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। ইহাতে মনসার জন্মকাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহাতে এই দেবীর আভিজাত্য কোন অংশেই খর্ব্ব না হয় সেইজন্য নাগকুলের পিতা কশ্যপের সহিতও তাহার সম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে, যেমন,—

কশ্যপ ও মনসা

"পুরা নাগভয়াক্রান্তা বভূবুর্ম্মানবা ভুবি।
যান্ যান্ খাদন্তি নাগাশ্চ নতে জীবন্তি নারদ॥
মন্ত্রাংশ্চ সসৃজে ভীতঃ কশ্যপো ব্রহ্মণার্থিতঃ।
বেদবীজানুসারেণ চোপদেশেন ব্রহ্মণঃ॥
মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবীং তাং মনসাং সসৃজে ততঃ।
তপসা মনসা তেন বভূব মনসা চ সা॥" *

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৪৬ অধ্যায়

* প্রাচীন বঙ্গে শৈব ধর্ম্মের প্রভাব বশতঃ একমাত্র বাংলা পদ্মাপুরাণেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনসা শিবের কন্যা, তদ্ভিন্ন সংস্কৃত পুরাণগুলিতে তাঁহাকে শিবের শিষ্যা ও কশ্যপের মানস-কন্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে পুরাণের উপর মহাভারতেরই অধিকতর প্রভাব অনুমিত হয়। 'দেবী ভাগবতে'ও পাওয়া যায়,—

"সা চ কন্যা ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী।
তেনৈব মনসা দেবী মনসা বা চ দীব্যতি॥
মনসা ধ্যায়তে যা চ পরমাত্মানমীশ্বরম্।
তেন যা মনসা দেবী তেন যোগেন দীব্যতি॥
জগদ্গৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী।
শিবশিষ্যা চ সা দেবী তেন শৈবী প্রকীর্ত্তিতা॥

দেবী ভাগবত, নবম স্কন্ধ, ৪৭ অধ্যায়

এইভাবে মনসার জন্ম হইলে পর তিনি বেদাদি অধ্যয়নের নিমিত্ত কৈলাসে শঙ্কর ভবনে গমন করিলেন ; সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যাদ্বারা চন্দ্রশেখরকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মহাজ্ঞান লাভ করিলেন ; সামবেদ পাঠ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারই আদেশে পুষ্কর তীর্থে তপস্যাদ্বারা কৃষ্ণকে তুষ্ট করিতে গমন করিলেন,—

শিব ও মনসা

"ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্ত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
সিদ্ধা বভূব সা দেবী দদর্শ পুরতঃ প্রভুম্॥"—ঐ

এই ভাবে সিদ্ধি লাভ করার পর কৃষ্ণ ও শঙ্কর উভয়েই মনসাকে পূজা করিলেন,—

কৃষ্ণ ও মনসা

"প্রথমে পূজিতা যা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
দ্বিতীয়ে শঙ্করেণৈব কশ্যপেন সুরেণ চ॥
মনুনা মুনিনা চৈব নাগেন মানবাদিনা।
বভূব পূজিতা সা চ ত্রিষু লোকেষু সুব্রতা॥"—ঐ

এই ভাবে মনসাদেবী ত্রিলোকের পূজালাভ করিবার পর পিতা কশ্যপ তাঁহাকে জরৎকারু মুনির সঙ্গে বিবাহ দিয়া দিলেন,—

মনসার বিবাহ

"জরৎকারু মুনীন্দ্রায় কশ্যপস্তাং দদৌ পুরা।
অযাচিত মুনিশ্রেষ্ঠো জগ্রাহ ব্রহ্মণাজ্ঞয়া॥"—ঐ

এইস্থলে মনসার লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতোক্ত বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর কাহিনী এক হইয়া গিয়াছে। মনসা-প্রণামের প্রচলিত মন্ত্রটিও এইস্থলে প্রণিধানযোগ্য, যথা,—

জরৎকারু মুনেঃ পত্নী ভগিনী বাসুকেরপি।
আস্তীকস্য মুনের্মাতা মনসাদেবী নমোঽস্তুতে॥

এইভাবে এই জাতীয় অর্ব্বাচীন পুরাণগুলিতে যে কাহিনীর বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে এই মনসা ও জরৎকারু একেবারে অভিন্ন।

মনসার সহিত মহাভারতোক্ত জরৎকারুর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে বলিয়াই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনসার কাহিনীর মধ্যে মহাভারতের আদি পর্ব্বের অন্তর্গত আস্তীক পর্ব্বোক্ত সমগ্র নাগ-কাহিনী আসিয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে স্থান লাভ করিয়াছে। এইজন্ত পদ্মাপুরাণের কাহিনী বাহ্যতঃ মহাভারতের আদিপর্ব্বোক্ত নাগকাহিনীর উপর স্থাপিত।

পদ্মাপুরাণ ও আস্তীক পর্ব্ব

এইস্থলে পদ্মাপুরাণের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া ইহার প্রধান প্রধান কবিদিগের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে,—

পদ্মাপুরাণের গল্প

পরম শৈব চাঁদ একদিন পূজার জন্য ফুল আহরণ করিতেছিল। সেই ফুলের গন্ধে মনসার অঙ্গ আভরণ নাগগণ ভয়ে পলাইতে লাগিল। মনসা চাঁদকে অভিশাপ দিলেন। চাঁদ চম্পকনগরে বিজয় সাধুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল। মর্ত্ত্যে দেবীর পূজা প্রচার করিতে হইবে। তাই অকারণে চাঁদ অভিশপ্ত হইল। কিন্তু যে হস্তে সে দেব শূলপাণির পূজা করিয়াছে, সেইহস্তে সে মনসার পূজা করিবে না, কিন্তু চাঁদের স্ত্রী সনকা স্বামীর মঙ্গলের জন্য গোপনে মনসার পূজা করে। এই গোপন পূজার কথা জানিতে পারিয়া চাঁদ মনসার ঘট পায়ে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, এমন কি সনকাকেও অপমান না করিয়া ছাড়ে নাই।

মনসার অপমান

মনসার রোষবহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। নন্দন-কানন সদৃশ চাঁদের গুয়াবাড়ী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। অসংখ্য নরনারী সর্প-দংশনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। কিন্তু চাঁদের দৈব-লব্ধ মহাজ্ঞানের দ্বারা গুয়াবাড়ীর লুপ্ত সৌন্দর্য্য পুনঃ ফিরিয়া আসিয়াছে। চাঁদের পরম বন্ধু ধন্বন্তরী ওঝা সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে

প্রতিহিংসা

পুনর্জ্জীবিত করিয়াছে। কিন্তু দৈবশক্তির নিকট মানুষী শক্তি কি ছার! মনসা কৌশলে ধন্বন্তরীর মৃত্যুর উপায় জানিয়া তাহাকে বধ করিলেন। গুরুর প্রাণ ফিরাইয়া আনিবার জন্য ধনামনা কত চেষ্টা করিল, কিন্তু বিধিলিপি অপরিবর্ত্তনীয়। তথাপি চাঁদের আদর্শের প্রতি অচল নিষ্ঠা, পুরুষকারের প্রতি অটল বিশ্বাস বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। মনসা বুঝিলেন যে, যতদিন চাঁদের মহাজ্ঞান থাকিবে ততদিন চাঁদ অজেয়; তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। তাই একদিন মনসা পরমাসুন্দরী নটীর বেশ ধারণ করিয়া কামমুগ্ধ চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করিলেন।

মহাজ্ঞান হরণ

দেবীর রোষবহ্নি তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। চাঁদের ছয় ছয়টি পুত্রের অন্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করা হইল। পুত্রহারা সনকার চোখের জল চাঁদকে বিচলিত করিতে পারিল না। তথাপি চাঁদ মনসার পূজা করিবে না।

পুত্রনাশ

তারপর স্বপ্নাদেশে ঝালুমালু মনসা পূজার আয়োজন করিল। মনসার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া সনকা দেবী পূজা করিয়া পুনঃ পুত্রবর লাভ করিল। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ—বিবাহের রাত্রে সর্পাঘাতে বাসর ঘরে সেই পুত্রের মৃত্যু হইবে। স্বর্গের অনিরুদ্ধ লক্ষীন্দর হইয়া সনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল। পূর্ব্বজন্মের স্ত্রী উষা সাহে বাণিয়ার ঘরে বেহুলা হইয়া স্বামীর অনুসরণ করিল।

লখাইর জন্ম

পুত্র-শোক-কাতর চাঁদ বাণিজ্যগমনের জন্য মনস্থ করিল। একদিন শুভলগ্নে চৌদ্দডিঙ্গা ভাসাইয়া চাঁদ পাটন অভিমুখে যাত্রা করিল। আত্মীয় স্বজনের শত অনুরোধ চাঁদ উপেক্ষা করিয়াছে, পথে বিপদের সম্ভাবনা জানিয়াও মনসার পূজা করিতে স্বীকার করে নাই। পাটনের রাজার নিকট হইতে নিজের অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যের বিনিময়ে বহুমূল্য দ্রব্য সওদা করিয়া চাঁদ দেশাভিমুখে যাত্রা

বাণিজ্য যাত্রা

করিল। পথিমধ্যে মনসা অনুরোধ জানাইল—"মোর তরে ফুল জল দেও একবার।" চাঁদ কাণীর পূজা করিবে না পরন্তু তাঁহাকে অপমান করিল।

দেবীর আদেশে সমুদ্রে বান ডাকিয়াছে। মুহূর্ত্তে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে চাঁদের চৌদ্দডিঙ্গা নিমজ্জিত হইল। চাঁদকে বাঁচিতে হইবে, না হইলে দেবীর পূজা প্রচার হয় না। চাঁদ জলে ভাসিতে ভাসিতে ক্ষুদ্র আশ্রয় পাইয়াও মনসার দয়া মনে করিয়া সেই আশ্রয় গ্রহণ করিল না। মনসার দয়ায় প্রাণ ভিক্ষার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। তবু চাঁদ কূল পাইল। সর্ব্বস্বহারা চাঁদ যেখানে দুই মুষ্টি অন্ন পাইয়াছে দেবীর প্রসাদে সে তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে।

পথে বিপত্তি

অনাহারে ক্লিষ্ট শ্রান্ত চাঁদ বহুদিন পরে দেশে ফিরিয়া আসিল। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষীন্দর তখন পূর্ণ যুবা। পুত্রমুখ দর্শন করিয়া সর্ব্বস্বহারা চাঁদ সকল দুঃখ ভুলিল। নবীন আশায় বুক বাঁধিয়া পুত্রের বিবাহের উদ্যোগে মাতিয়া উঠিল।

প্রত্যাবর্ত্তন

বিবাহ রাত্রে বাসর ঘরে সর্পাঘাতে পুত্রের মৃত্যু জানিয়া লোহার বাসর ঘর নির্ম্মিত হইল। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। বিবাহের রাত্রে বাসর ঘরে সর্পাঘাতে লক্ষীন্দর প্রাণ হারাইল।

বাসরে বিধবা

পতিপ্রাণা বেহুলার অটল প্রতিজ্ঞা সে স্বামী প্রাণ ফিরাইয়া আনিবে। পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের শত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া বেহুলা মৃত স্বামীকে কোলে করিয়া গাঙ্গরীর জলে ভেলায় ভাসিয়া অনিশ্চিত ভাগ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে চলিল।

ভাসান

একে একে শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট বেহুলা বিদায় লইল। যাইবার সময় শাশুড়ীর নিকট চারিটি নিদর্শন রাখিয়া বলিল, যখন সিদ্ধ ধানে অঙ্কুর হইবে তখন বেহুলা দেবপুর পৌছিবে, সিদ্ধ হরিদ্রায় যদি পত্র অঙ্কুরিত হয় তবে তাহার স্বামী পুনর্জীবন লাভ করিবে, ভাজা কলাই অঙ্কুরিত হইলে ছয় ভাসুর বাঁচিয়া উঠিবে, বিনা অগ্নিতে যেদিন হাঁড়ীর চাউল ফুটিবে সেই দিন বেহুলা তাহার শ্বশুরের হৃতসর্ব্বস্ব লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

মৃত স্বামীকে কোলে করিয়া বেহুলা ভেলায় ভাসিয়া চলিল। এই দুর্গম যাত্রাপথে স্বামীপ্রেমই তাহার একমাত্র সম্বল। তাহার অন্তরের অটল বিশ্বাস, এই নিষ্ঠা তাহাকে জয়যুক্ত করিবে।

গোদা ও আপু ডোমের ঘাট

বেহুলার ভেলা আসিয়া গোদার ঘাটে ঠেকিল। গোদা সেই ঘাটে বঁড়্‌শিতে মাছ ধরিত। বেহুলার রূপে মুগ্ধ হইয়া গোদা তাহাকে বিবাহ করিবার বাসনা জানাইল। বেহুলা শাপ দিল, যত দিন না সে দেবপুর হইতে ফিরিয়া আসিবে ততদিন গোদার পায়ে বঁড়্‌শি বিদ্ধ হইয়া থাকিবে। ভেলা ভাসিতে ভাসিতে আপু ডোমের ঘাটে আসিল। আপু ডোম তাহাকে প্রধানা স্ত্রী করিবার বাসনা জ্ঞাপন করিলে বেহুলার শাপে সে নদী তীরে অচেতন হইয়া পড়িল।

পথের সমস্ত প্রলোভন, ভয়, জয় করিয়া পতিপ্রাণা সতী বেহুলা নারী-জীবনের একমাত্র সম্বল স্বামীর জীবন ভিক্ষার জন্য দেবপুরে চলিল। তাহার অশ্রুস্নাত মুখমণ্ডল এক অপরূপ শ্রী ধারণ করিল।

ধোনা মোনার ঘাট

তারপর বেহুলা ধোনা-মোনার ঘাটে আসিয়া পৌছিল। ধোনা-মোনা দুই ভাই তাহাকে ধরিবার জন্য নৌকা ভাসাইল। মধ্য নদীতে তাহাদের নৌকা ডুবিয়া গেল। বেহুলার কৃপায় তাহারা কূল পাইয়া বাঁচিল। তারপর নেতা ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া লক্ষীন্দরের মাংস ভক্ষণ করিতে চাহিল। ব্যাঘ্ররূপিণী নেতার ক্ষুধার তৃপ্তির

জন্য বেহুলা নিজেকে উৎসর্গ করিতে চাহিল। তথাপি স্বামীর দেহ সে দিতে পারিবে না। নেতা চিলরূপ ধারণ করিয়া লখাইর পাঁজর ছোপ দিয়া হরণ করিতে চাহিল; বেহুলা অঞ্চলে স্বামীর পাঁজর রক্ষা করিল। ভেলা নেতা ধোপানির ঘাটে পৌছিল। বেহুলা স্বামীর গলিত শব জলে ধুইয়া পাঁজরগুলি গোপনে লোক-চক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া রাখিল।

সন্ন্যাসী ভোলানাথকে নৃত্যে সন্তুষ্ট করিয়া স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিবার জন্য নেতা উপদেশ দিল। তাই বেহুলা আজ জীবনের চরম পরীক্ষা দিবার জন্য দেব সভায় উপস্থিত হইয়াছে। ভোলানাথ বেহুলার অপরূপ নৃত্যে মোহিত হইয়া বর দিতে চাহিলে বেহুলা স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাহিল। কিন্তু মনসা ব্যতীত কে তাহার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া দিবে? মহাদেবের আদেশে মনসা লক্ষ্মীন্দরের প্রাণ ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃতা হইলেন কিন্তু বিনিময়ে চাঁদকে তাঁহার পূজা করিতে স্বীকার করা চাই। না হইলে, মানুষী শক্তির নিকট যে দৈবী শক্তির পরাজয় ঘটে, মনসার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়।

বেহুলার পরীক্ষা

বেহুলা প্রতিশ্রুতি দিল, চাঁদ মর্ত্ত্যে দেবীর পূজা প্রচার করিবে। লক্ষ্মীন্দর প্রাণ পাইল। দেবীর প্রসাদে চাঁদের ছয় পুত্র বাঁচিয়া উঠিল। সমগ্র সম্পদ-সম্ভার লইয়া চাঁদের চৌদ্দ ডিঙ্গা ভাসিয়া উঠিল। বেহুলার আজ কোন অভাব নাই, কোন অভিযোগ নাই, শ্বশুরের হৃতসর্ব্বস্ব সে উদ্ধার করিয়াছে, সে আজ বিজয়িনী।

পুনর্জীবন

বেহুলা গাঙ্গরী বাহিয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। পুত্রবধূর বিজয়গর্ব্বে চাঁদ উল্লসিত, তাহার হারাধন সাত পুত্র ও মধুকর ফিরিয়া আসিয়াছে। চাঁদের নগরী আজ আনন্দমুখর। কিন্তু এক মুহূর্ত্তে সকল আনন্দের অবসান হইল—চাঁদ জানিয়াছে যে, তাহার হৃতসর্ব্বস্ব পুনরুদ্ধারের মূলে রহিয়াছে, বেহুলার প্রতিশ্রুতি—

বেহুলার জয়

তাহাকে মনসার পূজা করিতে হইবে। তাহার যথাসর্ব্বস্ব বিলুপ্ত হউক তথাপি চাঁদ যে হস্তে দেব-শূলপানীর পূজা করিয়াছে সেই হস্তে মনসার পূজা করিবে না।

চাঁদের মনসা-পূজা

কিন্তু পুত্রবধূর কঠোর সাধনা, অপূর্ব্ব নিষ্ঠার কাছে চাঁদের প্রতিজ্ঞা টলিল। পুত্রবধূর স্নেহ সে উপেক্ষা করিতে পারে না। তাই বাম হস্তে মনসার পূজা করিল। এই পরাজয় দৈবশক্তির নিকট নহে, মানুষের স্নেহের কাছে মানুষের পরাজয়।

মনসার পূজা মর্ত্ত্যে প্রচারিত হইল। স্বর্গের দম্পতী অনিরুদ্ধ-উষা মর্ত্ত্যে লক্ষ্মীন্দর-বেহুলা রূপে মনসার পূজা প্রচার করিয়া শাপান্তে স্বর্গে গমন করিল।

কাহিনীর উদ্ভব

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, রামায়ণ মহাভারত কিম্বা কোন সংস্কৃত পুরাণে এমন কোন গল্প নাই। তবে এই গল্প কোথা হইতে আসিল? ইহার মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না! এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সহজ-সাধ্য নহে। পদ্মাপুরাণের কবিগণ প্রত্যেকেই নিজেদের নির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক জ্ঞানের মধ্যে এই কাহিনীর ঘটনা-স্থান সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। তাহার ফলে বঙ্গদেশেরই বহু স্থান চাঁদসদাগরের নিবাসভূমি বলিয়া দাবী করিতেছে। ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত এক চম্পকনগর গ্রাম বর্ত্তমান আছে। গ্রামের অদূরবর্ত্তী একস্থান 'নেতার টেক্' বা নেতা ধোবানীর ঘাট বলিয়া এখনও উক্ত হয়। গ্রামবাসীদিগের বিশ্বাস, ইহাই চাঁদ সদাগরের নিবাস-স্থান। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "দেখিতে পাওয়া যায় যে, অদ্যাপি ত্রিবেণীর (হুগলী জেলায়) বাধা ঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে নেত ধোবানীর পুকুর নামে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে— বৈদ্যপুরে, হাসানহাটী, নারিকেলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামগুলির নিম্ন দিয়া যে

সামান্য নদীটি আছে (বর্ত্তমানে তাহা একপ্রকার মজিয়া গিয়াছে) তাহাকে লোকে 'বেহুলা নদী' বলে এবং বর্দ্ধমানের প্রায় ষোল ক্রোশ পশ্চিমে চম্পাইনগর নামক পরগণার মধ্যে চম্পাই নগর নামক একটি গ্রামও আছে।…ঐ গ্রামের নিকটে তৃণগুল্মাচ্ছন্ন একটি উচ্চভূমি আছে; ঐ ভূমি লখিন্দরের বাসর বলিয়া প্রসিদ্ধ।"[১] উত্তর বঙ্গের লোকদিগের বিশ্বাস, বগুড়া জিলার মহাস্থানে চাঁদ সদাগরের নিবাস ছিল। দিনাজপুর জিলায় সনকা নামে একটি গ্রাম আছে, তত্রত্য স্থানের অধিবাসীদিগের বিশ্বাস, এই গ্রামেই চাঁদ সদাগর বাস করিতেন। আসামের অধিবাসিগণ কেহ কেহ ধুবড়ীর সহিত নেতা ধোবানীর সম্পর্ক কল্পনা করিয়া থাকেন। উত্তর বিহারেও চাঁদ সদাগরের একটি নিবাস-স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে।

চম্পকনগর কোথায়?

এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বিশ্বাস করেন, "চাঁদবেণের গল্পটি আগাগোড়া কল্পনা-মূলক।"[২] কিন্তু সকলেই এই সম্বন্ধে একমত নহে। ইহার মূলে নগণ্য হইলেও যে কোন না কোন সত্য প্রচ্ছন্ন আছে অবশ্য তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, এই গল্পটি উদ্ভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত ব্যাপক লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল। ইহার জন্য সর্প-পূজার জনপ্রিয়তার কথা বিশ্বাস করিয়া লইলেও ইহাও সত্য যে, সম্পূর্ণ একটা কাল্পনিক কাহিনী বাংলা, বিহার ও আসামের সর্ব্বত্র কাহিনীগত ঐক্য রক্ষা করিয়া এতকাল প্রচলিত থাকিতে পারিত না। উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টির সাহায্যে যে ইহার প্রচার বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাও নহে। কারণ, এ কথা সত্য যে, চণ্ডীমঙ্গলের কবি

পদ্মাপুরাণের কাহিনী কি কাল্পনিক?

১ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব পৃঃ ১১৯-২০।

২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ ১৮২।

মুকুন্দরাম ও অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্রের মত প্রথম শ্রেণীর কবি-শক্তি মনসা-মঙ্গল কাব্য-রচনায় কদাচ নিয়োজিত হয় নাই। তৎসত্ত্বেও কোন মঙ্গলকাব্যই মনসা-মঙ্গলের মত এত প্রচার লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহার কতকগুলি কারণ অবশ্য এই গ্রন্থের ভূমিকা-ভাগে উল্লেখ করিয়াছি।১ মনসা-মঙ্গলের চরিত্রগত আদর্শ-সৃষ্টি যতই উচ্চ হউক ইহার মূলে অন্ততঃ কোন সত্য না থাকিলে ইহা জাতির মানসক্ষেত্রে এত সুদৃঢ় শিকড় গড়িয়া তুলিতে পারিত না।

কাহিনীর সত্যাংশ

তাহা হইলে এই কাহিনীর মধ্যে কতটুকু সত্য থাকিতে পারে? ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, "চাঁদ সদাগরের উপাখ্যানের এইটুকু সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের আপত্তি নাই যে, যাঁহারা শৈব ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লৌকিক ধর্ম্ম প্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, চাঁদ সদাগর তাঁহাদের এক দলের নেতা ছিলেন ও শেষে তিনি মনসা দেবীর পূজা অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"২ কিন্তু অতিরিক্ত আরও একটুকু কাহিনী স্বচ্ছন্দে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অভিষেকোৎসুক রাজপুত্রের উপর দীর্ঘ বনবাসের নিদারুণ আদেশ যেমন ভারতের এক করুণ মহাকাব্যের মূল সত্য তেমনি বিবাহিত জীবনের আনন্দোৎসুক কোন অতুল ঐশ্বর্য্যবান্ নবযুবক শ্রেষ্ঠীপুত্রের বাসরগৃহেই দৈবাৎ সর্প-দংশনে মৃত্যুর মত কোন নিদারুণ সত্য ঘটনা হয়ত এই মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলিরও মূল সত্য। বালবৈধব্য-পীড়িত এই হিন্দুর সমাজও হয় ত সেইদিন অপরিস্ফুট-যৌবনা বেহুলার বাসর-রাত্রেই বৈধব্যের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তরুণ তরুণীর নব প্রস্ফুটনোন্মুখ জীবনের মূলে ক্রূর

১ পৃঃ ৩১

২ বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য (ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ ১৮৩

নিয়তির নিদারুণ এই পরিহাস যে কোন উচ্চতর কাব্যের রস-প্রেরণা দান করিতে সক্ষম। হয় ত সত্য ঘটনাটুকু এই খানেই শেষ হয় নাই। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুর গ্রাস হইতেও ফিরাইয়া আনিতে পারে, এই দেশের ইতিহাসে তাহা বহু পরীক্ষিত সত্য। সেইজন্য অনিশ্চিত আশার উপর নির্ভর করিয়া সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই কাহিনীতে হয় ত তাহাই হইয়াছিল; তারপর সম্ভবতঃ মৃতের সাধ্বী স্ত্রী শবদেহের অনুগমন করিয়া কোন স্থান হইতে তাহার স্বামীকে পুনর্জীবিত করিয়া লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। পদ্মাপুরাণের কাহিনীকে এই পর্য্যন্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। অবশ্য ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, শবানুগামিনী এই যুবতী পত্নীর নিঃসঙ্গ প্রবাস-জীবনের পবিত্রতা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই পরবর্ত্তী দৈব কাহিনীটুকু ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রামায়ণে সীতার অগ্নিশুদ্ধির কাহিনীও একই উদ্দেশ্যমূলক।

এইজন্যই গল্পটিকে অতি সহজেই "আগাগোড়া কল্পনামূলক" বলিতে পারা যায় না। তাহা হইলেই প্রশ্ন হয়, এই চাঁদ সদাগর কোথাকার লোক ছিলেন? তাঁহার পরিচয়ই বা কি? কাহিনী-ভাগ বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, চাঁদ সদাগর শৈব ছিলেন। উচ্চতর বাংলার সমাজে তখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম শৈব ধর্ম্মের মধ্যেই আত্মগোপন করিয়াছিল। কিন্তু সাধারণ জনসমাজে তখনও বৌদ্ধ আচার-সম্ভূত বিবিধ লৌকিক দেবতার পূজা বিশেষ প্রবল ভাবেই বর্ত্তমান ছিল। বিবাহের রাত্রে চাঁদ সদাগরের পুত্রের সর্পদংশন সাধারণ জনসমাজ চাঁদের লৌকিক সর্পদেবতা এই মনসার প্রতি ঔদাসীন্যের দ্বারাই ব্যাখ্যা করিল। তাহাতেই এই মনসা দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা সাধারণ লোকের শত গুণ বৃদ্ধি পাইল এবং তাহা

পদ্মাপুরাণে ঐতিহাসিকতা

হইতেই চাঁদ সদাগরের উক্ত মূল কাহিনীটি কবিত্ব-কল্পনার পত্র-পুষ্পে ক্রমে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।*

তাহা হইলে এই চাঁদ সদাগর কোথাকার লোক ছিলেন? ইতিহাসে তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় কি না? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। পূর্ব্ব বঙ্গের চন্দ্র রাজবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা শ্রীশচন্দ্র দেবকে কেহ এই চাঁদ সদাগরের সহিত অভিন্ন বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।১ রাজা শ্রীশচন্দ্র দেবের আনুমানিক কাল খৃষ্টীয় ৯৭৫ হইতে ১০০০ অব্দ। চাঁদ সদাগরের কাহিনী এই সময়ে উদ্ভূত হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে।

কেহ আবার অনুমান করেন, "চাঁদ সদাগর বাংলার লোক নহেন।"২ বেহুলার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলে মনে হয়, ইহা দাক্ষিণাত্যেরই নিজস্ব বস্তু। তাহার চরিত্রে বাঙ্গালী নারী-সুলভ কমনীয়তার যথেষ্ঠ অভাব রহিয়াছে। তাঁহাদের মতে, "বেহুলার তেজ ও নির্ভীকতা বিবাহ কাল হইতে। তাহার স্বামী সহ সমুদ্রে ভাসিয়া পড়াও কম সাহসের কথা নয়। তারপর শ্বশুর বাড়ী স্বামী সহ ডোম সাজিয়া যাওয়ার মধ্যে যে একটি পরিহাস-প্রিয়তা আছে তাহা খুব স্বাধীনভাবে চলাফেরার অভ্যাস না থাকিলে আশা করা যায় না। দেবপুরীতে নৃত্য করিয়া দেবতা প্রসন্ন করা দেবদাসীর কাজ। তাহা বাংলা দেশের প্রথা নয়। তাহা তৈলঙ্গেরই বস্তু।"৩

চাঁদ ও বেহুলার চরিত্র বৈশিষ্ট্য

---

১ Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum (Dr. N. K. Bhattasali) Pg. 225.

২ বাংলায় মনসা পূজা (শ্রীক্ষিতিমোহন সেন) প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৯, পৃঃ ৩৯৪

৩ ঐ পৃঃ ৩৯৫

আবার কেহ মনসা-মঙ্গলের চম্পকনগরীকে প্রাচীন মগধদেশের রাজধানী চম্পক অনুমান করিয়া "বিহারই এই গীতির আদি স্থান বলিয়া গণ্য" করিতে চাহেন।[১]

কাহিনীর উদ্ভবে বিহারের দাবী

পদ্মাপুরাণের প্রাচীন কবিদিগের রচনায় এই চাঁদ সদাগরের নিবাস সম্পর্কে কোনও আভাস পাওয়া যায় কিনা তাহাও বিচার্য্য।

মনসা-মঙ্গলের একজন অতি প্রাচীন কবি নারায়ণ দেব চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সোনেকাকে বেহারিয়া রাজার কন্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২] তাঁহার পরবর্ত্তী একজন কবি দ্বিজ বংশীদাসও সোনেকার এই প্রকার পরিচয় দিয়াছেন,—

"মাণিক্য পাটলী দেশে গন্ধ্য বণিক্য বংশে
সুর সার পুত্র শঙ্খপতি।
কুলে শীলে মহাশয়, বণিক্যের বংশে হয়
তার ঘরে কন্যা গুণবতী॥
পদ্মিনী জাতীয় কন্যা রূপে গুণে অতি ধন্যা
নাম তার সনকা সুন্দরী।—দ্বিজবংশী দাস।

এই মাণিক্য পাটলী দেশ বিহারের অন্তর্গত প্রাচীন পাটলীপুট বা বর্ত্তমান পাটনা বলিয়া অনুমিত হয়। দ্বিজবংশীর পদ্মাপুরাণের অন্যত্র আছে,—

"রত্নপাট মহা নদী বিহারিয়া দুই নদী
কালিন্দী আর যে কালিয়ানী।"

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, সম্ভবতঃ উড়িষ্যার মহানদীকেই বিহারিয়া বা বিহারের নদী বলা হইয়া থাকিবে।

১ বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় (ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭২

২ বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৭২ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

বঙ্গদেশের বাহিরে নিম্ন শ্রেণীর হালুয়া বা চাষী সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে মনসা-পূজা সর্ব্ব প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"উত্তরে নিষধ দক্ষিণে কালঞ্জর।
তার মধ্যে রম্য গিরি বাছাইর নগর॥
হৃষ্ট-পুষ্ট লোক সব সুখময় পুরী।
সেই রাজ্য জুড়িয়া বাছাই অধিকারী॥
মাতা তার মালতী পিতা যে গুণাকর।
সবে মাত্র এক পুত্র শ্রীবৎস ধর॥
রাজ্যেতে গোধন পালে কৃষি কর্ম্ম তার।
পঞ্চশত হাল চষায় অনিবার॥
ক্ষেতে বান্ধিয়াছে উত্তম টঙ্গী ঘর।
তাহাতে বসি চষায় হাল নিরন্তর॥
হাল কর্ম্ম বিনে তার অন্য কর্ম্ম নাই।
এতেকেই লোকে বলে হালুয়া বাছাই॥
বাছাইর দোহাই পড়ে সর্ব্বত্র নগরে।
বিনে তার আজ্ঞা কেহ পথ বৈতে নারে॥
ধনে ধান্যে রাজ্য পূর্ণ গোধন যূথ যূথ।
অতি মনোহর রাজ্য পরম সুকৃত॥
ইহা দেখি অন্তরে ভাবেন শূলপাণি।
এই রাজ্যে কন্যারে করিব পূজ্যমানী॥"

কোন বিশিষ্ট ভৌগোলিক জ্ঞান হইতে যে কবি এইখানে নিষধ ও কালঞ্জরের উল্লেখ করেন নাই তাহা সত্য। ইহা বিহার প্রদেশেরই কোন

সম্পদশালী কৃষকের বর্ণনা বলিয়া অনুমিত হয়। কবি ষষ্ঠীবর রচিত মনসা-মঙ্গলেও দেখিতে পাওয়া যায়, লক্ষীন্দরের নিমিত্ত কন্যাদর্শনে বহির্গত হইয়া—

'বেহার-পাটনে চাঁদ মিলিলেক গিয়া।'

অতএব দেখা যাইতেছে, বঙ্গের বাহিরেই যে এই কাহিনীটির ঘটনা-স্থান এই সম্বন্ধে পদ্মাপুরাণের প্রাচীন কবিদিগের রচনা-মধ্যেও একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এবং নানা ভাবে বিহারেরই উল্লেখ দেখিয়া ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মূল কাহিনীটি বিহারের কোন স্থানেই সংঘটিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে চাঁদ সদাগরের নির্দ্দিষ্ট কোন নিবাসের অনিশ্চয়তা হইতে এই সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

ছাপরার মনসার গল্প

পূর্ব্বেই একবার উল্লেখ করিয়াছি ১ যে, বিহারের অন্তর্গত ছাপরা জিলায় এই পদ্মাপুরাণের গল্প প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে প্রচলিত গল্পের সঙ্গে এই বিহারের গল্পের প্রায় বিশেষ কিছুই পার্থক্য নাই। তবে দুই এক স্থলে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু এই সামান্য পার্থক্য হইতেই কয়েকটি গুরুতর বিষয়েরও আভাস পাওয়া যায়।

বিহারে প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে বাংলার অনুরূপ হাসান হোসেন পালাটি নাই অবশ্য এই হাসান হোসেন পালাটি মূল কাহিনীর অপরিহার্য্য অংশ নহে। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই অংশটি বাংলা দেশে আসিয়া প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত যত পদ্মাপুরাণের পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই হাসান হোসেনের পালার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে, অতএব পদ্মাপুরাণের কাহিনী বাংলাদেশ হইতে যদি পরবর্ত্তী কালে বিহারে যাইত তবে এই অংশটিও তাহার মধ্যে

১ পৃঃ ৩০

যুক্ত থাকিত কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে, মূল কাহিনী বিহার হইতেই আসিয়াছে, পরে এই দেশে আসিয়া স্থানীয় কোন কোন অবস্থার প্রভাব বশতঃ ইহাতে পরবর্ত্তী কালে এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "ভাগলপুর ও পাটনা অঞ্চলে এখনও গীত ব্যবসায়ী দল মনসা-মঙ্গলের গান গাইয়া থাকে।১

বিহারী পদ্মাপুরাণ

বিহারের প্রচলিত কাহিনীতে বেহুলার পিতার নাম বাসু সৌদাগর ও মাতার নাম মাণিকো। বঙ্গদেশে প্রচলিত কাহিনীতে এই নামগুলির প্রায়ই কোন স্থিরতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্ষেমানন্দ বেহুলার পিতার নাম সায়বেনে ও মাতার নাম অমলা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিজয়গুপ্ত প্রমুখ পূর্ব্ববঙ্গের কবিগণ সাধারণতঃ পিতার নাম সাহে বানিয়া ও মাতার নাম সুমিত্রা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বগুড়ার কবি জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণে বিহারে প্রচলিত কাহিনীর অনুরূপ বেহুলার পিতার নাম বাহো সদাগর ও মাতার নাম মেনকা বলিয়া উল্লিখিত আছে। বিহারের বাসু সৌদাগর ও মাণিকোর সহিত এই বাহো সদাগর ও মেনকার কোন পার্থক্য নাই। জীবন মৈত্র হয়ত তাঁহার কাব্যে ইহার কাহিনীগত প্রাচীনতম ধারাটিই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের দাবী

কেহ আবার অনুমান করেন যে, মনসা-পূজার সঙ্গে সঙ্গে ইহার এই কাহিনী-ভাগও দাক্ষিণাত্য হইতেই আসিয়াছে। পদ্মাপুরাণের কাহিনীটি গভীর ভাবে অনুসরণ করিলে দেখা যায়, ইহার সহিত দক্ষিণ সমুদ্রের যোগ বড় নিবিড়। তেলেগু ভাষায় সিজ মনসা গাছের নাম চেংমুড়; এই সিজ মনসাগাছের নীচেই মনসাদেবীর পূজা হয়। বাংলা পদ্মাপুরাণে চাঁদসদাগর তাচ্ছিল্য প্রকাশ

১ 'মনসা-মঙ্গল'—আর্য্যাবর্ত্ত, ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ।

করিয়া মনসাকে চেংমুড়ী বলিয়া উল্লেখ করিতেন। বাংলায় চেংমুড়ী শব্দের কোন অর্থ নাই। অতএব অনুমিত হয়, তেলেগু হইতে এই চেংমুড়ী কথাটি আনীত হইয়াছে। এইভাবে সম্ভবতঃ গল্পটিও সেখান হইতেই আসিয়া থাকিবে। দাক্ষিণাত্যের বর্ত্তমান লৌকিক কাহিনীতে প্রায় পদ্মাপুরাণের অনুরূপ শিবের সহিত এক লৌকিক দেবী অম্মবরুর বিবাদের কথা উল্লিখিত আছে। ইহার সহিত চাঁদসদাগরের গল্পের সম্পর্ক আছে বলিয়া কেহ অনুমান করেন। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ,—

অম্মবরুর কাহিনী

ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব অম্মবরু নাম্নী গ্রাম্য দেবী-প্রসূত অণ্ড হইতে উদ্ভূত হন। তাঁহাদের পূজার জন্য অম্মবরু তিনটি নগরী নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

দেবীর নিজ পুরীর চতুর্দ্দিক তাম্র পিত্তল ও স্বর্ণ নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। নগরীর প্রত্যেক দ্বারে সহস্র তেজস্বী প্রহরী বিদ্যমান।

একদা যখন অম্মবরু জানিলেন যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁহার পূজার পরিবর্ত্তে স্ব স্ব পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে তখন দেবী তাঁহাদের পুরী বিনষ্ট করিয়া নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার মনস্থ করিলেন। ইতিমধ্যে শিবের আদেশে তাঁহার ভৃত্য আসিয়া দেবীকে অপমান করিল; দেবীর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দ্বিগুণ জাগিয়া উঠিল।

পীতবর্ণ বস্ত্রে,তাম্রবর্ণ মণিতে, রজত মেখলায়, শিরোভূষণে, স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দেবী এক হস্তে মৃগ অন্য হস্তে শঙ্খ ধারণ করিলেন। পবিত্র যজ্ঞসূত্র স্বরূপ সর্প তাঁহার শরীরে শোভা পাইল। এইরূপে দেবী বিবিধ শস্ত্র সুসজ্জিত হইয়া শৃগালারোহণ করতঃ শিবের পুরী দেবগিরি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দ্বাদশ মস্তক বিশিষ্ট এক বিরাটকায় সর্প সিংহদ্বারে বিপরীত মুখে অনবরত বিষোদ্গীরণ করিতে লাগিল। পথে মূক ব্যক্তি দেবীপ্রসাদে তাঁহার জয়োচ্চারণ করিল, দৈত্যগণ পুষ্পাঞ্জলি দান করিল।

অম্মবরু দেবগিরি পৌঁছিলেন। দেবীকে রোধ করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল ; দেবীর পূজা করিতে অস্বীকার করাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের শির দেহবিচ্যুত হইল এবং পুনঃ অম্মবরু তাঁহাদিগকে জীবন দান করিলেন। বহু রাজাকে নিহত করিয়া পুনরায় জীবন দান করা হইল এবং তাহারা দেবীর পূজা করিতে লাগিল।

এক বৎসর পরে অম্মবরু দেখিলেন, তাঁহার ভক্ত নৃপতিবর্গ শিবপূজা আরম্ভ করিয়াছে। তখন তিনি পুনরায় তাহাদের শাস্তি বিধান করিবার মনস্থ করিলেন। অম্মবরু বৃদ্ধাবেশে একটি বাক্স ও ফল সমেত দেবগিরি প্রবেশের ইচ্ছা করিলে দ্বারিগণ তাঁহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। দেবী প্রহরীদিগকে মূর্চ্ছাগ্রস্ত করিয়া নগরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন। নগরীর পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দ্বারে অসংখ্য লোক নীল ও লালবর্ণের বেত্রহস্তে পাহারা দিতে লাগিল।

প্রকাশ্যে নগরীতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া অম্মবরু লিঙ্গায়ত রূপ ধারণ করিয়া কৌশলে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং তোতার রূপ ধারণ করিয়া এক স্তম্ভের উপর বসিলেন। পূজারিগণ শিবপূজা করিতে উদ্যত হইলে তাহাদের হস্ত হইতে পূজাসামগ্রী পড়িয়া গেল। এই অমঙ্গল-সূচনায় শিবভক্তেরা আরাধ্যের শক্তির প্রতি আস্থাহীন হইল। এই অমঙ্গলকারীর সন্ধানের জন্য লোক প্রেরিত হইল। বহু চেষ্টার পর জনৈক প্রহরী তোতাবেশিনী অম্মবরুকে শিবের নিকট আনয়ন করিল।

তোতাবেশিনী অম্মবরুকে শিবের আদেশে উত্তপ্ত স্তম্ভে এবং হস্তীপদে বন্ধন করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইল কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অগ্নিবৎ উত্তপ্ত স্তম্ভ তাঁহার স্পর্শে শীতল হইল, তাঁহাকে হস্তীর পদে বন্ধন করিলে হস্তী গতিশক্তি রহিত হইল।

অম্মবরু ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার পূজা করিবার জন্য নগরবাসীকে আদেশ করিলেন। তাহারা স্ত্রী-দেবতার পূজা করিতে অস্বীকার করিল।

দেবীর ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বসন্ত রোগের প্রকোপে নগরবাসী প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল; কিন্তু শিবের পবিত্র বিভূতি-স্পর্শে পুনরায় তাহারা জীবন লাভ করিল। দেবী শিবের শক্তি-পরীক্ষার নিমিত্ত মানুষের রূপ দিয়া কতকগুলি পবিত্র বৃক্ষ সৃষ্টি করিলেন। শিব তাহাদের জীবন দান করিলেন।

অম্মবরু শিবের অসীম শক্তির পরিচয় লাভ করিয়া ব্রহ্মার পুরীতে গমন করিলেন। তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে পূজার্চ্চনায় আপ্যায়িত করিলেন। দেবী নিজ পুরীতে ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু এখনও অম্মবরুর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি শান্ত হয় নাই। পুনঃ দেবী বৃদ্ধাবেশে শিবপুরীতে গমন করিয়া স্বর্ণবিনিময়ে ফুল বিক্রয় করিতে লাগিলেন। দেবগিরিকে দেবী লক্ষ্মীভ্রষ্ট করিবেন স্থির করিলেন। শিবপূজারিগণ তাঁহার হীন মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার পুরীতে ফুলের জন্য গমন করিল। অম্মবরু তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। শত্রুর পরাজয় হইল।১

এই স্থলে একটা কথা বিশেষ ভাবে প্রণিধান-যোগ্য। দাক্ষিণাত্যের কোন সামাজিক আচার কিম্বা তদ্দেশীয় ভাষার কোন শব্দ বাংলার সমাজে কিম্বা বাংলা ভাষায় প্রচলিত থাকিতে দেখিলেই তাহা যে দাক্ষিণাত্য হইতেই পরবর্ত্তী কালে আনীত হইয়াছে এমন ধারণা করা সমীচীন নহে।

দাক্ষিণাত্য ও বাংলার সংস্কার

কারণ, দ্রাবিড় সংস্কার বাংলারও নিজস্ব প্রাচীনতম সংস্কার। বাংলা ভাষায় বহু দ্রাবিড় শব্দ প্রচলিত আছে, তাহা সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্য হইতে আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই এই দেশে প্রচলিত। কারণ, বাংলার সভ্যতাও দ্রাবিড় সভ্যতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। বিশেষতঃ সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্যের

১। The Village gods of South India, (H. Whitehead) Pg. 126—138.

লৌকিক সংস্কারগুলি এইদেশে প্রবর্ত্তনের যে খুব বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন এমন নহে। তাঁহারা দ্রাবিড় বংশজ হইলেও মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ্য সংস্কারেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সেনরাজদিগের সময় হইতেই বাংলার সমাজ আর্য্যসংস্কারে নূতন দীক্ষা লাভ করিয়াছিল। অতএব যাঁহারা মনে করেন, সেনরাজদিগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার লৌকিক দেবদেবীরাও দাক্ষিণাত্য হইতেই এই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদের মত সমর্থনযোগ্য নহে। উপরোক্ত অম্মবরুর গল্প হইতে নূতন কোনও তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। যেখানেই প্রাচীন লৌকিক ধর্ম্মের উপর এই ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইতে গিয়াছে সেখানেই এই লৌকিক ধর্ম্ম ও পৌরাণিক আর্য্য-ধর্ম্মের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। সংস্কৃত পুরাণেও

অম্মবরু ও মনসা

এই প্রকার আর্য্য ও অনার্য্য দেবতার বিরোধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অম্মবরুর গল্প গ্রাম্য দেবতা ও পৌরাণিক দেবতার কলহ লইয়াই রচিত। তাহার মধ্যে বেহুলা-লক্ষীন্দর-চাঁদ সদাগরের মত কোনও মানব-চরিত্রকে আনিয়া জড়িত করা হয় নাই। অতএব, বাংলার পদ্মাপুরাণের গল্পের উপর এই গল্পের প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব বর্ত্তমান আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

বিহারে প্রচলিত 'বিহুলা-বিষহরী'র গল্পের প্রকৃতি ও প্রাচীন বাংলা পদ্মাপুরাণের কবিদিগের নানাপ্রসঙ্গে বিহারের উল্লেখ ইত্যাদি হইতে এই গল্প যে বিহারেই সর্ব্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল এমন অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

তাহা হইলে এই কাহিনীর উদ্ভব-কাল কি এবং কবে কি ভাবেই বা তাহা বঙ্গদেশে আসিল? অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রথম প্রশ্নের

কাহিনীর উদ্ভব-কাল

উত্তর দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু পরবর্ত্তী প্রশ্নের উত্তর অনুমানেরও অতীত। এই সম্পর্কে ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অনুমান করেন, "কোন নবোদিত পূজা-

পদ্ধতি, দেবীর মাহাত্ম্যসূচক গল্প ইত্যাদি দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই পরে গীত রচয়িতাগণ অগ্রসর হইয়া দেবীর মাহাত্ম্যসূচক পালা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কাজেই দেবীর পূজার প্রথম প্রচার এবং তাহার মাহাত্ম্য বিস্তারের জন্য গীতের পালা রচয়িতাগণের আবির্ভাবের মধ্যে ১৫০।২০০ বৎসরের ব্যবধান থাকা সম্ভবপর। এই হিসাবে খৃষ্টের নবম দশম শতাব্দে মনসাদেবীর পূজা বাংলায় প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে।"[১] এই অনুমান যদি ঠিক হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, সেন রাজদিগের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই এই মনসা পূজা সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, পরে বিজয় সেনের সময় হইতে তাহা এক নূতন প্রেরণা লাভ করে।

প্রথম রচনা-কাল

অতএব নবম দশম শতাব্দীতে যদি মনসা পূজা সমাজে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে তবে অন্ততঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে দেবীর মাহাত্ম্য সূচক সংস্কৃত পৌরাণিক আখ্যানসমূহ রচিত হয় এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলা পদ্মাপুরাণের কাহিনী সর্ব্বপ্রথম গ্রথিত হয়।

পদ্মাপুরাণের প্রভাব

পদ্মাপুরাণের কাহিনী বাংলার সমাজে অতি অল্পকালের মধ্যে বিস্তৃত প্রচার লাভ করে। ক্রমে ইহার চরিত্রগুলির এতদূর প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হয় যে, কোন কোন স্বতন্ত্র বিষয়ক পরবর্ত্তী মঙ্গল কাব্যেও ইহাদের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য কোন মঙ্গল-কাব্যোক্ত চরিত্রের এই সৌভাগ্য হয় নাই। চণ্ডীমঙ্গলের কবি ধনপতির উপাখ্যান বর্ণনা-প্রসঙ্গে পিতৃশ্রাদ্ধে ধনপতির কুটুম্ব সমাগম উপলক্ষে চাঁদ সদাগরের উল্লেখ করিয়াছেন,—

"চম্পাই নগরের বেণে চাঁদ সদাগর।
সঙ্গে লক্ষ্মী সদাগর চাপিয়া কুঞ্জর॥"

---

১ 'মনসা দেবীর ইতিবৃত্ত'—প্রতিভা, চৈত্র, ১৩২৭ সন, পৃঃ ৪৮৭

তার পর সমাগত ষোলশত কুটুম্বের মধ্যে ধনপতি

"আগে জল দিল চাঁদ বেণের চরণে।"

এই চাঁদ সদাগরের ঐশ্বর্য্যের উল্লেখ করিয়া ধনপতি বলিতেছেন,

"ধনে জনে রূপে শীলে চাঁদ নহে বাঁকা।
বাহির মহলে যার সাত মরাই টাকা॥"

পদ্মাপুরাণের কাহিনীর আদি রচয়িতা কে, এই বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওযা যায় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কবি বিজয় গুপ্ত হরিদত্ত নামে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী একজন কবির নামোল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের মধ্যে প্রত্যেকেরই তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কবির নামোল্লেখ করিবার রীতি বর্ত্তমান ছিল। ইহাতে সেই সকল নামের সূত্র ধরিয়া প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধানেরও সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। হরি দত্ত সম্বন্ধে এ যাবৎ কাল উক্ত বিজয় গুপ্তের উল্লেখ ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই প্রায় জানা ছিল না। কিছুকাল যাবৎ অনুসন্ধানের ফলে হরি দত্ত রচিত পদ্মাপুরাণের অনেকগুলি নূতন পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং পদ্মাপুরাণের এই আদি কবি সম্বন্ধে অনেকটা স্পষ্ট ধারণায় আসিয়া পৌঁছান গিয়াছে।

পদ্মাপুরাণের আদি কবি হরি দত্ত

বিজয় গুপ্তের উল্লেখ হইতেই জানা যাইতেছে যে, হরি দত্ত খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী লোক ছিলেন। পদ্মাপুরাণ রচনা সম্বন্ধে বিজয় গুপ্তের যতটুকু জ্ঞান ছিল তাহাতে তাঁহার মতে হরি দত্তই এই জাতীয় কাব্যের আদি কবি,—

বিজয় গুপ্ত ও হরি দত্ত

প্রথমে রচিল গীত কাণা হরি দত্ত।—(স্বপ্নাধ্যায় পালা)

বিজয় গুপ্ত আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার সময়েই হরি দত্তের গীত লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল,

"হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে "—

ইহা হইতেই ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন যে, বিজয় গুপ্তের "সময়ে যে গীতি বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং কাণা হরি দত্ত মুসলমানকর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হরি দত্ত বিদ্যমান ছিলেন।"১ কিন্তু বিজয় গুপ্তের সময়ে হরি দত্তের গীত যে লুপ্ত হয় নাই তাহা হরি দত্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আলোচনা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অতএব হরি দত্তকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া ধরিয়া লইলেই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত হয়।

হরি দত্তের সময়

বিজয় গুপ্তের সমসাময়িক কালেও হরি দত্ত রচিত মনসার গীত যে বিশেষ প্রচলিত ছিল তাহা বিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক হরি দত্তের কাব্যের এই বিস্তৃত সমালোচনা হইতেও কতক আভাস পাওয়া যাইবে,—

হরি দত্তের গীতের প্রচলন

"হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥"—(স্বপ্নাধ্যায় পালা)

হরি দত্তের কবিতা যে "যোড়া গাঁথা-", মিত্রাক্ষর-" ও "কথার সঙ্গতি-" হীন অন্ততঃ এ যাবৎকাল আবিষ্কৃত হরি দত্তের পদগুলি পাঠ করিলে তাহা

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ১৭৪ (৬ষ্ঠ সংস্করণ)

মনে হয় না। হরি দত্তের রচনায় মনসার কাহিনী এইভাবে আরম্ভ হইয়াছিল,

"ওলা শুনি আন্তের কাহিনী।

মুই হেন সেবক শরণ লইলাম গো
ঘটে লামি লও ফুল পানি॥

হরি দত্তের পদ্মা-পুরাণের সূচনা

নেতা বলে বিষহরি এথা রহিয়া কিবা করি
মর্ত্ত্য ভুবনে চল যাই।

মর্ত্ত্য ভুবনে যাইয়া ছাগ মহিষ বলি খাইয়া
সেবকেরে বর দিতে চাই॥

নেতারে সঙ্গতি করি মাও লামে বিষহরি
হাসে পদ্মা রচনা দেখিয়া।

ছোট ধান্তের সরা উপরে বিচিত্র ঝড়া
সেনা ঘটে চন্দন দিয়া॥

ধূপ ধরে কেহ স্তব পঠে রে
ঘৃতের প্রদীপ সুললিত।

বিষাণের বাগু মনসা হরিষে রে
সমুখে গায়েন গায় গীত॥

চারি চতুর্ব্বেদ নিশি জাগরণ করে
পূজা হইলে ছাগ বলিদান।

কবি কহে হরি দত্ত যে জানে পরম তত্ত্ব
মনসা দেখিল বিগুমান॥"[১]

১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন পুঁথি সংখ্যা ১০৯১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন পুঁথিশালায় রক্ষিত আটখানি এই বিষয়ক পুঁথির মধ্যে ছয় খানির মধ্যেই হরি দত্তের ভণিতাতেই এই পদটি পাওয়া যায়; অপেক্ষাকৃত দুইখানি আধুনিক পুঁথিতে ইহা বিজয় গুপ্তের ভণিতাযুক্ত; মুদ্রিত পুস্তকে ইহা বিজয় গুপ্তেরই ভণিতাযুক্ত। অধিক সংখ্যক এবং প্রাচীনতম পুঁথিগুলিতে ইহা হরি দত্তের ভণিতাযুক্ত বলিয়া পদটি হরি দত্তের বলিয়া নিঃসংশয়ে

শিবের ঔরসে মনসা পাতালে নাগলোকে গিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে মনসা নিজের প্রকৃত রূপ পরিগ্রহ করিয়া পিতৃসকাশে আগমন করিলেন। সেই সময় দেবী বিবিধ সর্পে তাঁহার অঙ্গাভরণ ধারণ করেন। হরি দত্ত রচিত দেবীর এই সর্পসজ্জার পদটি প্রকৃত কবিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক,—

হরি দত্তের কবিত্ব

"বিচিত্র নাগে করে দেবী গলায় সুতলি।
শ্বেত নাগে করে দেবী বুকের কাচুলি॥
অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।
বেত নাগে করে দেবী কাকালি কাছুনি॥
সোনা নাগে দেবী করিলা চাকী বলি।
মকর নাগে করে দেবী পায়ের পাসুলি॥
কর্কটনাগে পদ্মার গলার হার।
অঙ্গুরি হইল তবে নাগ ব্রহ্মজাল॥
দুই হস্তের শঙ্খ হইল গরল শঙ্খিনী।
মণিময় নাগ শোভে সুন্দর কিঙ্কিনী॥
সখিশুয়া নাগে করিল হাতের তাড়।
কজ্জলিয়া নাগে কজ্জল শোভে ভাল॥
নীল নাগে দেবী বান্ধিল কেশ পাশ।
অঞ্জনিয়া নাগে করে অঞ্জন বিলাস॥
বাসকি তক্ষক দুই মুকুট উজ্জ্বল।
এলাপত্র নাগে করিল তোড়ল মল॥

প্রমাণিত হয়। এই প্রকার হরি দত্তের বহু পদ বিজয় গুপ্তের নামে প্রচলিত আছে। তাহাতেও বিজয় গুপ্তের সমসাময়িক কালে হরি দত্তের পদের বিশেষ প্রচলন ছিল, এমনই মনে হয়।

হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের থোপনা।
সর্ব্বাঙ্গ হইতে বাহির হয় যার অগ্নি কণা কণা॥
অমৃত নঞান এড়ি দেবী বিষ নঞানে চায়।
চন্দ্র সূর্য্য গিয়া তবে আভেতে লুকায়॥
দর্পণ হাতে করি দেবী বেশ বানায়।
মনসার চরণে লাচারি হরিদত্তে গায়॥১

বিজয়গুপ্ত হরিদত্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

'মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।'—(স্বপ্নাধ্যায় পালা)

উল্লিখিত পদ যে কোন মূর্খের রচনা হইতে পারে না এই বিষয়ে নিশ্চিত। অতএব বিজয় গুপ্তের এই উক্তি হইতেই হরি দত্তের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই।

হরি দত্তের পরিচয় ও প্রচার

ময়মনসিংহ জিলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে হরি দত্তের সমস্ত পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে ময়মনসিংহের অধিবাসী বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু তাঁহার আত্ম-পরিচায়ক কোন পদ পাওয়া যায় নাই বলিয়া এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। হরি দত্তের কবিত্ব-খ্যাতি বরিশাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এমন কি বরিশালের শ্রেষ্ঠ কবি বিজয় গুপ্তের আবির্ভাবের পরেও হরি দত্তের গীত সেই অঞ্চলে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। পুরুষোত্তম নামক একজন গায়েন বিজয় গুপ্তের পরবর্ত্তী কালেও হরি দত্তের গীতই যে গান করিতেন এই ভাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন,—

১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন পুঁথি সংখ্যা, কে ২৩৪, পত্রাঙ্ক ১১৩ খ। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য" (৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ১৭৪) হরি দত্তের সর্প সজ্জার যে পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ইহা হইতে অল্প-বিস্তর পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

"কাণা হরি দত্ত হরির কিঙ্কর
মনসা হউক সহায়।
তার অনুবন্ধ নাচারির ছন্দ
কবি পুরুষোত্তমে গায়।"

হরিদত্তের গীত ময়মনসিংহ ও কতক বরিশাল অঞ্চল হইতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ময়মনসিংহে স্থানীয় কোন কবি ব্যতীত অন্য কোন কবির এমন কি বিজয় গুপ্তেরও পদ্মাপুরাণ আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু ময়মনসিংহের কবিদিগের খ্যাতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণেও হরি দত্তকে ময়মনসিংহের অধিবাসী বলিয়াই অনুমিত হয়।

হরি দত্তের পদের পরিণতি

বরিশাল অঞ্চলে হরি দত্তের প্রচলিত পদগুলি ক্রমে বিজয় গুপ্ত, পুরুষোত্তম প্রভৃতি কবিগণ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি প্রাচীন কোন কোন পুঁথির কোন কোন পদে হরি দত্তের নামও আজিও রক্ষিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ আধুনিক পুঁথিগুলিতে হরি দত্তের ভণিতা পরিত্যক্ত হইয়া তৎস্থলে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও প্রচলিত কবিগণের নামই সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।[১]

ময়মনসিংহ অঞ্চলেও হরি দত্তের পদের অনুরূপ পরিণতিই ঘটিয়াছিল। দ্বিজ বংশীদাস, দ্বিজ জগন্নাথ, চন্দ্রপতি প্রভৃতি পরবর্ত্তী কবি ও গায়েনগণ

১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালার গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা সমিতিতে "হরি দত্তের মনসা-মঙ্গল" নাম দিয়া এই বিষয়ে একটি উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি আজিও অপ্রকাশিত। হরি দত্তের সম্পর্কে এই অংশ রচনায় আমি তাঁহার প্রবন্ধ হইতে সাহায্য পাইয়াছি।

হরি দত্তের অনেক পদের মধ্যে নিজেদের ভণিতা ব্যবহার করিয়া ক্রমে সাধারণ্যে তাঁহার নাম লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। অনেক সময় কবিরাই যে ইচ্ছাপূর্ব্বক এমন করিতেন তাহা নহে, পুঁথির পরবর্ত্তী অনুলিপিকার ও আসরের গায়েনগণ পদমধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও প্রচলিত কোন কবির ভণিতা সংযোগ করিয়া অপ্রচলিত প্রাচীন ও প্রকৃত কবির নাম লোপ করিয়া দিত। অনেক ক্ষেত্রে হরি দত্তেরও তাহাই হইয়াছে।

নারায়ণ দেব

পদ্মাপুরাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির নাম নারায়ণ দেব। তাঁহার গ্রন্থ সমগ্র বাংলা ও আসামে প্রচার লাভ করিয়াছিল। বাংলার আর কোন পদ্মাপুরাণের কবির এই সৌভাগ্য হয় নাই। তিনি তাঁহার কাব্যে এই প্রকার আত্মপরিচয় দিয়াছেন,

নারায়ণ দেবে কয় জন্ম মগধ।[১]
মিশ্র পণ্ডিত নহে ভট্ট বিশারদ॥
অতি শুদ্ধ জন্ম মোর কায়েস্থের ঘর।
মৌদ্‌গোল্য গোত্র মোর গাঁই গুণাকর॥
পিতামহ উদ্ধব নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥
পূর্ব্ব পুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি।
রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোরগ্রামে বসতি॥

১ জন্ম মগধ শব্দের অর্থ জন্ম স্থান মগধ নহে, জন্মমূর্খ। কবি নিজেকে মূর্খ বলিয়া বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন। এই শব্দটি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা এক কালে এই কবির প্রকৃত জন্মস্থান সম্বন্ধে এক মহা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। কেহ তাঁহাকে মগধ বা বিহারের আদি বাসিন্দা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেহ বা এই মগধের সহিত শ্রীহট্টের অন্তর্গত মাগধী পর্ব্বত ও তন্নামীয় আনুমানিক একটা দেশের সম্পর্ক কল্পনা করিয়া কবিকে আসাম অঞ্চলে লইয়া গিয়াছেন।

এই বোরগ্রাম যে বঙ্গদেশেরই অন্তর্গত এবং বঙ্গদেশই যে কবির জন্মভূমি তাহা নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের কোন কোন পুঁথিতে প্রাপ্ত নিম্নোদ্ধৃত পদটি হইতেই জানিতে পারা যায়,—

বাঙ্গালী কবি

"নারায়ণ দেবের জন্ম হইল বঙ্গদেশ।
নরসিংহ দেব পুত্র বিজ্ঞতা বিশেষ॥
কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিদ্যা বিশারদ।
সুকবি বল্লভ খ্যাতি সর্ব্বগুণ যুত॥"

—(চারু প্রেস সংস্করণ, পৃঃ ১)

ইহা হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, নারায়ণ দেবেরই উপাধি ছিল সুকবি বল্লভ।১ তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ রাঢ় দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। পশ্চিম বঙ্গে মুসলমান অধিকারের সময় বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবার পূর্ব্ব বঙ্গে চলিয়া আসেন। নারায়ণ দেবের পূর্ব্বপুরুষও তাহাদের অন্যতম।

নারায়ণ দেবের জন্মস্থান বোরগ্রাম ময়মনসিংহ জিলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন তাড়াইল থানার অন্তর্গত নসিরুজিয়াল পরগণায় অবস্থিত। সেই গ্রামে 'নারায়ণের ভিটা' বলিয়া একটা স্থান এখনও নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, তাঁহার বংশধরগণ এখনও সেখানে বসবাস করিতেছেন। তাঁহারা নারায়ণ দেব হইতে বর্ত্তমানে অষ্টাদশ পুরুষ। নারায়ণ দেবের বংশধরদিগের গৃহে রক্ষিত

সুকবি বল্লভ উপাধি

১ কেহ কেহ সুকবি বল্লভকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা সমীচীন নহে।

বংশ-লতিকার একটি অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।* ইহার সাহায্যে কবির সময় সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইতে পারে,—
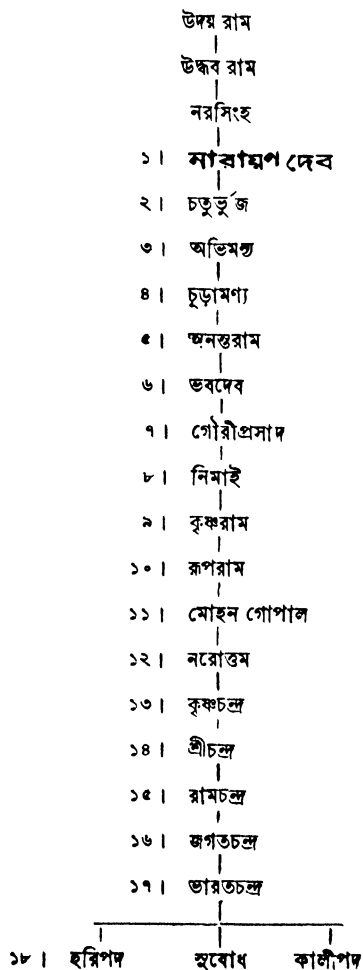
চারি পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া লইলে নারায়ণ দেব আনুমানিক সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। নারায়ণ দেব পদ্মাপুরাণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিজয় গুপ্তের সামান্য কিছু অগ্রবর্ত্তী।

কেহ অনুমান করেন, নারায়ণদেব চৈতন্যের পরবর্ত্তী। ইহার কারণ এই যে, আসামে নারায়ণদেবের যে পদ্মাপুরাণ প্রচলিত আছে তাহাতে চৈতন্যদেবের একটি বন্দনা দেখিতে পাওয়া যায়। আসামে চৈতন্যের ধর্ম্ম অপেক্ষা মধ্যযুগের আসামী বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শঙ্করদেবের ধর্ম্মই অধিক প্রচলিত। অতএব চৈতন্য বন্দনা পরবর্ত্তী কালে আসামে গিয়া প্রক্ষিপ্ত হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। ইহা নারায়ণ দেবের মৌলিক রচনা

নারায়ণ কি চৈতন্যের পরবর্ত্তী?

কিন্তু একটা কথা এই যে, আসামে চৈতন্য ধর্ম্মের যদি কোন প্রভাবই না থাকিত তাহা হইলে আসামবাসিগণ স্বচ্ছন্দে নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ হইতে চৈতন্য-বন্দনার অংশটি পরিত্যাগ করিতে পারিত। আসামে শ্রীচৈতন্যের কোন প্রভাব নাই এই কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। আসামী প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চৈতন্য তীর্থ-ভ্রমণ ব্যপদেশে কামরূপের অন্তর্গত হাজো নামক স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, এমন একটা মতবাদ আসামবাসিদের মধ্যে বর্ত্তমান আছে।[১] বিশেষতঃ যে শ্রীহট্ট জিলার উপর দিয়া নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ আসামে প্রচলিত হইয়াছিল তাহা বিশেষ ভাবেই চৈতন্যের ধর্ম্মদ্বারা প্রভাবিত। অতএব এই চৈতন্যবন্দনা পরবর্ত্তী কালে আসামে গিয়া প্রক্ষিপ্ত হওয়াও কিছুই আশ্চর্য্য নহে। বিশেষতঃ নারায়ণদেবের আসামী সংস্করণেও উক্ত চৈতন্যবন্দনা ব্যতীত চৈতন্য ধর্ম্মের আর কোন প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় না।

১ 'আসামে শ্রীচৈতন্য'—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২২ সাল, পৃঃ ২৪১

চৈতন্যকে বন্দনা করিবার মত চৈতন্য-ভক্তি যদি নারায়ণ দেবের থাকিত তাহা হইলে তাঁহার কাব্যে চৈতন্যের প্রভাব আরও কিছু সংক্রামিত হইত। তদুপরি চৈতন্যধর্ম্ম-প্রভাবিত বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত নারায়ণদেবের কোন না কোন পুঁথিতে এই চৈতন্য বন্দনার পদটি রক্ষিত হইত। অতএব মনে হয়, আসামী পদ্মাপুরাণের ঐ চৈতন্য-বন্দনার পদটি পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

কবির উপর আসামের দাবী

আসামে নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের বহুল প্রচারের জন্য আসামের অধিবাসিগণ তাঁহাকে নিজেদের প্রদেশবাসী বলিয়াই দাবী উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীরাও এই কবির উপর নিজেদের দাবী ত্যাগ করে নাই। এই উপলক্ষে উভয় পক্ষে কিছুকাল খুব বাদানুবাদ চলিয়াছিল।[১] কিন্তু নারায়ণদেবের জন্মভূমি বোরগ্রাম ময়মনসিংহ জিলারই অন্তর্গত। আসাম বাসিগণের দাবী এই যে, পূর্ব্বে তাহা শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাত্র ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জিলা সৃষ্টি হওয়ার পর[১] তাহা ময়মনসিংহ জিলার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। অতঃপর শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ দুই জেলা বিভিন্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাওয়াতেই প্রাদেশিক অভিমানের ফলে এই অনাবশ্যক বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য একটা কথা এই স্থলে স্বীকার্য্য যে, বোরগ্রামের সহিত শ্রীহট্টের যোগ যত নিবিড়

---

১ 'নারায়ণদেব ও পদ্মাপুরাণ'—রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮ ২য় সংখ্যা। (৺ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

'নারায়ণদেব ও পদ্মাপুরাণ' ঐ ১৩১৯ ২য় সংখ্যা (বিরজাকান্ত ঘোষ)

ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৭২ (পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ)

'মনসা-মঙ্গল'—আর্য্যাবর্ত্ত, ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ (দীনেশচন্দ্র সেন)

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি)

১ 'ময়মনসিংহের বিবরণ' - ৺কেদার নাথ মজুমদার

ময়মনসিংহের তত নহে। ইহা ময়মনসিংহ জিলার একান্তে অবস্থিত এবং বিস্তৃত হাওর বা জলাভূমি দ্বারা ময়মনসিংহের কেন্দ্রীয় যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহার সহিত বাংলার রাজনৈতিক যোগ থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে ভৌগোলিক যোগ শ্রীহট্টেরই। সেইজন্যই নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ আসামেই সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিল। কথিত আছে যে, নারায়ণদেব আসামের কোচবংশীয় দরঙ্গরাজ সভায় থাকিয়া নিজের বাংলা পদ্মাপুরাণখানি অসমীয়াতে অনুবাদ করেন। কিন্তু দরঙ্গরাজগণ আসামে সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। নারায়ণদেব তাহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন সমালোচক নারায়ণদেবকে এই দরঙ্গ রাজসভায় আনিয়া উপস্থিত করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার বংশ-লতিকাটিকে একেবারেই অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন।১

কেহ মনে করেন, নারায়ণদেবই পদ্মাপুরাণের আদি রচয়িতা।২ হরি দত্তকে তাঁহারা সাধারণ গায়েন বলিতে চাহেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে পারা না গেলেও ইহা সত্য যে, নারায়ণদেব অন্ততঃ কোন পূর্ব্ববর্ত্তী পদ্মাপুরাণের লেখককে আদর্শ করিয়া লইয়া তাঁহার কাব্য রচনা করেন নাই। অন্যান্য পরবর্ত্তী কবিগণ যেমন কোন পূর্ব্ববর্ত্তী কবিকে আদর্শ করিয়া কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, নারায়ণদেবের পক্ষে তেমন সুযোগ ছিল না। হরিদত্তের কাব্যও তাঁহার অগোচর ছিল। নারায়ণদেবের আদর্শ ছিল কয়েক খানি সংস্কৃত পুরাণ। এই সম্বন্ধে তাঁহার কাব্য মধ্যে এই প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

পদ্মাপুরাণের আদি-রচয়িতা

১ 'নারায়ণদেবের বংশতত্ত্ব'—রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২২ সাল, নবম ভাগ,—পৃঃ ১০৯

২ 'দ্বিজবংশীদাসের পদ্মাপুরাণ,'—শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামনাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, সম্পাদকীয় মন্তব্য,—পৃঃ ২

"ষোল প্রকরণে আছিলেক পদ্মপুরাণ।
পয়ার করিয়া কবি করিলা বাখান॥"[১]

ইহাতে অনুমিত হয়, সংস্কৃত পদ্মাপুরাণ হইতে কাহিনী-সূত্র অবলম্বন করিয়া নারায়ণদেব সর্ব্বপ্রথম বাংলা পয়ার ছন্দে পদ্মাপুরাণ বা মনসা-মঙ্গল রচনা করেন। কিন্তু সংস্কৃত পদ্মাপুরাণে মনসার একটি ক্ষুদ্র স্তব ব্যতীত মনসার কাহিনীর আর কোন উল্লেখ নাই। তাহাতেই উক্ত কবিতাংশের অর্থ খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না।

উক্ত পদদ্বয়ের সমর্থক আর একটি পদ একটি প্রাচীন হস্তলিখিত পদ্মাপুরাণ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা এই প্রকার,—

"পদ্মাপুরাণের কথা শ্লোক করা আছে।
নারায়ণদেব তাকে পাঁচালী রচিছে॥"[২]

ইহা হইতেও মনে হইতেছে যে, নারায়ণদেব বর্ণিত পদ্মাপুরাণের সমগ্র কাহিনী পূর্ব্বে সংস্কৃতেই রচিত হইয়াছিল, নারায়ণদেব তাহা বাংলা পাঁচালীতে রূপান্তরিত করিয়াছেন মাত্র। মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের মধ্যে তাহাদের প্রত্যেকের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লইবার একটা রীতি ছিল। নারায়ণ দেবের পুঁথিতে তেমন কাহারও উল্লেখ নাই, পরন্তু তাঁহার নিম্নলিখিত পদ হইতেও ইহাই মনে হয় যে, তাঁহার সম্মুখে আর কোন আদর্শ ছিল না,—

"চৌদ্দ যে বৎসর কালে দেখিল স্বপন।
কবিত্বের আশা মোর সেহি সে কারণ॥
সেই দিন হইতে মোর কবিত্বের আশা।
আর কতদিন স্বপ্ন দেখাই না মনসা॥

---

১ চারুপ্রেস সংস্করণ, নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ।

২ 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১০ম ভাগ।

কতদিন মনসা যে স্বপ্ন কইলা মোরে।
পন্থ বন্ধে পদ যে পুরাণ রচিবারে॥"

তাহা হইলে মনসার উপাখ্যান সম্বলিত এই সংস্কৃত পুঁথিটি কি? পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ইত্যাদিতেও মনসার সমগ্র কাহিনী বিশেষতঃ চাঁদসদাগরের কাহিনীর উল্লেখ মাত্রও নাই। তবে উক্ত কবিতাংশগুলিতে কোন্ সংস্কৃত পুরাণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে?

নারায়ণের আদর্শ

কেহ অনুমান করেন, উল্লিখিত পদগুলি দ্বারা কোন অধুনা-লুপ্ত স্থানীয় সংস্কৃত পুরাণকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকিবে।[১] কিম্বা ইহাও হইতে পারে যে, নারায়ণদেব তাঁহার পদ্মাপুরাণের পৌরাণিক অংশ রচনায় উক্ত সংস্কৃত পুরাণগুলির উপর নির্ভর করিয়া লইয়াছিলেন, লৌকিক অংশ বা চাঁদসদাগরের কাহিনী হয়ত প্রচলিত ছড়া পাঁচালী বা পল্লীগাথা (ballad songs)র উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছে। তবে ইহা একপ্রকার অবিসম্বাদিতরূপে সত্য যে, তাঁহার সম্মুখে আর কোন বাংলা পদ্মাপুরাণ আদর্শ ছিল না।

মঙ্গলকাব্যের মুল নীতি অনুবর্ত্তন করিয়া নারায়ণদেবও তাহার কাব্য প্রেরণার মুলে দেবতার স্বপ্নাদেশ কল্পনা করিয়াছেন,

"বারয় বৎসর কালে দেখিলাম স্বপন।
মহা পরিশ্রম মনে হৈল দরশন॥
শিশুকালে গোপরূপে হাতে লৈয়া বাঁশী।
আলিঙ্গন দেন মোকে বড় সুখে হাসি॥
তদ্‌পরে পদ্মা মোরে দেখাইলা স্বপন।
কবিত্বের আশা আমার সে হিত কারণ॥

---

১ পদ্মাপুরাণ ও তাহার লেখকগণ (৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)—রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২২ সাল, পৃঃ ৫১।

গুণীর সাক্ষাতে আমি কি বলিব বাণী।
কোকিল সাক্ষাতে যেমন কাকে করে ধ্বনি॥
মুনি মুখে শুনিয়াছি সৃষ্টির পত্তন।
পদ্মাপুরাণ কথা শুন জ্ঞানিজন॥"১

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ তিনখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে কবির আত্মপরিচয় ও দেবতার বন্দনা ইত্যাদি, দ্বিতীয় খণ্ডে পৌরাণিক আখ্যান সমূহ, তৃতীয় খণ্ডে চাঁদসদাগরের গল্প। তৃতীয় খণ্ড অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত, দ্বিতীয় খণ্ডের পৌরাণিক আখ্যানই প্রকৃতপক্ষে নারায়ণদেবের কাব্যে প্রধান অংশ। ইহাতে আদিদেব নিরঞ্জন ও আদ্যাশক্তি কেতকী হইতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, তাহাতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের জন্ম, মধুকৈটভবধ, পৃথিবীর জন্ম, জীব-জন্ম, নাগগণের জন্ম, কদ্রু-বিনতার গল্প, অমৃত হরণ, দক্ষপ্রজাপতির গল্প, সতীর জন্ম, বিবাহ, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, মহাদেবের তপস্যা, উমার জন্ম, মদন-ভস্ম, উমার তপস্যা, মহাদেবের উমাকে ছলনা, শিবের বিবাহ, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম, তারকাসুর বধ, জনমেজয়ের সর্পসত্র, আস্তীকের জন্ম, সমুদ্র মন্থন, মহাদেবের বিষপান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহাকে পৌরাণিক কাহিনীর একটি বিশাল ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে।

রচনা-পরিচয়

তৃতীয় খণ্ডই প্রকৃত পদ্মাপুরাণের গল্প। তাহাতে শিবের পদ্মবনে গমন, চণ্ডীর ছলনা, নেতা ও পদ্মার জন্ম, চণ্ডী ও পদ্মার বিবাদ, পদ্মা ও নেতার বিবাহ, পদ্মার পূজা প্রচারের চেষ্টা, গোয়ালাগণের মনসা-পূজা, হুসেনের মনসা-পূজা, ঝালোমালোর পদ্মাপূজা, চাঁদসদাগরের জন্ম, বিবাহ, ছয় পুত্রের জন্ম, বিবাহ, ঝালোমালোর নিকট মনসার মাহাত্ম্য শুনিয়া সনকার মনসা-পূজার আয়োজন, চাঁদের বাধা প্রদান, মনসার ক্রোধ,

১ চারুপ্রেস (ময়মনসিংহ) প্রকাশিত নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ১

ছয়পুত্র বিনাশ, চৌদ্দডিঙ্গাডুবি, লখাইর জন্ম, বিবাহ, লৌহবাসরে সর্পাঘাতে মৃত্যু, ভাসান, বেহুলার দেবপুরে নৃত্যপ্রদর্শন, স্বামীর পুনর্জীবন লাভ, ডুমনীর বেশে পিত্রালয়ে ও পরে শ্বশুরালয়ে গমন, চাঁদের বাম হস্তে মনসা-পূজা, বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের শাপবিমুক্তি, স্বর্গারোহণ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

নারায়ণদেবের কাব্যের প্রকৃত নাম মনসার পাঁচালী,—

"নারায়ণদেবে কয় মনসার পাঁচালী।"

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মঙ্গল-কাব্যের প্রাচীনতম নামই পাঁচালী। নারায়ণদেবের রচনায় স্বভাব-স্ফূর্ত্ত সরস কবিত্বের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই তাহাতে পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও দুর্লভ নহে। তাঁহার রচিত বিষয়-বস্তু হইতেই লক্ষ্য করা যাইবে যে, সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যে তাঁহার অপরিসীম পাণ্ডিত্য ছিল, কিন্তু এই পাণ্ডিত্য তাহার অনুভূতি-সজাগ কবি-হৃদয়ের উপর দুর্ভার বোঝা হইয়া পড়ে নাই; সহজ কবিত্বের স্রোতে তাহার অন্তর-সঞ্চিত জ্ঞানোপল রাশি স্বচ্ছন্দ-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে শিবের কটূক্তি শ্রবণ করিয়া কুপিতা উমা বলিতেছেন,

পাণ্ডিত্য

"না বোল না বোল দ্বিজ হেন কুবচন।
মহাজন নিন্দার এথা নাহিক প্রয়োজন॥
নিরঞ্জন অব্যয় নির্গুণ ভগবান।
যাহার স্মরণ মাত্র হয় পরিত্রাণ॥
চারি বেদ কণ্ঠে যিনি সর্ব্ববেদময়।
যাহার মুখের অগ্নি সংসার প্রলয়॥
প্রলয়ের কালে শিব আপনি যোগ বলে।
বটপত্রে শয়ন করি ভাসিলেক জলে॥

সৃষ্টির কারণে শিব আপনি একাকী।
তাহা হৈতে সৃষ্টি কৈলা সকল প্রকৃতি ॥
কীট পতঙ্গ আদি যত সব শিবময়।
নিশ্চয় জানিও দ্বিজ নাহিক সংশয় ॥"

ইহার সহিত কালিদাস-রচিত কুমার সম্ভবের পঞ্চম সর্গের কোন কোন অংশের তুলনা করা যাইতে পারে।

পদ্মাপুরাণ কাব্য করুণ রসের আকর। এই করুণ রসের স্বাভাবিক বর্ণনায় নারায়ণদেবের সমকক্ষ বড় কেহ নাই। কিন্তু নারায়ণদেবের কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে এক অতি অপূর্ব্ব করুণ ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে। ইহার পরিকল্পনাও যেমন কবিত্বপূর্ণ ইহার রচনায়ও নারায়ণদেব তেমনই পরিপূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। স্বামীর জীবন লইয়া প্রত্যাগতা বেহুলা মাতা সুমিত্রার নিকট মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র দেখা দিলেন; তারপর একখানি পত্রে আত্মপরিচয় লিখিয়া রাখিয়া স্বামীর সঙ্গে স্বর্গারোহণ করিলেন। এই দীর্ঘ ও আশঙ্কা-সঙ্কুল বিরহের অবসানে সন্তানকে ফিরিয়া পাইয়া সুমিত্রার মাতৃ-হৃদয়ের রুদ্ধ স্নেহ সহসা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু স্নেহের কন্যাকে নিজের বাহু-বন্ধনে আর ধরিতে পারিলেন না। যেদিন বেহুলা সর্ব্বপ্রথম গাঙ্গুরের ভাসানে মৃতের সহযাত্রিণী হইয়াছে সেই দিন হইতেই সে চিরতরে জীবিতের সমাজের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; সেইদিন তাহারও সহমরণ হইয়াছে। অতএব তাহার প্রত্যাবর্ত্তন একটা রূপকের মত। কবি নারায়ণদেব ইহাই কল্পনা করিয়া প্রত্যাগতা বেহুলাকে মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র সমাজের কল্পনা-চক্ষুর সম্মুখীন করিয়া পুনরায় স্বর্গলোকে নিরুদ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহা কি আদর্শবাদী সমাজের আদর্শ সতী-চরিত্র কল্পনার ফল? বেহুলার প্রত্যাবর্ত্তনের কল্পনা কি

কবিত্ব

নারায়ণের আদর্শবাদ

স্নেহময়ী সুমিত্রার সন্তান স্নেহাতুর জননী-হৃদয়ের অলীক সুখস্বপ্নের ছায়া? পদ্মাপুরাণের কবি তাঁহার পাঠকের নিকট এই জিজ্ঞাসা রাখিয়া গিয়াছেন।

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণকে কেহ অশ্লীলতার দোষে দোষী করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নারায়ণদেবের আদর্শ ছিল সংস্কৃত পুরাণ। সেই যুগে সংস্কৃত পুরাণগুলির নৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত দূষিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ শৈব পুরাণগুলি এই বিষয়ে আরও একটুকু অগ্রসর ছিল। অতএব এই আদর্শের প্রভাব বাঙ্গালী কবির পক্ষেও অনেক স্থলেই অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আর শুধু নারায়ণ দেবকেই এই বিষয়ে দায়ী করিলে চলিবে না। প্রকৃত পক্ষে বাংলার মধ্যযুগের সমগ্র মঙ্গলকাব্যই এই দোষে দোষী; কারণ, ইহাদের প্রত্যেকেরই প্রেরণা এই নীতি ও রুচির বন্ধনহীন সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্য হইতেই আসিয়াছিল।

অশ্লীলতা

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মনসা-মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে নারায়ণদেবের কাব্যই সমধিক প্রচারের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। সেইজন্য পরবর্ত্তী সমস্ত মনসা-মঙ্গলের কবি ও গায়েন নারায়ণদেবকেই আদর্শ করিয়া তাঁহারই পদ কিম্বা পদাংশের উপর নূতন পদ রচনা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ভণিতাগুলি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়,—

নারায়ণের প্রচার

১ "মিলি যদুনাথ সনে কহে দেব নারায়ণে
শৃগালীর বাঁকেতে গমন।"—

২ "কবি নারায়ণ রচে সরস পয়ার।
ভট্ট অনুপেতে কহে লাচারীর সার॥"—

সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম বঙ্গের কবি ক্ষেমানন্দ তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনার প্রারম্ভে বাণী-বন্দনায় ব্যাস-বাল্মীকির সঙ্গে নারায়ণদেবেরও সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন,—

"ব্যাস বাল্মীকি মুনি নারায়ণ তত্ত্ব জানি
তোমাকে সেবিয়া হৈল কবি।"

ক্ষেমানন্দের নিম্নলিখিত পদ-ভাগেও হয়ত নারায়ণদেবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে,—

দেব নারায়ণ যথা আছ গো ভারতী মাতা
ত্যজি দেবী বৈকুণ্ঠ নগর।
অবোধ বালকে ডাকে দেহ পদছায়া তাকে
বৈস মোর কণ্ঠের উপর॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর বগুড়ার কবি জীবন মৈত্রের রচনার কোন কোন অংশের "সহিত নারায়ণ দেবের রচনার যেন এক দূর সাদৃশ্য আছে বলিয়া অনুমিত হয়।" ১

নারায়ণদেবের স্বদেশবাসী পরবর্ত্তী কবি দ্বিজ বংশীদাসের রচনা যে বহুলাংশে নারায়ণদেব দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। এই সম্পর্কে কেহ উল্লেখ করিয়াছেন, ২ "তিনি (বংশীদাস) নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের উপাখ্যান রূপকচ্ছলে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি পরধর্ম্মের অত্যাচার প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত করিয়া তাঁহার পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার উপাখ্যানে চণ্ডী হিন্দুধর্ম্মের এবং পদ্মা পরধর্ম্মের স্থানীয়া হইয়াছেন, তাঁহার চন্দ্রধর হিন্দুজাতির, সর্পগণ পরজাতির স্থান গ্রহণ করিয়াছে।"

---

১ কবি জীবন মৈত্র—রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (মোহিনীমোহন মৈত্রেয়) ৪র্থ ভাগ, ১৩১৬ সাল, পৃঃ ১৯৩।

২ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ—শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামকান্ত চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, সম্পাদকীয় মন্তব্য পৃঃ।০

বর্ত্তমানে বঙ্গদেশ অপেক্ষা আসামেই নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ সমধিক প্রচলিত আছে। ইহার কারণ, নারায়ণদেবই প্রকৃতপক্ষে আসামে প্রচারিত একমাত্র পদ্মাপুরাণের কবি। আসামবাসিগণ এই কবিকে নিজেদের প্রদেশবাসী জ্ঞানেই শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। আসামে গিয়া কালক্রমে নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন বাংলা পদগুলি আসামে গিয়া কি ভাবে পাঠান্তরিত হইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত পদটির বাংলা ও আসামী পাঠ তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—

আসামে নারায়ণদেব

বাঙ্গালা

ওঠ ওঠ ওহে প্রিয়া কত নিদ্রা যাও।
কাল নাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও॥
তুমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতিতলে।
অকারণে রাঁড়ি হৈলা খণ্ড ব্রত ফলে॥
কত খণ্ড তপ তুমি কৈলা গুরুতর।
সে কারণে তোমা ছাড়ি যায় লক্ষীন্দর॥
মাও সোনকা মোর মৃত্যু কথা শুনি।
অগ্নিকুণ্ড করি মায়ে ত্যজিব পরাণি॥
আমার মরণে মায়ে বড় পাবে তাপ।
পুত্র শোকে মাও মোর সাগরে দিবে ঝাঁপ॥
আমার মরণে মাও হইবে পাগল।
মাগনি হইয়া মায়ে বেড়াবে সহর॥
ছয় পুত্র পাশরিল আমাকে দেখিয়া।
কেমনে ধরিবে দুঃখ মা ঘরে রৈয়া॥

খেয়াতি রাখিল মায়ে সংসার জুড়িয়া।
মায়ে পুত্রে মরিবেক চিতায় পুড়িয়া॥
চিতা সাজাইবে নিয়া গুঙ্গড়ীর তীরে।
আমাসঙ্গে প্রবেশিবে অগ্নির মাঝারে॥
সুকবি নারায়ণদেবের সরস পাঁচালী।
পয়ার ছাড়িয়া এক বলিব লাচাড়ী॥

আসামী

উঠা উঠা প্রাণেশ্বৰী কত নিদ্রা যাস।
মোক খাইল কাল নাগে চক্ষু মেলি চাস্॥
তোৰ সম অভাগী নাহিকে ক্ষিতি তলে।
অকালত বাঁৰী ভৈলী খণ্ড ব্ৰতৰ ফলে॥
কতো জন্মে খণ্ড ব্ৰত কৈলি বহুতৰ।
সেহি দোষে তোক এৰি যাওঁ লখিন্দৰ॥
মাও সনেকা মোৰ মৰণ শুনিলে।
অগণি জালিয়া মাও গাওৰ অঞ্চলে॥
আমাৰ মৰণে মাও মৰিব পুৰিয়া।
খ্যাতি রাখিবো মায়ে সংসাৰ জুড়িয়া॥
বিষৰ জালত লখাই বিনায়ে বচন।
কাল নিদ্রা হৈলা বেহুলাৰ নাহিক চেতন॥
কায়া আঙ্গুলিৰ বিষে ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰ পাইলা।
বেহুলা বেহুলা লখাই ডাকিতে লাগিলা॥
সুকবি নাৰায়ণ দেওর সরস পাঞ্চালী।
লখাইৰ কৰুণা বুলি এক যে লেচাৰী॥

এই উদ্ধৃত উভয় অংশ যে একই কবির অভিন্ন রচনা কালক্রমে দেশান্তর ভেদে কেবল সামান্য রূপান্তরিত হইয়াছে এই বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। ১

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে, বাংলার প্রাচীন কবিগণের নামে বহু কৃত্রিম রচনা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। যে কবি যত প্রাচীন ও যত জনপ্রিয় সেই কবির কাব্য-মধ্যে তত বেশি প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। নারায়ণদেবের পক্ষেও তাহাই হইয়াছে। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের বহুল প্রচারের ফলে আজ এই এত শতাব্দীর ব্যবধানে তাঁহার একটি অকৃত্রিম প্রাচীন পুঁথিও দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। নারায়ণদেবের কাব্যে বিপ্রজগন্নাথ বৈদ্য জগন্নাথ, জগন্নাথ দাস, বিপ্রজানকীনাথ, দ্বিজবংশীদাস, শিবানন্দ, চন্দ্রপতি এই সমস্ত বিভিন্ন কবি ও গায়েন নিজেদের নামও যোগ করিয়া দিয়াছেন।

নারায়ণদেবে প্রক্ষিপ্ত রচনা

পদ্মাপুরাণের কবিদিগের মধ্যে নারায়ণদেবের পরই বিজয়গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গ্রন্থমধ্যে যে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা হইতেই তাঁহার বিস্তৃত পরিচয়ও সুলভ হইয়াছে। তিনি এইভাবে নিজের দেশকাল সম্বন্ধে পরিচয় দিয়াছেন,

বিজয়গুপ্ত

"ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সনাতন হুসেন শাহ্ নৃপতি তিলক॥
উত্তরে অর্জ্জুন রাজা প্রতাপেতে যম।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তক সীম॥

১ 'পূর্ব্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ'—(ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্) ১৩৪৫ সাল, পৃঃ ২৪।

পশ্চিমে ঘাঘরা নদী পূর্ব্বে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর॥
চারি বেদ ধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্য জাতি বৈসে তথা শাস্ত্রেতে কুশল॥
কায়স্থ জাতি বৈসে তথা লিখিতে প্রচুর।
আর যত জাতি নিজ শাস্ত্রেতে চতুর॥
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে নিবসে বিজয়॥"

এই উক্তি হইতেই জানা যায় যে, ১৪১৬ শকাব্দ অথবা ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে যে সময় হুসেন শাহ্ গৌড়ের নবাব তখন ফুল্লশ্রী গ্রামের অধিবাসী বিজয়গুপ্ত পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। এই ফুল্লশ্রী গ্রাম বরিশাল জিলার অন্তর্গত। এই গ্রামে বিজয়গুপ্ত পূজিত মনসাদেবীর মূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাঁহার বংশধরেরা এখনও সেই গ্রামে বসবাস করিতেছেন। বিজয়গুপ্তের পিতার নাম সনাতন ও মাতার নাম রুক্মিনী।[১]

পরিচয়

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বিজয়গুপ্তের কবিপ্রতিভায় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের যশ প্রায় সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। বিজয়গুপ্তের কবিত্ব যে খুব উচ্চস্তরের ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। পদ্মাপুরাণ প্রধানতঃ করুণ রসের আকর। এই করুণ রস-প্রধান কাব্য-সৃষ্টিতে সার্থকতা অর্জ্জন করিতে হইলে যে গভীর ভাব-প্রবণতার প্রয়োজন হয় বিজয়গুপ্তের তাহা অভাব ছিল। বিজয়গুপ্তের দৃষ্টি ব্যষ্টিচরিত্রের অন্তস্তল অপেক্ষা সমষ্টির দিকেই অধিক আকৃষ্ট ছিল।

কাব্যের দোষগুণ

---

১ 'সনাতন তনয় রুক্মিনী গর্ভজাত।
সেই বিজয়গুপ্তে রাখ তব পদে সাত॥'
বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, (গায়নের বন্দনা)

সেইজন্য খণ্ড চরিত্র সৃষ্টি অপেক্ষা ব্যাপকভাবে সামাজিক চিত্রগুলিই তাঁহার কাব্যে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। এই দিক দিয়া বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান উপাদান হইয়া রহিয়াছে। এমন কি বিজয়গুপ্ত কল্পিত দেবচরিত্রগুলিও তৎকালীন সমাজের এক একটি জীবন্ত মানব চরিত্ররূপেই অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দেবত্বের লেশ মাত্র নাই। পদ্মা, চণ্ডিকা, শিব প্রভৃতির চরিত্র এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। কন্যা পদ্মার বিবাহ স্থির করিয়া আসিয়া শিব যখন চণ্ডীকে বিবাহের আয়োজন করিতে বলিলেন তখন অসচ্ছল সংসারের গৃহিণী চণ্ডী স্বামীর দারিদ্র্যের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,

কাব্যের নীতি বিচার

হাসি বলে চণ্ডী আই, তোমার মুখে লজ্জা নাই,
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো এ'সে মঙ্গল গাইতে, তা'রা চাইবে পান খাইতে,
আর চাইবে তৈল সিন্দুরে॥

ইহার উত্তরে শূলপাণি যাহা বলিলেন তাহা কবির স্থূল হাস্যরস সৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচায়ক হইলেও শিবের পক্ষে অন্ততঃ দেবত্বের পরিচায়ক নহে,

"হাসি' বলে শূলপাণি, এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি,
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হ'য়ে।
দেখিয়া আমার ঠান এয়োর উড়িবে প্রাণ,
লাজে সবে যাবে পলাইয়ে॥"

বিজয় গুপ্তের রচনাতেই বাংলা কাব্য সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম ছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। পয়ার ও ত্রিপদী বা লাচারী ভিন্ন সেই যুগে অন্য কোন ছন্দের বড় অস্তিত্ব ছিল না। বিজয় গুপ্ত এই ছন্দ-সৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রথম মৌলিকতা প্রদর্শন করিলেন। নিম্নোদ্ধৃত ছন্দটিতে বাংলার আধুনিক স্বরবৃত্ত ছন্দের সুর ধ্বনিত হইতেছে,—

বিজয় গুপ্তের ছন্দ সৃষ্টি

"প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি॥
আগুন লাগুক কান্ধের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে।
গলার সাপ গরুড় খাউক যেমন ভাণ্ডাল মোরে॥" ইত্যাদি—

আবার কোন কোন ছন্দে বহু পরবর্ত্তী ভারত চন্দ্রের ছন্দের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়,—

জগত মোহন শিবের দাস।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ॥
রঙ্গে নেহারিয়া গৌরীর মুখ।
নাচেরে মহাদেব মনেতে কৌতুক॥

পাণ্ডিত্য

বিজয় গুপ্তের কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যই অধিক ছিল। তাঁহার কাব্যের প্রথম ভাগে মনসার উৎপত্তির যে বিস্তৃত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্য পূর্ণ আয়ত্তের ফল বলিতে হইবে। অবশ্য এই সমস্ত বিষয়ে তিনি হরিদত্তকেও সম্মুখে কতক আদর্শ রূপে লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও সত্য।

বিজয় গুপ্তের প্রচার

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বরিশাল ফরিদপুর অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। ময়মনসিংহ ত্রিপুরা শ্রীহট্ট অঞ্চলে নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণই সমধিক প্রচলিত। বিজয় গুপ্ত এই অঞ্চলে এক প্রকার অপ্রচলিতই ছিল বলিতে পারা যায়।

বিজয় গুপ্তে প্রক্ষিপ্ত রচনা

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আদ্যোপান্ত তাঁহার ভণিতাযুক্ত কোন পুঁথি আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আদ্যোপান্ত বিজয় গুপ্তের ভণিতাযুক্ত কোন পুঁথিও আজ পর্য্যন্ত কোথা হইতেও আবিষ্কৃত হয় নাই। বিজয় গুপ্তের মুদ্রিত এবং প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত

পুস্তকেও* বহুসংখ্যক পদের মধ্যে কবি কর্ণপুর,[১] বর্দ্ধমান দাস[২] চন্দ্রপতি[৩] হরিদত্ত[৪] পুরুষোত্তম[৫] জানকীনাথ[৬] ইত্যাদির ভণিতা দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত হরিদত্তের বহু পদও যে বিজয় গুপ্তের নামে কি ভাবে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে তাহাও পূর্ব্বে হরিদত্তের আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত মুদ্রিত গ্রন্থে বহু পদে কাহারও কোন ভণিতা দৃষ্ট হয় না, সেই সমস্ত পদ অধিকাংশই গায়েনের রচনা বলিয়া সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এই কারণে বিজয় গুপ্তের গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "বিজয় গুপ্তের ছদ্মবেশে 'জয়গোপাল গণ' ঐতিহাসিক মরীচিকা উৎপাদন করিতেছেন। সেই গাঢ়ভ্রম-সমুদ্র হইতে রত্ন উঠাইতে যাইয়া অনেক সময় শঙ্খ লইয়া ফিরিতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগুলির ন্যায় বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণও নানা হস্তস্পর্শে নানা তুলির বর্ণক্ষেপে পরিশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"[৭]

---

*শ্রীযুক্ত প্যারী মোহন দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত

১ 'মাতা যার রুক্মিনী বাপ দিবাকর।
তাহারে সদয় হউক দেব মহেশ্বর॥
ভণে কবি কর্ণপুর মধুর প্রবন্ধ।
পয়ার এড়িয়া বল লাচারির ছন্দ॥'—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ৪০

২ পৃঃ ৮৫, ৮৯

৩ "ভনে কবি চন্দ্রপতি বিষহরীর বর।"—ঐ পৃঃ ১৩১, ১৬৩

৪ পৃঃ ২৩৫

৫ ঐ পৃঃ ২৩১, ২৩৫

৬ 'জানকীনাথের বাণী, শুনদেবী ব্রহ্মাণি, দাস করি রাখিবা চরণে।' পৃঃ ৫৭

৭ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ১৭৬

এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া কেহ কেহ বিজয় গুপ্তকে সামান্য গায়েন বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশ পাইয়াছেন।১ বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের এক জায়গায় আছে,—

বিজয় কি সাধারণ গায়েন ?

"বিজয় গুপ্ত গায়েন মনসার দাস।"

অবশ্য বিজয় গুপ্ত যে সাধারণ গায়েন ছিলেন না এবং পদ্মাপুরাণের একজন প্রকৃত কবিই ছিলেন তাহা প্রমাণ করিতে অধিক দূর অগ্রসর হইতে হয় না। তবে এই সমস্ত ভণিতা হইতে মূল কবির কাব্যকীর্ত্তির মধ্যে যে গায়েনের দানও নেহাৎ নগণ্য ছিলনা তাহাই প্রমাণিত হয়। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে নিম্নলিখিত প্রকার ভণিতাগুলির মধ্যে পদকর্ত্তার প্রকৃত পরিচয় সহজ লভ্য নহে।

১ বিজয়গুপ্ত বলে গায়েন হও সাবহিত।
পয়ার ছাড়িয়া বল লাচাড়ির গীত॥

২ গায়েক হ'য়ে তাল ধরে জন্মে নানা জাতি।
বিজয়গুপ্তে বন্দিয়া ভাই গীতে দাও মতি॥

৩ গায়েন বন্দি বায়েন বন্দি সঙ্গে পঞ্চ ভাই।
ঘট ছাড়ি রহ যদি শিবের দোহাই॥

৪ ছাড়িয়া বন্দনা গায়েন গীতে দেও মন।
পদ্মাবতীর বিহা পালা শুন সর্ব্বজন॥

৫ অবশেষে গাইনে বাইনে মাগিয়া লও বর।
ঘরে দিবা ধন জন গলায় মধুর স্বর॥

এই সমস্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কোন সময় হয়ত যে সাধারণ গায়েন মাত্র সেই প্রকৃত কবির মর্য্যাদা লাভ করিতেছে,

১ 'পদ্মাপুরাণ ও তাহার লেখকগণ (৺সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী) রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সন ১৩২২

আর কখনও যে প্রকৃত কবি সে সাধারণ গায়েন মাত্র বলিয়া তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য কবি যে স্বয়ংই গায়েন তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী কবি দ্বিজ বংশীদাস ও চন্দ্রপতিই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহারা উভয়ে একাধারে যেমন কবি তেমনই গায়েনও ছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিয়াছি।

কবি ও গায়েন

যাহা হউক, উপরের আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, নারায়ণদেবের আদ্যোপান্ত ভণিতাযুক্ত প্রামাণ্য পুঁথি যেমন বহু অনুসন্ধানের ফলেও আবিষ্কৃত হয় নাই বিজয়গুপ্তেরও প্রামাণ্য পুঁথি আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। অধুনা প্রাপ্তব্য মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুঁথিগুলি আলোচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে, বিজয়গুপ্তের মূল পুঁথি বর্ত্তমানে প্রচলিত পুঁথি অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র ছিল, তাহা ক্রমে পরবর্ত্তী কবিদিগের হস্তস্পর্শে বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। অতএব এই পুঁথি সমগ্রভাবে বিচার করিয়া বিজয়গুপ্তের কাব্যের দোষগুণ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা নিরাপদ নহে।

বিজয়গুপ্তের প্রামাণিকতা

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের কাব্যাংশ বিজয়গুপ্ত অপেক্ষা স্বাভাবিক। বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ লইয়া মান্দসে ভাসিয়া চলিয়াছে। বেহুলার মাতা সংবাদ পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিসাধুকে[১] বেহুলাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পাঠাইলেন। বিজয়গুপ্তের রচনায় বেহুলার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বেহুলাকে ফিরিবার জন্য অনুনয় করিয়া কহিতেছে—

নারায়ণ ও বিজয়

১ বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে বেহুলার ভ্রাতার নাম হরিসাধু, নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে তাহার নাম নারায়ণী।

হরিসাধু বলে বেহুলা যাও কোন ঠাঁই।
আসিয়াছি অভাগিয়া তব জ্যেষ্ঠ ভাই॥
আসিয়াছি তোমাকে নিতে মায়ের আজ্ঞা পাইয়া।
মাজুষ চাপাও ঘাটে কথা কও রইয়া।
বাপ ভাই তেজি বেহুলা কোন দেশে যাও।
বাপ মায়ের ঘরে বসি ঘৃত অন্ন খাও॥
সাহের কুমারী তুমি নহ ছোট জনা।
মায়ের নিকটে বসি কর যতিপনা॥

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে এই অংশ ইহা অপেক্ষা অনেক স্বাভাবিক ও করুণ। বিজয়গুপ্তের কাব্যাংশে ভগ্নী-বিচ্ছেদের কাতরতা নাই বরং ঐশ্বর্য্যের দাম্ভিকতার ছাপ রহিয়াছে। কিন্তু নারায়ণদেবের নিম্নোক্ত কাব্যাংশে ভ্রাতার প্রিয়জন-বিচ্ছেদের করুণ আর্ত্তি যেন ছন্দে সুরে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে,—

নারায়ণী শুনি বোলে বিপুলা বচন।
কি কারণে কৈলা ভইন অশক্য কথন॥
বিষম সাহস ভইন কইলা কি কারণ।
দেবতা মনিষ্য কোথা হইছে দরশন॥
কেমতে ছাড়িয়া দিমু সাগর ভিতর।
কথাতে পাইবা তুমি দেবর নগর॥
কাঁদে নারায়ণী সাধু কহএ বিপুলা চাইয়া।
প্রাণে না সয় দুঃখ না দিমু এড়িয়া॥
অবুদ্ধিয়া সদাগর বুদ্ধি অতি ছার।
জিয়ন্তা ভাসাইয়া দিছে সইতে মরার॥
বিষম সাগরে ঢেউ তোলপাড় করে।
জলেতে পড়িলে খাইব মৎস্য মকরে॥
মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর।
কি কথা কইব আমি উজানী নগর॥

লখীন্দরও বেহুলা স্বর্গে গমন করিলে বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গল কাব্যে,

"পুত্রবধূ শোকে চান্দ দুঃখ ভাবে মন।
জোড় হাতে মনসার করয়ে স্তবন॥
তোমার প্রসাদে আমি ভুঞ্জিলাম সুখ।
পুত্রবধূ শোকে মোর বিদরিছে বুক॥"

ইহাতে করুণ শোক-চিত্র অপেক্ষা চাঁদসদাগরের চরিত্রগত হীনতাই অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে। মনসার সম্মুখে চাঁদসদাগরের জোড় হাত করিয়া থাকার চিত্র অত্যন্ত শোচনীয় ও অস্বাভাবিক; বিশেষতঃ এই অবস্থায়। কিন্তু সন্তানের শোক চাঁদসদাগরের পিতৃহৃদয় অপেক্ষা সনকাব মাতৃহৃদয়েই অধিকতর তীব্র হওয়া স্বাভাবিক। কন্যার শোকে সুমিত্রাব ক্রন্দনের ছন্দে সুরে নারায়ণের কবি-প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, বর্ণনার স্বাভাবিকত্বে কাব্যাংশ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে,—

কি করিব ঘরে আসি বিফল বসতি।
বিপুলার শোকে মরিব গলায় দিয়া কাতি॥
মায়ের দুর্লভ ঝি বিপুলা সুন্দরি।
হেন মাও ছাড়িয়া বেউলা গেলা কার পুরি॥
অনেক দুঃখে মাও পুসিলাও তোমারে।
আমাকে এড়িয়া তুমি গেলা কার ঘরে॥
কোথা গেলা বিপুলা রহিলা কোন দেশে॥
সেই ঠাঞি বলি যাব তোমার উদ্দেশে।
কোথা গেলে বিপুলা তোমার লাগ পামু।
পক্ষী হইয়া তথায় উড়া দিয়া জামু॥

স্বাভাবিক চিত্রাঙ্কনে বিজয় গুপ্ত অপেক্ষা নারায়ণ দেবের কৃতিত্ব অনেক বেশী। চরিত্রাঙ্কনেও বিজয় গুপ্ত অপেক্ষা নারায়ণ দেবের কৃতিত্ব অধিক। চাঁদসদাগরের চরিত্র পুরুষকারের জীবন্ত আদর্শ। তাঁহার জীবনের অবিচ্ছিন্ন ভাগ্য-বিড়ম্বনা অতি বিরল, কিন্তু করুণও মর্ম্মস্পর্শী। জীবন-সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালাকে দলিত ও মথিত করিয়া চাঁদ-চরিত্র আদর্শের প্রতি অটল অচল নিষ্ঠায় অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। বেহুলার গুণে চমৎকৃত চাঁদ শেষ অঙ্কে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বাম হস্তে পূজা দিবেন স্থির করিলেন। এতদূর পর্য্যন্ত বিজয়গুপ্ত চাঁদসদাগরকে চরিত্রোপযোগী করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু শেষকালে চণ্ডীর আওতায় এত বড় মহান আদর্শ চরিত্রকে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছেন। বাম হস্তে পূজার বদলে পুস্তকের শেষ পর্য্যন্ত "জোড় হাতে মনসার করয়ে স্তবন।" চাঁদ শেষ কালে ঘটা করিয়া মনসার পূজা করিতেছেন। নানাপ্রকার পূজার সম্ভার লইয়া মনসাদেবীর সম্মুখে জোড় হস্তে দণ্ডায়মান। এত বিরাট একটি চরিত্রকে শেষ কালে বিজয়গুপ্ত এইভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার অকৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। পুরুষকারের জীবন্ত গগনস্পর্শী আদর্শ দৈবশক্তির নিকট শেষে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিতেছে। এতবড় চরিত্রের এরূপ পতন কেবল অস্বাভাবিক নহে, অসম্ভব।

বিপ্রদাস

বিজয়গুপ্তের সমসাময়িক আর একজন কবি পদ্মাপুরাণ কাব্য রচনা করেন, তাঁহার নাম দ্বিজ বিপ্রদাস।[১] ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে মনসা-মঙ্গল লেখকদিগের তালিকার মধ্যে বিপ্রদাস নামক একজন কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এই একজন অতি প্রাচীন কবির আর কোন পরিচয় দেন নাই।

---

১ বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ) ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা। পৃঃ ২২

বিপ্রদাস তাঁহার রচিত মনসার পাঁচালীতে নিজের সম্বন্ধে এই পরিচয় দিয়াছেন,—

পরিচয়

"মুকুন্দ পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি নাদুড়ে বটগ্রাম॥
বাচ্যগোত্র পিপিলার পঞ্চ প্রবর।
সাম বেদ কুত্তক (?) সখা চারি সহোদর॥"

তাঁহার কাব্যের রচনা-কাল সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,—

রচনা-কাল

"শুক্ল দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে॥
পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ॥
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহো গৌড়ে সুলক্ষণ॥
সেবকেরে বর দিতে চাহে বিষহরী।
দ্বিজ বিপ্রদাস কহে করযোড় করি॥

ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৪১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিজ বিপ্রদাস তাঁহার পদ্মাপুরাণ কাব্য রচনা করেন। তখন হুসেন শাহ গৌড়ের নবাব ছিলেন। নাদুড়ে বটগ্রাম চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখনও সেই গ্রামে শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা উপলক্ষে দ্বিজ বিপ্রদাসের পদ্মাপুরাণ পঠিত হয়। তাঁহার কাব্যের নাম মনসার পাঁচালী, কাব্যখানি সংক্ষিপ্ত।

কবি ষষ্ঠীবর ও তাঁহার পুত্র গঙ্গাদাস সেনের নাম মধ্য যুগের বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহাদের উভয়ের রচিত রামায়ণ ও মহাভারতের

বাংলা অনুবাদ এককালে বিশেষ প্রচলিত ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থান হইতেই তাঁহাদের উভয়েরই রচিত রামায়ণ, মহাভারত ও পদ্মাপুরাণের কোন কোন অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ষষ্ঠীবর রচিত স্বর্গারোহণ পর্ব্বের একটি পদ হইতে অনুমিত হয়, তিনি সমগ্র মহাভারতই বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার পদ্মাপুরাণ কাব্যও যথেষ্ট প্রচার লাভ করিয়াছিল। ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল, গুণরাজ খাঁন।[১]

পিতাপুত্র

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মহেশ্বরদি পরগণায় জিনারদি[২] নামক গ্রামে বণিক-কুলে[৩] কবি ষষ্ঠীবরের জন্ম হয়। জিনারদি গ্রামে আজ পর্য্যন্তও বহু বণিকের বাস। মনসা-পূজা উপলক্ষে তাহাদের মধ্যে আজিও বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের মধ্যে এই কবির বংশধর কে সেই বিষয়ে অনুসন্ধান হয় নাই। কবি তাঁহার মহাভারতের অনুবাদে এক স্থানে জগদানন্দ নামক কোন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন; সম্ভবতঃ এই জগদানন্দ তাঁহার প্রতিপালক,—

ষষ্ঠীর পরিচয়

"অমৃত লহরী ছন্দ পুণ্য ভারতের বন্ধ
কৃষ্ণের চরিত্র শেষ পর্ব্বে।
শ্রীযুত জগদানন্দে অহর্নিশি হরি বন্দে
কবি ষষ্ঠীবর কহে সর্ব্বে॥

১ ষষ্ঠীবর তাঁহার কোন পদে এই প্রকার ভণিতা দিয়াছেন,—
"ভণে গুণরাজ খানে কাজির বড়াই।"

২ প্রাচীন পুঁথিতে প্রায়ই 'দিনিদীপ' বা 'দিনারদীপ' বলিয়া উল্লিখিত।

৩ ষষ্ঠীবরের পুত্র গঙ্গাদাস এই ভাবে নিজের কুল-পরিচয় দিয়াছেন,—
"বিরচিল গঙ্গাদাস বণিক্য তনয়"—পদ্মাপুরাণ।

এই প্রতিপালক গুণগ্রাহা ব্যক্তিই বোধ হয় তাঁহাকে 'গুণরাজ' এই উপাধি দিয়া গৌরবান্বিত করেন।

পুত্র গঙ্গাদাস পিতা ও পিতামহ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন,

'পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর।
যার যশঃ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর॥'

ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই কবির সময় সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে না পারিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, "ষষ্ঠীবর ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিখিত পুঁথিগুলিতেও ইঁহাদের উভয়ের রচনা পাওয়া যাইতেছে।"[১]

সময়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালায় রক্ষিত ষষ্ঠীবরের পুত্র গঙ্গাদাস কৃত অশ্বমেধ পর্ব্বের একটি প্রাচীন পুঁথিতে নিম্নোদ্ধৃত পদটি পাওয়া গিয়াছে,—

"সড় মোনি বেদ সসি সকল পালিত। (?)
যেই মতে অশ্বমেধ রচিল কবিত্ব॥
কুলপতি সেন সুত কবি ষষ্ঠীবর।
সর্ব্বলোকে জানে তান দিনিদীপে ঘর॥
তাহান তনয়ে শিশু করি পরিহার।
ছিদ্র পাইলে সমে দোষ ক্ষেমিবা আমার॥" পুঁথি সংখ্যা ৪৪৩৬, পত্রসংখ্যা ২ (ক)

প্রথম চরণটি অনুলিপিকর কর্ত্তৃক বিকৃত হইয়াছে। ইহাতে যে গঙ্গাদাসের অশ্বমেধ পর্ব্ব রচনার কাল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা নিশ্চিত। পদটি শুদ্ধ করিয়া লিখিলে এই প্রকার হইবে।

"শর মুনি বেদ শশী শক গণিত।"

১ বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য—(ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ ৪৪২

তাহা হইলে গঙ্গাদাসের গ্রন্থরচনার কাল ১৪৭৫ শকাব্দ বা ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। পিতাপুত্রের সময়ের ব্যবধান খুব অধিক না হওয়াই সম্ভব। অতএব গঙ্গাদাস যদি ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ রচনা করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার পিতার সাহিত্য-জীবন অন্ততঃ তাহার ২০।২৫ বৎসর অগ্রবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

যাহা হউক, ষষ্ঠীবরও যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই বর্ত্তমান ছিলেন তাহা একপ্রকার স্থির করিয়াই বলিতে পারা যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণে গঙ্গাদাস রচিত অশ্বমেধ পর্ব্বের যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতেও ষষ্ঠীবর সম্বন্ধে এই পরিচয় লাভ করা যায়,—

"পিতামহ নৃপতি (কুলপতি) পিতা ষষ্ঠীবর।
যাহার কীর্ত্তি ঘোষে দেশ দেশান্তর॥
জ্যেষ্ঠভাই সত্যবান নানা বুদ্ধিমন্ত।
নানা শাস্ত্র বিশারদ গুণে নাহি অন্ত॥
গঙ্গাদাস সেন কহে অনুজ তাহার।
অশ্বমেধ পুণ্যকথা রচিল পয়ার॥"

—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪

ইহা হইতে জানিতে পারা যায়, ষষ্ঠীবরের জ্যেষ্ঠপুত্রও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাহার নাম সত্যবান।

ষষ্ঠীর পাণ্ডিত্য

ষষ্ঠীবরের মহাভারতের অনুবাদ হইতেই জানা যায় যে, তিনি সংস্কৃতে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পদ্মাপুরাণ-রচনাতেও এই পাণ্ডিত্য যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। স্থূল ভাবে বিচার করিতে গেলে, সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত কোন বিষয় তাঁহার কাব্য মধ্যে আছে বলিয়া মনে হইবেনা। তাহার

পদ্মাপুরাণ কাব্য শুধু ঘটনার পর ঘটনা বর্ণনায় পরিপূর্ণ। মৌলিক কবিত্ব কোন স্থানেই স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। তবে তাঁহার বর্ণনার সহজ ভঙ্গিটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

চাঁদ সদাগরের সমুন্নত রাজোচিত চরিত্র তাঁহার বর্ণনায় সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ, মহাভারতের কাহিনী রচনা করিয়া কবি অভিজাত চরিত্রের সম্পর্কে আসিতে পারিয়াছিলেন, চাঁদের চরিত্রেও সেই জন্যই তাহারই ছায়াপাত দেখিতে পাই। লক্ষীন্দরের জন্য কন্যা দর্শন করিতে যাত্রা করিবার বর্ণনাটি উল্লেখ যোগ্য,

"সর্ব্বসৈন্য লৈয়া সাধু করিল পয়ান।
ধানুকীর ঠাট সব হইল আগুয়ান॥
তেলেঙ্গার ঠাট সভে বত্রিশ হাজার।
নট নর্ত্তকী চলে নাই ওর পার॥
বেয়াল্লিশ বাদ্য বাজে কাংস্য করতাল।
পঞ্চশ্বরী বাদ্য বাজে ঢাককে বিশাল॥
গজ কান্ধে সোয়ার চলিল লক্ষীন্দর।
কনক চৌদল চড়ি চলে সদাগর॥
কহে কবি ষষ্ঠীবর মনসার বর।
বেলাবেলি এড়াইল চম্পক নগর॥"

দ্বিজবংশীদাস

পদ্মাপুরাণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি দ্বিজ বংশীদাস ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তঃপাতী পাতুয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই পাতুয়ারী গ্রাম নারায়ণদেবের জন্মস্থান বোরগ্রাম হইতে তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত ও এ, বি, রেলওয়ের নীলগঞ্জ ষ্টেশনের আধ মাইলের মধ্যবর্ত্তী। বংশীদাসের কাল সম্বন্ধে যতদূর আলোচনা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, ইনি

নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্ত প্রভৃতির অনেক পরবর্ত্তী। এ'যাবৎ যে যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই কবির কাল-নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছে সংক্ষেপে তাহাদের আলোচনা করা যাইতেছে।

বংশীদাসের কোন কোন পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদ দুইটি পাওয়া যায়,—

"জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজবংশী পুরাণ পদ্মার॥"

ইহা হইতে দেখা যায় যে, ১৪৯৭ শক অর্থাৎ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বংশীদাস তাঁহার পদ্মাপুরাণ কাব্য রচনা করেন।

দ্বিজবংশীর সময়

বংশীদাসের একখানি মুদ্রিত পুস্তকে[১] নিম্নলিখিত পদ দুইটি দৃষ্টিগোচর হয়,—

"রাঢ় হইতে আসিলেন লৌহিত্যের পাশ।
হাজ্‌রাদি পাতুয়ারী গ্রামেতে নিবাস॥"

তপে হাজরাদি কিশোরগঞ্জ মহকুমার পূর্ব্বাঞ্চলের একটি পরগণার নাম। পাতুয়ারী গ্রাম এই তপে হাজরাদি পরগণার অন্তর্গত। কিন্তু ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে এই দেশে পরগণার সৃষ্টি হয় নাই, আকবরের সময়ে ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষ দশকে এই দেশে পরগণা বিভাগ হয়। অতএব, দ্বিজবংশী যদি ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার হাজরাদি পরগণার নামোল্লেখ করা অসম্ভব। অতএব উপরি-উদ্ধৃত পদ দুইটির একটি প্রক্ষিপ্ত এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিন্তু কোনটি প্রক্ষিপ্ত?

বংশীদাসের কাব্য-মধ্যে মঘ ফিরিঙ্গিদের উল্লেখ আছে,

"মঘ ফিরিঙ্গি যত, বন্দুক পলিতা হাত
একেবারে দশবিশ ছুটে।
কামান বন্দুক ভরি, ছাড়িতেছে ঘড়ি ঘড়ি
যার শব্দে হস্তী ঘোড়া ছুটে॥

১ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ও রমানাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত।

বাংলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্ত্তুগীজেরা বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে সবে মাত্র এই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেশের আভ্যন্তরিক সমাজের সঙ্গে এত ব্যাপকভাবে তাহাদের সংমিশ্রণ তখনও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আওরঙ্গজেব পর্ত্তুগীজদিগের বাণিজ্য কুঠিগুলি ভাঙ্গিয়া দিলে পর তাহারা অনন্যোপায় হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে। এই উদ্দেশ্যেই তাহারা আরাকানের মঘদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিম্নবঙ্গে যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে থাকে। এই সময়ে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই মোগল সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়া এই পর্ত্তুগীজ ও মঘদস্যুদল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং পূর্ব্ব ও নিম্নবঙ্গের সর্ব্বত্র গুলিবারুদের ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করে। এখনও পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক স্থলেই বারুদের ব্যবসায়ী এই ফিরিঙ্গিদের বহু বংশধর তাহাদের জাত ব্যবসায় পালন করিতেছে।

অতএব উপরি-উদ্ধৃত পদ যদি দ্বিজ বংশীর রচনা হয় তাহা হইলে তিনি কখনও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক হইতে পারেন না, এই বিষয়ে নিশ্চিত।

"ময়মনসিংহের বিবরণ" রচয়িতা স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন,[১] "বংশীদাসের বংশ বর্ত্তমান সময়ে সপ্তম পুরুষে অবতীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তিনি ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" "বংশীদাস নামে তালুক এখনও পাতুয়াইরের রায়দের দখলে আছে। সুতরাং বংশীদাস লর্ড কর্ণওয়ালিসের সম- সাময়িক।"[২] কিন্তু ইহা খুব নিশ্চিত যুক্তি নহে; কারণ, এই তালুকোক্ত বংশীদাস অন্য কোন বংশীদাস হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

১ 'ময়মনসিংহের বিবরণ' পৃঃ ৭২

২ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৯ সাল, পৃঃ ১৪৮

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "পাতুয়ারি গ্রামে, তাঁহার (বংশীদাসের) নিজ বংশধরগণের নিকট হইতে আমরা যে বংশাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে দেখা যায়, পূর্ব্বপুরুষ চক্রপাণি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত গণনা করিলে তদীয় বংশধরগণের মধ্যে জীবিত ব্যক্তিগণ অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষে আসিয়া পড়েন।" চারি পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে কবি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

দ্বিজবংশী যে সপ্তদশ শতাব্দীর লোক এই বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়-বস্তুর আলোচনা হইতেও কতক অনুমান করা যাইতে পারে।

দ্বিজবংশীর কাব্যে চণ্ডী

শৈবধর্ম্মের উপর লৌকিক দেবতা মনসাকে প্রতিষ্ঠিত করাই মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যেই প্রাচীনতম পদ্মাপুরাণগুলি রচিত হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিজবংশীর আদর্শ স্বতন্ত্র। তাঁহার যুগে পরবর্ত্তী যুগে প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের আদর্শের যেন সূচনা দেখিতে পাই। চাঁদ সদাগরের আরাধ্য দেবতা নিজেই চাঁদকে মনসার পূজা করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন,—

"যেহি পদ্মা সেহি আমি জানিহ নিশ্চয়।
পদ্মা পূজা কর পুত্র না ভাব বিস্ময়॥"

ইহা যেন পরবর্ত্তী যুগের ভারতচন্দ্র বর্ণিত শিবনিন্দক বিষ্ণুভক্ত ব্যাসের প্রতি বিষ্ণুর এই উক্তিরই অনতিদূর পূর্ব্ব সূচনা,—

"যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।
শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব॥"

বংশীদাসের সময়ে শৈবধর্ম্মের প্রাধান্য একেবারেই লোপ পাইয়া গিয়াছিল, তৎস্থলে চণ্ডীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বংশীদাসের চাঁদ সদাগর পরম শৈব নহে, বরং শাক্ত,

"চাঁদ বলে কভু আমি না পূজিব কাণী।
চণ্ডীর চরণ বিনে অন্য নাহি জানি ॥"

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, প্রাচীনতম সমাজে শিবেরই প্রতিষ্ঠা ছিল, লৌকিক দেবী চণ্ডী মনসার পরবর্ত্তী কালে বাংলার সমাজে আপনার অধিকার স্থাপন করিয়া লইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাংলার সমাজে শাক্তধর্ম্ম শৈব ধর্ম্মের পরবর্ত্তীকালে উদ্ভূত হইয়াছিল; চাঁদ সদাগরকে শাক্ত করিয়া অঙ্কিত করায় দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যের অপেক্ষাকৃত আধুনিকত্বই প্রমাণিত হইতেছে। অতএব এই কবির কাব্য রচনার সময় জ্ঞাপক প্রথম উদ্ধৃত পদদ্বয়কে নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে; বিশেষতঃ অনেক প্রাচীন এবং নির্ভরযোগ্য পুঁথিতেই উক্ত পদদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা হইতে অনেকেই এই পদদ্বয়ের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।[১] অতএব যাঁহারা উক্ত পদদ্বয়ের উপয় নির্ভর করিয়া দ্বিজবংশীকে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহারা নিশ্চিতই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমাদের পূর্ব্ব আলোচনা হইতেই দেখা যাইবে যে দ্বিজবংশী সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

পরিচয়

কবি দ্বিজবংশীই বাংলার মহিলা কৃত্তিবাস চন্দ্রাবতীর পিতা। বিদুষী কন্যা তাহার রচিত রামায়ণে পিতার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,

---

১ "এই শ্লোক ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যায়, বংশীদাস ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে পদ্মাপুরাণ রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহারও পূর্ব্বের হস্তলিখিত পদ্মাপুরাণ আমাদের কাছে আছে। কিন্তু তাহার পাতা উল্টাইতে গেলে ভয় হয়। এরূপ কোন কোন পুস্তকে এই শ্লোকটি দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে এই শ্লোকটি কি প্রক্ষিপ্ত?"—শ্রীচন্দ্রকুমার দে ('ময়মনসিংহের কবি কথা')—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৪৫ সন, পৃঃ ১৮।

"ধারা স্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়॥
ভট্টাচার্য্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পালার ঘর ছনের ছাউনী॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায়॥
দ্বিজ বংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে॥"

—ময়মনসিংহ গীতিকা

এই ফুলেশ্বরী নদীর বর্ত্তমান নাম নরসুন্দা। নরসুন্দা নদী কিশোরগঞ্জ শহরের মধ্যভাগ দিয়া প্রবাহিতা। পাতুয়ারি গ্রামে দ্বিজবংশীর বংশধরেরা এখনও বসবাস করিতেছেন। দ্বিজ বংশীর শিব-মন্দির এখনও সেই গ্রামে বর্ত্তমান আছে। দ্বিজবংশী কোথাও বংশীধন, কোথাও বংশীবদন, কোথাও বংশীদাস কোথাও দ্বিজবংশী এই প্রকার ভণিতা দিয়াছেন, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে পদ্মাপুরাণ রচয়িতা এই সকলেই একই ব্যক্তি।

দ্বিজবংশীর সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। চন্দ্রাবতী লিখিয়াছেন,—

"ঘরে নাই ধান চাল, চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি।"

জীবিতকালেই দ্বিজবংশীর কবিত্বখ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার কারণ, তিনি কাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই তাহা সর্ব্বত্র গাহিয়া বেড়াইতেন। চৈতন্যের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর সঙ্কীর্ত্তন করিয়া নাম-প্রচারের রীতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল; বংশীদাসও সঙ্কীর্ত্তনের দল বাঁধিয়া স্বরচিত ভাসান গান সর্ব্বত্র গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; ইহাতেই তাঁহার সাংসারিক অনটন কোন মতে দূর হইত। ক্রমে শুধু কবি বলিয়া

নহে, সুকণ্ঠ গায়ক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কথিত আছে, একবার তিনি তাঁহার গানের দল লইয়া জালিয়ার হাওরের মধ্যদিয়া নৌকা করিয়া কোথাও গান গাহিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি নরহন্তা দস্যু কেনারামের হাতে পড়িলেন। কেনারাম তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। বৃদ্ধ কবি জন্মের শেষ একবার ভাসান গাহিয়া লইবার অনুরোধ জানাইলেন, কেনারাম তাহাতে সম্মত হইল। ভক্ত কবির কণ্ঠে বেহুলার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া দস্যুর হৃদয়ও বিগলিত হইল। সে হাতের খড়্গ ফেলিয়া দিয়া কবির পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। কেনারাম দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিল।

দস্যুহস্তে

দ্বিজবংশীর পদ্মাপুরাণোক্ত কাহিনী একটু স্বতন্ত্র। এই বিষয়ে পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার চাঁদ সদাগরের ইষ্ট দেবতা শিব নহেন, বরং চণ্ডী, শিবের পত্নী। সপত্নীর কন্যা পদ্মা বা মনসার সহিত তাঁহার বিবাদ। চাঁদ সদাগরকে তিনি স্বপ্নাদেশ করিয়াছেন, যেন তিনি কদাচ মনসার পূজা না করেন। উভয়ের বিবাদের মধ্যে পড়িয়া চাঁদ সদাগরের লাঞ্ছনার একশেষ হইল। অবশেষে শিব মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন।

কাহিনীর স্বাতন্ত্র্য

চাঁদ সদাগরের এই চরিত্র-পরিকল্পনা মঙ্গল-কাব্যের মূল আদর্শের বিরোধী। কারণ, প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে স্ত্রী-দেবতার পূজার বিরুদ্ধেই কাব্যোক্ত নায়কের অভিযান দেখিতে পাওয়া যায়।[১] কিন্তু এখানে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম রহিয়াছে। ইহা দ্বিজ বংশীর আধুনিকত্বেরই প্রমাণ।

১ 'স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি।' —কবিকঙ্কণ
'মাইআ দেবতা না পূজিব আমি।' ইত্যাদি। বিজয়গুপ্ত

দ্বিজ বংশী একাধারে কবি ও সাধক। এই কাব্যের ভিতর দিয়াই তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার পিপাসাও চরিতার্থ করিয়াছিলেন। এই হিসাবে বাংলার আর একজন পরবর্ত্তী কবির সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয়, তাঁহার নাম রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের গান যেমন বাঙ্গালীর প্রাণের বস্তু তেমনই ভক্ত দ্বিজবংশীর গানও পূর্ব্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের একেবারে প্রাণের জিনিস। এই সম্পর্কে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ গীতি-কাব্য সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের নিজের উক্তিই কতক উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না, তিনি লিখিয়াছেন, "কবি দ্বিজবংশী ছিলেন পূর্ব্ব ময়মনসিংহের প্রাণের কবি। প্রায় তিনশত বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে, আজও ময়মনসিংহবাসী তাহাদের প্রাণের কবিকে ভুলে নাই। ঘরে বাহিরে মনের মধ্যে, আজও তাহাকে দেবতার পাশে ঠাঁই দিয়া রাখিয়াছে। বিবাহে, উপনয়নে, অন্যান্য উৎসবে আজও দ্বিজবংশীর গান তাহাদের ক্রিয়া অনুষ্ঠানাদির একটি প্রধান অঙ্গ। মেয়ের বিবাহে সোহাগ সাধিতে, তৈল রাঁধিতে পাড়ার মেয়েরা আজও বংশীদাসের গান গাহিয়া থাকে। অধিবাসকালে বরকন্যাকে হলুদ জলে নাইয়া তোলার যে রীতি ও অন্যান্য যে স্ত্রী-আচার আছে তাহাতে তাহারা বংশীদাসের উপদেশই গ্রহণ করিয়া থাকেন। মার নিকট হইতে মেয়ে, সেই গান আচার অনুষ্ঠান ক্রমেই শিক্ষালাভ করিয়া চলিয়াছে। পল্লীতে পল্লীতে আজও বংশীদাসের নামে উলুধ্বনি পড়ে। আজ কোন দুর্ব্বার প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে যদি বংশীদাসের সেই সুবৃহৎ পদ্মাপুরাণসকল সমূলে নষ্ট হইয়া যায়, তবু কালের কবল হইতে একটি অক্ষরও মুছিবে না। এ দেশে এমন গায়ক আজও জীবিত আছেন, যাঁহারা এই দেড় হাজার পৃষ্ঠার অতিকায় পুঁথিখানা আগাগোড়াই একদম কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন।"[১]

ভক্ত বংশীদাস

১ 'ময়মনসিংহের কবি কথা'—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ই চৈত্র ১৩৪৫

বংশীদাসের এই ব্যাপক লোকপ্রিয়তার কারণ, তাঁহার অনুভূতির আন্তরিকতা ও ভাষার সরলতা। সহজ নিরলঙ্কারা ভাষায় ব্যক্ত মনের গভীর ভাবটি পাঠকের মর্ম্মস্থল গিয়া স্পর্শ করে। ভক্ত সাধকের দৃষ্টির সঙ্গে সহজ কবিত্বের শুচিদৃষ্টি মিলিত হইয়া তাহার কাব্যে মণিকাঞ্চণ যোগ সৃষ্টি করিয়াছে। পদ্মাপুরাণ কাব্য যে করুণ রসের আকর অন্তরের সহজ ভাবানুভূতি হইতে বংশীদাস তাঁহার কাব্যে তাহা উৎসারিত করিয়াছেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও কৃত্রিমতা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই ভাবানুভূতিব অকৃত্রিমতাই দ্বিজ বংশীকে ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর কাছে এত জনপ্রিয় কবিয়া রাখিয়াছে।

চরিত্র সৃষ্টি

চরিত্র সৃষ্টিতে বংশীদাস এই গতানুগতিক কাহিনীভাগের মধ্যেও কোন কোন স্থলে অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন। সমগ্র মনসা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে তাহার চাঁদসদাগরের চরিত্র-সৃষ্টি অভিনব। চাঁদের চরিত্রেণ কঠোরতা তিনি বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইতে দেন নাই। দুর্ব্বার নিয়তির বিরুদ্ধে নিঃসঙ্গ সংগ্রাম করিয়াও যে নিজের আদর্শকে অটল রাখিয়াছিল, দৈবশক্তি যাহার পৌরুষের নিকট বারবার সমুচ্চ মস্তক নত করিয়াছে, সেই চাঁদ সদাগরের চরিত্র সকল বাঙ্গালী কবির কল্পনায়ই যে সমান মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু দ্বিজ বংশীদাস তাহার এই দৃপ্ত পৌরুষকে আরও শতগুণ উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। বেহুলার দুঃখের চিত্র বর্ণনায় তাহার সহানুভূতিপূর্ণ কবিহৃদয়ের যে পরিচয়টুকু লাভ করা যায় তাহাই চাঁদ সদাগরের চরিত্রের দৃঢ়তা বর্ণনা করিতে আবার সময়োচিত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, দেখিতে পাই। পদ্মার চক্রান্তে চাঁদসদাগরের ছয় পুত্র সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করিল। পুত্রশোকাতুরা সনকার মাতৃহৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল কিন্তু চাঁদ অটল রহিলেন, মৃতপুত্রদিগকে শীঘ্র জলে ভাসাইয়া

দিবার আদেশ দিয়া কহিলেন, "কাণীর উচ্ছিষ্ট পুত্র শীঘ্র কর পার।" পদ্মার প্রতি আক্রোশ তাঁহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

চৌদ্দ ডিঙ্গি ডুবিবার পর ভাগ্য-বিপর্য্যস্ত সর্ব্বহারা চাঁদ যখন একাকী দেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার অনুচরদিগের পরিবারবর্গ নিজেদের আত্মীয় স্বজনের নিধন-সংবাদ শুনিয়া বিলাপ করিতে লাগিল,—

"বিলাপ করয়ে নারী আপনার স্বামী স্মরি
কান্দি সব ভূমিতে লুটায়।
ঘরে ঘরে উঠে রোল না শুনে কাহার বোল
এক ধেতে সহস্রেক ধায়॥
চাঁদের চরণে পড়ে, কান্দে সবে উচ্চৈঃস্বরে,
শোকে দুঃখে যায় গড়াগড়ি।
প্রজার দুর্গতি দেখি অন্তরে হইয়া দুঃখী
প্রবোধ করয়ে অধিকারী॥
চাঁদ বলে প্রজাগণ, কেন কান্দ অকাবণ,
আমি কহি শুন তত্ত্ব-কথা।
যত লোক মরিয়াছে বন্ধি করি লব পাছে,
কাণীকে পাইলে লাগ হেথা॥"

কিন্তু এই প্রবোধ বাক্যেও যখন প্রজাবর্গ সান্ত্বনা লাভ করিলনা তখন চাঁদ-সদাগর দৃঢ় হইয়া উঠিলেন; কারণ, প্রজাবর্গের এই আকুল ক্রন্দনে শত্রু মনসা হাসিবে, ইহা তাঁহার অসহ্য,—

চাঁদের চরিত্র

"যে কাঁদে আমার হেথা, মুড়াইব তার মাথা
দেশেতে রাখিয়া নাই কাজ।
কাতর করুণা-ধ্বনি শুনিয়া হাসিবে কাণী,
তাহাতে হইবে মোর লাজ॥

পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় মনসা-মঙ্গলের কবির নাম ক্ষেমানন্দ। ক্ষেমানন্দ বর্দ্ধমান জিলার অধিবাসী ছিলেন এবং পশ্চিম বঙ্গ অঞ্চলেই তাঁহার কাব্য বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় যখন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তখন তিনি ক্ষেমানন্দ ব্যতীত আর কোন পদ্মাপুরাণের কবির নাম জানিতেন না। তাহাতে মনে হয়, পূর্ব্বোল্লিখিত পদ্মাপুরাণের পূর্ব্ববঙ্গের কবিগণ পশ্চিম বঙ্গে তখনও ততখানি পরিচিত হন নাই। পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র ক্ষেমানন্দের পদ্মাপুরাণই সবিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল।

ক্ষেমানন্দ

ক্ষেমানন্দ জাতিতে কায়স্থ ছিলেন; তিনি স্বজাতির জন্য মনসাদেবীর নিকট কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন,

"কেতকার বাণী, রক্ষ ঠাকুরাণী, কায়স্থ যতেক আছে।"

ক্ষেমানন্দ তাঁহার কাব্য-মধ্যে এই ভাবে নিজের আত্মবিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন,

ক্ষেমানন্দের পরিচয়

"শুন ভাই পূর্ব্ব কথা দেবী হৈলা বরদাতা
সহায় পূর্ব্বক বিষহরী।
বলিভদ্র মহাশয় চন্দ্রহাসের তনয়
তাঁহার তালুকে ঘর করি।

তিন পুত্র অল্প বয় প্রসাদ গুরু মহাশয়
তালুকের করে লেখা পড়া।
তাহার তালুকে বৈসে প্রজা নাই চাষ চসে
শমন নগর হইল কাঁথড়া॥

রণে পড়ে বারা খাঁ, বিপাকে ছাড়িল গাঁ,
যুক্তি করেন জনে জন।
দিন কত ছাড়িয়া যাই তবে সে নিস্তার পাই
সকলের তবে ভাল জান॥
শ্রীযুত আস্কর্ণ রাএ অনুমতি দিল তাএ,
যুক্তি দিল পালাবার তরে।
তার যুক্তি স্তুনি বাণী পলাএ অনেক প্রাণী
বড়ই প্রমাদ হৈল পুরে॥
মনে ভাবি সবিস্ময় বেলা আছে দণ্ড ছয়
সঙ্গে লইয়া অভিরাম ভাই।
অবসান হল বেলা গ্রামের উত্তর জলা
খড় কাটিবারে তথা যাই॥
মুচিনীর বেশ ধরি বলেন দেবী বিষহরী
কাপড় কিনিতে আছে টাকা।
এতেক কহিয়া মোরে কপট চাতুরী করে
যত্নে এক ইয়া দেই টাকা॥
বেষ্টিত ভুজঙ্গ ঠাটে অবতরি মাঝ মাঠে
দেখি মোর মুখে উঠে ধূলা।
পাইলাম মনস্তাপ দেখিলাম অনেক সাপ
আমারে বেড়িলো কথো গুলা॥
যেরূপ দেখিলা নেতে মানা কৈল প্রকাশিতে
কহিলে না হব তোর ভাল।
ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ কবিত্বে কর প্রবন্ধ
আমার মঙ্গল গাইয়া বোল॥

উদ্ধৃত পদভাগে যে বারাখাঁর উল্লেখ রহিয়াছে, তিনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত সিলিমাবাদ পরগণার অধিপতি ছিলেন। উক্ত জিলার সিলামপুর গ্রামে এখনও তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। ক্ষেমানন্দ বারাখাঁর মৃত্যুর পর সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহার কাব্য রচনা করেন।

ক্ষেমানন্দের সময়

মনসাদেবীর আর এক নাম কেতকা।[1] সেইজন্য ক্ষেমানন্দ নিজেকে কেতকাদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের কোন কোন স্থলে কেবল কেতকাদাস ভণিতা দেখিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র লোক বলিয়া ভ্রম করিবার কোন কারণ নাই।

ক্ষেমানন্দের কাব্যে প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় খুব বেশি নাই, তবে স্থানে স্থানে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বেহুলার দুঃখ বেদনা বর্ণনায় কবি সার্থক করুণরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহার কাব্য বৈশিষ্ট্য বর্জ্জিত। স্থানে স্থানে চণ্ডীমঙ্গল ও রামায়ণের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। কালীদহে চাঁদসদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবি সম্পর্কে ঝড় বৃষ্টির বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য,—

কাব্যের দোষগুণ

অবনী আকাশে, প্রখর বাতাসে, হৈল মহা অন্ধকার।
গঠিয়া গাবর নায়ের নফর নাহিক দেখে নিস্তার ॥
গজ শুণ্ডাকার পড়ে জলধার ঘন ঘোর তর্জ্জে গর্জ্জে।
মনে পাইয়া ডর বলে সদাগর যাইতে নারিনু রাজ্যে ॥
হুড় হুড় হুড় পড়িছে চিকুর বেগে যেন ধায় গুলি।
বলে কর্ণধার নাহিক নিস্তার ভাঙ্গিল মাথার খুলি ॥
দেখিতে অদ্ভুত হইছে বিদ্যুৎ ছাইল গগনের ভানু।
বিপদ গণিয়া বলিছে বেণিয়া কেন বা বাণিজ্যে আনু ॥

---

১ "কেতকা পাতে জন্ম লৈল কেতকা সুন্দরী ॥"—ক্ষেমানন্দ

অন্যান্য মনসা-মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ক্ষেমানন্দের কাব্যের কাহিনীগত বিশেষ অনৈক্য নাই। তবে ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলার মাতার নাম সুমিত্রার স্থলে অমলা বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যত্র প্রায় এক। বিশেষভাবে নারায়ণদেবের কাব্যই তাঁহার আদর্শ ছিল বলিয়া মনে হয়। নারায়ণদেবের আলোচনায় এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কবি কালিদাসের মনসা-মঙ্গল রচিত হয়।[১] কালিদাস পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার কাব্যে যে সমস্ত স্থানের নামোল্লেখ আছে তাহা সমস্তই বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার অন্তর্গত। নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে কবি এই মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন

কালিদাস

"কহে কবি কালিদাস গৌড় দেশে যার বাস
বিরচিল মনসা-মঙ্গল।"

গ্রন্থ রচনার কাল সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন,

"গ্রহ বিধু ঋতু শশী শকের গণনা।
এই শকে এই কাব্য করিল রচনা॥"

ইহা হইতেই জানা যায় যে, ১৬১৯ শকাব্দ অথবা ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা সম্পন্ন হয়। কবি তাঁহার কাব্য রচনা প্রসঙ্গে দুই জনের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। প্রথমতঃ কার্ত্তিক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ; তাঁহার আদেশেই কবি কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন; দ্বিতীয়তঃ গোলোক নাথ। সম্ভবতঃ গোলোক নাথ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবি। প্রত্যেক পদের শেষেই নিজের ভণিতার সঙ্গে তাঁহারও নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,

রচনা-কাল

'গোলোক নাথের পদ পঙ্কজ স্মরণে।
মনসা-মঙ্গল কবি কালিদাসে ভণে॥'

১ 'কবি কালিদাসের মনসা-মঙ্গল' (ভোলানাথ ব্রহ্মচারী) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৯

কবি কালিদাসের রচনা সরল ও পাণ্ডিত্যের দুর্ভার-মুক্ত। তাহার ভাষায়ও লালিত্য আছে, চরিত্র চিত্রণে মৌলিকতাহীন হইলেও রচনার দিক দিয়া ইহা সার্থক। এই সমস্ত কারণেই তাহার কাব্যখানি হৃদয়গ্রাহী। পশ্চিম বঙ্গের অনেক স্থলেই ইহা বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। পতির মৃত্যুতে বেহুলার শোকের চিত্রটি অত্যন্ত করুণ,—

'কান্দে বালি করিয়া বিলাপ।
ললাটে হানিয়া কর অঙ্গ এড়ি অনাদর
উপজিল বিষম সন্তাপ॥
পড়িয়া ভূমির তলে ভাসিল নয়ান জলে
ধৌত হৈল উজ্জ্বল কাজল।
পড়িছে আনন মাঝে, জেন দেখি দ্বিজ রাজে
শোভিত করয়ে কলেবর॥"

জীবন মৈত্র

বগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীর তীরে লাহিড়ী পাড়া গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে মনসা-মঙ্গলের অন্যতম কবি জীবন মৈত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম অনন্ত, মাতার নাম স্বর্ণমালা,—

"স্বর্ণমালা সুত কবি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
শ্রীমৈত্র জীবন গায় অনন্ত নন্দন॥"

অনন্তের পাঁচ পুত্র ; জীবন তাঁহাদের এই ভাবে পরিচয় দিয়াছেন,

"সর্ব্বাগ্রজ দুর্গারাম, তস্যানুজ আত্মারাম
সর্ব্বেশ্বর প্রাণকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ।
শ্রীকবি ভূষণ নাম বাস লাহিড়ী পাড়া গ্রাম
জীবন মৈত্র চতুর্থের কনিষ্ঠ॥"

জীবনের উপাধি ছিল 'কবি ভূষণ'। তাঁহার কাব্য রচনার কাল সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পদ্মাপুরাণে নিম্নলিখিত নির্দ্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন,

পরিচয়

"মহী পৃষ্ঠে শশী দিয়া বাণ বিধু সমর্পিয়া
বুঝহ সনের পরিমাণ।"

ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১১৫১ বঙ্গাব্দে বা ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কাব্য রচিত হয়। কবি নিজেকে নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবাণীর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের রাজ্যের প্রজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,

"সে সতী পুণ্যবতী রাণী ভবাণী।
মহারাণী বলি তাকে ভুবনে বাখানি॥
যার পুত্র রামকৃষ্ণ রাজা রাজ্যেশ্বর।
অপার মহিমা যশ ভুবনে যাহার॥
তাহার রাজ্যেত বাস ভিক্ষা করি খাই।
কহে কবি জীবন মৈত্র নির্দ্দয় গোঁসাই॥"

'কবি সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। সেইজন্য পণ্ডিত হইয়াও আত্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতে পারিতেন না।' লাহিড়ীপাড়া গ্রাম নাটোরের জমিদারী-ভুক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ জীবন মৈত্র কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের জন্য উক্ত জমিদারের নিকট হইতে যে কোন সমাদর প্রাপ্ত হন নাই, তাহা তাঁহার কাব্য পাঠেই জানা যায়। শুধু তাহাই নহে, রাজা রামকৃষ্ণের বিবাহের সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়াও তাঁহার 'বেগার' খাটিবার প্রায় উপক্রম হইয়াছিল,

"রামকৃষ্ণ রায়ের বিভা তাত বেগার ধুম।
লেখা ছাড়ি র'লাম পড়ি চক্ষে চাপিল ঘুম॥"

কোন মতে ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া থাকিয়া কবি সেইবার বেগার খাটিবার অপমান হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। জীবনের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল ছিল।

জীবনের স্ত্রীর নাম ছিল ব্রজেশ্বরী। এই সাংসারিক অসচ্ছলতাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিবার জন্য কবি সর্ব্বদা তাঁহার কল্পনা-কুঞ্জে বিচরণ করিতেন, কিন্তু ইহার মধ্যে এই কবি-পত্নী আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাদ সাধিতেন,—

"তত্ত্ব দিল পুরদারা, সকল বুদ্ধি হইল হারা
পুঁথি বান্ধি হাটে চলি' যাই।"

কবি জীবন মৈত্র 'পাগ্‌লা জীবন' নামে পরিচিত ছিলেন।

জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণ কাব্য দুই খণ্ডে বিভক্ত,—দেবখণ্ড ও বণিক খণ্ড। দেবখণ্ডে মঙ্গলকাব্যের সাধারণ গৌরচন্দ্রিকা সমূহ, মহাভারত ও পুরাণোক্ত নাগ এবং মনসার জন্ম ও বিবাহ-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বণিক খণ্ডে চাঁদ সদাগর ও বেহুলার বৃত্তান্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, এই বণিক খণ্ডই প্রকৃতপক্ষে পদ্মাপুরাণের মূল লৌকিক কাহিনী; ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব বশতঃ পরবর্ত্তী কালে এই দেবখণ্ড ইহাতে আসিয়া সংযোজিত হইয়াছে। কাহিনীর এই সুস্পষ্ট বিভাগ হইতে ইহাদের পরস্পরের স্বতন্ত্র উদ্ভবই সূচিত হইতেছে।

কাব্য পরিচয়

জীবনের কাব্যে অন্যান্য মনসা-মঙ্গল হইতে কতকগুলি বিষয়ে অনৈক্য লক্ষ্য করা যায়। তাহার মতে, বেহুলার পিতার নাম বাহো সদাগর, মাতার নাম মেনকা এবং ভ্রাতার নাম শঙ্খধর। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বিহারে ছাপরা জিলায় প্রচলিত বেহুলা বিষহরীর কাহিনীতে এই নামগুলি প্রায় জীবন মৈত্রের কাব্যেরই অনুরূপ। আর কোন মনসা-মঙ্গলে

এই প্রকার নাম পাওয়া যায় না। ইহা হইতেই বিহারের কাহিনীর সঙ্গে জীবন মৈত্রের কোন একটা যোগ কল্পনা করা অসমীচীন হইবে না। জীবনের কাব্যে দুই একটি উপকাহিনী ও অন্যান্য মনসা-মঙ্গল কাব্য হইতে একটুকু স্বতন্ত্র। এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, বেহুলা মৃত স্বামী লইয়া কলার মান্দাসে করিয়া চলিয়াছেন, পথে বাণিজ্য প্রত্যাগত সহোদর ভ্রাতা শঙ্খধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। শঙ্খধর ভগিনীকে চিনিতে পারেন নাই, পরন্তু সুন্দরী যুবতীকে নিঃসঙ্গ পাইয়া তাহার নিকট প্রণয় নিবেদন করিলেন। বেহুলা যখন আত্ম-পরিচয় দিল তখন শঙ্খধরের লজ্জার আর সীমা রহিল না। তিনি কৃতকর্ম্মের জন্য অন্তরে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং স্নেহের ভগিনীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেহুলা ভ্রাতার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া নিজের দুর্গম কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইয়া চলিল।

জীবনের রচনা সর্ব্বত্র সরল নহে। কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যই তাহার অধিক ছিল। শব্দচয়নে কবি তাহার কাব্যমধ্যে পাণ্ডিত্যের অবতারণা করিলেও অনেকস্থলেই তাহা সহজকবিত্বস্ফুর্ত্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য রচনা অনেকস্থলেই লালিত্য-হীন। কিন্তু কোন কোন স্থলে তিনি এই পাণ্ডিত্য মুক্ত হইয়া সহজ ভাষায়ও অন্তরের ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এমন স্থলেই তাহার প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভ্রাতা শঙ্খধর ভগিনীকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিতেছেন,

রচনার দোষ

"সাধু বলে তুমি ভগ্নী সোহাগিনী যাও।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হইয়া কোন দেশে যাও॥
বাপ বড় দুরন্ত জানিনু এতদিনে।
তার কারণে জলে ভাসে দয়ার বহিনে॥

কি দণ্ড লাগিল পিতার কোন দুঃখে মরে।
কি দেখিয়া বিভা দিল সর্প খাউকার ঘরে॥
একখানি ভগিনী ছয় ভায়ের দুলালী।
শূন্য কৈল ঘর মায়ের কোল কৈল খালি॥"

অনেক অনাবশ্যক ও অবান্তর রচনায় জীবনের কাব্য ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে; কাহিনীর সহজ গতি ইহাতে বহুল পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। জীবন নিখুঁত চিত্রকর ছিলেন। সংসারের প্রত্যেকটি বাস্তব অভিজ্ঞতা রচনায় তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সেইজন্যই আয়োজনের স্তূপের নীচে পড়িয়া তাহার কাব্যের মূল উপকরণ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে নাই। জীবন সংস্কৃতে সবিশেষ পণ্ডিত ছিলেন,—তাহার কাব্যে সংস্কৃত অলঙ্কার উপমারও যথেচ্ছ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

পদ্মাপুরাণের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন কবির সম্বন্ধে যথাসম্ভব আলোচনা করা গেল। এতদ্ব্যতীত বহু অজ্ঞাতপরিচয় কবিও পদ্মাপুরাণ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলের আলোচনা সহজ-সাধ্য নহে। তাহাদের অধিকাংশেরই কাব্যমধ্যে তাহাদের নিজেদের কোন পরিচয়ও পাওয়া যায় না। মনসা-মঙ্গলের এই বাংলা কাহিনী অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতে পর্য্যন্ত কাব্য রচিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে হুগলি কলেজের অধ্যাপক ৺ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ মহাশয়ের চম্পূ কাব্যখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহা ১৮৭০ খৃঃ প্রকাশিত হয়। অনেক অজ্ঞাত-কুলশীল কবি হয়ত উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াও তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন প্রতিষ্ঠাবান কবির নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, সেইজন্যই প্রাচীন প্রত্যেক কবির রচনাতেই প্রক্ষিপ্ত অংশ যেমন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে তেমনি কয়েকজন মুষ্টিমেয় লব্ধকীর্ত্তি কবির বিরাট

মনসা-মঙ্গলের কবিগণ

পক্ষচ্ছায়ায় অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন কবিদিগের পরিচয় চিরতরে গুপ্তই রহিয়া গিয়াছে। আবার ইহার বিপরীতও ঘটিয়াছে। পদ্মাপুরাণের গায়েনগণ অনেক সময় কবিদিগের যশ নিজেরাই হরণ করিয়া লইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, আসরে গাহিতে দাঁড়াইয়া ভণিতার স্থলে আসিয়া কোন সময় নিজেরই নাম জুড়িয়া দিয়াছে, কোন সময় কোন বিস্মৃতপ্রায় অপ্রচলিত প্রাচীন কবির নাম লোপ করিয়া দিয়া তদানীন্তন প্রচলিত কোন কবির নাম ও সংযোগ করিয়া দিয়াছে। ইহাতেই বিশেষ কোন পদ হইতে তাহার প্রকৃত রচয়িতার নাম উদ্ধার করা অনেক সময় দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে।

এ যাবত মনসা-মঙ্গল রচয়িতা প্রায় ৮০ জন কবির নাম পাওয়া যায় কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই প্রকৃত কবি না গায়েন, তাহা অনুমান করিবারও উপায় নাই। কারণ, অনেক স্থলেই অনেকের সামান্য কয়েকটি পদ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহা কবির পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে। নিম্নে এ যাবৎ প্রাপ্ত মনসা-মঙ্গলের কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ করা গেল।

১। হরিদত্ত ২। নারায়ণ দেব ৩। বিজয় গুপ্ত ৪। বিপ্র-দাস ৫। ষষ্ঠীবর ৬। গঙ্গাদাস ৭। বংশীদাস ৮। ক্ষেমানন্দ ৯। রঘুনাথ ১০। যদুনাথ পণ্ডিত ১১। বলরাম দাস ১২। বৈদ্য জগন্নাথ ১৩। বংশীধর ১৪। বল্লভ ঘোষ ১৫। বিপ্র হৃদয় ১৬। গোবিন্দ ১৭। গোপীচন্দ্র ১৮। বিপ্র জানকীনাথ ১৯। দ্বিজ বলরাম ২০। অনুপ ভট্ট ২১। রাধাকৃষ্ণ ২২। হরিদাস ২৩। কমল ২৪। সীতাপতি ২৫। রামনিধি ২৬। চন্দ্রপতি ২৭। গোলোক-চন্দ্র ২৮। কবি কর্ণপুর ২৯। জানকীনাথ দাস ৩০। বর্দ্ধমান দাস ৩১। রামবিনোদ ৩২। আদিত্য দাস ৩৩। কৃষ্ণানন্দ ৩৪। কমল-

লোচন ৩৫। গুণানন্দ সেন ৩৬। জগৎবল্লভ ৩৭। বিপ্র জগন্নাথ ৩৮। জগমোহন মিত্র ৩৯। জীবন মৈত্র ৪০। জয়দেব দাস ৪১ দ্বিজ জয়রাম ৪২। নন্দলাল ৪৩। বাণেশ্বর ৪৪। মধুসূদন ৪৫। বিপ্র রতিদেব ৪৬। বৈদ্য রতিদেব ৪৭। রমাকান্ত ৪৮। দ্বিজ রসিকচন্দ্র ৪৯। রামচন্দ্র ৫০। রামজীবন ৫১। বিপ্র রবিদাস ৫২। বৈদ্য রামদাস ৫৩। দ্বিজ বনমালী ৫৪। বিশ্বেশ্বর ৫৫। বিষ্ণুপাল ৫৬। সুকবি দাস ৫৭। সুখদাস ৫৮। সুদাম দাস ৫৯। বিশ্বনাথ ৬০। শিবানন্দ ৬১। গুণাকর ৬২। রতিনাথ ৬৩। দ্বিজ রঘুনাথ ৬৪। দ্বিজ রত্নেশ্বর ৬৫। দ্বিজ মনোহর ৬৬। গুরুদাস ৬৭। রাম নাথ ৬৮। হরিবল্লভ ৬৯। মহেশ ৭০। তন্ত্রবিভূতি ৭১। জগজ্জীবন ৭২। রাজসিংহ ৭৩। রাজকৃষ্ণ ৭৪। রাধানাথ ৭৫। পুরুষোত্তম ৭৬। কালিদাস ৭৭। ভৈরবচন্দ্র ৭৮। গোলোকনাথ

অসংখ্য কবি যখন মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা সম্পন্ন করিলেন তখন হইতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, গানের আসরে কোন বিশেষ এক কবির একচ্ছত্র আধিপত্য লুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বে হয় ত কোন স্থানে একমাত্র নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত কিম্বা অন্য কোন কবির সমগ্র কাব্যই গীত হইত; কিন্তু কালক্রমে বিষয়বস্তুর পারম্পর্য্য রক্ষা করতঃ প্রত্যেক কবিরই উৎকৃষ্ট অংশ আহরণ করিয়া পদসংগ্রহ সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ করিল। সম্ভবতঃ বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহের রীতি হইতেই পরবর্ত্তী কালে মনসা-মঙ্গল কাব্যেও এই রীতি গৃহীত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই রীতিই পরবর্ত্তী কালে বিশেষ প্রভাবশালী হইয়াছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই ফলে, একই কবির রচনা-মধ্যে অন্যান্য কবির রচনা প্রবেশ লাভ করিতে থাকে এবং তাহা হইতেই প্রত্যেক কবিরই স্বাতন্ত্র্য অল্প বিস্তর লুপ্ত পাইতে আরম্ভ

পদসংগ্রহ

করে। এইজন্য কোন প্রাচীন কবিরই সমগ্র একখানি মূল কাব্য আজ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে।

মনসা-মঙ্গলের এই পদ সংগ্রহকে বলিত বাইশা বা বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল। বাইশ কবি অর্থে বাইশ জনই যে কবি তাহা নহে, বাইশ জনের অধিক কিম্বা অনধিকও কবির রচনা তাহাতে স্থান পাইত। এই

বাইশা

পদ সংগ্রহের রীতি অবলম্বনের ফলে অনেক অখ্যাত-নামা কবির নামও বিস্মৃতি হইতে রক্ষা পাইয়াছে সত্য কিন্তু প্রসিদ্ধ কবিদেরও ইহাতে কোন প্রকার অমর্য্যাদা করা হয় নাই। তাহাতে দুই তৃতীয়াংশই কোন কোন প্রসিদ্ধ কবির রচনা সঙ্কলিত হইত, বাকী এক তৃতীয়াংশ বিভিন্ন কয়জন অখ্যাত কীর্ত্তি কবির রচনা হইতে গৃহীত হইত। এই বাইশা সঙ্কলনে বিশিষ্ট একটি ভৌগোলিক নীতি অনুসৃত হইতে দেখা যায়। বরিশাল অঞ্চলের বাইশা সমূহ একমাত্র সেই অঞ্চলেরই কবিদিগের রচনা সংগ্রহ করিয়াছে, ময়মনসিংহ অঞ্চলের বাইশাসমূহ বরিশাল অঞ্চলের কবিদিগকে বাদ দিয়া স্থানীয় কবিদিগেরই রচনার স্থান দান করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রাঢ় অঞ্চলে যে বাইশা প্রচলিত তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের কবিদিগের উল্লেখ থাকিলেও ক্ষেমানন্দ প্রভৃতির রচনাই সমধিক স্থান পাইয়াছে।

সমগ্র মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে মনসা-মঙ্গল কাব্যই সমধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। এই বিষয়ে পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। সর্পদেবী মনসার পূজার ব্যাপকতাই যে ইহার একমাত্র কারণ তাহা নহে। ইহার চরিত্রগুলির মধ্যেই এমন জিনিষ আছে যাহা স্বভাবতঃই বাঙ্গালীর হৃদয়

মনসামঙ্গলের প্রচার

হরণ করিয়াছে। এইজন্যই বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের উপরও নানা দিক দিয়া এই কাব্যোক্ত কাহিনী অধিকার স্থাপন করিয়াছে। বিবাহের পর যে রাত্রিতে লক্ষীন্দর

সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল এখনও নব বিবাহিত দম্পতীর তাহা কালরাত্রি বলিয়া অভিহিত হয় এবং এই দিবস সমস্ত দিবারাত্রের মধ্যে তাহারা পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে না। এই সম্পর্কে বেহুলারই দুর্ভাগ্যের কথা সাধারণতঃ স্মরণ করা হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান জিলার একটি গ্রামে এখনও প্রতি বৎসর "বেহুলার মেলা" নামে এক বিরাট মেলার অধিবেশন হয়। সাপুড়িয়ারা সাপ দেখাইবার সময় সুর করিয়া টানিয়া টানিয়া যে গান গাহে তাহাতেও অভাগিনী বেহুলার অকাল বৈধব্যের করুণ কাহিনীই শুনিতে পাওয়া যায়। মধ্য-যুগের সাহিত্যে এই চাঁদ সদাগর লক্ষীন্দরের কাহিনীর বহু উল্লেখ রহিয়াছে।

পদ্মাপুরাণের চাঁদ সদাগরের চরিত্রের মত এমন সমুন্নত পুরুষকারের আদর্শ সমগ্র মধ্য যুগের বঙ্গ সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই। এই কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, চাঁদ সদাগরের চরিত্রের আদর্শেই পরবর্ত্তী মঙ্গল-কাব্যের দেব-বিদ্রোহী নায়কদিগের চরিত্রগুলি পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। চণ্ডী-মঙ্গলের ধনপতি সদাগর চাঁদ সদাগরেরই অনুকরণে সৃষ্ট চরিত্র। পরম শৈব চাঁদ অবজ্ঞাভরে মনসা সম্বন্ধে যেমন বলিয়াছিলেন,

চাঁদ সদাগরের চরিত্র

'যে হাতে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি
সে হাতে পুজিব পুণি চেংমুড়ি কাণী'—বিজয় গুপ্ত।

চণ্ডী মঙ্গলের ধনপতিও ইহারই যেন প্রতিধ্বনি করিয়া চণ্ডীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,

'যদি বন্দিশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি॥'—মুকুন্দ রাম।

শীতলা-মঙ্গলের শৈব রাজা চন্দ্রকেতুকেও চাঁদ সদাগরের আদর্শেই শীতলার প্রতি অবজ্ঞাসূচক এই উক্তি করিয়াছিলেন,

'রাজা বলে শীতলা করেছে যদি বাদ।
কদাচিৎ আমি তার না ল'ব প্রসাদ॥'—দৈবকীনন্দন।

অতএব, দেখা যায়, পরবর্ত্তী প্রায় সমস্ত মঙ্গল কাব্যই চরিত্র সৃষ্টির জন্য এই পদ্মাপুরাণের নিকট ঋণী; এই বিষয়ে তাহাদের নিজস্ব প্রায় কোনই মৌলিকতা নাই। তৎকালীন বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে পদ্মাপুরাণের কাহিনীর ব্যাপক প্রভাবেরই ইহা অন্যতম প্রমাণ।

সমগ্র মধ্যযুগের বঙ্গ সাহিত্যের অন্ধকার যুগের মধ্যে কর্ণপাত করিয়া থাকিলে যে একটি চরিত্রের পদশব্দ সর্ব্বপ্রথম শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই এই চাঁদ সদাগরের। যে যুগে দৈবানুগ্রহই জাতির জীবনে পরম প্রসাদ বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই যুগে দৈবানুগ্রহকেই সকল প্রকারে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র নিজের পুরুষকারের উপর এই চরিত্রটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার প্রতি প্রত্যেকেরই প্রশংসমান সহানুভূতি সর্ব্বপ্রথম ধাবিত হয়। এই সমাজ চিরদিনই আদর্শবাদী, অন্তরের এই আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সংসারের কোন বিপদকেই সে কোনদিন গ্রাহ্য করে নাই। নিজস্ব আদর্শের উপাসনায় লাঞ্ছিত চাঁদ সদাগর আদর্শ পূজারী চিরলাঞ্ছিত এই সমাজেরই যেন মূর্ত্ত প্রতীক্। সেই জন্য চাঁদ দেব-বিদ্রোহী চরিত্র লইয়াও সাধারণ জনসমাজের শ্রদ্ধা কখনও হারায় নাই। প্রত্যেকেই চাহিয়াছে, চাঁদের এই লাঞ্ছনার অবসান হউক। ধনে পুত্রে সুখী হইয়া পুনরায় সে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহার নিজের আদর্শের প্রতি এই ঐকান্তিক নিষ্ঠার জন্য দুঃখের ভিতর দিয়াই যেন তাহার জীবন শেষ না হয়। সেই জন্যই দেখিতে পাই, পদ্মাপুরাণের কবিগণ তাহাদের কাব্যের শেষ অঙ্কে চাঁদের চরিত্রে কি এক অসম্ভব পরিবর্ত্তন কল্পনা করিয়াছে। ইহা তাহার মূল চরিত্রগত আদর্শের বিরোধী হইলেও কাব্যের পরিসমাপ্তির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

চাঁদের শেষ মুহূর্ত্তের যে পরাজয় তাহা কাব্যেরই কল্পনা-ফল, প্রকৃত সত্যের ক্ষেত্রে ইহার কোন স্থান নাই।

পদ্মাপুরাণ কাব্য-মধ্যেও চাঁদ সদাগরের চরিত্রের একটা বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে। একদিকে চাঁদের দৃঢ় কঠোর চরিত্র ও অপরদিকে সনকা-বেহুলার সকরুণ চিত্র এই উভয়ের চরিত্রগত বিভিন্নমুখী আদর্শের পরস্পর সংঘাতে পদ্মাপুরাণ কাব্য এক অপূর্ব্ব রসরূপ ধারণ করিয়াছে, এক ঘেয়ে করুণ রসের প্রবাহ হইয়া উঠে নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলেও চাঁদের চরিত্র পদ্মাপুরাণ কাব্যের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিয়া আছে।

আদর্শ সমাজের অন্যতম আদর্শ চরিত্র-সৃষ্টি বেহুলা। আমাদের সমাজের যে নিয়ম তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার দুঃখের ভাগটা অধিকাংশই নারীর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। চক্ষু বুজিয়া সহ্য করিবার ক্ষমতাও এই নারী জাতির অসীম, সেইজন্য যে কোন ব্যবস্থাই সে কোন দিনই মাথা পাতিয়া লইতে অস্বীকার করে নাই, কোন ব্যবস্থার জন্য তাহার কোন দিন কোন প্রতিবাদও শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বেহুলার চরিত্রের মধ্যে এমন একটা জিনিসের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যাহা হইতে মনে হয় যে, এই নিয়মানুবর্ত্তিতার মূলে তাহারও একটু বিদ্রোহের ভাব সুপ্ত রহিয়াছে। মৃত স্বামীকে কোলে করিয়া বেহুলা যখন গাঙ্গুরের স্রোতে অনির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করিল তখন সনকা কাঁদিয়া বলিলেন,

বেহুলা

"সনকা কাঁদিয়া বলে আলো অভাগিনী।
এ তিন ভুবন মাঝে কোথাও না শুনি॥
বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যার পতি মরে।
বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে॥

কিসের কারণে তুমি জলেতে ভাসিবে।
প্রতীত কাহার বোলে কান্তে জিয়াইবে॥"

সনকার এই নজীরে বেহুলা অবিচলিত রহিল। ভ্রাতৃগণ সংবাদ পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিল. ভগিনীর অকাল বৈধব্যের শোকের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভগ্নী-বিচ্ছেদের শোকও জাগিয়া উঠিল, তাহারা বলিল,

"হরি সাধু বলে ভগ্নী মোর বাক্য ধব।
সমুদ্রের কূলে তুমি লখিন্দরে পোড়॥
এইক্ষণে চল বেহুলা মুক্ত শাহের বাড়ী।
খনি বদলে দিব কাঁচা পাটের শাড়ী॥
শঙ্খ বদলে দিব স্ুবর্ণের চুড়ি।
সিন্দুর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি॥"

বেহুলা তথাপি অবিচলিত। কাহারও অনুনয় বিনয় ও সস্নেহ অনুরোধ তাহাকে তাহার লক্ষ্য পথ হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। লৌকিক আকর্ষণ হইতে একটা অনির্দ্দিষ্ট আদর্শের আকর্ষণই তাহার কাছে বড় হইয়া উঠিল এবং তাহার উপরই তাহার জগজ্জয়ী সতীত্বেরও প্রতিষ্ঠা হইল। আজ যদি বেহুলা শাশুড়ী ও ভ্রাতার নির্দ্দেশ মত সমাজের সাধারণ নিয়মানুযায়ী মৃত স্বামীর সৎকার করিয়া আসিয়া সমাজের আরও দশজন বিধবার মত নিষ্ঠাবান জীবন যাপন করিয়া যাইত তাহা হইলে তাহার সতীত্বের এই ঔজ্জ্বল্য হয়ত প্রকাশ পাইত না কিন্তু আজ যে সে এই সমাজ নির্দ্দেশেরই প্রতিবাদ করিয়া পরিস্ফুট যৌবনেও মৃত স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া সুদুর প্রবাস হইতে স্বামীর পুনর্জীবন লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে সেইজন্যই তাহার প্রকৃত গৌরব। বেহুলার দুঃখ-সহনশীলতার চাইতেও তাহার এই নির্ভীক তেজস্বিতাই যেন সকলের মন অধিক আকৃষ্ট করে। সহনশীলতা নারীর ধর্ম্ম। ছয় অকাল বিধবা পুত্র বধূর গভীর

মৌন বেদনা চাঁদ সদাগরের সংসারকে স্তব্ধ শ্মশানের মত নিত্য নিরানন্দ করিয়া রাখিয়াছিল। বেহুলা চাঁদ সদাগরের সংসারে যেন এই গতানুগতিক দুঃখসহনশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে আসিল। নির্ম্মম অত্যাচারী মৃত্যুর হাত হইতে অসীম সংগ্রাম করিয়া সে সকলের প্রাণ ফিরাইয়া আনিল। অত্যাচার অবিচার নীরবে মাথা পাতিয়া বহন করাও কাপুরুষতা; আত্ম-শক্তিকে জাগ্রত করিয়া সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করিতে জানে সেই সংসারে প্রকৃত বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী। অত্যাচারী দৈবশক্তি বেহুলার এই একাগ্র সাধনার নিকট মাথা নত করিতে বাধ্য হইল, এইখানেই বেহুলার জয়।

সনকা

'পদ্মাপুরাণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক চরিত্রই সনকার। সমগ্র মধ্য যুগের বঙ্গ-সাহিত্যে জাতীয় বাঙ্গালী চরিত্র বলিয়া যে কয়টি চরিত্র দাবী করিতে পারে ইহা তাহাদের অন্যতম। সনকার চরিত্রটি বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায়, পদ্মাপুরাণের কবিদিগের চরিত্র সৃষ্টির আদর্শ যত উচ্চই হউক তাহাদের দৃষ্টি বাঙ্গালীর গৃহাঙ্গিনা হইতে বহুদূর অপসারিত হয় নাই; আদর্শ সৃষ্টিই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না, বাস্তবতার প্রতিও তাহাদের প্রবল আকর্ষণ ছিল। সনকার চরিত্র এই বাঙ্গালী কবির অনবদ্য বাস্তব সৃষ্টি।'

মনসা

আর একটি চরিত্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান অধ্যায়ের উপসংহার করিব। তাহা মনসা। উল্লিখিত মানব চরিত্রগুলির সংস্পর্শে আসিয়া এই দেব চরিত্রটি এত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে যে এই সম্পর্কে তাহার আলোচনা এক প্রকার অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াই মনে হয়। পদ্মাপুরাণের কবিগণ তাহার উপর বাহ্যতঃ দৈব আভিজাত্য আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু ইহাতে তাহার আভ্যন্তরিক দৈন্য কিছুতেই প্রচ্ছন্ন হইতে পারে নাই। পদ্মাপুরাণের মধ্যে

প্রকৃত পক্ষে মহত্ত্ব যদি কাহারও ফুটিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা কোন দেব-চরিত্রের মধ্যে ফুটে নাই তাহা মানুষের মধ্যেই ফুটিয়াছে। চাঁদ-সদাগরকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য মনসা বার বার যে সমস্ত হীন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় লইয়াছে, তাহা কোন দেব-চরিত্র সম্পর্কে কল্পনা করা যায় না। মৃত স্বামীর অস্থি কয়খানি সম্বল করিয়া বেহুলা যখন স্বর্গের দেব-সমাজে গিয়া উপস্থিত হইল তখন দেবগণ তাহার স্বামীর প্রাণদানের বিনিময়ে তাহার নৃত্য দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। শবের সহযাত্রিণী হইয়া এই দীর্ঘ দুস্তর পথ যে নিঃসঙ্গ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, দেবতাদিগের এই ক্রুর ঔৎসুক্য তাহাকে আঘাত করিতে পারিল না। সে তাঁহাদের এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন অভিলাষ পূর্ণ করিল। ইহাতে দেব-সমাজের অন্তরের অসীম দৈন্য প্রকাশ পাইল, কিন্তু বেহুলার মহত্ত্বের এতটুকু খর্ব্ব হইল না। সেইজন্যই বলিয়াছি, পদ্মাপুরাণে দেবতা নাই, পদ্মাপুরাণ প্রকৃত মানুষেরই কাব্য।*

তৃতীয় অধ্যায়

মঙ্গলচণ্ডী পূজার ইতিহাস—চণ্ডীমঙ্গল

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি, দ্রাবিড়প্রমুখ অনার্য্য সমাজ হইতেই স্ত্রীদেবতার পূজা ক্রমে আর্য্য সমাজেও প্রচলন লাভ করে। এই মাতৃকা অথবা স্ত্রীদেবতার পূজা অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজে শক্তিপূজার প্রতিষ্ঠা হয়[১]। সমগ্র ভারতময় বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাপক প্রচারের ফলে জগত ও জীবনের প্রতি সমাজের যে নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের ভাব পুঞ্জীভূত হইতেছিল তাহার প্রতিক্রিয়ারূপেই সমাজে এই শক্তিপূজার আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধভাবে সমাচ্ছন্ন এই ভারতীয় সমাজের বুকে যখন মায়াবাদী শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক এই নিষ্ক্রিয় জীবনের আদর্শই দার্শনিক আধ্যাত্মিকতার গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে গেল তখনই সমাজের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাবও প্রবল হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ ও হিন্দুর তন্ত্র তখনই প্রবল ভাবে সমাজমধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল। সেইজন্যই প্রাগৈতিহাসিক যুগে সমাজে স্ত্রীদেবতার পূজা প্রতিষ্ঠিত হইলেও অতি পরবর্ত্তীকালে এই স্ত্রীদেবতাকে সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী করিয়া কল্পনা করা হইয়াছিল। আবার এই বিদ্রোহের 'প্রচণ্ডতার ঝড়' যখন সমাজে কাটিয়া গেল তখন আবার এই শক্তি স্ত্রীদেবতাকেই ভক্ত রামপ্রসাদ প্রমুখ কবিদিগের গানে কল্যাণী ব্রহ্মময়ী-রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিতে পাওয়া গেল।

শক্তিপূজা

---

১ Sakti or Divine Power, Int. (S. K. Das)

পৌরাণিক শৈবধর্ম্মের উদ্ভবের মূলে অনার্য্য প্রভাব থাকিবার ফলেই অনার্য্য সমাজ হইতে আগত শক্তি-ধর্ম্মও স্বভাবতঃই সর্ব্বপ্রথম শৈবধর্ম্মেরই সংস্পর্শে আসিল। তাহাতেই শৈবধর্ম্মের পৌরাণিক আভিজাত্য স্থাপনের চেষ্টা আরও ব্যর্থ হইল। শক্তিকে স্ত্রীরূপিণী বলিয়া কল্পনা করা হইতে লাগিল এবং শৈবধর্ম্মের সহিত তাঁহার সান্নিধ্যের ফলে তিনি অচিরেই পৌরাণিক প্রসঙ্গে শিবের ভার্য্যারূপে পরিণত হইলেন।* সংস্কৃত পুরাণ ও তন্ত্রের হাতে পড়িয়া এই শক্তিদেবীর পরিকল্পনা কালক্রমে অত্যন্ত বিকৃত রুচির পরিচায়ক হইয়া উঠিল; বৈদিক হিন্দুধর্ম্মের সমুচ্চ আদর্শকে এই শক্তিদেবতা এক অনুদার ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিল। সাধারণ সমাজের মধ্যে ইহার পরিকল্পনা এত রুচিকর হইয়া পড়িল যে অনতিকাল মধ্যেই তাহা হিন্দুধর্ম্মের মূল আদর্শকে একেবারে প্রচ্ছন্ন করিয়া দিল। পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই অনার্য্য প্রভাবই সেই যুগে জয়ী হইয়াছিল।

শিবের পত্নীই এই শক্তিদেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; পুরাণে তাঁহার বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন রূপ, তন্ত্রে তাঁহার গুণগ্রাম আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। শিবের পত্নী হইলেও তাঁহার প্রভাব শিবের অপেক্ষা বেশী, তাহার প্রতিষ্ঠাও শিব হইতে স্বতন্ত্র। শুধু শৈবধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক দেখাইবার জন্যই বাহির হইতে তাঁহার সঙ্গে এই সম্পর্ক কল্পনা করা হইয়াছে। অবশ্য সেই যুগে নিম্ন শ্রেণীর সমাজের মধ্যেই এই শক্তিদেবীর প্রভাব বর্ত্তমান ছিল।[১] পুরাণে তাহার এই সমস্ত নাম পাওয়া যায়, যথা, দুর্গা, নারায়ণী, ঈশানী, বিষ্ণুমায়া, শিবা, সতী, নিত্যা, সত্যা, ভগবতী, সর্ব্বাণী, সর্ব্বমঙ্গলা, অম্বিকা, বৈষ্ণবী, গৌরী, পার্ব্বতী, সনাতনী।[২] পরবর্ত্তী কালে বিশেষ প্রচলিত নামই চণ্ডী।

১ Studies in the Religions of the East, (A. S. Goden) Pg. 397.

২ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৫৭ অধ্যায়।

চণ্ডী বৈদিক দেবতা নহেন; রামায়ণ, মহাভারত কিম্বা প্রাচীন কোন পুরাণে এই দেবতার উল্লেখ মাত্র নাই। পরবর্ত্তী কয়েকখানি সংস্কৃত পুরাণ, বিশেষতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, দেবী ভাগবত, বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ হরিবংশ প্রভৃতিতে এই দেবীর সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। ইহা হইতেই মনে হয়, পরবর্ত্তীকালে অনার্য্য সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়া এই দেবী আর্য্য সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন।

চণ্ডীর অনার্য্য উদ্ভব

'চণ্ডী' শব্দটিও অর্ব্বাচীন সংস্কৃত, অর্থাৎ কোন অনার্য্য ভাষা হইতে পরবর্ত্তী কালে সংস্কৃত শব্দকোষে স্থান লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, চণ্ডী শব্দটী মুণ্ডা ভাষা হইতে আগত। মুণ্ডা শ্রেণীভুক্ত ওরাওঁ প্রভৃতি জাতির মধ্যে 'চাণ্ডী' নামে এক শক্তি-দেবীর সহিত পরিচয় লাভ করা যায়।[১] তাহা হইতেই কেহ কেহ অনুমান করেন, দ্রাবিড়দিগের পূর্ব্বেই এই মুণ্ডা জাতির মধ্যে শক্তি-পূজা ভারতে প্রচলিত ছিল।[২] অতঃপর ক্রমে দ্রাবিড় ও আর্য্য সমাজের মধ্যেও তাহা প্রসার লাভ করে। যাহাই হউক, এই ওরাওঁ জাতির দেবতা চাণ্ডী ও বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের চণ্ডী যে মূলতঃ একই দেবতা এই বিষয় নিঃসন্দেহ। তবে কালক্রমে এই মুণ্ডাজাতীয় দেবতা হিন্দু আদর্শে নব-কলেবর ধারণ করিয়াছে, এই মাত্র। মুণ্ডা সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, "অর্দ্ধ রাত্রে উলঙ্গ হইয়া 'চাণ্ডী'র ওরাওঁ অবিবাহিত যুবক পূজারী চাণ্ডীস্থানে গিয়া পূজা করে।"[৩] এই ওরাঁও, সাঁওতাল প্রভৃতি মুণ্ডাসমাজ হইতে এই দেবতা ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রে প্রবেশলাভ করে। যে সমস্ত প্রদেশে মুণ্ডাজাতীয় লোক অধিক

---

১ 'ভারতের মানব ও মানব সমাজ'—(শ্রীশরৎচন্দ্র রায়) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৫ ভাগ, পৃঃ ২৪৭

২ ঐ

৩ ঐ

পরিমাণে বসবাস করিতেছে, যেমন,রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা,ছোটনাগপুর ও তাহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থান যথা, মালদহ, রাঢ় প্রভৃতি স্থানে এই চণ্ডীপূজার বিশেষ লোকপ্রিয়তা এই উক্তিরই পরিপোষকতা করিতেছে।

মুণ্ডা সমাজের এই চণ্ডী হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রে ঠিক কোন সময়ে প্রবেশ লাভ করিলেন স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই; তবে তান্ত্রিক ধর্ম্মের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হইয়া গেল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। আর্য্য সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া এই দেবী সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বশতঃ তন্ত্রগ্রন্থাদিতে চণ্ডিকা, চণ্ডেশ্বরী, চণ্ডী, চণ্ডা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন এবং এইভাবে ক্রমে সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যেও তিনি স্থানাধিকার করিয়া লইলেন।

ব্যাধের দেবতা

চণ্ডী মূলতঃ ব্যধজাতিরই দেবতা এবং পশুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মুণ্ডা-জাতীয় লোক ব্যাধবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সেইজন্য তাহাদের মধ্যে এই দেবতার প্রভাব [ব]ই ব্যাপক। এই মুণ্ডাসমাজের উপর আর্য্য ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত [হ]ইলে পর এই সমাজের নিজস্ব এই দেবতাটিও একটু আর্য্য ভাবাপন্ন [হ]ইয়া হিন্দু সমাজেও প্রবেশের উপায় করিতে লাগিলেন। এই অনার্য্য [ব্যা]ধজাতির দেবতার আর্য্য-সমাজে প্রবেশাধিকার লইয়া চণ্ডীমঙ্গল [কা]ব্যগুলি রচিত হয়।

এই চণ্ডী যে ব্যাধ ও পশুকুলেরই দেবতা চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলি হইতেও [ত]াহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 'গোহিংসক অস্পৃশ্য' ব্যাধ-সন্তান [কা]লকেতুই এই চণ্ডীর প্রথম পূজারী। কালকেতুর বিক্রমে পরাজিত [হ]ইয়া পশুকুল এই চণ্ডীরই শরণাপন্ন হইতেছে। শূকর মাংসের মত [অ]স্পৃশ্য মাংসও চণ্ডীপূজারই উপকরণরূপে বর্ণিত আছে। চণ্ডী ও

গঙ্গার মধ্যে যখন বিবাদ উপস্থিত হইল তখন গঙ্গা চণ্ডীকে নিন্দা করিয়া কহিলেন যে, তুমি

'নীচ পশু নহি ছাড় বরা।'[১]

এইভাবে অস্পৃশ্য ব্যাধসমাজে জন্মলাভ করিয়া ক্রমে আর্য্য সমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে এই দেবতার প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল, এবং ক্রমে পৌরাণিক একটি প্রসিদ্ধ স্ত্রীদেবতার চরিত্র পার্ব্বতীর সঙ্গে এক হইয়া এই চণ্ডী পরবর্ত্তী হিন্দু সমাজে এক বিশেষ স্থানাধিকার করিয়া লইলেন। পরবর্ত্তীকালে হিন্দু-ভাস্কর্য্যে গঠিত কোন কোন চণ্ডীদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে পশুরাজ সিংহ, হস্তী ও গোধিকা খোদিত দেখিয়া এই দেবতা যে পূর্ব্বোক্ত আরণ্য ব্যাধজাতি কর্ত্তৃকই সর্ব্বপ্রথম পূজিতা হইতেন এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়।

বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রে বহু স্ত্রীদেবতাকেই শক্তিরূপিণী বলিয়া কল্পনা করা হইত। তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধ তন্ত্রোক্ত বজ্রতারার নাম বিশেষভাবে

বজ্রতারা

উল্লেখযোগ্য। অনেকে অনুমান করেন,[২] বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী এই বজ্রতারা পরবর্ত্তীকালে পৌরাণিক চণ্ডীতে পরিণত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ওরাওঁ জাতির চাণ্ডী বৌদ্ধ ও হিন্দুতান্ত্রিক সমাজেও নিজের প্রবেশাধিকার স্থাপন করা সম্ভব। অতঃপর এই তন্ত্র সাহিত্য হইতেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে এই দেবী পৌরাণিক সাহিত্যেও প্রবেশলাভ করিয়া থাকিবে। অতএব ওরাওঁ ব্যাধদিগের দেবতার বিশেষ কোন কোন গুণের অস্তিত্ব তন্ত্রোক্ত দেবতার মধ্যেও আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধনমালায় বজ্রতারার যে সাধনার কথা উল্লেখ আছে তাহাতে তাহাকে পরিপূর্ণ শক্তিদেবতা কল্পনা করা হইলেও

১ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, (পৃঃ ২৪২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ

২ চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী (চারু বন্দোপাধ্যায়) ২য় ভাগ, পৃঃ ৯০০

তাহার মধ্যে ব্যাধ কিংবা পশু সংশ্রবের কোন ইঙ্গিত দৃষ্টিগোচর হয় না। বজ্রতারার নিম্নোদ্ধৃত ধ্যান হইতেই তাহা প্রতীয়মান হইবে,—

"মাতৃমণ্ডলমধ্যস্থাং তারাদেবীং বিভাবয়েৎ।
অষ্টবাহুং চতুর্ব্বক্ত্রাং সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতাম্॥
কনকবর্ণনিভাং ভব্যাং কুমারীলক্ষণোজ্জ্বলাম্।
পঞ্চবুদ্ধমহামুক্তিং বজ্রসূর্য্যাভিষেকজাম্॥
নবযৌবনলাবণ্যাং চলৎকনককুণ্ডলাম্।
বিশ্বপদ্মসমাসীনাং রক্তপ্রভাবিভূষিতাম্॥
বজ্রপাশ তথা শঙ্খসচ্ছরোদ্যতদক্ষিণাম্।
বজ্রাঙ্কুশোৎপলধনুস্তর্জ্জনীবামধারিণীম্।

বজ্রপর্য্যঙ্কযোগেন সাধয়েৎ ভুবনত্রয়ম্॥—সাধনমালা,৯৫।৬৭।৭৩।৪

এই বজ্রতারা দেবী বৌদ্ধ তান্ত্রিক সমাজের নিজস্ব পরিকল্পনা বলিয়াই মনে হয়, ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত ওরাওঁ জাতির চাণ্ডীদেবীর কিম্বা পরবর্ত্তী পৌরাণিক চণ্ডীদেবীর কোন গুণেরই সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না।

বজ্রযান বৌদ্ধসমাজে বজ্রধাত্বীশ্বরী বা বজ্রধাত্বেশ্বরী নামে এক শক্তি দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই দেবী ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধ বজ্রসত্ত্বের শক্তি-স্বরূপিণী। তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে এই দেবীর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বজ্রসত্ত্বের সঙ্গে তাহার মুর্ত্তিও সর্ব্বত্রই পূজিত হইত।

বজ্রধাত্বীশ্বরী

সাধনমালায় এই বজ্রধাত্বেশ্বরীর যে সাধনার কথা উল্লেখ আছে তাহাতে তাঁহার সহিত সর্প, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি পশুরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"বজ্রধাত্বীশ্বরীং মারীচীং দ্বাদশভুজাং রক্তাং ষন্মুখীং লম্বোদরাং জ্বলৎ-পিঙ্গলোর্দ্ধকেশাং কপালমালিনীং সর্পমণ্ডিতমেখলাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরাং নানাবরাহাকৃষ্যমানরথাং·········ত্রিনেত্রাং ললজ্জিহ্বাং করালবদনামতি-ভয়ানকাকারাং চিন্তয়েৎ" —সাধনমালা ১৩৩

কেহ কেহ অনুমান করেন, এই বজ্রধাত্বীশ্বরীই বাংলার লৌকিক শাক্ত দেবী বাসুলী নামে অভিহিত হন।[১] তাঁহাদের মতে বজ্রেশ্বরী হইতে বাসুলী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু সাধন-মালায় বজ্রেশ্বরী নামে কোন দেবতার উল্লেখ নাই, বজ্রধাত্বেশ্বরী, বা বজ্রধাত্বীশ্বরীই উক্ত শাক্ত দেবীর প্রকৃত নাম। এই বজ্রধাত্বেশ্বরী দেবীর সহিত কতকগুলি হিংস্র পশুর সংশ্রব দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে, সম্ভবতঃ ওরাওঁ, সাঁওতাল প্রভৃতি মৃগয়া-জীবীর সমাজ হইতেই এই দেবী বজ্রযান বৌদ্ধ সমাজে গিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত চাণ্ডীদেবীই সাময়িকভাবে বজ্রযান তান্ত্রিক সংজ্ঞানুযায়ী এই নূতন নামে অভিহিত হইতেছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এই তান্ত্রিক ধর্ম্ম লোপ পাইতে আরম্ভ করিলে সংস্কৃত পৌবাণিক সাহিত্যে চাণ্ডী অথবা চণ্ডী নামেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

বাশুলী

প্রাচীন বঙ্গসমাজে বাসুলীর বিশেষ প্রভাব বর্ত্তমান ছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। 'বাসুলী-মঙ্গল' নামে দুই একখানি মঙ্গলকাব্যও তাঁহার উপর রচিত হইয়াছিল। প্রাক্ চৈতন্যযুগের অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস এই বাসুলীরই সেবক ছিলেন বলিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথিতে বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি কারণে মনে হয়, বাসুলী লৌকিক গ্রাম্যদেবতা; পরবর্ত্তী কালে পৌরাণিক প্রভাব বশতঃ হিন্দু ও বৌদ্ধ পূজায় স্থান পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় ১৩৩৫ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় 'উড়িষ্যায় বাশুলী" (পৃঃ ১০৪) নামক প্রবন্ধে উড়িষ্যার কেওট বাড় প্রমুখ জাতির মধ্যে প্রচলিত ঘোড়ামুখ বাশুলী নামক এক দেবতার পরিচয় দিয়াছেন। মনে হয়, এই বাসুলী ও বাংলার বাসুলী একই অনার্য্য সমাজ হইতে আসিয়াছে। এই সম্পর্কে প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন "হয়ত

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ভূমিকা, (শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়) পৃঃ ২২

ইনি প্রথমে গ্রাম্য দেবতা ছিলেন, পরে হিন্দু দেবদেবীর পংক্তিতে স্থান পাইয়াছেন, হয়ত বা ইনি দ্রাবিড়-দেশাগতা।” সমাজে পৌরাণিক দেবতাদিগের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পৌরাণিক পার্ব্বতী ও বাসুলী অভিন্ন হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন। তখন হইতেই বাসুলী দেবীর উপর পৌরাণিক গুণাবলীর প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে এবং বাসুলীই তখন চণ্ডী নামে পরিচিত হন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে গিয়া এই মিলন কার্য্য সম্পূর্ণ হয়, ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্ম মঙ্গলের নিম্নোদ্ধৃত পদভাগ হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে,—

“বাশুলী বলেন বাছা শুন প্রাণ জোয়া।
কোথা পাব জোয়ান আপনি ভজি বুড়া॥”

বাসুলী নিজেকে বৃদ্ধ স্বামীর বা শিবের পত্নী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, অর্থাৎ এখানে বাসুলী ও পার্ব্বতী সম্পূর্ণ অভিন্না। কিন্তু বাশুলীর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ধ্যান-মন্ত্রেই তাহাকে শিবের পত্নী বলা হয় নাই। কালক্রমে সমাজে হিন্দু পৌরাণিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন পৌরাণিক দেবতার আবরণে সমস্ত লৌকিক দেবতাই আত্মগোপন করিতে ছিলেন তখন পৌরাণিক পার্ব্বতীর মধ্যে বিভিন্ন লৌকিক শাক্তদেবীর পরিকল্পনা শেষ পরিণতি লাভ করিতেছিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কি ভাবে যে এই বিভিন্ন সম্প্রদায়গত আদর্শগুলি ঐক্য সন্ধান করিতেছিল তাহাই এ স্থলে উল্লেখ করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাক্‌চৈতন্য বাংলার সমাজে বাশুলী নামে এক শাক্ত দেবীর বিশেষ প্রাধান্য ছিল। চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস তৎকালীন বাংলার সমাজিক অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,

“বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥” আদি ২ অধ্যায়

এই বাশুলী দেবীর উৎপত্তির ইতিহাস যাহাই থাকুক, তিনি যে প্রথমতঃ চণ্ডী হইতে স্বতন্ত্র দেবতা ছিলেন, এই বিষয় নিঃসন্দেহ। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে এই বাশুলীর সহিত চণ্ডী আসিয়া মিলিত হন। নিম্নোদ্ধৃত বাশুলীর ধ্যান ও আবাহন মন্ত্রের মধ্যে এই উভয় দেবতারই একত্র সংমিশ্রণ অনুভব করা যায়,—

বাসুলী ও চণ্ডী

"ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপুরে
সিন্দূরাভাব সন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাসুলী পাতু সা নঃ॥

ওঁ বাশুল্যৈ নমঃ।

ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটি সমপ্রভাম্॥
রক্তবস্ত্রপরিধানাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্।
অষ্টতণ্ডুল দূর্ব্বাক্তাং অর্চ্চেন্মঙ্গলকারিণীম্॥
অসিদ্ধ সাধিনীং দেবীং কালীং কিল্মিষনাশিনীম্।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ কল্পয়॥"[১]

এই ধ্যান ও আবাহন যে মূলতঃ এক দেবতার ছিলনা তাহা উদ্ধৃত অংশ একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। প্রথমোক্ত ধ্যান মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবী বাশুলী ও শেষোক্ত আবাহন মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবী চণ্ডী বা চণ্ডিকা।

পুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর যে ধ্যানের উল্লেখ আছে তাহাও উদ্ধৃত শেষাংশের প্রায় অনুরূপ, কিন্তু প্রথমাংশের সম্পূর্ণ বিপরীত, যথা,—

"দেবীং ষোড়শবর্ষীয়াং শশ্বৎ সুস্থির যৌবনাম্।
সর্ব্বরূপ গুণাঢ্যাঞ্চ কোমলাঙ্গীং মনোহরাম্॥

১ 'ধর্ম্মপূজা বিধান' (শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) পৃঃ ১০২—৩

শ্বেত চম্পকবর্ণাভাং চন্দ্রকোটি সমপ্রভাম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণ ভূষিতাম্॥
বিভ্রতীং কবরীভারং মল্লিকামাল্যভূষিতাম্।
বিম্বোষ্ঠীং সুদতীং শুদ্ধাং শশ্বৎ পদ্মনিভাননাম্॥
ইসদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যাং সুনীলোৎপল-লোচনাম্।
জগদ্ধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বসম্পদাম্।
সংসারে সাগরে ঘোরে পোতরূপাং বরাং ভজে॥"

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতি ৪১

মনে হয়, 'ধর্ম্মপূজা বিধান' সঙ্কলনের সময় বাশুলী ও মঙ্গলচণ্ডী এক হইয়া গিয়া পৌরাণিক চণ্ডীর বেদীতলে আত্মবিসর্জ্জন করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন।

বিশলাক্ষী ও বাসুলী

কেহ কেহ অনুমান করেন, তান্ত্রিক শক্তি দেবী বিশালাক্ষী ও বাশুলী অভিন্না।[২] কিন্তু তাহা সত্য নহে। 'ধর্ম্মপূজা বিধানে' দেখা যায় বিশালাক্ষী ও বাশুলী ধর্ম্মের দুই স্বতন্ত্র আবরণ দেবতা।[৩] উক্ত পুস্তকেই বিশালাক্ষীর যে ধ্যান-মন্ত্র আছে তাহা বাশুলীর উপরি-উদ্ধৃত ধ্যান-মন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র। দেবী বিশালাক্ষীর ধ্যান এই প্রকার,

"ওঁ প্রাতঃকালে কুমারী কুমুদ-কলিকয়া জাপ্যমালা জপন্তী
মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়রূপা বিকসিতবদনা চারুনেত্রা বিশালা।
সন্ধ্যায়াং বৃদ্ধরূপা গলিতকুচযুগা মুণ্ডমালা পতাকা
সা দেবী হেমবর্ণা ত্রিজগত জননী যোগিনী যোগমুদ্রা॥

ওঁ বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ॥

২ 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী' (চারু বন্দ্যোপাধ্যায়) পৃঃ ৯০০
৩ 'ধর্ম্মপূজা বিধান' পৃঃ ৫

ওঁ বিশালবদনা দেবী বিশাল নয়নোজ্জ্বলে
দৈত্য-মাংস স্পৃহে দেবি বিশালাক্ষী নমোস্তুতে ॥
বিশালাক্ষৈ নমঃ ॥" ১

ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাশুলী কিম্বা পূর্ব্বোল্লিখিত চণ্ডীর সহিত বিশালাক্ষীর কোনই সাদৃশ্য নাই। পরবর্ত্তী চণ্ডীর মিশ্র পরিকল্পনায়ও এই বিশালাক্ষীর কোন প্রভাব তাহার উপর পতিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

চণ্ডীদাসের বাশুলী

চণ্ডীদাসের জীবনী সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাশুলী কোন দেবী নহেন, তিনি রক্ত মাংসে গঠিতা মানবী ; নিত্যা নামক কোন বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবীর সিদ্ধা বা ডাকিনী,—

"শাল তোড়া গ্রামে অতি পীঠ স্থান
নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাশুলী নিত্যা সহচরী
বসতি করয়ে তথা ॥
চণ্ডীদাস কহে সে এক বাশুলী
প্রেম প্রচারের গুরু।
তাহারি চাপড়ে নিদ ভাঙ্গিল
পিরীতি হইল সুরু ॥"
—পদ সমুদ্র

কেহ অনুমান করেন, এই বাশুলী দ্বিজ কন্যা ছিলেন।[২] অতঃপর বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী নিত্যার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ডাকিনী

১ 'ধর্ম্মপূজা বিধান'—পৃঃ ৯৭

২ নব্যভারত, ১২শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা—পৃঃ ২৮৩

হইয়া যান। কালক্রমে তাঁহার চরিত্র দেবত্বে পরিণত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। সাধারণতঃ গ্রাম্য লৌকিক দেবতাদিগের এই ভাবেই উদ্ভব হইয়া থাকে।

যে ভাবেই হউক, বাশুলী তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া ক্রমে হিন্দু পৌরাণিক ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের যুগে পৌরাণিক চণ্ডীর সহিত অভিন্ন হইয়া হিন্দু সমাজেও অধিকার স্থাপন করিয়া লন।

তন্ত্রে চণ্ডী

তথাপি তিনি তাহার মৌলিক অনার্য্য আচার কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। প্রাচীন লৌকিক তন্ত্র সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়, দস্যু তস্করও নিজেদের কার্য্য সিদ্ধির মানসে তান্ত্রিক আচারে এক চণ্ডী দেবীর পূজা করিত।[১] অবশ্য দস্যু তস্করের আরাধ্যা দেবতা সাধারণতঃ কালী[২], চণ্ডী নহে। এই বিষয় পরে 'কালিকা-মঙ্গলে' আলোচিত হইয়াছে। এই কালীকেই কোন কোন জায়গায় চণ্ডী বলিয়া অভিহিত করিয়া দস্যু তস্করকে দিয়া চণ্ডী পূজা করান হইয়াছে। অনার্য্য দেব-সমাজ হইতে এই সমস্ত স্ত্রী-দেবতা হিন্দু সমাজে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য সকলেই পরবর্ত্তীকালে চণ্ডী নামেই অভিহিতা হইতেন। মূলতঃ ইহাদের প্রকৃতিগত অনেক বৈষম্য রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও বহু লৌকিক স্ত্রী-দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারাও পরবর্ত্তী হিন্দু-সমাজে চণ্ডীর প্রাধান্য দেখিয়া নিজেদেরও আভিজাত্য স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের নামের শেষে পদবীর মত চণ্ডী কথাটিও জুড়িয়া দিতেন; যেমন নাটাই চণ্ডী, ঘোর চণ্ডী, উড়ন চণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, জয়মঙ্গল

---

১ "চণ্ডী রাখিলেন আজ বলে দুই চোরে।" —চৈ. ভা. আদি, ৩

২ 'নিশিকালী মহাকালী উন্মত্ত কালী নাম।
চরণে পড়হু মাতা আইস এই ধাম ॥'
—চোরের পাঁচালী, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৫শ ভাগ, ২১৮ পৃঃ

চণ্ডী, শুভ চণ্ডী, উদ্ধার চণ্ডী, রণ চণ্ডী [১] ইত্যাদি। ক্রমে চণ্ডী নামটি বিশেষ কোন দেবতার নাম না হইয়া স্ত্রী দেবতা মাত্রেরই প্রায় একটা সাধারণ পদবীর মত হইয়া দাঁড়াইল। অতএব, দেখা যাইতেছে, চণ্ডীর বিশিষ্ট কোন একটি পরিচয় লাভ করা দুষ্কর। ইহার কারণ, মুণ্ডা, দ্রাবিড়, বৌদ্ধ, আর্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন শক্তি-দেবতার পরিকল্পনা এই চণ্ডীর ভিতর দিয়াই সর্ব্বশেষ পৌরাণিক পার্ব্বতী, অন্নদা বা অন্নপূর্ণায় শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। বাংলা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলির ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়।

৺ চণ্ডীর দেবত্বের এই অনিশ্চয়তার জন্যই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবির লিখিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যেও কাহিনীগত অনৈক্য দৃষ্ট হয়। লৌকিক কাহিনী বা কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি-লহনা-খুল্লনার গল্পই প্রাচীনতম কবিদিগের বর্ণিতব্য বিষয় ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কবিগণ চণ্ডীমঙ্গলের এই লৌকিক অংশ পরিত্যাগ করিয়া মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর কাহিনীকেই মুখ্য স্থান দিয়াছেন। এই শ্রেণীর কাব্যগুলি 'দুর্গা মঙ্গল' বলিয়া অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় পুরাণের অনুবাদ কাব্য আমাদের বর্ত্তমান গ্রন্থে আলোচনার বিষয়ীভূত নহে।

এই চণ্ডী নামের উৎপত্তি নিরূপণ সম্পর্কে সংস্কৃত আভিধানিকেরা স্থির করিয়া কিছুই বলিতে পারেন নাই। প্রথমেই বলিয়াছি, এই শব্দটি মুণ্ডাভাষা হইতে পরবর্ত্তী কালে সংস্কৃতে আসিয়াছে, অতএব সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী ইহাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। যাই হউক, পুরাণে এই নামের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া

চণ্ডীর উৎপত্তি

১ মালদহ জেলায় চণ্ডীপুর গ্রামে রণচণ্ডীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়। ঘোর চণ্ডীরও একখানি ক্ষুদ্র পাঁচালী অনেক জায়গা হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হইয়াছে যে বিখ্যাত শুম্ভাসুরের সেনাপতি চণ্ড নামক অসুরকে বধ করিয়া এই দেবী চণ্ডী নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র রায়ও তাঁহার অন্নদা-মঙ্গলে লিখিয়াছেন, 'চণ্ডের কপালে পড়ি নাম হইল চণ্ডী।

'এই চণ্ডী নামধেয় বিভিন্ন প্রকৃতির স্ত্রীদেবতার মধ্যে বিশিষ্ট কোন স্ত্রীদেবতাই যে মঙ্গল চণ্ডী নামে অভিহিতা হইতেন এই বিষয় নিঃসন্দেহ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলির দেবতা বিশেষ করিয়াই এই মঙ্গল চণ্ডী।

"মঙ্গল চণ্ডীকা রূপে স্বপন কহিয়া ভূপে
পূজা ল'বে দৈন্য দুঃখ হরা।"—কবিকঙ্কণ

তাহার নাম কেন যে মঙ্গল চণ্ডী হইল এই বিষয়ে কোন কোন সংস্কৃত পুরাণে [১] পাওয়া যায়,

"মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা।"

যিনি ভক্তের মঙ্গল সাধনে দক্ষ তিনিই মঙ্গলচণ্ডী। পুরাণকার যদি এই কথা বলিয়াই নিরস্ত থাকিতেন তাহা হইলে অবশ্য এই ব্যাখ্যাই মানিয়া লওয়া যাইত, কিন্তু যেহেতু এই পরবর্তী পুরাণগুলি রচনার বহু পূর্ব্বেই মঙ্গল চণ্ডীর দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য পুরাণগুলিও এই দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিতে পারেনা। এই সম্বন্ধে অনেকগুলি ব্যাখ্যা দিবারই চেষ্টা করিয়াছে। এই সম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের (প্রকৃতি খণ্ড ৪৪ অধ্যায়) নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি প্রণিধান যোগ্য,

পুরাণে

"হর্ষ মঙ্গলদক্ষে চ হর্ষমঙ্গলদায়িকে।
শুভে মঙ্গল দক্ষে চ শুভে মঙ্গল চণ্ডিকে॥
মঙ্গলে মঙ্গলার্হে চ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গলে।
সতাং মঙ্গলদে দেবি সর্ব্বেষাং মঙ্গলালয়ে॥

---

১ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড ৪৪ অধ্যায়

পূজ্যে মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাভীষ্ট দেবতে।
পূজ্যে মঙ্গলবংশস্য মনুবংশস্য সন্ততম্॥
মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃ দেবি মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলে।
সংসার মঙ্গলাধারে মোক্ষ মঙ্গলদায়িনী॥
সারে চ মঙ্গলাধারে পারে চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
প্রতি মঙ্গলবারে চ পূজ্যে মঙ্গ সুখপ্রদে॥
স্তোত্রেণানেন শম্ভুশ্চ স্তত্বা মঙ্গল চণ্ডিকাম্।
প্রতি মঙ্গলবারে চ পূজাং দত্তা গতঃ শিবঃ॥
প্রথমে পূজিতা দেবী শিবেন সর্ব্বমঙ্গলা।
দ্বিতীয়ে পূজিতা সা চ মঙ্গলেন গ্রহেণ চ॥
তৃতীয়ে পূজিতা ভদ্রা মঙ্গলেন নৃপেণ চ।
চতুর্থে মঙ্গলে বারে সুন্দরীভিঃ প্রপূজিতা॥
পঞ্চমে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নরৈর্ম্মঙ্গলচণ্ডিকা।
পূজিতা প্রতিবিশ্বেষু বিশ্বেশ পূজিতা সদা॥”

উদ্ধৃত অংশে ইহাও বলা হইয়াছে যে, মঙ্গলগ্রহ কর্তৃক পূজিতা হইয়াছিলেন বলিয়া এই চণ্ডীর নাম মঙ্গল চণ্ডী। শুধু তাহাই নহে, আরও বলা হইয়াছে যে, মঙ্গল নামে কোন নৃপতি এই চণ্ডীর পূজা করেন, সেইজন্যও তাঁহার নাম মঙ্গল চণ্ডী হইয়া থাকিবে। অথবা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানব কর্তৃক মঙ্গল বারে পূজিতা হন বলিয়াও তাঁহার নাম মঙ্গল চণ্ডী হইয়াছে।

পাঁচালী

কোন কোন পরবর্ত্তী বাংলা মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালীতে আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, মঙ্গল নামক এক দৈত্যকে বধ করিয়া চণ্ডী মঙ্গলচণ্ডী এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ভবানী শঙ্কর দাসের "মঙ্গল চণ্ডীর পাঞ্চালিকা”য় আছে,—

“মঙ্গল নামে দনুজেক হৈয়া উতপতি।
সুরগণ হিংসা করে সেই দুষ্টমতি॥

নির্জরা সভার ক্লেশ দেখিয়া প্রচুর।
ভয়ঙ্করীরূপে দেবী বাধিলা অসুর॥
আনন্দ হইল শক্র পাই সিংহাসন।
ভক্তিভাবে অর্চ্চিলেক চণ্ডিকা চরণ॥
বন্দম ত্রিজগদম্বা দেবী নারসিংহী।
মঙ্গল চণ্ডী নাম হৈল মঙ্গলাসুর হন্তি॥"[১]

এখানে দেখা যাইতেছে যে, মঙ্গলাসুরকে বধ করিয়া চণ্ডীর মঙ্গল চণ্ডী নাম হইয়াছে। এই আখ্যানও সম্ভবতঃ কোন পুরাণ হইতে গ্রহণ করা হইয়া থাকিবে, কিন্তু কোন পুরাণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই।[২] সম্ভবতঃ বহু পরবর্ত্তী কালে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কাহিনীর অনুকরণে এই গল্প রচিত হইয়া থাকিবে। কারণ, প্রাচীন কোন চণ্ডী মঙ্গলে এমনকি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও এই কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চণ্ডীর প্রথম পূজারী রামচন্দ্র,

"সমর বিজয়ী কাম, সমুদ্রের তীরে রাম
একভাবে চণ্ডীপূজে মনে।
বর পেয়ে রঘুনাথ, করিয়া রাক্ষস পাত
সীতা ল'য়ে গেলেন ভবনে।" —কবিকঙ্কণ চণ্ডী

আবার কোথাও উল্লিখিত হইয়াছে এই চণ্ডী,

"প্রথমে সম্মান পাইল ইন্দ্রের সভায়"—কবিকঙ্কণ

১ পৃঃ ১—২; মুক্তারাম সেনের সারদা-মঙ্গলেও অনুরূপ কাহিনী আছে।

২ মঙ্গল চণ্ডীর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি আছে বলিয়া 'বিশ্বকোষে' উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ভাগবতের কোন স্থানে শ্লোকটি আছে তাহার নির্দ্দেশ না থাকায় এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা গেল না। মনে হয়, ভাগবতে এই শ্লোকটি পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে;—

"সৃষ্টৌ মঙ্গলরূপা চ সংহারে কোপরূপিণী।
তেন মঙ্গল চণ্ডী সা পণ্ডিতৈঃ পরিকীর্ত্তিতা॥"

অতএব কোন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য তাহা স্থির করা যাইতেছে না। ইহা হইতেই মনে হয়, পুরাণকারদিগের মধ্যে এই সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা ছিল। এই মঙ্গলচণ্ডিকা পৌরাণিক নিজস্ব দেবতা হইলে এই অনিশ্চয়তা থাকিবার কোন কারণ ছিল না। পরবর্ত্তী পুরাণগুলি রচনার বহু পূর্ব্বেই মঙ্গল-চণ্ডী মনসা, ষষ্ঠী প্রভৃতি লৌকিক দেবতাদিগের প্রতিষ্ঠা সমাজে সুদৃঢ় হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য ইহাদের উৎপত্তির ইতিহাস সন্ধান করা এই পুরাণগুলির পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। অতএব মঙ্গলচণ্ডী নামের উৎপত্তি নিরূপণ করিতে সংস্কৃত পুরাণগুলির নিকট কোন সাহায্য লাভের আশা নাই।

দেবীর অনিশ্চয়তা

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, দেবীভাগবত প্রভৃতিতে উল্লিখিত আছে যে এই দেবী স্ত্রীলোকেরই দেবতা,—

"কৃপারূপাতি প্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্টদেবতা।"[১]

ইহা হইতে মনে হয়, অনার্য্য সমাজ হইতে এই দেবতা সর্ব্বপ্রথম হিন্দু-সমাজের স্ত্রী-জাতির মধ্যেই নিজের পূজাধিকার স্থাপন করেন। ইহার অর্থ এই যে, পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রভাব বশতঃ যখন নবসংস্কার-দীক্ষিত পুরুষ-সমাজ লৌকিক দেবতার সহিত সমস্ত সংস্রব কাটাইয়া একমাত্র পৌরাণিক দেবতার পূজায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল তখনও রক্ষণশীল স্ত্রী-সমাজ তাহাদের পূর্ব্বতন আরাধ্য দেবতাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এই দেশীয় প্রাচীনতম সংস্কারের ধারা তাহাদের মধ্যে আজ পর্য্যন্তও সঞ্জীবিত দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য প্রত্যেক লৌকিক দেবতাই "যোষিতামিষ্ট-দেবতা" অর্থাৎ স্ত্রী-সমাজের দেবতা। সনকা-বেহুলা মনসার পূজা করিলেও চাঁদ সদাগর মনসার শত্রু, খুল্লনা চণ্ডীর পূজা করিলেও স্বামী

স্ত্রী-সমাজের দেবতা

১ ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ, ৪৪ অধ্যায়; দেবী ভাগবত, ৪৭ অধ্যায়।

ধনপতি তাহার বিরোধী। কিন্তু এক গৃহতলে বাস করিয়া স্ত্রী-পুরুষের এই বিরোধ প্রায় লঘুক্রিয়ায়ই পর্য্যবসিত হইয়াছিল; পুরুষই পরাজয় স্বীকার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পুরাণের মধ্যে এই স্ত্রী-দেবতার মাহাত্ম্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে যেমন কাহিনগত ঐক্য আছে চণ্ডী-মঙ্গলের মধ্যে তেমন নাই। ইহা হইতেই মনে হয়, বিভিন্ন লৌকিক স্ত্রী-দেবতার পরিকল্পনা এই চণ্ডীর মধ্যে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ, চণ্ডীমঙ্গলগুলিতে দুইটি মূল কাহিনী বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। একটি কালকেতুর কাহিনী; অপরটি ধনপতি সদাগরের গল্প।

কাহিনীর বিভাগ

কালকেতুর কাহিনীতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই চণ্ডী প্রকৃতই পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং ব্যাধ-জাতির আরাধ্যা। কিন্তু ধনপতির গল্পের মধ্যে চণ্ডীর এই বিশিষ্ট গুণের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে তাঁহার সহিত ব্যাধ কিম্বা পশুকুলের কোন সংস্রবই নাই, এখানে তিনি প্রকৃতই মঙ্গলচণ্ডিকা, ভক্তের মঙ্গলকারিণী। মনে হয়, স্বতন্ত্র দেব-কল্পনা হইতে এই উভয় কাহিনী পরবর্ত্তী কালে আসিয়া এক স্থলে গ্রথিত হইয়াছে। শেষোক্ত অর্থাৎ ধনপতির গল্পের দেবীর নামই প্রকৃত মঙ্গল-চণ্ডী, প্রথমোক্ত দেবতা চণ্ডী। কিন্তু যে সময় হিন্দুর সমগ্র সম্প্রদায়গুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া এক সূত্রে মিলনের পথ অনুসন্ধান করিতেছিল সেই সময়ই এক দেবতার নামে এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধেরও অবসান হইয়া গিয়াছিল। মনে হয়, লোকমুখে প্রচলিত পাঁচালী বা ছড়ার আকারে যতদিন এই কাহিনীগুলি ছিল ততদিন এইগুলি বিক্ষিপ্ত আকারেই ছিল। মঙ্গল কাব্যের সৃজন-যুগে এইগুলি যখন উচ্চশ্রেণীর কাব্যাকারে গ্রথিত হইল তখনই এই বিভিন্ন কাহিনীগুলি

আসিয়া একত্র মিলিত হইল। এক চণ্ডী-মঙ্গলের মধ্যে এই দুই স্বতন্ত্র কাহিনী সমাবেশের সম্ভবতঃ ইহাই ইতিহাস।

অতএব মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে উল্লিখিত এই চণ্ডীর পূজা-ইতিহাস নিরূপণ করিতে এই দেবতার এই প্রকৃতিগত বৈষম্যের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। 'ধর্ম্মপূজা বিধান' হইতে বাশুলীর যে ধ্যান ও আবাহন মন্ত্র পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি[১] তাহার মধ্যেও এই বৈষম্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহার প্রথমার্দ্ধই প্রকৃত বাশুলীর কিন্তু শেষার্দ্ধ অর্থাৎ আবাহন মন্ত্র বলিয়া যাহা পরিচিত তাহা প্রকৃত মঙ্গল চণ্ডিকার, আদৌ বাশুলীর নহে। একটু অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাশুলী শাক্ত ও মঙ্গল-চণ্ডিকা বৈষ্ণব প্রকৃতির দেবতা।

পূর্ব্বে ওরাওঁ জাতির যে চণ্ডী দেবীর কথা উল্লেখ করিয়াছি, তিনিই কালকেতু ব্যাধের গল্পের চণ্ডী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। মৃগয়া-জীবী ওরাওঁ ও ব্যাধ কালকেতুর জীবনে কোন অনৈক্য নাই। কিন্তু ধনপতি সদাগরের গল্পের চণ্ডী প্রকৃত মঙ্গল চণ্ডী; মনে হয়, তিনি বৌদ্ধ সমাজ হইতে আগতা আন্তা, পববর্ত্তীকালে চণ্ডীর সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। অবশ্য কালক্রমে এই চণ্ডী নামের প্রভাবে সমস্তই প্রায় একাকার হইয়া গিয়াছিল।

কাহিনীর বৌদ্ধ উদ্ভব

ধনপতি সদাগরের গল্পে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য এবং তাহা হইতেই এই কাহিনীর উদ্ভবেরও কতক আভাস পাওয়া যাইতে পারে। তাহা 'কমলে কামিনী'র গল্প। ইহা স্বীকার্য্য যে, মূল কাহিনী পরিকল্পনায় কমলে কামিনীর গল্পাংশ কতকটা অপ্রাসঙ্গিক। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কমলে কামিনী'র এই চিত্রটি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের সৌন্দর্য্য-কল্পনার

১ পৃষ্ঠা ২১৬।

ক্রটি স্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মধ্য-যুগের কবিরা একান্তভাবে সৌন্দর্য্য কল্পনায় মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না, ইহারও মূলে একটু ঐতিহাসিক তথ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।

' চণ্ডী ধনপতিকে ছলনা করিবার জন্য এই 'কমলে কামিনী' মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। চণ্ডীর এই পরিকল্পনা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আসিয়াছে।' চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে যে সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত পরিচিত হওয়া যায় তাহা ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যগুলির অনুরূপ। বুদ্ধ বা ধর্ম্মের অপর নাম আদিদেব।

তন্ত্র বা শক্তি প্রভাবিত দেশে এই আদিদেব আদ্যাশক্তি নামে পূজিতা হন। 'কমলে কামিনী'র পরিকল্পনায় এই চণ্ডীকে বৌদ্ধ আদ্যাশক্তি রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। মাণিক দত্ত রচিত চণ্ডীমঙ্গলে যে সৃষ্টি প্রকরণের উল্লেখ আছে তাহা সর্ব্বাংশেই বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের অনুকূল,—

"জলেতে আসন গোসাই জলেতে বৈসন।
জলভর করিঞা ভাসেন নিরঞ্জন॥
ভাসিতে ধর্ম্ম গোসাই পাইল বৈসন।
চৌদ্দ যুগ বহিঞা গেল ততক্ষণ॥
*　　*　　*　　*
সম্মুখে রচিল গোসাই পদ্ম ফুল।
তাহাতে বসিয়া গোসাই জপে আদ্যমূল॥
*　　*　　*　　*
কার উপর স্থাপিব নির্ম্মাণ বসুমতী।
আপনে ধর্ম্ম গজযুক্ত হইল॥
গজের উপরে বসুমতীকে স্থাপিল॥"

অতএব, চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর এই অংশ রচনার মূলে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার

আভাস পাওয়া যাইতেছে। বৌদ্ধতন্ত্র হইতেই এই দেবী হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগে হিন্দু সমাজে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিবার চেষ্টা করেন। সেইজন্যই নব হিন্দু-সংস্কার-দীক্ষিত পুরুষ সমাজ তাঁহার পূজার বিরোধিতা করেন। এই সম্বন্ধে মালদহ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"আদিবুদ্ধ বা আদিধর্ম্ম হইতে আদ্যা নামক এক শক্তির উদ্ভব দেখিতে পাইতেছি। এই আদ্যাদেবী ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মালদহের আদ্যের গম্ভীরায় এই আদ্যার পূজা হইয়া থাকে। বৌদ্ধ আদ্যাদেবী বা চণ্ডী ক্রমশঃ আমাদের শ্রীশ্রীচণ্ডীদেবী হইয়া শিবসহ অর্চ্চিত হইতেছেন। মাণিক দত্ত এই আদ্যার চণ্ডীত্ব প্রাপ্তির যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অদ্ভুত ব্যাপার। পূর্ব্বে এদেশে এই প্রকার আদ্যার চণ্ডীতে পরিণতির কাহিনী সকলের রুচিকর ও বিশ্বাস্য ছিল।

মাণিক দত্তের চণ্ডী

বৌদ্ধমতে ধর্ম্মের স্ত্রীরূপ ও চারিপদ। মাণিক দত্তের আদ্যা স্ত্রীরূপ; কিন্তু ধর্ম্মদেহ হইতে ধর্ম্মরূপী যে কচ্ছপ বাহির হইয়াছে তাহার চারিপদ সূচিত হইতেছে। ধর্ম্মের সৃষ্টি হইতে আদ্যার উৎপত্তি এই চণ্ডীতে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আদ্যাকে দেখিতে দেবীবৎ বোধ হইলেও তিনি প্রথমে স্ত্রীমূর্ত্তি ছিলেন না। আদিধর্ম্ম হইতে এই যে ধর্ম্মমূর্ত্তির জন্ম হইল, ইনিই প্রকৃতি রূপিণী ধর্ম্ম।

"কাপ্তেন টেম্পালের মতে সিকিম দেশে যে ধর্ম্ম প্রতিমা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাঁহার বর্ণ শ্বেত, চারিখানি হস্ত এবং স্ত্রীমূর্ত্তি; হস্তে পদ্ম ও জপমালা আছে। সিকিম দেশীয় এই ধর্ম্মমূর্ত্তির সহিত মহাবিদ্যার ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। মহাবিদ্যা বৌদ্ধদের, তিনি নিরাকার হইয়াও সাকার ভাবে পূজিতা হ'য়েন।

"মহাবিদ্যা কাশপুষ্প সদৃশ শুভ্রবর্ণা, নানালঙ্কার-ভূষিতা, চতুর্ভুজা, দুই হস্তে পদ্ম ও অক্ষমালা, সর্ব্বরাজেন্দ্র মুদ্রা। পাদমূলে এক বিদ্যাধর ধূপাধার ও পুষ্পাধার লইয়া আছেন। যাহাই হউক, এই প্রকার মূর্ত্তিই আমাদের চণ্ডীদেবী হইয়াছেন।" [১]

মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়, আদিদেব বা ধর্ম্মের শক্তিস্বরূপিণী আদ্যাই চণ্ডীতে পরিণত হইয়াছেন।* বিশ্বসৃষ্টি করিয়া আদিদেব ভাবিলেন,

"একস্বর রাজ্যভার পালিব কেমনে।"

তখন সেই আদিদেবের,

"হাস্তেতে জন্মিয়া আদ্যা পড়ে ভূমি তলে।
উঠিঞা দাঁড়াইল আদ্যা দেখেন সকলে॥"

কিন্তু তখনও তাহার,

"স্ত্রীর আকার নাই চণ্ডিকা হ'বে কিসে।"

আদিদেব এই আদ্যাকে স্ত্রীরূপে সাজাইয়া দিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করিয়া আদিদেব শিবকে আদ্যার পতিরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে বলিলেন। শিব বলিলেন, আদ্যা সপ্তবার জন্মগ্রহণ করিয়া আসিলে তারপর তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিবেন, তৎপূর্ব্বে নহে। আদ্যাদেবী তাহাতেই সম্মত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। অতঃপর আদ্যা কর্ম্মকার কুম্ভকার দক্ষরাজ প্রভৃতির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া অবশেষে এক ঋষির আশ্রমে প্রতিপালিতা হইতে লাগিলেন। একদিন শিব ভিক্ষা করিতে গিয়া এক ঋষির আশ্রমে আদ্যাকে দেখিতে পাইলেন এবং বিবাহ

---

১ "গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী গীতে বৌদ্ধভাব" সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সাল ১৩১৮ পৃঃ ২৫৩

আদিদেব নিরঞ্জন ভাবিলেন,

করিয়া সঙ্গে লইয়া গেলেন। শিবের পত্নী হইয়া আদ্যা চণ্ডীতে পরিণত হইলেন।

কিন্তু তখনই চণ্ডী নিজের পূজা প্রচারে মানোনিবেশ করিলেন। কলিঙ্গ নগরে দেহারা নির্ম্মাণ করাইয়া দিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মারূপী হনুমানকে আদেশ করিলেন। আদেশ মাত্র হনুমান,

"জোড় হস্ত করিঞা বোলে কামিনী সুনগো মঙ্গলচণ্ডীরাই।"

সাঁতালি পর্ব্বত হইতে চারিখণ্ড পাথর আনিয়া হনুমান কলিঙ্গ নগরে চণ্ডীর দেহারা তুলিয়া দিল।

আদ্যা ও চণ্ডী

এই কাহিনী হইতেই কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, "বৌদ্ধ আদ্যা ক্রমশঃ হিন্দুর চণ্ডী হইয়া শিবের ভার্য্যা হইলেন।"[১] কিন্তু মাণিক দত্তের এই কাহিনী অনেক পরবর্ত্তী কালে সংকলিত হইয়াছিল; কারণ, ইহার কোন কোন অংশ অবিকল কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে গৃহীত দেখিতে পাই। অতএব, ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্ত্তীকালে যখন চণ্ডীর প্রতিষ্ঠা সমাজে দৃঢ় ভাবে স্থাপিত হইয়াছে তাহার পর এই কাহিনী সংকলিত হইয়াছে। অতএব, ইহা হইতে অবিমিশ্র কোন তথ্যের সন্ধান লাভ দুষ্কর। মনে হয়, মঙ্গলচণ্ডী নামক স্বতন্ত্র কোন লৌকিক দেবতার পরিকল্পনার সঙ্গে এই আদ্যার কাহিনী পরবর্ত্তীকালে আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে আত্মগোপন করিতেছিল তখনই হয়ত বৌদ্ধ আদ্যাকে এইভাবে চণ্ডীরূপে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস দেখা দিয়াছিল। মঙ্গলচণ্ডীও অনার্য্য দেব-সমাজ হইতেই হিন্দু-সমাজে আসিয়াছেন কিন্তু তাঁহার উদ্ভবের কাহিনী এতখানি নিশ্চিত নহে। সেইজন্যই এই সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাচীন পুস্তকে বিবিধ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

১ 'শূন্য পুরাণ' (চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) পৃঃ ৪২

ডাকিনী ও চণ্ডী

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ডাকিনী এবং যোগিনীরা এই দেবীর নিত্য সহচরী,—

"কৃত নরমালা, পরিহিত জটিলা
অভিনব জলধর-নাদা।
শত শত ডাকিনী, সঙ্গে বামুনী
ছাড়িয়া কুলমর্য্যাদা॥" কবিকঙ্কণ

কোন কোন স্থলে এই চণ্ডীকেও ডাকিনী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। খুল্লনাকে চণ্ডী পূজা করিতে দেখিয়া ধনপতির নিকট লহনা গিয়া বলিতেছে,

"তোমার মোহিনী বালা শিখিয়া ডাইনী কলা
নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা।" —কবিকঙ্কণ

এক সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীকে ডাকিনী বলিত। এই ডাকিনীরা নানাপ্রকার তান্ত্রিক আচারদ্বারা কতকগুলি অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিত। ইহা দ্বারাই তাহারা সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। চণ্ডীদাসের প্রেম-প্রচারের গুরু বাশুলীও যে সম্ভবতঃ এই প্রকার ডাকিনী ছিলেন, সেই সম্পর্কে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই ডাকিনীরা ক্রমে সিদ্ধিলাভ করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে প্রায় দেবত্বে অধিষ্ঠিত হইত, অতঃপর তাহারা দেহরক্ষা করিলে তাহাদের জীবনের লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে নানা প্রকার অলৌকিক কাহিনী মিশ্রিত

ডাকিনী-দেবতা

হইয়া তাহাদের দেবত্বকে আরও সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিত। এই সমস্ত ডাকিনীদিগের এক এক জনের এক একটি বিশিষ্ট গুণ থাকিত, এবং তাহারই সূত্র অবলম্বন করিয়া তাহাদের জীবনের অলৌকিক কাহিনীসমূহ রচিত হইত। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, এই সমস্ত ডাকিনীরাই পরবর্ত্তী কালে সমাজে দেবতায় পরিণত হইয়া গিয়া সমাজে বিশেষ প্রভাবশালী অপর কোন দেবতার সহিত

একেবারে অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। বিশেষ গুণ-সম্পন্না কোন ডাকিনী পরবর্ত্তীকালে এই প্রকার চণ্ডীর সহিত অভিন্ন হইয়া যাওয়াও কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এই ডাকিনীরা তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের জন্য হিন্দু সমাজে বিশেষ নিন্দনীয় হইত। কিন্তু হিন্দুর রক্ষণশীল স্ত্রী-সমাজে তাহারা গোপনে বিশেষ শ্রদ্ধাই লাভ করিত বলিয়া মনে হয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্য্যন্ত মুকুন্দরাম ধনপতির মুখে এই দেবতার প্রতি যে প্রকার অশ্রদ্ধা প্রকাশ করাইয়াছেন তাহাতেও তাহার সমাজে যে কি স্থান ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। খুল্লনাকে চণ্ডী পূজা করিতে দেখিয়া ধনপতি,—

"পূজা গৃহে উপনাত হৈল ধনপতি।
জয় দিয়া পূজে চণ্ডী খুল্লনা যুবতী॥
বাম পথী হইয়া করিস্ কার পূজা।
ইহা শুনি যদি মোরে ক্রোধ করে রাজা॥
পুনর্ব্বার জ্ঞাতি বন্ধু যদি ছল ধরে।
পরীক্ষা তোমারে কত দিব বারে বারে॥
কারো ঘরে নাহি আছে হেন পাপ বধূ।
খুল্লনা গর্জ্জিয়া তবে ক্রোধে বলে সাধু॥
এতেক বলিয়া সাধু জ্বলে কোপানলে।
লজ্ঘিয়া দেবীর ঘট ধরে তারে চুলে॥
ভূমিতে দেবীর ঝারি গড়াগড়ি যায়।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়॥
কেমন দেবতা এই পূজিস্ ঘট ঝারি।
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি॥"

অতঃপর মশানে শ্রীমন্তকে রক্ষা করিয়া কিম্বা কারাগার হইতে ধনপতিকে উদ্ধার করিয়াও এই মঙ্গলচণ্ডী দেবী যে সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধা

আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী সমাজে যে চণ্ডীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় তিনি বাস্তবিক পক্ষে লৌকিক মঙ্গলচণ্ডী নহেন, তিনি পৌরাণিক চণ্ডী। অবশ্য পরবর্ত্তী কোন কোন চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক চণ্ডীর আখ্যানের সঙ্গে এই লৌকিক দেবতার আখ্যানও সংক্ষিপ্ত ভাবে জড়িত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু নামের সামঞ্জস্য হেতুই উভয়ের এই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, অন্য কোন কারণে নহে। এই মঙ্গলচণ্ডীর স্থান স্ত্রী-সমাজে আজ পর্য্যন্তও অক্ষুন্ন রহিয়াছে। এখনও কোন কোন পল্লীবাসী হিন্দুর গৃহে বিশেষ কোন কোন মঙ্গলবারে অতি অকিঞ্চিৎকর উপাচারে স্ত্রীলোক কর্ত্তৃকই এই দেবতার ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে; ব্রত সাঙ্গ হইলে মেয়েলি ব্রত কথায় দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়। প্রায়ই পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না; অবশ্য পুরোহিত হইলেও আপত্তি নাই; অত্যন্ত সাধারণ পূজামন্ত্রেই পুরোহিত এই দেবীর পূজাকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে।[১]

অতএব মনে হয়, কোন বৌদ্ধ ডাকিনী সিদ্ধিলাভ করিয়া কতকগুলি লোক-হিতকারিণী শক্তির অধিকারিণী হয়; ইহাতেই তাহার সামাজিক প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হয়, কালক্রমে তাহার উপরই দেবত্ব আরোপিত হইয়া থাকে এবং ক্রমে তাহাই পৌরাণিক অন্যতম প্রধান স্ত্রীচরিত্র চণ্ডীর সহিত এক হইয়া যায়। বাংলার এবং দাক্ষিণাত্যের অনেকগুলি লৌকিক বা গ্রাম-দেবতার এইভাবেই জন্ম হইয়াছিল। সেইজন্য এই দেবতাদিগের উদ্ভবের ইতিহাস এত অনিশ্চয়তায় সমাচ্ছন্ন।

এই দেবতার পূজা কবে হইতে সমাজে প্রবর্ত্তিত হইল? এই জাতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে দুই প্রকার প্রমাণের আলোচনা করা যায়। প্রথমতঃ

---

১ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধ তান্ত্রিক পঞ্চকন্যা সর্ব্বপ্রথম খুল্লনাকে এই পূজা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সাহিত্যিক প্রমাণ, দ্বিতীয়তঃ ভাস্কর্য্যের প্রমাণ। সাহিত্যিক প্রমাণ এই ক্ষেত্রে প্রচুর না হইলেও ভাস্কর্য্যের প্রমাণ ইহাতে দুর্লভ নহে। প্রথমতঃ সাহিত্যিক প্রমাণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাউক।

চৈতন্যের সমসাময়িক নবদ্বীপের অবস্থা বর্ণনা করিতে চৈতন্য ভাগবতের কবি বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,

"ধর্ম্ম কর্ম্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥" আদি খণ্ড, অধ্যায় ২

ইহাতে অনুমান হয়, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই এই লৌকিক দেবতার পূজা সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, সমাজে যাঁহারা ধনে মানে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও তখন এই দেবতার পূজার প্রচলন হইয়া গিয়াছিল। দরিদ্র শ্রীধরকে শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

"লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।
অন্নবস্ত্রে কষ্ট পাও কহ দেখি শুনি॥
দেখ এই চণ্ডী বিষহরীরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে যত নাগরিয়া॥"

—চৈতন্য ভাগবত, আদি, ৮ অধ্যায়

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে দেবতা সমাজে এতখানি প্রাধান্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহার পূজা আরও অন্ততঃ তিনশত বৎসর পূর্ব্বেও যদি সমাজে প্রথম প্রচলিত হইয়া থাকে তাহা হইলে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কিম্বা তাহারও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম সমাজে এই পূজা প্রবর্ত্তিত হয় এমন অনুমান করা যাইতে পারে। ইহাতেই মনে হয়, মঙ্গলচণ্ডীর পূজা মনসা পূজা প্রবর্ত্তিত হওয়ার কিছু পরবর্ত্তীকালে সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার আরও প্রমাণ এই যে, চৈতন্যের পূর্ব্বেই যেমন নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত প্রমুখ

পূজা প্রবর্ত্তনকাল

কবিগণ মনসাদেবীর মাহাত্ম্য-সূচক মঙ্গল-কাব্য রচনা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন প্রাক্‌চৈতন্য যুগের তেমন কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সহিত পরিচয় লাভ করা যায় না। ইহাতেই মনে হয়, পদ্মাপুরাণ কাব্যগুলির অনুকরণে পরবর্ত্তী কালে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হয়।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে চণ্ডী-মঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি মাণিক দত্তকে বন্দনা করিয়া লইয়া নিজে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন,

"মাণিক দত্তেরে বন্দোঁ করিয়া বিনয়।
যাহা হইতে হৈল গীত-পথ-পরিচয়॥" —কবিকঙ্কণ

ইহা হইতেই কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, মাণিক দত্ত খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য প্রণয়ণ করেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কোন কবি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির নামোল্লেখ করিলে তাহার সময় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা সমীচীন হয় না। বিশেষতঃ মাণিক দত্তের যে কাব্য বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে কবিকঙ্কণের বহু পদ মিশ্রিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে অনতিকাল ব্যবধানের লোক বলিয়াই বিবেচিত হয়; সেইজন্য মাণিক দত্তকে পঞ্চদশ শতাব্দীর কিম্বা অন্ততঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে। এই পঞ্চদশ শতাব্দীতে মঙ্গলচণ্ডীর গীত যে বিশেষ প্রচলন লাভ করিয়াছিল তাহা চৈতন্য ভাগবতকারের উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব, এই গীত প্রচলনের দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও যদি এই দেবীর পূজা সমাজে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই দেবী বৌদ্ধ সমাজ হইতে ক্রমে হিন্দু সমাজের পূজা লাভ করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, দেবীভাগবত, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ইত্যাদিতে যে মঙ্গলচণ্ডীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ

দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও এই সমসাময়িক কালেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক চণ্ডী পূজার যে উল্লেখ রহিয়াছে তাহা হইতেই অনুমিত হয় যে, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই সমাজে পৌরাণিক চণ্ডীর পূজা বিশেষভাবেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেইজন্য অনার্য্য সমাজ হইতে আগত এই দেবতা পুরাণের সাধারণ স্ত্রীদেবতা চণ্ডীর সহিতই নিজের অভিন্নতা স্থাপন করিয়া লইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম কর্তৃক চণ্ডী পূজার অংশ যদি প্রক্ষিপ্ত হয় তথাপি এই পৌরাণিক চণ্ডীর পূজা যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই সমাজে বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল তাহা বাংলার বহু স্থান হইতে আবিষ্কৃত বহু চণ্ডীদেবীর মূর্ত্তি হইতেও জানিতে পারা যায়।[১] মঙ্গলচণ্ডীর দেবত্বের আভিজাত্য প্রমাণ করিতে পরবর্ত্তী চণ্ডীমঙ্গলের কবিরা কিম্বা পূজারীরা এই পৌরাণিক চণ্ডীর সহিত এই লৌকিক দেবতার যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই প্রায় এই পৌরাণিক ও লৌকিক আদর্শের সমন্বয় সাধন নিষ্ফল হইয়াছে।

কৃত্তিবাসে চণ্ডী

মনসাদেবীর পূজার উদ্ভবকাল নির্দ্দেশ করিতে যেমন বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্য্যের সাহায্য লইতে পারা গিয়াছিল মঙ্গলচণ্ডীর সম্পর্কেও তাহার চেষ্টা করা যাইতেছে। পৌরাণিক চণ্ডীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণের একটা বিশিষ্ট আদর্শ প্রাচীন বাংলার ভাস্কর-সমাজে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার সঙ্গেই এই লৌকিক দেবতার আদর্শও গিয়া মিশ্রিত হইয়াছিল। সেইজন্য প্রাচীন ভাস্কর্য্যে মঙ্গলচণ্ডীর স্বতন্ত্র কোন মূর্ত্তি

ভাস্কর্য্যে চণ্ডী

১ Journal of Asiatic Society of Bengal, 1913, Pg. 290, Plates XIII and XXIV. Iconography of Buddhist and Brahmanical sculpture in the Dacca Museum (N. K. Bhattashali Pg. 196.) etc.

পাওয়া না গেলেও পৌরাণিক চণ্ডীর সহিত মিশ্র অবস্থায় তাহাকে উদ্ধার করা কঠিন নহে। আধুনিক বাশুলীর যে সমস্ত মূর্ত্তি পাওয়া যায় পূর্ব্বোদ্ধৃত বাশুলীর কোন ধ্যানের সহিত তাহাদের কাহারই মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। মনে হয়, গ্রাম্যদেবতা বাশুলীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণেও কোন বিশিষ্ট আদর্শ অনুসৃত হইত না। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণের একটা বিশিষ্ট আদর্শ ছিল।

পণ্ডিত গোপীনাথ রাও প্রণীত Elements of Hindu Iconography (Vol I. Part II) গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রাচীন মূর্ত্তিশিল্প সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রূপমণ্ডন হইতে যে "প্রতিমা-লক্ষণ" অর্থাৎ প্রতিমা নির্ম্মাণের আদর্শ উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃঃ ১১৩ ও ১২০), তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন গৌরী প্রতিমার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাহা গোধাসনা হইবে,— "গোধাসনা ভবেদ্গৌরী লীলয়া হংসবাহনা।

সিংহারূঢ়া ভবেদ্দুর্গা মাতরস্ব্বস্ববাহনাঃ॥" পৃঃ ১১৩

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে আছে যে, এই গোধা-রূপ ধারণ করিয়াই চণ্ডী কালকেতুর ভবনে গমন করেন। অতএব, এই গোধাসনা যে গৌরী তিনিই প্রকৃতপক্ষে কালকেতু কাহিনীর চণ্ডী। পরবর্ত্তী কালে পৌরাণিক প্রভাব বশতঃ গৌরী নাম ধারণ করিলেও গোধার সহিত তাহার এই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহার এই গোধা-সংস্রবের আর কোন অর্থ হইতে পারে না।

এই গোধাসনা গৌরীই যে পূর্ব্বোদ্ধৃত "যোষিতামিষ্ট দেবতা" ও "গৃহে পূজ্যা" প্রতিমা-লক্ষণে তাহার অন্যান্য পরিচয়ের সহিত ইহারও উল্লেখ রহিয়াছে, যথা,—

"অক্ষসূত্রং তথা পদ্মমভয়ং চ বরং তথা।
গোধাসনাশ্রিতা মূর্ত্তি গৃহে পূজ্যা শ্রিয়ে সদা॥"

"শ্রী", ঐশ্বর্য্য বা মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় গোধাসনা যে মূর্ত্তি গৃহে পূজিতা হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে এই মঙ্গলচণ্ডীরই মূর্ত্তি। উক্ত প্রতিমা-লক্ষণের অনুযায়ী অনেক মূর্ত্তি প্রাচীন ভাস্কর্য্যে গঠিত হইয়াছিল। তাহা সাধারণতঃ গৌরীর মূর্ত্তি বলিয়াই পরিচিত হইলেও তাহার সহিত এই গোধার সংস্রবের জন্যই তাহাকে কালকেতু কাহিনীর চণ্ডী বলিয়া চিনিতে পারা যাইতেছে।

ঢাকা প্রত্নবস্তু-রক্ষণাগারে এই জাতীয় কয়েকটি চণ্ডীর মূর্ত্তি রক্ষিত আছে।[১] মূর্ত্তিগুলি চতুর্ভুজা, অক্ষসূত্র-পদ্ম-অভয় ও বরহস্তা, প্রসন্ন মুখ, প্রফুল্ল পদ্মপাদপীঠ, তন্নিম্নে ক্ষুদ্র গোধিকা।[২] মূর্ত্তিগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়।

যদিও কোন অর্ব্বাচীন স্মৃতির গ্রন্থে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ঘটে পটে বা প্রতিমায় নিষ্পন্ন করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে[৩] তথাপি সাধারণতঃ এই দেবতার পূজা একমাত্র ঘটেই সম্পন্ন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক কালেও যে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত হইয়া থাকে তাহাও ঘটেই নিষ্পন্ন হয়। মঙ্গলচণ্ডীর কোন পট কিম্বা প্রতিমা বর্ত্তমানে আর পূজিত হয় না।

কিন্তু পুরাণে বলা হইয়াছে যে, এই মঙ্গলচণ্ডী "মূর্ত্তিভেদেন সা দুর্গা," সেইজন্য পরবর্ত্তীকালে দুর্গার সহিত এই মঙ্গলচণ্ডিকা অভিন্ন হইয়া গেলেন।

---

১ Iconography of Budddhist and Brahmanical Sculpture in the Dacca Museum, (N. K. Bhattasali). Plate, LXVIII (a), (b); LXVII, etc.

২ ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার উক্ত গ্রন্থে এই "গোধাসনা" কথাটিকে "alligator as her vehicle" বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিমা-লক্ষণে তাহা স্পষ্ট গোধাসনা বলিয়াই উল্লেখ আছে।—ঐ পৃঃ ১৯৯

৩ "অষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ পূজাকার্য্যা বিবৃদ্ধয়ে।
পটেষু প্রতিমায়াং বা ঘটে মঙ্গলচণ্ডিকাম্ ॥" —তিথিতত্ত্ব

অনেক স্থলেই শারদীয়া দুর্গোৎসবের সময় দুর্গা প্রতিমার সম্মুখেই এই মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী বা চণ্ডীমঙ্গল পাঠ করা হইত, অনেক স্থলেই এখনও তাহা হইয়া থাকে।[১]

দুর্গা ও চণ্ডী

এক্ষণে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী বর্ণনা করিয়া ইহার উদ্ভবের ইতিহাস সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমস্ত মঙ্গল কাব্যেরই যেমন একটিই কাহিনী চণ্ডীমঙ্গলের তেমন নহে। চণ্ডীমঙ্গলে দুইটি কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি কাহিনী যে স্বতন্ত্র দেবতার, এবং পরবর্ত্তী কালে এক পৌরাণিক দেবতার প্রভাবের তলে আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছি। কাহিনী দুইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

কালকেতুর উপাখ্যান

দেবী ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে ব্যাধরূপে মর্ত্ত্যে পাঠাইয়া নিজ পূজা প্রচারের জন্য শিবকে ছলনা করিয়া অভিশাপ দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু শিব নিরপরাধকে শাপ দিতে সম্মত হইলেন না। চণ্ডী নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভোলানাথ স্বামীকে ছলনা করিয়া তাঁহার মত করাইলেন।

ইন্দ্র শিব পূজার জন্য পুত্র নীলাম্বরকে পুষ্প আহরণের আদেশ দিলেন। ছলনাময়ী চণ্ডী পূর্ব্বেই পুষ্পমধ্যে কীটরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। নীলাম্বরের আহৃত পুষ্পে ইন্দ্র মহাদেবের পূজা করিলেন। কীটরূপিণী চণ্ডী শিবকে দংশন করিলেন। তাঁহার দংশন জ্বালায় মহাদেব অস্থির হইয়া নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন, "তুমি ব্যাধরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর।"

স্বর্গভ্রষ্ট দম্পতি

স্বর্গের ইন্দ্র-পুত্র নীলাম্বর মর্ত্ত্যে ব্যাধপুত্র কালকেতু হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, পূর্ব্বজন্মের স্ত্রী ছায়া পরজন্মে ফুল্লরারূপে স্বামীর অনুগামিনী হইলেন।

---

১ মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা, (ভূমিকা) শ্রীরাজচন্দ্র দত্ত, সম্পাদিত, পৃঃ ৩

কালকেতু শৈশবাবধিই বীর ও বলিষ্ঠ, অমিত তাহার শক্তি, দুর্জ্জয় তাহার সাহস। সে শশারু তাড়িয়া ধরিত, পক্ষীগুলিকে বাঁটুল ছুঁড়িয়া মারিত ; ভল্লুক, ব্যাঘ্র লইয়া খেলা করিত।

মর্ত্ত্যের ব্যাধজীবন

একাদশবর্ষ বয়সে কালকেতু ফুল্লরাকে বিবাহ করিল। ফুল্লরা সুন্দরী, গৃহকর্ম্মে নিপুণা, বস্তুত সর্ব্বাংশে কালকেতুর গৃহিণী হইবার উপযুক্ত।

কালকেতুর দুঃখের সংসার, কিন্তু শান্তিময়। শীকারে তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা। পশু শীকারই তাহার উপজীব্য। প্রতিদিন যাহা শীকার করিয়া আনে, তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া যাহা পায় তাহাতে কোন রকমে দিন চলে।

এদিকে বনের পশুগণ কালকেতুর অত্যাচারে চণ্ডীর শরণাপন্ন হইল। চণ্ডী তাহাদের অভয় দিলেন।

আজ তিন চারি দিন হইল, কালকেতুর কোন শীকার মিলে নাই।

দুঃখের সংসার

সমস্ত বন ঘুরিয়া কালকেতু একটি শীকারেরও সন্ধান পাইল না। সমস্তই চণ্ডীর ছলনা। ইহাই ছিল তাহার দুঃখময় অভাবের সংসারে ক্ষুন্নিবৃত্তির একমাত্র সম্বল। আজ তিনচারি দিন হইল ব্যাধ দম্পতির অন্নের সংস্থান হয় নাই।

সেদিন কালকেতু ধনুক লইয়া বনে যাত্রা করিল। পথে অনেক মঙ্গল চিহ্ন দেখিল। কিন্তু হঠাৎ এক স্বর্ণগোধিকা দেখিয়া তাহার সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইল ; কারণ গোধিকা যাত্রার পক্ষে অশুভ। কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ধনুর্গুণে বাঁধিয়া লইল এবং মনে মনে বলিল, যদি আজ অন্য শীকার না মিলে তবে ইহাকেই পোড়াইয়া খাইব।

সমস্ত বন ঘুরিয়া কালকেতু সেদিন যখন একটি শীকারেরও সন্ধান পাইল না, তখন সেই গোধিকা লইয়া বাড়ী ফিরিল।

ফুল্লরা শীকারের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল; শূন্যহস্তে স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কালকেতু গোধিকার ছাল ছাড়াইয়া রাঁধিতে আদেশ করিল এবং সখী বিমলার গৃহ হইতে কিছু ক্ষুদ ধার করিয়া আনিতে বলিয়া সে বাসি মাংসের পসরা লইয়া বাজারে চলিয়া গেল।

এদিকে গোধিকারূপিণী চণ্ডী সুন্দরী যুবতীর বেশ ধারণ করিলেন। ফুল্লরা গৃহে ফিরিয়া দেখিল, এক অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী সুন্দরী যুবতী তাহার গৃহের আঙিনায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ফুল্লরা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তাহার স্বামীই তাঁহাকে আনিয়াছে এবং তিনি সেই ব্যাধ কুটীরেই থাকা স্থির করিয়াছেন।

চণ্ডীর ছলনা

ফুল্লরার দুঃখের সংসারে তাহার স্বামীপ্রেমই ছিল একমাত্র অমূল্যরত্ন। চণ্ডীর মুখ দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। পাছে সে রত্ন হারায়। ফুল্লরা সীতা, সাবিত্রীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, অনেক নৈতিক বক্তৃতা দ্বারা পরগৃহবাস হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। তারপর তাহাদের সংসারের সংবৎসরের দারিদ্র্যের কাহিনী বলিয়াও যখন তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না, তখন ফুল্লরা কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর নিকট ছুটিল।

কালকেতু গৃহে আসিয়া চণ্ডীর অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। সেও তাঁহাকে পরগৃহবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। দেবীকে নিরুত্তর দেখিয়া কালকেতুর ক্রোধবৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কালকেতু যখন কিছুতেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলনা তখন ধনুকে শর জুড়িল। চণ্ডী ফুল্লরার অকৃত্রিম স্বামীপ্রেম ও কালকেতুর অমোঘ চরিত্র-বলে মুগ্ধ হইয়া স্ব-মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন।

চণ্ডীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া কালকেতু ও ফুল্লরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল। চণ্ডী তাহাদিগকে সাতঘড়া ধন ও একটি অঙ্গুরী দিয়া নগর পত্তন করিতে

আদেশ দিলেন। কালকেতু মুরারি শীলের নিকট অঙ্গুরী ভাঙ্গাইতে গেলে মুরারি শীল তাহা পিতলের বলিয়া তাহাকে ঠকাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক মূল্যই দিল।

কালকেতু চণ্ডীর আদেশে গুজরাট বন কাটাইয়া নগর পত্তন করিল। সংসারে একপ্রকার লোক আছে যাহারা পরের অনিষ্ট করিতেই আনন্দ পায়। ভাঁড়ুদত্ত সেই প্রকৃতির লোক, সে ধূর্ত্ততার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। সে কালকেতুর নিকটে মন্ত্রীপদ প্রার্থনা করিয়া অপমানিত হইলে কলিঙ্গাধিপতিকে কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্ররোচনা দিল।

ব্যাধের রাজ্য লাভ

কলিঙ্গাধিপতি কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কালকেতু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ফুল্লরার পরামর্শে "লুকাইল বীর ধান্য ঘরে।" এখানেও ধূর্ত্ত ভাঁড়ুদত্ত সরলা ফুল্লরার উপকার করিবার ভাণ করিয়া তাহার স্বামীর খবর সংগ্রহ করিয়া কলিঙ্গাধিপতির কোটালকে জ্ঞাপন করিল।

কালকেতু বন্দী হইল। কারাগৃহে কালকেতু চণ্ডীর স্তব করিল। কলিঙ্গাধিপতিকে চণ্ডী স্বপ্নে আদেশ করিলেন যে, কালকেতু তাঁহার ভক্ত; তাহাকে মুক্তি দিয়া তাহার রাজ্য ফিরাইয়া দিতে হইবে।

পরাজয়

কালকেতু মুক্তিলাভ করিল। কলিঙ্গরাজের সাহায্যে সুদৃঢ়ভাবে রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব ভোগ করিতে লাগিল।

তারপর একদিন শুভ মুহূর্ত্তে কালকেতু ও ফুল্লরা শাপান্তে নীলাম্বর ও ছায়ারূপে স্বর্গে ফিরিয়া গেল।

স্বর্গারোহণ

ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান

তালভঙ্গের দোষে অপ্সরা রত্নমালা অভিশপ্ত হইয়া বণিকের গৃহে রম্ভাবতীর গর্ভে খুল্লনা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল।

একদিন উজানিনগরের যুবক ধনপতি সদাগর জনার্দ্দন ওঝা নামক এক ব্যক্তির সহিত ক্রীড়াচ্ছলে পায়রা উড়াইতেছিলেন। ধনপতির পায়রা শ্যেন পক্ষীর তাড়ায় ভীত হইয়া অদূরে ক্রীড়াশীলা খুল্লনার বস্ত্রাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পায়রার অনুসন্ধানে ধনপতিও আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ধনপতি পায়রা চাহিলেন, খুল্লনা দিল না—সে ধনপতিকে তাহার খুড়তুত ভগিনীর স্বামী জানিয়া তাঁহার সহিত কৌতুক করিয়া পায়রা লইয়া চলিয়া গেল। খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হইয়া ধনপতি জনার্দ্দন ওঝাকে খুল্লনার সহিত তাঁহার বিবাহ প্রস্তাব করিতে পাঠাইলেন।

পারাবত-ক্রীড়া

কুলে ও গুণে শ্রেষ্ঠ ধনপতি সহজেই সম্মতি পাইলেন। কিন্তু ধনপতির প্রথমা স্ত্রী লহনাসুন্দরী এই বিবাহের কথা শুনিয়া অভিমান করিয়া বসিল। ধনপতি তাহাকে অনেক প্রবোধ দিলেন, শেষে লহনা একদিন পাটশাড়ী ও চুড়ি গড়াইবার জন্য পাঁচতোলা সোনা পাইয়া স্বামীকে বিবাহে সম্মতি দিল।

বিবাহের পর ধনপতিকে রাজাজ্ঞায় সুবর্ণপিঞ্জর আনিতে গৌড়ে যাইতে হইল। গৌড়ে যাইবার সময় ধনপতি খুল্লনাকে লহনার হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন। লহনাও স্বামীর কথায় খুল্লনাকে ভালবাসিতে লাগিল।

সপত্নী হস্তে

এদিকে দুই সতীনের এইরূপ পরস্পর প্রীতিতে দুর্ব্বলা দাসীর বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। একজনের সহিত আর একজনের ঝগড়া বাধাইতে না পারিলে তাহার কোনরূপ সুবিধা নাই ভাবিয়া সে লহনাকে খুল্লনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য অনেক কূট পরামর্শ দিল। দুর্ব্বলার উপদেশ কাজে লাগিল। খুল্লনাকে স্বামীর চক্ষে বিষ করিতে লহনা নানারূপ মন্ত্রপূত ঔষধের ব্যবস্থা করিল। কিন্তু সখী লীলাবতীর

মন্ত্রপূত ঔষধে যখন কোন কাজ হইল না, তখন লহনা তাহার স্বামীর এক জালপত্র লইয়া খুল্লনার নিকট উপস্থিত করিল ; পত্রের মর্ম্ম এই—"অদ্য হইতে তুমি ছাগল চরাইবে, ঢেঁকিশালে শয়ন করিবে, এক বেলা আধ পেটা আহার করিবে এবং খুঁয়া বস্ত্র পরিবে।

নির্য্যাতন

বুদ্ধিমতী খুল্লনা বুঝিল, পত্রটি তাহার স্বামীর লেখা নহে এবং পত্রানুযায়ী কার্য্য করিতে সে প্রথমেই অস্বীকার করিল। তর্কবিতর্ক কলহে দাঁড়াইল এবং শারীরিক বলের প্রভাবে লহনারই জয় হইল।

খুল্লনাকে বাধ্য হইয়া ছাগল চরাইতে যাইতে হইল ; ঢেঁকিশালে শয়ন করিতে হইল এবং খুঁয়া বস্ত্রও পরিতে হইল। যুবতী খুল্লনা গৃহ হইতে বনের শ্যামল প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বসন্ত কালের বনের শ্যামলতা, কোকিলের কুহুরব, ভ্রমরের মধুর গুঞ্জন, প্রকৃতির তরুপল্লব দর্শনে খুল্লনার হৃদয়ে স্বামী-প্রেম উছলিয়া উঠিল ; সে কোকিলকে বলিল—"সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা, এই বনে ডাক অকারণ।"

অরণ্যচারিণী

একদিন পথশ্রান্তা খুল্লনা বসন্ত ঋতুর নব হিল্লোলে ও বনফুল-মত্ত বায়ুর স্পর্শে বনমধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল। এমন সময়ে চণ্ডী দেবী খুল্লনাকে রম্ভাবতী বেশে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন—"তোর 'সর্ব্বশী' ছাগল শৃগালে খাইয়াছে।" স্বপ্ন দেখিয়া খুল্লনার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—জাগিয়া দেখিল সত্য সত্যই সর্ব্বশী ছাগল নাই। লহনার তিরস্কারের ভয়ে সে ছাগল অন্বেষণ করিতে করিতে পঞ্চ দেবকন্যার দেখা পাইল। তাঁহারা খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা শিক্ষা দিল ; চণ্ডী খুল্লনাকে দেখা দিলেন। দেবী তাহাকে স্বামী-পুত্র লাভের বর দিয়া চলিয়া গেলেন।

চণ্ডী লহনাকে স্বপ্নে খুল্লনাকে পূর্ব্বের ন্যায় আদর যত্ন করিতে আদেশ দিলেন। স্বপ্ন দেখিয়া লহনার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাহার অনুতাপ উপস্থিত হইল। প্রভাতে যখন খুল্লনা গৃহে ফিরিয়া আসিল তখন চণ্ডীর স্বপ্নাদেশের কথা স্মরণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাহাকে আদর যত্ন করিতে লাগিল।

চণ্ডীর প্রসাদ

এদিকে ধনপতি গৌড়ে অসঙ্গত সুখে মত্ত হইয়া বাড়ীর কথা ভুলিয়া ছিলেন। সেই রাত্রে চণ্ডী দেবী ধনপতিকে স্বপ্নে খুল্লনা ও লহনাকে দেখাইলেন। ধনপতির বাড়ীর কথা মনে হইল। ধনপতি বাড়ী ফিরিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদে লহনা তাড়াতাড়ি সুন্দর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া স্বামী সন্দর্শনে গেল।

স্বামী সন্দর্শনে

এদিকে সেদিন সাধুর গৃহে বহু লোক নিমন্ত্রিত; ধনপতি খুল্লনাকে রন্ধন করিতে বলিলেন। লহনা আপত্তি করিল এবং রন্ধন কার্য্যে খুল্লনার অনিপুণতার কথা তুলিয়া তাহাকে রন্ধন হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল। এই আপত্তিতে কোন ফল হইল না, খুল্লনাই রাঁধিতে গেল। চণ্ডী খুল্লনাকে বর দিলেন। রন্ধন খুব উত্তম হইল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ খুব সুখ্যাতি করিলেন।

ইহার পরে ধনপতির পিতৃ-শ্রাদ্ধে নানা স্থান হইতে স্বজাতিবর্গ আসিলেন। মালা-চন্দন দেওয়া লইয়া সভায় গণ্ডগোল বাধিল। খুল্লনা বনে ছাগল চরাইত—এই কলহের সুযোগে তাঁহারা খুল্লনার সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণে আপত্তি তুলিলেন এবং খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষা না হইলে তাঁহারা কেহই আহার করিবেন না কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে ধনপতিকে এক লক্ষ টাকা শাস্তি স্বরূপ দিতে হইবে এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন।

সামাজিক বিপত্তি

এই অবস্থায় ধনপতি লহনাকে তাহার কার্য্যের জন্য ভৎর্সনা করিলেন এবং এক লক্ষ টাকা দিয়া সভাসদ্‌দিগের মুখ বন্ধ করিবেন বলিয়া খুল্লনাকে আশ্বাস দিলেন। খুল্লনা তাহাতে সম্মত হইল না। সে জানিত যে, এক লক্ষ টাকায় বর্ত্তমানে তাঁহাদের মুখ বন্ধ হইলেও অন্য নিমন্ত্রণ উপলক্ষে পুনরায় এই প্রশ্ন তুলিয়া তাঁহারা দ্বিগুণ চাহিবেন। সে পরীক্ষা দিতেই মনস্থ করিল।

পরীক্ষা

খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষা হইল। তাহাকে জলে ডুবাইতে চেষ্টা করা হইল—সর্প দ্বারা দংশন করান হইল, প্রজ্বলিত লৌহ দণ্ডে তাহাকে দগ্ধ করা হইল, অবশেষে তাহাকে জতুগৃহে রাখিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হইল—কিন্তু খুল্লনার কিছুই হইল না। সে সতী, সতীত্বের ধ্বজা উড়াইয়া জতুগৃহ হইতে অক্ষত অবস্থায় বাহিরে আসিল।

বাণিজ্য যাত্রা

কিছুদিন পরে রাজ-ভাণ্ডারে চন্দনাদি দ্রব্যের অভাব হওয়ায় ধনপতিব সিংহল যাত্রা করিতে হইল। খুল্লনা তখন গর্ভবতী। যাত্রার নির্দ্ধারিত সময় অশুভ ছিল; কিন্তু ধনপতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সাত ডিঙ্গা বোঝাই করিয়া যাত্রার আয়োজন করিলেন। খুল্লনা পতির মঙ্গল কামনা করিয়া চণ্ডী পূজা করিতে বসিল।

ধনপতি ছিলেন পরম শৈব; স্বামীর চক্ষে খুল্লনাকে বিষ করাইবার জন্য লহনা ধনপতিকে খুল্লনার দেবী পূজার কথা বলিল। ধনপতি ক্রোধে অন্ধ হইয়া "ডাকিনী দেবতা" বলিয়া চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিয়া গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন।

'কমলে কামিনী'

ধনপতি চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিয়াছিলেন, অকূল সমুদ্রে পাইয়া চণ্ডী ধনপতির উপর তাহার প্রতিশোধ তুলিলেন। তাঁহার ছয় ডিঙ্গা ডুবিল, স্বরূপ নষ্ট হইল; একমাত্র 'মধুকর

ডিঙ্গা' লইয়া তিনি পথে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া সিংহলে পৌঁছিলেন। সিংহলের পথে চণ্ডী তাঁহাকে "কমলে-কামিনী"র মূর্ত্তি দেখাইলেন।

কারাগৃহে

সিংহলরাজ ধনপতির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেন। কিন্তু ধনপতির মুখে 'কমলে-কামিনী'র অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া বিশ্বাস করিলেন না। ধনপতির বারংবার উক্তিতে সিংহলরাজ তাঁহাকে অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন যে, 'কমলে-কামিনী' দেখাইতে পারিলে তাঁহাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিবেন, নতুবা ধনপতিকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিতে হইবে। ধনপতি স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু সিংহলরাজকে তিনি সে দৃশ্য দেখাইতে পারিলেন না। চণ্ডী তাঁহাকে ছলনা করিলেন। অঙ্গীকার-অনুযায়ী ধনপতিকে কারাগৃহে অবরুদ্ধ থাকিতে হইল।

পিতৃ-সন্ধানে

এদিকে খুল্লনার এক পুত্র জন্মিল। মালাধর গন্ধর্ব্ব শিবের শাপে খুল্লনার গর্ভে শ্রীমন্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। শ্রীমন্ত ক্রমে বড় হইল; পাঠশালায় পড়িতে গেল। একদিন গুরু মহাশয়কে পরিহাস করায় গুরু রাগিয়া তাহার জন্ম সম্বন্ধে কটাক্ষ করিলেন। সেইদিনই তরুণ বয়স্ক শ্রীমন্ত পিতার উদ্দেশ্যে সিংহল যাত্রা করিতে মনস্থ করিল। রাজার অনুরোধ, মাতার ক্রন্দন তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। শ্রীমন্ত সাত ডিঙ্গা লইয়া সিংহল যাত্রা করিল।

মশানে

শ্রীমন্তও জলরাশির মধ্যে সেই 'কমলে কামিনী মূর্ত্তি' দেখিয়া সিংহল-রাজকে গিয়া বলিল—এবারেও এ'কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। রাজা বলিলেন, যদি শ্রীমন্ত 'কমলে-কামিনী' মূর্ত্তি দেখাইতে পারে তাহা হইলে তাহাকে অর্দ্ধেক রাজ্য ও তাহার সহিত তাঁহার কন্যাকে বিবাহ দিবেন, নচেৎ দক্ষিণ মশানে তাহার শিরশ্ছেদ হইবে। শ্রীমন্তকেও চণ্ডী ছলনা করিলেন—শ্রীমন্ত সিংহলরাজকে

"কমলে-কামিনী" মূর্ত্তি দেখাইতে পারিল না। রাজার লোকেরা তাহাকে মশানে লইয়া গেল। মশানে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তব করিল। চণ্ডী মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজার সৈন্যগণ চণ্ডীর ভূতপ্রেতের হস্তে পরাজিত হইয়া পলাইল। চণ্ডী শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিলেন। চণ্ডীর কৃপায় সিংহলরাজ 'কমলে কামিনী'র মূর্ত্তি দেখিলেন। পিতাপুত্রের মিলন হইল—শ্রীমন্তের সহিত সিংহল-রাজকন্যা সুশীলার বিবাহ হইল। পিতাপুত্রে বাড়ী ফিরিলেন। পথে ধনপতি চণ্ডীর কৃপায় তাঁহার ছয় ডিঙ্গা ফিরিয়া পাইলেন। উজানিনগরে আসিয়া শ্রীমন্ত উজানিনগরের রাজাকে 'কমলে কামিনী' মূর্ত্তি দেখাইয়া মুগ্ধ করিল এবং তাঁহার কন্যা জয়াবতীকে বিবাহ করিল। তারপর স্বর্গভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন।

মুক্তি

চণ্ডীমঙ্গলের এই গল্প দুইটি কোথা হইতে আসিল? সর্পপূজা সমগ্র ভারতবর্ষময় ব্যাপক বলিয়া মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর উদ্ভব প্রকৃত কোথায় হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা যেমন দুঃসাধ্য চণ্ডীমঙ্গলের তেমন নহে। মঙ্গল চণ্ডীর পূজা একমাত্র বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ, সেইজন্য ইহার কাহিনীও এই দেশেই উদ্ভূত হইয়াছিল।

কাহিনীর উদ্ভব

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে একটি শ্লোকে চণ্ডীমঙ্গলের উভয় কাহিনীরই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন,

"ত্বং কালকেতু-বরদা চ্ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গল চণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশাল বাহন নৃপাদ্ বণিজঃ স্বসূনোঃ
রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী।"

উত্তর খণ্ড, ১৬ অধ্যায়

অনেকে মনে করেন, এই শ্লোকটি হইতে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে।[১] কিন্তু তাহা সত্য নহে। বরং প্রচলিত চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তী কালে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে এই শ্লোকটি রচিত হইয়াছে। অতএব, একটি অত্যন্ত অর্ব্বাচীন পুরাণের সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত এই শ্লোকটির সহিত বাংলা চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর উদ্ভবের কোন সম্পর্ক নাই। ইহাতে শুধু লৌকিক দেবতা মঙ্গল চণ্ডীকে একটা পৌরা-ণিক আভিজাত্য দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দুইটি যে শুধু পরস্পর স্বতন্ত্র তাহাই নহে, ইহাদের উদ্ভবের কালও স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে কালকেতুর গল্পটি প্রাচীনতর। বাংলার তথাকথিত আর্য্য সমাজের মধ্যে অনার্য্য প্রভাব যখন প্রতিহত হইয়া উঠিয়াছিল তখনই এই অনার্য্য দেবতার উপর আর্য্য-আভিজাত্য পরিকল্পনা করিয়া নানাপ্রকার গল্প রচিত হইতেছিল। কারণ, "শবর রাঢ় চোয়াড় জাতিরা যখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের দেবতাদের সভ্য সমাজে প্রবেশ অনিবার্য্য হইয়া উঠে।"[২]

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এই দ্বন্দ্বের যুগেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এই সমস্ত আর্য্য-অনার্য্য মিলনাত্মক কাহিনীর সৃষ্টি হয়। বাংলার ইতিহাসের কোন যুগে এই সামাজিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে আনুমানিক যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার কথাই নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

চণ্ডী পূজার আদি স্থান

চণ্ডী মঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায় কলিঙ্গ দেশেই চণ্ডীর পূজা সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। মাণিক দত্তের

১ 'বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ' (জ্ঞানেন্দ্র কুমার কাব্যার্ণব) রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২২ সাল ১০৭ পৃ।

২ চণ্ডী মঙ্গল বোধিনী (চারু বন্দ্যোপাধ্যায়) পৃঃ ৯০৪

চণ্ডী মঙ্গলে আছে, আদ্যাদেবী বা চণ্ডী কলিঙ্গ নগরে তাঁহার প্রথম দেউল নির্ম্মাণ করিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মারূপী হনুমানকে আদেশ দিতেছেন,—

'আমার বচন ধর, কলিঙ্গ নগরে চল, দেহারা নির্ম্মাণ করহ।" মুকুন্দ রামের চণ্ডীতেও দেখিতে পাওয়া যায়, চণ্ডী কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নে বলিতেছেন,—

"করি বহু পরামর্শ আল্যাও ভারতবর্ষ
লইব তোমার পূজা আগে।
করিব রিপুর ধ্বংস বাড়াব তোমার বংশ
নৃপতি করাব নর-ভাগে॥"

ইহা হইতেই অনুমিত হয়, এই কলিঙ্গ দেশ হইতেই আসিয়া লৌকিক মঙ্গলচণ্ডী পূজা কালক্রমে বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল। চণ্ডীর দ্বিতীয় পূজারী ব্যাধ কালকেতু। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'সাহিত্য' নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার যোগ্য বিবেচনা করি, "কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে দেবী এই যে ব্যাধের দ্বারা নিজের পূজা মর্ত্ত্যে প্রচার করিলেন, স্বয়ং ইন্দ্রের পুত্র যে ব্যাধরূপে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিল, বাংলাদেশের এই লোক-প্রচলিত কথার কি কোন ঐতিহাসিক অর্থ নাই? পশুবলি প্রভৃতি দ্বারা যে ভীষণ পূজা এককালে ব্যাধের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেই পূজাই কালক্রমে উচ্চ সমাজে প্রবেশ লাভ করে নাই? কাদম্বরীতে বর্ণিত শবর নামক ক্রূরকর্ম্মা ব্যাধজাতির পূজা পদ্ধতিতে ইহারই কি প্রমাণ দিতেছে না? মালতী-মাধবের করালদেবীর পূজোপচারে যে নৃশংস বীভৎসতা দেখা যায়, তাহা কখনই আর্য্যসমাজের ভদ্রমণ্ডলীর অনুমোদিত ছিল বলিয়া মনে করিতে পারি না। এক সময়ে এই দেবী-পূজা যে ভদ্রসমাজের বহির্ভূত ছিল,

অনার্য্য সমাজ ও চণ্ডী

তাহা কাদম্বরীতে দেখা যায়; কবি ঘৃণার সহিত অনার্য্য শবরের পূজা-পদ্ধতির যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, পশু-রুধিরের দ্বারা দেবতার্চ্চন ও মাংস দ্বারা বলিকার্য্য তখন ভদ্রমণ্ডলীর কাছে নিন্দিত ছিল। কিন্তু সেই ভদ্রমণ্ডলীও পরাস্ত হইয়াছিলেন। সেই সামাজিক মহোৎপাতের দিনে নীচের জিনিস উপরে এবং উপরের জিনিস নীচে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

"বৌদ্ধধর্ম্মের লোপের পর কলিঙ্গদেশে শৈবধর্ম্মের প্রবল অভ্যুদয় হইয়াছিল—ভুবনেশ্বর তাহার প্রমাণ। কলিঙ্গের রাজারাও প্রবল রাজা ছিলেন। এই কলিঙ্গ রাজত্বের প্রতি শৈবধর্ম্মবিদ্বেষীদের আক্রোশ প্রকাশ, ইহার মধ্যেও দূর ইতিহাসের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়।"

কিন্তু এই কলিঙ্গদেশ কোথায়? প্রাচীন বাংলার কবিদিগের ভৌগোলিক জ্ঞান যে খুব সুস্পষ্ট ছিল না তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অতএব, এই কলিঙ্গের উল্লেখ হইতেই প্রাচীন ভৌগোলিক বিভাগোক্ত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের কলিঙ্গ অর্থাৎ উড়িষ্যা বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। এই সম্পর্কে মালদহ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস পলিত মহোদয় "গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী গীতে বৌদ্ধ প্রভাব" শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কতক উদ্ধৃত করিতেছি,—"এতদেশ থাকিতে কলিঙ্গদেশে দেহারা (চণ্ডীর) নির্ম্মাণের আবশ্যক কি ছিল? তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, এ কলিঙ্গ পুণ্ড্রদেশ বহির্ভূত হিমালয় সন্নিকটবর্ত্তী বৌদ্ধতান্ত্রিক প্রধান দেশ। Broucke কৃত ১৬৩০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে কোচবিহার ও আসামের উত্তরস্থিত এক কলিঙ্গবন দৃষ্ট হয়। এই কলিঙ্গ দেশে এক সময়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রভাব বিশেষ ভাবে আত্মবিস্তার করিয়াছিল। দার্জ্জিলিংএ অদ্যাপি একটি সংঘারামের চিহ্ন ও বৌদ্ধ দেবদেবী মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। আমাদের বিশ্বাস, কতকগুলি অনার্য্য দেবতা বৌদ্ধ

কলিঙ্গ কোথায়?

ও হিন্দু দেবদেবীতে পরিণত হইয়াছেন। যে সময়ের কথা মাণিক দত্ত বলিতেছেন, সম্ভবতঃ সেই সময়ে উক্ত কলিঙ্গ দেশে অবশ্য পুণ্ড্র রাজ্যের পার্শ্বেই, বৌদ্ধগণ বা অনার্য্যগণ তখন বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম্মের উৎকর্ষে যত্নবান ছিলেন। সেই কারণে কলিঙ্গে আদ্যার দেহারা তুলিবার ইচ্ছা হইল, তখনও ঐ দেশে বৌদ্ধতান্ত্রিকতামূলক অপূর্ব্ব দেবদেবীর আবির্ভাব হয় নাই। উক্ত কলিঙ্গ হইতেই বৌদ্ধতান্ত্রিকতামূলক কোন কোন প্রজা পুণ্ড্র বা মালদহ প্রদেশে আনীত হইয়া থাকিবে। পুণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণও সম্ভবতঃ সেইকালে সেই নব ধর্ম্মদেবীর উপাসনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় জনগণ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন।"[১] উদ্ধৃত অংশে প্রবন্ধকার বলিতে চাহেন যে, এই চণ্ডীর পূজা বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক সমাজের বহির্ভূত কোন অনার্য্য সমাজেই সর্ব্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল। অতঃপর তাহা বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজে আসিয়া প্রবেশ লাভ করে। পূর্ব্বে যে আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, এই দেবী কোলমুণ্ডা ব্যাধের সমাজ হইতেই ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে। রাঢ় ও বারেন্দ্রের সংলগ্ন পশ্চিমদিকের আরণ্য ও পার্ব্বত্যভূমি প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতেই মুণ্ডা সাঁওতাল জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হইয়া আসিতেছে, বাংলার আর্য্য ও অনার্য্য মিশ্র সমাজে তাহাদের ভাষার যেমন প্রভাব লক্ষিত হয়[২] তেমনি বাংলার সামাজিক জীবনেও তাহাদের প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ব্যাধ-সমাজে চণ্ডী

১ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৭ সাল, পৃঃ ২৫৫।

২ Munda Affinities of Bengali (Md. Shahidullah), Proceedings of the Sixth Oriental Conference. Pg. 715.

প্রাচীন কবিদিগের ভৌগোলিক জ্ঞান খুব স্পষ্ট ছিল না। অতএব কলিঙ্গরাজ্যে সর্ব্বপ্রথম চণ্ডীর দেহারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, নির্দ্দেশ করিতে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, এই দেবতা এই দেশে এখনও অপরিচিত হইলেও অন্যত্র তাহার বিশেষ প্রভাব বর্ত্তমান। ইহা দ্বারা সন্দিগ্ধ লোকের মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি উৎপাদনের চেষ্টা করা হইত। অতএব, প্রাচীন কলিঙ্গের ভৌগোলিক সীমা সন্ধান করিয়া এই দেবতার উদ্ভব-ক্ষেত্র নিরূপণ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল।

চণ্ডীমঙ্গলে সৃষ্টি-তত্ত্ব

কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের কতকগুলি বিষয় হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যোগ-তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রভাবিত সমাজেই এই দেবতার পূজার বিশেষ বিস্তার লাভ ঘটিয়াছিল। এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব। এই চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবিত অন্যতম গ্রাম্যদেবতা ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারক কাব্য ধর্ম্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণ একরূপ এবং বৌদ্ধমত শূন্যবাদের অনুকূল। ইহার সহিত আবার পরবর্ত্তী কালে নাথ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীও আসিয়া মিলিত হইয়াছে। যদিও ইহাতে উক্ত দেবতাগণ পৌরাণিক তথাপি এই বিষয়ে পুরাণের স্বতন্ত্র কোন প্রভাব ইহাদের উপর একেবারেই দৃষ্টিগোচর হয় না। অবশ্য নাথপন্থ ও ধর্ম্মপূজা উভয়েই বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রভাবিত বলিয়া উভয়ের কাহিনী মধ্যে স্বভাবতঃই কতকটা ঐক্য রহিয়াছে এবং এই মঙ্গলচণ্ডীও বৌদ্ধ সমাজের ভিতর দিয়া আগত বলিয়া তাহার সহিত বৌদ্ধসমাজসম্মত সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীও সংযুক্ত হইয়া আসিয়াছে।

মাণিকদত্তের সৃষ্টিতত্ত্ব

মাণিকদত্তের মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে এইভাবে সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে,—আদিদেব নিরঞ্জন ধর্ম্ম প্রথমে একা ছিলেন, তারপর জগৎ সৃষ্টির কার্য্যে মনঃসংযোগ করিয়া মুখামৃত হইতে জলের সৃষ্টি করিলেন, বাহন উলূকের সৃষ্টি করিলেন,

পাতাল হইতে মাটি আনিয়া বসুমতী সৃষ্টি করিলেন, নিজের কনক পৈতা ছিঁড়িয়া সহস্র-শীর্ষা বাসুকিকে সৃষ্টি করিলেন এবং তাহার উপর বসুমতীকে স্থাপন করিলেন, অতঃপর ধর্ম্মের হাস্য হইতে আদ্যার জন্ম হইল, অতঃপর ধর্ম্ম ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহাদেবকে সৃষ্টি করিলেন, আদ্যা সাতবার জন্মগ্রহণ করিয়া আসিলে পর মহাদেবের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল। মাণিক দত্ত বলিয়াছেন, এই আদ্যাই শিবের বিবাহিতা চণ্ডী।

মুকুন্দরামে সৃষ্টিতত্ত্ব

মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের কবি কঙ্কণেও এই আদ্যার বন্দনা দেখিতে পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন,

আদি দেবের শক্তি ভুবন মোহন মূর্ত্তি
উরিলেন সৃষ্টির কারিণী,
করিয়া সম্পুট পাণি মৃদুমন্দ সুভাষিণী
সম্মুখে রহিলা নারায়ণী।
প্রভুর ইঙ্গিত পায়্যা আদ্যাদেবী মহামায়া
সৃষ্টি নিয়জিতে কৈলা মন।" ইত্যাদি—

ভারতচন্দ্রে

ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদা-মঙ্গলেও এই সৃষ্টি প্রকরণ বৌদ্ধধর্ম্ম সম্মতও নাথ সম্প্রদায়ের সাহিত্যের অনুকূল। অতএব দেখা যাইতেছে যে,বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত এই চণ্ডীর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ইহা হইতেও আমাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয়।

চণ্ডীমঙ্গলের উভয় কাহিনীই অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। ধনপতি সদাগরের গল্পটি প্রধানতঃ পদ্মাপুরাণের কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক রীতিতে রচিত। কিন্তু

কাহিনীর ঐতিহাসিকতা

কেহ কেহ মনে করেন, ইহার মূলেও ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। এই সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য কিছু বিস্তৃত করিয়াই উদ্ধৃত করিতেছি,—"ধর্ম্মকথা

বাদ দিলেও চণ্ডীকাব্যের একটা মূল্যবান ঐতিহাসিক দিক আছে, যাহা উপেক্ষা করা যায় না। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত মঙ্গলকোটে বিক্রমকেশরী রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়; রাজ-প্রাসাদ একটি দুর্গদ্বারা অভিরক্ষিত ছিল। মঙ্গলকোটের অধিবাসিগণ বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টির পর এই পুরাতন রাজবাড়ীর উপর সোনা খুঁজিয়া থাকে, এইস্থানে মাঝে মাঝে অনেকে অনেক অর্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোগ্রামের মঙ্গলচণ্ডীর দেউলের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে শ্রীমন্তের ডাঙ্গা এখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রীমন্ত সদাগরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছে। ডাঙ্গার অনতি-উত্তরে অজয় নদ ও পূর্ব্বভাগে ক্ষীণ-সলিলা কুনুর নদী প্রবাহিতা। অদ্যাপি কোগ্রামবাসী নরনারীগণ বিজয়াদশমীর দিন দেবীর ঘট বিসর্জ্জনের পর মঙ্গল-চণ্ডীর দেউলে গমন করিয়া মহামায়ার চরণে প্রণামপূর্ব্বক এই শ্রীমন্তডাঙ্গায় আগমন করিয়া যাত্রা করেন। শ্রীমন্ত এইস্থান হইতে যাত্রা করিয়া সিংহলে গমনপূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এইস্থানের প্রতি সাধারণের যথেষ্ট ভক্তি ও বিশ্বাস রহিয়াছে। খুল্লনা ছাগল চরাইবার সময় যে স্থানে ভাত রাঁধিয়া ভাতের মাড় ফেলিয়াছিলেন, তাহা 'মাড়গাড়া' নামে বিখ্যাত হইয়া খুল্লনার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। পূর্ব্বকালে কোগ্রাম, মঙ্গল-কোট, ইছানি, আড়াল প্রভৃতি গ্রামসমূহকে একত্রে উজানি বলিত।[১] বর্ত্তমান সময়ে উজানি নামে কোন গ্রাম বা নগর বর্ত্তমান নাই; কেবলমাত্র উজানির মেলাই উজানির অস্তিত্ব

লোক-প্রবাদ

[১] পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' বলিতেছেন, "মঙ্গলকোটের নিকটে উজানী (উজ্জয়িনী) নামে অদ্যাপি একটি স্থান দেখা যায়। ইহা পতিত ভূখণ্ড মাত্র—গ্রাম বা নগর ইহার উপর কিছুই নাই।" পৃঃ ১০৭

ঘোষণা করিতেছে।[১] এই উজানিতে পূর্ব্বে বিক্রমকেশরী নামে এক রাজা ছিলেন, মঙ্গলকোটে তাহার রাজধানী ও দুর্গ ছিল। মঙ্গলচণ্ডীদেবী দুর্গের রক্ষয়িত্রীরূপে প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলিয়া দুর্গের নাম মঙ্গলকোট হইয়াছিল। ধনপতি দত্ত ও শ্রীমন্ত সওদাগর রাজা বিক্রমকেরশীর সভার বণিক ছিলেন; যে স্থানে বর্ত্তমান কোগ্রাম অবস্থিত, তাঁহারা তথায় বাস করিতেন।"[২]

ঐতিহাসিক মূল্য

বলা বাহুল্য, কোন নিশ্চিত ঐতিহাসিক প্রমাণদ্বারা সমর্থিত না হইলে এই জাতীয় লোক-প্রবাদের উপর কোন আস্থা স্থাপন করা যায় না। বাঙ্গালাদেশে ভগ্নস্তূপের অভাব নাই, এবং এই সমস্ত ভগ্নস্তূপকে অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী কালে যে যাহার প্রয়োজন মত কাহিনী রচনা করিয়া লইতে এবং তাহা বিশ্বাস করিতেও এইদেশে লোকের কোনদিন অভাব হয় নাই। অতএব, 'এই মঙ্গলচণ্ডীর কাহিনীর মূলে কোন প্রকার ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া কেহই আস্থা স্থাপন করেন না। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ও লিখিয়াছেন, "সচরাচর প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণে ইহার (চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর) কোনরূপ উল্লেখ দেখিতে না পাওয়ায় অনেকে ইহাকে স্বকপোল-কল্পিত বলিয়াই মনে করেন। আমরা বাল্যকালে পিতামহীদিগের মুখে মনসার কথা, ইতুর কথা, ষষ্ঠীর কথা, সুবচনীর কথা, লক্ষ্মীর কথা, মঙ্গল-চণ্ডীর

---

১ এতদ্দেশে প্রচলিত তন্ত্রের পুঁথিগুলিতে উজানী একান্ন পীঠের অন্যতম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যে একান্নপীঠ বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

'উজানীতে কফোণি মঙ্গলচণ্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যারে সেবি॥'

বর্ত্তমান কোগ্রামই এই উজানী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

২ রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২২ সাল, পৃঃ ৯৭

কথা প্রভৃতি অনেক কথা শুনিয়াছি ; সেই কথায় এইরূপ অনেক উপাখ্যান আছে। অতএব, আমাদের বোধ হয়, কবি স্বদেশ-প্রচলিত তাদৃশ কোন উপাখ্যানকে ভিত্তি স্বরূপ করিয়া তদুপরি এই সুরম্য হর্ম্মোর নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন।"[১]

কাহিনীর আদি রচয়িতা

এই কাহিনীর আদি রচয়িতা কে? ইহা বলাই বাহুল্য যে, পাঁচালী বা লোক-কথায় ক্ষুদ্র গীতিকাব্যের আকারে ইহা বহুকাল হইতেই হয়ত সমাজে প্রচলিত ছিল। অতঃপর নিপুণ কাব্যশিল্পীদিগের হাতে পড়িয়া পরবর্ত্তী কালে ইহা মঙ্গল-কাব্যের রূপ লাভ করিয়াছে।

মাণিক দত্ত

ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের বন্দনা করিতে গিয়া বাল্মীকি, বেদব্যাস, জয়দেব, বিদ্যাপতির সঙ্গে মাণিক দত্ত ও শ্রীকবিকঙ্কণ নামক দুই কবির উল্লেখ করিয়াছেন,

"জয়দেব বিদ্যাপতি বন্দোঁ কালিদাস।
আদি কবি বাল্মীকি বন্দিলুঁ মুনি ব্যাস॥
মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত-পথ পরিচয়॥
বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ।
প্রণাম করিয়া মাতা পিতার চরণ॥" —দিগ্‌বন্দনা

ইহা হইতে মনে হয়, মুকুন্দরামের মতে মাণিক দত্তই এই গীতি রচনার প্রবর্ত্তক এবং শ্রীকবিকঙ্কণ উপাধিধারী কোন ব্যক্তি মুকুন্দরামের সঙ্গীত শিক্ষক। কেহ কেহ মনে করেন, এই কবিকঙ্কণও মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (তৃতীয় সংস্করণ) পৃষ্ঠা ১০৫

একজন কবি, তাঁহার প্রকৃত নাম বলরাম। মেদিনীপুর অঞ্চলে তাঁহার মঙ্গলচণ্ডীর গীত বিশেষ প্রচলিত ছিল, মুকুন্দ তাঁহার কাব্যরচনায় তাহা-কর্তৃকও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। মুকুন্দরাম কর্তৃক মাণিক দত্তের এই উল্লেখ হইতেই সকলে তাঁহাকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন।[১] মাণিক দত্তের চণ্ডী-মঙ্গলে সৃষ্টিতত্ত্ববর্ণনা-সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেও প্রতীয়মান হইবে যে, এই দেশের সমাজে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্বেই মাণিক দত্তের কাহিনী রচিত হইয়াছিল। উক্ত অংশ পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধ ও নাথ সাহিত্য হইতে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ হইবারও সঙ্গত কারণ নাই; কারণ, মাণিক দত্তের নামে প্রচলিত একাধিক পুঁথিতে উক্ত সৃষ্টিতত্ত্বটি প্রায় একই প্রকার পাওয়া যায়। অতএব ইহা মাণিক দত্তের মৌলিক রচনা বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। মুকুন্দরাম নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, "বিচারিয়া অনেক পুরাণ" তিনি তাঁহার কাব্য-রচনা করিয়াছেন, তখন সমাজের মধ্যে সংস্কৃত পুরাণের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল এবং এই যুগের কবিগণ তাঁহাদের পূর্ব্বতন কবিদিগের রচনাগুলিকে এই সংস্কৃত পুরাণের আদর্শে পুনর্গঠন করিয়া ইহাদের মধ্যে এক অভিনব বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাণিক দত্তের রচনা এই যুগের এই পৌরাণিক অনুকরণের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। ইহা হইতেই স্বভাবতঃই মনে হইবে যে, মাণিক দত্ত মুকুন্দরামের অনেক অগ্রবর্ত্তী, তবে একেবারে তিন শত বৎসরের অগ্রবর্ত্তী কি না তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।

কবির সময়

১ বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩০০ ; Origin and Development of Beng. Lang. (S. K. Chatterjee) Pg. 131, ১

মাণিক দত্তের রচনা পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, তিনি প্রাচীন গৌড় বা মালদহ অঞ্চলের লোক।[১] তাঁহার কাব্য এখনও মালদহ অঞ্চলেই প্রচলিত আছে। তাহাতে যে সমস্ত স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা সমস্তই মালদহ বা গৌড়ের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। চণ্ডীর চক্রান্তে মগরা নদীর জলে যখন শ্রীমন্তের সমস্ত ডিঙ্গিগুলি ডুবিল তখন তাহাতে মহানন্দা, কালিন্দী, পুনর্ভবা ও টাঙ্গন প্রভৃতি নদীও আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। এই সমস্ত নদীই গৌড়ের সন্নিকটে অবস্থিত। অন্য কোন চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যে ইহাদের উল্লেখ মাত্র নাই। এতদ্ব্যতীত ধনপতি সদাগরের গৌড়ে আগমন উপলক্ষে মাণিক দত্ত এই সমস্ত স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন,

কবির বাসস্থান

"মোড় গ্রামে করি স্নান, রন্ধন ভোজন পান,
ছাত্যা ভাত্যা এড়াইল তথি।
বড় গাছা আগ্‌লা সকল গঙ্গা পার হৈলা
বুধ রাত্রে বানিয়া ধনপতি॥
কাঞ্চন নগর আইল সদাগর
আইলে বাণ্যা সন্ন্যাসী পাটন।
যায় সাধু গঙ্গাজলে স্নান করিয়া চলে
রাজদ্বারে দিল দরশন॥"

মোড়গ্রাম, বড়গাছা, আগলা, কাঞ্চননগর ও সন্ন্যাসীপাটন এই গ্রাম গুলি প্রাচীন গৌড়ের ইতিহাসে নদী-তীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া পরিচিত। ছেতে ভেতের বিল বা ছাত্যা ও ভাত্যার বিল গৌড়ের

১ 'মাণিক দত্তের মঙ্গল-চণ্ডী', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী) ১৩১১ সাল, পৃঃ ৩৪; গৌড়ীয় মঙ্গল-চণ্ডী গীতে বৌদ্ধ প্রভাব', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, (শ্রীহরিদাস পালিত) ১৩১৭ সাল, পৃঃ ২৪৮

পূর্ব্বদিকে অবস্থিত সুবৃহৎ বিল। বহু প্রাচীন গ্রন্থে ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ভেতে বা ভাত্যার-বিল পদ্মার গর্ভ হইতে জন্মিয়াছে, প্রসিদ্ধ আইন-ই-আকবরিতেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌড় হইতে বিদায় হইয়া ধনপতি সদাগর,

"গৌড়েশ্বরী প্রণমিঞা গঙ্গাপুর হইল পার।

গঙ্গাস্নান করিয়া করিল ফলাহার॥" —মাণিকদত্তের চণ্ডী

গৌড়েশ্বরীর মন্দির গৌড়েই অবস্থিত, কবি সেই অঞ্চলের লোক না হইলে এই গৌড়েশ্বরীর উল্লেখ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। মাণিক দত্ত শ্রীমন্তের চৌতিশায় ভগবতীকে দ্বারবাসিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, এখন পর্য্যন্তও প্রাচীন গৌড়ের নিকটবর্ত্তী চণ্ডীপুব গ্রামে দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বারবাসিনী গৌড়েরই বিশিষ্ট দেবতা।

চণ্ডীর রূপ বর্ণনায় মাণিক দত্ত বলিয়াছেন,

"মাজাখানি দেখি তোর কেন্দুয়ার নালা।" —ঐ

এই কেন্দুয়ার নালাও মালদহ জেলায় অবস্থিত।

কবির পরিচয়

মাণিক দত্ত তাঁহার পুঁথিতে যে সংক্ষিপ্ত আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিবাস ফুলুয়া নগর। এই ফুলুয়া নগর মালদহ জিলার বর্ত্তমান ফুলবাড়ী বলিয়া অনেকে সন্দেহ করেন। কবির উল্লিখিত স্থানসমূহ ফুলবাড়ীর চতুস্পার্শ্বেই অবস্থিত বলিয়া এই ধারণা অনেকটা সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

১ 'মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী,' সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী) ১৩১১ সাল, পৃঃ ৩৫।

মাণিক দত্তের আত্মবিবরণী হইতে জানা যায়, তিনি কানা ও খোঁড়া ছিলেন ; দেবীর অনুগ্রহে তাঁহার এই উভয় দোষই ঘুচিয়া যায়। চণ্ডী তাঁহাকে অষ্টমঙ্গলার পুঁথি রচনা করিতে স্বপ্নাদেশ করেন। দেবীর প্রসাদে তিনি কবিত্বশক্তি লাভ করেন। এই পুঁথি পাইয়া তিনি গানের দল বাঁধেন, তাঁহার দুইজন দোহার ছিল। তাহাদের নাম রঘু ও রাঘব। তাহাদিগকে লইয়া তিনি নানা জায়গায় বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে চণ্ডীর গান গাহিয়া বেড়াইতেন.

> "রঘু রাঘব 'পাইল' দিনু সহিতি করিঞা।
> বায়েন তাম্বুর দিনু সম্প্রদা গৌছাঞা॥
> তিন চারি জনে সবে সম্প্রদা হইঞা।
> দুর্গার মণ্ডপে সবে উত্তরিল গিঞা॥

কথিত আছে যে, মাণিক দত্তের গানে কলিঙ্গ রাজের উল্লেখ থাকাতে তৎকালীন কলিঙ্গরাজ তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজের রাজ্যে ধরিয়া আনেন ও কারাগারে নিক্ষেপ করেন। চণ্ডীর কৃপায় কবি মুক্তি লাভ করেন। কলিঙ্গরাজও চণ্ডীর মাহাত্ম্য দর্শনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিজেও তাঁহার পূজার অনুষ্ঠান করেন। এইভাবে কলিঙ্গরাজ্যে চণ্ডীর পূজা প্রচারিত হয়।

মাণিক দত্ত বর্ণিত সৃষ্টি তত্ত্বের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তৎকালীন গৌড়ীয় সমাজে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ও মঙ্গলচণ্ডী দেবী এই বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়া এই হিন্দু পুরাণ-বহির্ভূত বৌদ্ধ সৃষ্টি তত্ত্বের আখ্যান ইহাতে আসিয়া স্থানলাভ করিয়াছে। মালদহে প্রচলিত জগজ্জীবনের মনসার পাঁচালীতেও অনুরূপ সৃষ্টি তত্ত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নতুবা অন্য সমস্ত পদ্মপুরাণেই সৃষ্টি তত্ত্বের কাহিনী স্বতন্ত্র।

মাণিক দত্তের রচনা সরল ও অনাড়ম্বর, এই রচনা সরল-প্রাণ ভক্তের মর্ম্মস্পর্শী হইলেও সাহিত্য রসিকের হৃদয়গ্রাহী হইবার ধৃষ্টতা রাখে না। মঙ্গলচণ্ডী পূজার বিধান নির্দ্দেশ করিতে তিনি লিখিয়াছেন,—

রচনার দোষ গুণ

"ঘট স্থাপিয়া বৈসে গৌরী পার্ব্বতী
নাট গীতে বড় হৈল রঙ্গ॥
দুয়ারে ব্রহ্মা পাতালে বাসুকি
নবগ্রহ বৈসে স্থানে স্থানে।
অষ্ট নাগ কুল লৈঞা আইল মনসাদেবী
সেহ বসে এক স্থানে॥
পূজহি মঙ্গল-চণ্ডিকা এক মন চিত্তে
হইয়া হরষিত মনে।
দুর্গারে পূজিলে বিঘ্ন খণ্ডিবে
লক্ষ্মী হবে পরসন্ন।
বারি অবলম্বনে নানা নাট শুভক্ষণে
অষ্টরাত্রি সপ্তদিন পূজন॥"

মাণিক দত্তের কাব্যে চরিত্র সৃষ্টির কোন প্রয়াস নাই। একমাত্র কাহিনীটি ছন্দ দ্বারা গ্রথিত করা হইয়াছে মাত্র, তিনি ছড়া পাঁচালীর আকারে লোক মুখে প্রচলিত কাহিনীই হয়ত একটা যৎসামান্য কাব্যগৌরব দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তথাপি স্থানে স্থানে তাঁহার কবিত্ব শক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সম্পর্কে তাঁহার একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

রচনায় প্রাচীন ছড়ার প্রভাব

"আমারে বোল ডানরে বুড়িরে আমারে বোল ডান।
কার খাইনু ভাতার পুত কার করিনু হান॥

ডান নইরে ডান নই হইএ মুখ দোষী।
দ্বারে বোসে খাইনু মুই চৌদ্দ ঘর পড়শি॥
ডাইন বোলিঞা মোরে বোলে বার বার।
দ্বারে বোসে খাইনু মুই বুঢ়া পোদ্দার।
উত্তর দেশে গেনু খাইঞা আইনু কাঙ্গাল।
দুয়ারে বসিয়া খাইনু তিন লক্ষ বাঙ্গাল॥
ডাইন বোলিয়া মোরে বোলে বার বার।
আজিকা হইনু ডান তোমা খাইবার॥"

রচনার দিক দিয়া প্রাচীন ছড়ার আদর্শ হইতে ইহা মুক্ত না হইলেও বিষয় বস্তুর দৃষ্টি ভঙ্গিতে কবি সামান্য স্বকীয়তার দাবী করিতে পারেন মাত্র।

মাণিক দত্তে প্রক্ষিপ্ত রচনা

এত প্রাচীন একজন কবির একেবারে খাঁটি রচনার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা দুষ্কর। এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীর বহুল প্রচারের জন্য পরবর্তী কালে এই মাণিক দত্তের কাব্যেও মুকুন্দরামের অনেক পদ আসিয়া প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী গায়েনেরা মাণিক দত্তের পদের মধ্যে মুকুন্দরামের পদেরও যোজনা করিয়া লইত, তাহাতেই মাণিক দত্তের পুঁথির মধ্যে অনেক স্থলেই মুকুন্দরামের পদের সহিত পরিচয় ঘটে। মাণিক দত্তের কাব্যে একটি পদ পাওয়া যায়,—

"মাণিক দত্ত রচিয়া মাণিক দত্ত কৈল।
রঘুর রচনা কবিকঙ্কণ হইল॥"

ইহার অর্থ এই হয় যে, মাণিক দত্তের রচিত পদ মাণিক দত্ত নিজে গান করিতেন কিন্তু তাহার মধ্যে রঘু নামক কোন গায়েন কবিকঙ্কণের

রচনা সংযোগ করিয়া দিল। ইহা হইতেও মূল কবির রচনা-বিকৃতিতে গায়েনদিগের যথেচ্ছাচারিতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

একমাত্র সৃষ্টি-তত্ত্বের আখ্যান ব্যতীত মাণিক দত্তের চণ্ডীতে চণ্ডীমঙ্গলের সাধারণ কাহিনীর সঙ্গে তাহার আর বিশেষ কোন অনৈক্য নাই। ইহাতেও দুইটি কাহিনী ;—কালকেতু ব্যাধের কাহিনী ও ধনপতি সদাগরের কাহিনী। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে, পরবর্ত্তী কালে মুকুন্দরামের ব্যাপক প্রভাবের ফলে এই কাহিনীগত সমগ্র অনৈক্য একপ্রকার বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল। অতএব মাণিক দত্তের মূল গ্রন্থের সন্ধান যতদিন না পাওয়া যায় ততদিন তাঁহার এই সম্পর্কে বৈশিষ্ট্যের কথা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। একমাত্র তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্ব রচনার বৈশিষ্ট্যই কালের দুর্জ্জয় পরীক্ষা উপেক্ষা করিয়াও বর্ত্তমানে রহিয়া গিয়াছে।

বর্দ্ধমানের কবি মুকুন্দরামের নিকট ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগেও মাণিক দত্তের নাম অপরিচিত না হইলেও তৎপরবর্ত্তী যুগেই তাঁহার প্রচার একমাত্র তাঁহার নিজের অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

চণ্ডীমঙ্গলের একজন শ্রেষ্ঠ কবির নাম মাধবাচার্য্য। তিনি তাঁহার কাব্যে এই প্রকার আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন,

মাধবাচার্য্য

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারায় বহে জল॥
সেই মহানদী তটবাসী পরাশর।
যাগে যজ্ঞে যপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥

মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু।
আচারে বিচারে বুদ্ধে সম দেবগুরু॥
তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥
ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত॥

ইহা হইতেই জানিতে পারা যায়, দিল্লীশ্বর আকবরের রাজত্বকালে ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম নিবাসী পণ্ডিত পরাশরের পুত্র মাধবাচার্য্য তাঁহার চণ্ডী মঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা-ভাগে মঙ্গল কাব্যের যে যুগকে সৃজন-যুগ (age of creation) বলিয়া অভিহিত করিয়াছি মাধবাচার্য্য সেই যুগেরই সর্ব্বপ্রথম কবি। পাঁচালী ও লোক-গাথার বৈচিত্রহীন রচনা হইতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই কাহিনীকে একখানি প্রথম শ্রেণীর কাব্য রচনার মর্য্যাদা দান করিলেন, এবং তাঁহার এই প্রবর্ত্তিত পথে ক্রমে মধ্যযুগের দুইজন শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র তাঁহাদের নিজেদের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজিয়া পাইলেন।

কথিত হয়, মাধবাচার্য্য ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমার নবীনপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম গোঁসাই-গঞ্জ। তাঁহার পিতামহও পরম পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নাম ধরণীধর বিশারদ। তাঁহার পুত্রের নাম জয়রাম গোস্বামী।

মাধবের কবিত্ব

মধ্য যুগের বঙ্গ সাহিত্যে মাধবাচার্য্য একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। চরিত্র সৃষ্টির এমন মৌলিকতা তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন কবি দেখাইতে পারেন নাই, তাঁহার পরবর্ত্তী কবিরাও এই বিষয়ে তাঁহারই পথানুসরণ করিয়াছেন মাত্র। কালকেতুর কাহিনীর মধ্যে ব্যাধ-নায়ক ও তাহার পত্নীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যটুকু বিকাশ করিয়া

তোলা একমাত্র কবিত্ব গুণ থাকিলেই যে সম্ভবে তাহা নহে, তাহার মধ্যে সেই অনার্য্য জীবনের প্রতি সহানুভূতি-মূলক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন। মাধবাচার্য্যের যে সেই অভিজ্ঞতা ছিল তাহা বলিতেছি না, কিন্তু তাহা না থাকিলেও তাঁহার মানব চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা এত নিপুণ ছিল যে তাহা দ্বারাই তিনি নিজের সমাজ বহির্ভূত এই অনার্য্য জীবনের চিত্রটিকে বাস্তব ও সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। নিরলঙ্কারা ভাষা ও অনাড়ম্বরে ভাব-বর্ণনার গুণে এই চিত্রগুলি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাধ শিশু কালকেতুর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন,

"তবে বাড়ে বীরবর, জিনি মত্ত করিবর
গজশুণ্ড জিনি কর বাড়ে।
যতেক আখেটি স্থত, তারা সব পরাভূত
খেলায় জিনিতে কেহ নারে॥
বাঁটুল বাঁশ লয়ে করে পশুপক্ষী চাপি ধরে
কাহার ঘরেতে নাহি যায়।
কুঞ্চিত করিয়া আঁখি, থাকিয়া মারয়ে পাখী
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে যায়॥"

তাঁহার পরবর্ত্তী কবি মুকুন্দরাম মাধবাচার্য্যের এই একান্ত স্বাভাবিক চিত্রটির উপরই উপমা, অলঙ্কার ও কবিত্বের বর্ণ-বিন্যাস করিয়া ইহাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন,

"দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বলে মত্ত গজপতি রূপে নব রতিপতি,
সবার লোচন-সুখ হেতু॥
সহিয়া শতেক ঠেলা যার সঙ্গে করে খেলা
তার হয় জীবন সংশয়।

যে জন আকুড়ি করে আছাড়ে ধরণী ধরে
ডরে কেহ নিকটে না রয় ॥
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, সজারু তাড়িয়ে ধরে
দূরে গেলে ধরায় কুক্কুরে।
বিহঙ্গ বাটুলে বিন্ধে, লতায় জড়ায়ে বাঁধে,
স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে ॥”

বর্ণনার স্বাভাবিকত্বই মাধবাচার্য্যের বিষয়-বস্তুকে এতখানি মর্ম্মস্পর্শী করিয়াছে। কালকেতুর কাহিনীর মত ধনপতি সদাগরের কাহিনীও তাঁহার সমাজের ব্যক্তি-চরিত্রে গভীর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। লহনা খুল্লনার বিবাদে সপত্নী বিদ্বেষের যে শোচনীয় চিত্রখানি কবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা এই বহুবিবাহ-পীড়িত বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবনের কলঙ্কের রূপে চিরদিন অম্লান হইয়া থাকিবে। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া অতিক্রান্ত-যৌবনা পত্নী যুবতী সতিনীর উপর যে নির্য্যাতন করিতেছে, তাহার এই চিত্রখানি কেবল স্বাভাবিক বলিয়াই মর্ম্মস্পর্শী,—

বর্ণনার স্বাভাবিকত্ব

“খুল্লনা বাঁধিল ছেলী নিয়া অজাশালে।
শালের পাতে লহনা ক্ষুদের অন্ন ঢালে ॥
অল্প অন্ন দিল তা’তে পোড়াই বহুল।
এক পাশে ঢালি দিল পাকা কলার মূল ॥
অন্ন দিয়া লহনা হাতেত ধরি পাত।
খুলনারে দিল নিয়া ঢেঁকি শালে ভাত ॥
ভাঙ্গা নারিকেলে জল দিল সুবদনী।
ভোজন করিতে বৈসে খুলনা বাহ্যানী ॥

ধুঁঞা পোড়া অন্ন দেখি নাড়ি চাড়ি চায়।
ক্ষুধার কারণ রামা তার কিছু খায়॥
ঘৃণা জন্মিল তাতে পিপীলিকা দেখি।
অন্ন হতে হস্ত তুলি কাঁদে ইন্দুমুখী॥
পাত ধরিয়া ভাত ফেলিল অন্তরে।
ভাঙ্গা নারিকেল জলে আচমন করে॥
ঢেঁকি শালা ঘরে শুইল খৈঁয়াবাস পরি।
সমস্ত যামিনী খায় ক্ষুদিয়া পিপড়ী॥
সমস্ত যামিনী রামা কাঁদি গোঁয়াইল।
প্রভাত সময়ে কিছু নিদ্রাগত হইল॥"

ইহাতে রচনার পরিপাট্য কিছুমাত্রও নাই, উন্মাদিনী কবি-কল্পনার লাস্য-নৃত্যও নাই, একমাত্র অনাড়ম্বর ভাব ও ভাষার ভিতর দিয়া একান্ত প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্যের সহজ বর্ণনা আছে, এই গুণেই মাধবাচার্য্য মধ্যযুগের বঙ্গ-সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

মাধবের কাব্যের পরিণতি

কিন্তু এ'কথাও সত্য যে মাধবাচার্য্যের কবি-যশ তাঁহার পরবর্ত্তী কবি মুকুন্দরাম অনেকটা হরণ করিয়া লইয়াছেন। মুকুন্দরাম মাধবাচার্য্যেরই 'বিষয় বস্তুকে অধিকতর শক্তির প্রভাবে পুণর্গঠিত করিয়া লইয়া নিজের কাব্য-সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অনতিকাল ব্যবধানে মুকুন্দরামের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া মাধবাচার্য্যের যশ লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পূর্ব্বেই সাধারণের দৃষ্টি মুকুন্দরামের অপূর্ব্ব সুন্দর সৃষ্টির উপর গিয়াই স্বভাবতঃই ন্যস্ত হইল। মুকুন্দরামের প্রভাবে মাধবাচার্য্যের প্রচার আর অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারিল না, চণ্ডী-মঙ্গলের জগতে মুকুন্দরামই একপ্রকার একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া রহিলেন।

ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "কবিকঙ্কণের সান্নিধ্যের ছায়া হইতে মাধু কবিকে নিরাপদ স্থলে রাখিয়া বিচার করা উচিত। আমরা উভয় কবিকে দেখিয়া ফেলিয়াছি; সুতরাং বোধ হয় প্রকৃত বিচারের অধিকারী নহি"।[১] এ'কথা খুবই সত্য। মাধবাচার্য্যের কাব্য-সমালোচনায় মুকুন্দরামের কথা বিস্মৃত হইবার উপায় থাকে না, কারণ, উভয়ের কাহিনীভাগে সম্পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে এবং কাহিনী বর্ণনায়ও উভয়েই একই পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, ইহাতেই মাধবাচার্য্যের কাব্যের কোন অংশ পাঠ করিতে গেলেই মুকুন্দরামেরও সেই অংশের কথা মনে পড়িয়া মনে মনে তাহাদের মধ্যে তুলনামূলক সমালোচনা আরম্ভ হয়;—রসগ্রাহী পাঠকের নিকটে মাধবাচার্য্য এই সমালোচনায় টিকিতে পারে না। যাহা হউক সেকালে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে মুকুন্দরামের প্রচার সমধিক হইলেও পূর্ব্ববঙ্গ বিশেষতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলে মাধবাচার্য্যের চণ্ডীরই অধিকতর প্রচলন। মুকুন্দরামের পুঁথি পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষতঃ চট্টগ্রামে একেবারেই অপ্রচলিত ছিল। একমাত্র শিক্ষিত লোক ব্যতীত চট্টগ্রামে মুকুন্দরামের পুস্তকের নামও কেহ জানেনা। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, কথিত আছে মাধবাচার্য্য পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী হ'ন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাঁহার পুথির ব্যাপক প্রচলন দেখিয়া ইহাই

চট্টগ্রামে মাধুর প্রচার

অনুমিত হয় যে, সম্ভবতঃ তিনি নিজেই চট্টগ্রামে গিয়া বসতি স্থাপন করেন কিম্বা অপর কেহ তাহা চট্টগ্রামে লইয়া যান। কিন্তু কবে কি অবস্থায় কাহাকর্ত্তৃক তাঁহার পুঁথি চট্টগ্রামে নীত হয় তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

মাধবাচার্য্য প্রণীত 'গঙ্গামঙ্গল' নামেও একখানি পুঁথির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে পুরাণের অনুযায়ী গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে।[২]

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ ৩৭৩

২ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১০ সন, অতিরিক্ত সংখ্যা পৃঃ ১৫৪

মধ্যযুগে বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।'

মুকুন্দরাম

তিনি তাঁহার কাব্যে যে বিস্তৃত গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ দিয়াছেন ব্যক্তিগত মূল্য অপেক্ষাও তাহার ঐতিহাসিক মূল্য সমধিক। সেইজন্যই তাহা সম্পূর্ণ ই উদ্ধৃত করিতেছি,—

"সহর সিলিমাবাজ তাহাতে সজ্জন রাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি,
নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণু পদাম্বুজ-ভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিফ॥[১]
উজির হ'লো রায়জাদা, বেপারিরে দেয় খেদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হৈল অরি।
মাপে কোণে দিয়ে দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥

১ ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "কবির স্বহস্ত লিখিত চণ্ডী" হইতে এই অংশের নিম্নলিখিত পাঠান্তর দিয়া পদটির এক নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত পাঠটি এইরূপ,—

"অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে
খিলাৎ পায় মামুদ সরিফ্।"

কিন্তু তথাকথিত অপ্রকাশিত "কবির স্বহস্ত লিখিত" পাঠ অপেক্ষা সর্ব্বত্র প্রচলিত পাঠই অধিকতর প্রামাণ্য।

সরকার হইল কাল খিলভূমি লেখে লাল,
বিনা উপকারে খায় ধূতি।
পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥
ডিহিদার অবোধ খোজ, কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে॥
পেয়াদা সবার কাছে, প্রজারা পলায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হৈল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়ালি,
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ, চণ্ডী বাটী যার গাঁ
যুক্তি কৈলা মুনিব খাঁর সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে॥
ভেঠনায় উপনীত রূপ রায় নিল বিত্ত
যদু কুণ্ডু তিলি কৈলা রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর
দিবস তিনের দিল ভিক্ষা॥
বহিয়া গোরাই নদী, সদাই স্মরিয়ে বিধি
তেউট্যায় হইলুঁ উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি পাইল পাণ্ডুর পুরি
গঙ্গাদাস বড় কৈল হিত॥

নারায়ণ পরাশর এড়াইল দামোদর
উপনীত কুচট্যা নগরে।
তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান করিনু উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে ॥
আশ্রম পুখরি আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া
পূজা কৈলুঁ কুমুদ-প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
হাতে লইয়া পদ্মমসী আপনি কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য ॥
দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণ ছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই বাহিয়া যাই
আড়রার হইলুঁ উপনীত ॥
আড়রা ব্রাহ্মণ ভূমি ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী সম্ভাষিনু নৃপমণি,
পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান ॥
সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
সুতপাশে কৈল নিয়োজিত।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
গুরু করি করিল পূজিত ॥

সঙ্গে দামোদর নন্দী যে জানে স্বরূপ সন্ধি
অনুদিন করিত যতন।
নিজে দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়েনেরে দিলেন ভূষণ॥
বীর মাধবের সুত রূপগুণে অদভুত
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান্।
তার সুত রঘুনাথ, রাজগুণে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান॥

বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে কবির পৈতৃক বাসস্থান ছিল। ডিহিদার মাহ্‌মুদ সরিপের অত্যাচারে তিনি সাতপুরুষের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত আড়রা গ্রামের পালধি বংশজাত ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুরা রায়ের আশ্রয়ে গমন করেন। বিদ্যোৎসাহী রাজা বাঁকুরা রায় কবিকে নিজের পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার জীবিকার সংস্থান করিয়া দেন। এই বাঁকুরা রায় অল্পকাল মধ্যেই দেহত্যাগ করেন, অতঃপর তাঁহার পুত্র রঘুনাথ রাজা হন। এই রঘুনাথেরই সভাসদরূপে বাসকালীন তাঁহারই অভিলাষে মুকুন্দরাম তাঁহার প্রসিদ্ধ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।[১]

পরিচয়

বর্ত্তমান সময়ে রাজা রঘুনাথের বংশধরগণ আরড়া গ্রামের চারি মাইল দূরবর্ত্তী সেনাপতি নামক গ্রামে অত্যন্ত দীন অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন; তাঁহাদের জমিদারীর সর্ব্বস্ব বর্দ্ধমানরাজের জমিদারীভুক্ত হইয়াছে। তাঁহারা বর্ত্তমানে রঘুনাথ রায় হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ।

১ 'রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত, রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ, রচি চারুপদ, শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥'

মুকুন্দরামের বংশধরগণ বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত রায়না থানার ছোটবৈনান গ্রামে বসবাস করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। কেহ বলেন, মুকুন্দরামের বংশধরগণ বর্ত্তমানে তিন স্থানে বসবাস করিতেছেন।[১] কবির পৈত্রিক বাসস্থান দামুন্যায়, মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত বীরসিংহে ও হুগলী জিলার অন্তঃপাতী রাধাবল্লভপুরে। তাঁহারাও বর্ত্তমানে কবিকঙ্কণ হইতে অধস্তন একাদশ কিম্বা দ্বাদশ পুরুষ।[২]

মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্য-মধ্যে নিজের পরিচয় সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন,

'মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥'

তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতা হৃদয় মিশ্র, জ্যেষ্ঠ সহোদর কবিচন্দ্র। সম্ভবতঃ এই কবিচন্দ্র উপাধি, নাম নহে।* প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে কবিচন্দ্র উপাধিবিশিষ্ট বহু কবির সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, ইহাদের মধ্যে মুকুন্দরামের অগ্রজ যে কে তাহা নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যায় না।[৩] কবি তাঁহার কাব্য মধ্যে পুত্র-পুত্রবধূ ও কন্যা-জামাতার জন্যও চণ্ডীর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন,

উর মা কবির কামে, কৃপা কর শিবরামে,
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে।"

---

১ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২, শ্রাবণ, পৃঃ ১১৯

২ 'অনুসন্ধান' —১২৮৯ সাল, মাঘ, পৃঃ ৩১৫

৩ ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় কবির স্বহস্তলিখিত যে পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে মুকুন্দরামের একটি পদ দেখিয়া মনে হয় যে, কবিচন্দ্র উপাধি নহে কবিচন্দ্র মুকুন্দরামের অগ্রজের নাম,—

তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম শিবরাম, কন্যার নাম যশোদা, পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা ও জামাতার নাম মহেশ। গ্রন্থের রচনা-কাল সম্বন্ধে গ্রন্থের মধ্যে যে সমস্ত নির্দ্দেশ রহিয়াছে তাহা হইতে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইবার উপায় নাই। তবে আনুমানিক একটা সময় সম্বন্ধে ধারণা করিয়া লইতে বেগ পাইতে হয় না।

রচনা-কাল

মুকুন্দরামের কাব্যের কোন কোন বটতলার মুদ্রিত পুঁথির শেষভাগে এই একটি পদ দেখিতে পাওয়া যায়,

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা॥"

অনেক হস্তলিখিত পুঁথিতেই এই পদটি পাওয়া যায় না।[১] এই পদটি হইতে গ্রন্থ রচনার একটা সময়ের নির্দ্দেশ পাওয়া যায় সত্য কিন্তু কতকগুলি কারণে এই পদটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাহা ক্রমে উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ এই পদটি বিশ্লেষণ করিলে ইহার এই অর্থ হয় যে, ১৪৯৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত কবির আত্মবিবরণীতে কবি রাজা মানসিংহকে গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বাংলার ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, মানসিংহ ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলার সুবাদার বা

বিশেষ পুণ্যের ধাম, সুধন্য হৃদয় নাম
কবিচন্দ্র তার বংশধর।'

—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ ৩৮১ পাদটীকা

কিন্তু এই পদটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। মুকুন্দরামের অসংখ্য পুঁথির মধ্যে এই পদটি আর কোথাও পাওয়া যায় নাই।

১ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, (বঙ্গবাসী সংস্করণ) পৃঃ ৩১৩ পাদটীকা দ্রষ্টব্য

শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মতান্তরে মানসিংহের সুবেদারির কাল খৃষ্টীয় ১৫৮৮ শতাব্দী হইতে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দ। অতএব ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা সম্পন্ন করিয়া মুকুন্দরাম মানসিংহের উল্লেখ করিতে পারেন না। শুধু তাহাই নহে, মানসিংহকে গৌড়, বঙ্গ ও উৎকল বা উড়িষ্যার অধিপ বলা হইয়াছে। মানসিংহ ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা অধিকার করেন, অতএব অন্ততঃ ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সমগ্র কাব্য রচিত হইতে পারে না। অনেকে মনে করেন, "ঐ ১৪৯৯ গ্রন্থের আরম্ভ কালের শক,—সমাপ্তি-কালের শক নহে। ঐ শকে তিনি আড়রা নগরে অবস্থান পূর্ব্বক চণ্ডীরচনার আরম্ভ করিয়া ১২।১৪ বৎসর পরে অর্থাৎ যখন মানসিংহের আধিপত্য দেশ মধ্যে সুবিদিত হইয়াছিল, তৎকালে রচনার শেষ করিয়া থাকিবেন এবং এখনকার গ্রন্থকারেরা যেরূপ রচনা সমাপ্তি করিয়া শেষে ভূমিকা লিখিয়া থাকেন, বোধ হয় তিনিও সেইরূপ গ্রন্থ রচনা সমাপনের পর পরিশেষে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ শীর্ষক সূচনা ভাগটী লিখিয়া গ্রন্থের প্রথমভাগে যোজনা করিয়া দিয়াছেন।"[২]

কিন্তু যে স্থলে সাধারণতঃ গ্রন্থ রচনার উপরি-উদ্ধৃত শক নিরূপক পদটি পাওয়া যায় সেই স্থলটির পারম্পর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, তাহা "গ্রন্থের আরম্ভ কালের শক" নহে, বরং গ্রন্থ সমাপনেরই শক। স্থানটি একটু বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে,—

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা॥

২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৩য় সংস্করণ (রামগতি ন্যায়রত্ন) পৃঃ ১০১। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ও এই মত সমর্থন করেন।—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ ৩৭৯

অভয়া-মঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ।
আসোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ ॥
কলিকালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ।
যার যেবা মনোরথ পূরে তার আশ ॥
ব্রাহ্মণ শুনিলে ধর্ম্ম শাস্ত্রের ভাজন।
যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিবে ক্ষত্রিগণ ॥" ইত্যাদি।

ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এই অংশ প্রকৃত পক্ষে চণ্ডীমঙ্গল শ্রবণ-মাহাত্ম্য। এই জাতীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন সাধারণতঃ পুস্তকের শেষ ভাগেই হইয়া থাকে, প্রথম ভাগে নহে। অতএব মুকুন্দরামই যদি এই পদ রচনা করিয়া থাকেন তবে তিনি তাঁহার গ্রন্থরচনার শেষেই রচনা করিয়াছেন, প্রারম্ভে করেন নাই। কিন্তু তিনি যদি শেষ ভাগে এই পদ রচনা করিতেন তাহা হইলে তিনি "পুস্তক সমাধা করিয়া' গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ লিখিতে বসিয়া মানসিংহের উল্লেখ করিতে পারিতেন না। কারণ উক্ত পদে উল্লিখিত সময় ও মানসিংহের সময়ে অন্ততঃ ১০।১২ বৎসরের পার্থক্য রহিয়াছে। এমনও সম্ভব নহে যে গ্রন্থ সম্পন্ন করিয়া তিনি এই ১০।১২ বৎসর তাহা ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, অতঃপর মানসিংহ যখন বাংলার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন তখন গ্রন্থোৎপত্তির কারণটি রচনা করিয়া ভূমিকার মত তাহা তাঁহার কাব্যের প্রথম ভাগে যোজনা করিয়া দিলেন। বিশেষতঃ উদ্ধৃত পদ ভাগের ভাষা দেখিয়াও মনে হয় ইহা স্বতন্ত্র হস্তের রচনা, মুকুন্দরামের মত নিপুণ কবির রচনা নহে। পরবর্ত্তী কালে কোন কবি হয় ত সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া একটা সময় জ্ঞাপক পদ রচনা পূর্ব্বক এই গ্রন্থের শেষ ভাগে জুড়িয়া দিয়াছে, অতএব এই পদটিকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বিশেষতঃ মুকুন্দরামের মত সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে পণ্ডিত লোক 'রস' শব্দের

প্রক্ষিপ্ত পদ

অর্থে ছয় ধরিয়া ইহার একটা নিতান্ত ব্যবহারিক অর্থ করিবেন এমন মনে হয় না; অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে 'রসে'র সংখ্যা নয়। মুকুন্দরাম তাহা জানিতেন, একস্থানে নিজেই লিখিয়াছেন,

"প্রবেশিলে একাদশে মদন হৃদয়ে বসে
নব রস হয় এক স্থানে।"

অন্যত্রও পাই, "কাব্য নবরসে যশ অপযশে
আপনি তুমি প্রমাণ।"

অথচ 'রস' অর্থে নয় ধরিয়া লইলে উপরি-উদ্ধৃত সময়জ্ঞাপক পদের কোন সঙ্গত অর্থ হয় না।

এই পদটির অপ্রামাণিকতা প্রমাণ করিতে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় [১] শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। তিনি বলিতেছেন, 'এই শ্লোকটি কিরূপে কোথায় পাওয়া যায়, অগ্রে তাহাই বলা কর্ত্তব্য। কলিকাতা বটতলার মুদ্রাকরগণ, এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হইবার পর হইতে অনেকগুলি বাঙ্গালা পুঁথি মুদ্রিত করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ইংরেজি ১৮২০ অব্দে যে চণ্ডীকাব্য সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত করেন, তাহাতেই এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর বটতলার চণ্ডীকাব্যের পুনঃ পুনঃ যে সকল সংস্করণ হইয়া আসিতেছে, তাহা প্রথম সংস্করণেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র, তবে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় চণ্ডীকাব্যের যে একটি সংস্করণ প্রচারিত করেন, তাহার পাঠ অনেকটা নির্ভরযোগ্য বটে, সেরূপ অনেক পুঁথিই আমরা এতদঞ্চলে দেখিয়াছি। তৃতীয় সংস্করণ গ্রন্থখানি বঙ্গবাসীর পূর্ব্বতন স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ৺ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুজ মহাশয় দ্বারা প্রকাশিত, তাহা দামুন্যা

অন্যান্য প্রমাণ

১ ১৩১৩ সাল, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১১৫

গ্রামের একখানি পুঁথির আদর্শে মুদ্রিত। আমরা দামুন্যা গ্রামের তিন মাইল দূরে অবস্থিতি করি, এ অঞ্চলের অনেকেরই বাড়ীতে হস্ত লিখিত চণ্ডী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় পঞ্চাশ ষাট খানি পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাদের কোন খানিতে বা অক্ষয় বাবুর ও বঙ্গবাসীর মুদ্রিত পুস্তকে আমরা উপরিউক্ত শ্লোক দেখিতে পাই নাই। অধিকন্তু কবির জন্মভূমি দামুন্যা গ্রামস্থ বর্ত্তমান বংশধরগণের নিকট তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত যে পুঁথিখানি আছে ও কবির আশ্রয়দাতা মেদিনীপুর জিলার আরড়া ব্রাহ্মণ ভূমির নরপতি ৺ রঘুনাথ দেবরায়ের বর্ত্তমান বংশধরগণ কবির হস্ত লিখিত বিশ্বাসে যে পুঁথিখানি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এতদুভয়ের কোন খানিতেই উক্ত কাব্যের শেষাংশ না থাকায় ঐ শ্লোকের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না।”

মুকুন্দরামের চণ্ডী প্রকৃত যেখানে সম্পূর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ অষ্ট মঙ্গলা যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে কাব্যের রচনা-কাল নির্দ্দেশক এইরূপ একটি পদ কোন কোন পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—

“অষ্ট মঙ্গলা সায়, শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
অমর সাগর মুনিবরে।”

—বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৩০৪

‘অমর’ শব্দে চৌদ্দ ধরিয়া লইলে এই পদ হইতে পাওয়া যায় যে, ১৪৭৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে এই কাব্য রচিত হয়। অবশ্য ইহাতেও মানসিংহের সময় পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু একই গ্রন্থে দুই জায়গায় দুই প্রকার সময় নির্দ্দেশ দেখিয়া উভয় পদেরই প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। অতএব ইহা হইতেও পুস্তক রচনার কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের সন্ধান পাওয়া যায় না।

এখন একমাত্র আনুমানিক কালের উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায় নাই। কবির প্রতিপালক রাজা রঘুনাথ দেবের রাজত্বকাল ১৫৭৩—১৬০২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। অবশ্য এই অনুমান সত্য হইলে মানসিংহের সময়েই কবির কাব্য রচনার কাল নিরূপিত হয়, এতদ্ব্যতীত কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই অনুমান সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিবারও প্রমাণ প্রয়োগের অভাব রহিয়াছে; অতএব ইহার উপর নির্ভর করাও সমীচীন নহে।

রঘুনাথের রাজত্বকাল

কবির পুত্র শিবরাম বাংলার তদানীন্তন সুবাদার কুতুব খাঁর নিকট হইতে এক জায়গীরের সনন্দ প্রাপ্ত হ'ন। এই সনন্দের তারিখ ১৫২৮ শক অথবা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ। তখন মুকুন্দরাম নিশ্চিতই জীবিত ছিলেন না। ইহা হইতে অনুমান করা ভুল হইবে না যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তিনি গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার জামাতা পুত্রবধূ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন; খুল্লনার ঔষধ-প্রকরণ দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, "বুড়ারে না করে বশ মোহন ঔষধ।" অতএব মনে হয়, মানসিংহ বাংলার শাসনভার গ্রহণ করার অব্যবহিত পরে কিম্বা অন্ততঃ সমসাময়িক কালে তাঁহার কাব্য রচিত হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬০ বৎসর বয়স হইয়া থাকিলেও তিনি অন্ততঃ ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এমন একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছান যাইতে পারে। কবির জন্ম ও রচনাকাল সম্বন্ধে অনেকেই অনেক অনুমান করিয়াছেন। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুমান, মুকুন্দরাম ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১] স্বর্গীয় হরিসাধন

শিবরামের সময়

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ ৩৮০

মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন "১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভূমিষ্ঠ হন।[১] স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মনে করেন, ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যের রচনা আরম্ভ করেন ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ করেন।[২] শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ১৫৯৪ কিম্বা ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যরচনা শেষ করেন।[৩] এই মতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহা মানসিংহের সময়কালেরও মধ্যবর্ত্তী।

কবির কাল সম্বন্ধে বিভিন্নমত

মুকুন্দরামের জীবন সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। কেহ মনে করেন, শিবরাম ব্যতীত মুকুন্দরামের আর এক পুত্র ছিল এবং গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণে 'শিশু কান্দে ওদনের তরে' এই পদে শিবরামের কনিষ্ঠকেই মনে করা হইয়াছে।[৪] তাহা হইলে কাব্যমধ্যে এই পুত্রেরও উল্লেখ থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা নাই। তবে এই শিশু কে? কেহ কেহ মনে করেন, এই শিশু শিবরামের পুত্র ও কবির পৌত্র। কোন পুঁথিতে তাঁহার পৌত্রেরও এই প্রকার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে,—"শিবরাম বংশধর, কৃপাকর মহেশ্বর, রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান।"—বিশ্ব সং পৃঃ ২৪

কবির জীবন

লহনা ও খুল্লনার কলহ বর্ণনা প্রসঙ্গে একস্থলে কবি বলিয়াছেন,

"এক জন সহিলে কোন্দল হয় দূর।
বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর॥"

---

১ বঙ্গভাষার লেখক 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা

৩ Date of Kavikankan Mukundaram Chakravorty, Journal of the Department of Letters, 1927.

৪ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১২, পৃঃ ১১০

ইহাতে মনে হয় তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। লহনা-খুল্লনার জীবন বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি এই স্থানে নিজের গার্হস্থ্য জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেও কতক সাহায্য পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

মুকুন্দরামের ধর্ম্মমত

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের প্রকৃত ধর্ম্মমত সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। 'চণ্ডী মঙ্গল বোধিনী' প্রণেতা স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত এই যে তিনি বৈষ্ণব-মতাবলম্বী ছিলেন।[১] শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়া বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, Kavikakan Mukundaram Chakraborty was neither a Vaisnava, nor a Sakta, nor Saiva nor a Ganapata; but he was everything. In other words he was a believer in all the deities of the Smarta cult."[২] মুকুন্দরামের কাব্যে সমস্ত দেবতার সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিতে পাইয়া ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয় যে, তিনি পঞ্চোপাসক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই যুগের বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চণ্ডীর মাহাত্ম্য লিখিবার মত এত উদারতা ছিল না।

মুকুন্দরামের কাব্যের উপাদান

মূলতঃ মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকে অবলম্বন করিয়াই মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যরচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও মাণিকদত্ত ও বলরাম কবিকঙ্কণের ঋণ এই বিষয়ে স্বীকার করিয়াছেন।' ইতিপূর্ব্বে মঙ্গলকাব্য রচনার বিশিষ্ট রীতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্যই দেখিতে পাই, তিনি

১ 'ভারতী', অগ্রহায়ণ, ১৩২৭; কবিকঙ্কণ চণ্ডী, (ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্) চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী, ৯১০ পৃঃ।

২ 'Religion of Kavikankan Mukundaram Chakravorty'. I. H. Q. 1928 pg. 482.

যদিও রাজা রঘুনাথের আদেশেই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন[৩] তথাপি গতানুগতিকতা অনুসারে তাঁহার কাব্য রচনার মূলে অতিপ্রাকৃত দেবতার স্বপ্নাদেশের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, কাব্যের গঠনের মধ্যে তাঁহার মৌলিক কোন কৃতিত্ব নাই। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণাদি হইতে অশেষ বস্তু আহরণ করিয়া তাঁহার কাব্যকে সৌষ্ঠব মণ্ডিত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তিনি নিজেও লিখিয়াছেন,

"গুনিরাজ-মিশ্র-সুত সঙ্গীত কলায় রত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামুন্যা নগর বাণী সঙ্গীত অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান ॥"

তাঁহার জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতা ও এই শ্রমলব্ধ পাণ্ডিত্যই তাঁহাব কাব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

কবিকঙ্কণের সমস্ত সমালোচকই একবাক্যে বলিয়াছেন, মুকুন্দরাম দুঃখের কবি; নিজের জীবনে যেমন তিনি দুঃখভোগ করিয়াছেন, তাঁহার কাব্যের

কবিত্ব

ভিতরে এই দুঃখের চিত্রগুলিকেই তিনি তেমন সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। অবশ্য এই এক কথায়ই মুকুন্দরামের কবিত্বের সম্পূর্ণ বিচার করা যায় না। শুধু দুঃখের চিত্রই নহে, বাঙ্গালীর গৃহের চিত্রটি সম্পূর্ণ তাঁহার কাব্যে এমন স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে যে সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। সেই যুগের সাধারণ বাঙ্গালীর গৃহে দারিদ্র্য, নির্য্যাতন, অত্যাচার, অপমানেরই নিত্য অভিনয় হইত, সেইজন্য জীবনের প্রত্যেক অভিজ্ঞতাতেই তাহারা অভয়া চণ্ডীরই প্রসাদ কামনা করিয়া থাকিত। এই নিত্য

৩ 'নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি, গানেরে দিলেন ভূষণ।' কবিকঙ্কণ-চণ্ডী

অত্যাচারিত সমাজেরই কবি মুকুন্দরাম, তাহাদের দৈনন্দিন দুঃখে আশার আশ্বাস বাণীর মত তাঁহার এই চণ্ডী-মঙ্গল কাব্য যেন তাহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিত।

আন্তরিকতাই মুকুন্দরামের কাব্যের প্রাণ। যে কোন একটি চিত্র নিখুঁতভাবে চিত্রিত করিতে পারিলেই যে তাহার সার্থকতা, তাহা নহে; তাহার সহিত কবি-হৃদয়ের একটু সহানুভূতিও মিশ্রিত হওয়া প্রয়োজন। মুকুন্দরামের হৃদয়ে সেই সহানুভূতির অভাব ছিলনা। ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ-বর্ণনায় যখন তিনি বলিয়াছেন,—

"বৈশাখে অনল সম বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
পায় পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন॥
নিযুক্ত করিল বিধি সভার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥"

তখন ব্যাধ-জীবনের মূলে তাঁহার যে শুধু নিবিড় অভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহার ভিতর হইতে একটি দুঃখ-কাতর কবিমন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। এই নিপুণ সামাজিক অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতা লইয়াই মুকুন্দরামের কবিত্ব।

মধ্য যুগের কবিদিগের মধ্যে মুকুন্দরামের সম্বন্ধেই ইদানীং কিছু আলোচনাও হইয়াছে, সেইজন্য এই সম্বন্ধে অধিক মন্তব্য প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি; কেবল একজন সমালোচকের মত উদ্ধৃত করিয়া এই অংশের উপসংহার করিব।

এই কাব্য সম্বন্ধে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "**Its most remarkable feature is its intense reality.** Many

of the incidents are superhuman and miraculous but the thoughts and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with a fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali literature."[১]

মুকুন্দরামের কাব্যের উপকরণ অত্যন্ত নগণ্য ছিল। ঘটনাগুলির কেন্দ্রীয় ঐক্য ও চরিত্রগুলির কার্য্যাবলীর পূর্ব্বপর সামঞ্জস্যের অভাবে সমগ্রভাবে কাব্যের মধ্যে কোন সংহত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু এই ত্রুটি মুকুন্দরামের নহে। কাহিনীগত গতানুগতিকতা যথেচ্ছ লঙ্ঘন করিয়া নিজের রসরুচি ও উচ্চতর কাব্যাদর্শের প্রেরণায় নূতন করিয়া কাহিনীগঠনের তাঁহার কোনই ক্ষমতা ছিল না। কারণ, ইতিপূর্ব্বেই ইহার এই বিশিষ্ট কাহিনী একপ্রকার বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুকুন্দরামের অপূর্ব্ব ক্ষমতাগুণে কাহিনীর এই অসংলগ্ন চিত্রগুলিও স্বতন্ত্র-ভাবে হইলেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীকে সমগ্র ভাবে বিচার না করিয়া ইহার চিত্র ও চরিত্রগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিলেই কবির উপর মর্য্যাদা করা হইবে।

বঙ্গ সাহিত্যে মুকুন্দ-রামের প্রভাব

রাঢ় ভূমিতে মুকুন্দরামের কাব্যের প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে পরবর্ত্তী সমস্ত মঙ্গল-কাব্যের কবিরই একপ্রকার এই মুকুন্দরামই আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল।

বিষয়-বর্ণনায় ও ভাব-কল্পনায় মুকুন্দরামের পরবর্ত্তী রাঢ়ভূমির মঙ্গল-কাব্যগুলি এক বিশিষ্ট রীতির সন্ধান পাইল। এই প্রভাবের ফলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত এই বিধি নিয়মের বৈচিত্র্যহীন গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার অন্নদামঙ্গলের কাহিনীকেও আনিয়া স্থাপন করিলেন।

---

১ Literature of Bengal pg. 116.

মুকুন্দরামের কাব্যের প্রকৃত নাম 'অভয়া-মঙ্গল' বলিয়াই মনে হয়। কোন কোন স্থানে ইহাকে তিনি 'অম্বিকা-মঙ্গল' নামেও অভিহিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, দুই এক জায়গায় 'গৌরী-মঙ্গল' ও 'চণ্ডিকা মঙ্গল' নামও পাওয়া যায়। তবে 'অভয়া-মঙ্গল' নামই কবি সমধিক ব্যবহার করিয়াছেন।

কাব্যের নাম

চণ্ডীমঙ্গলের অন্যতম প্রধান কবির নাম মুক্তারাম সেন। তাঁহার কাব্যের প্রকৃত নাম "সারদা-মঙ্গল।" এই সম্বন্ধে কাব্যমধ্যে তাহার এই প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

মুক্তারাম সেন

"শুন শুন সর্ব্বলোক সারদা-মঙ্গল।
একচিত্ত হইয়া শুন না হইয় চঞ্চল॥"

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম (বর্ত্তমানে আনোয়ারা) নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জ্ঞাতি বংশীয়েরা অদ্যাপি সেই গ্রামে বসবাস করিতেছেন। কবির এই বংশ চট্টগ্রামের মধ্যে বিশিষ্ট কুলীন বলিয়া সম্মানিত। কবি তাঁহার কাব্য-মধ্যে এই প্রকার আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন,—

"চাটেশ্বরী রাজ্যে বন্দোম্ পশ্চিমে সাগর।
বাড়ব আনল পূর্ব্বে তীর্থ মনোহর॥
তাহার উত্তরে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ হর।
চন্দ্র শেখর জাতে বসতি শঙ্কর॥
মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রি দেশ অধিকারী।
সিংহ সম রণে দ্বিজগণ প্রতিকারী॥
ধার্ম্মিক শরীর দানে অকাতর নাম।
তেনমত প্রতি সৈন্য লালা নন্দরাম॥

চাটীগ্রামে রাজ্যেতে বন্দোম নিজ গ্রাম।
বন্দহুঁ জনম ভূমি দেবগ্রাম নাম॥
আগ্যগোত্র আগ্য সেন ভেষজে বিশ্রাম।
বসতি জাহ্নবী কূলে রাঢ়া হেন নাম॥
স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্ব্বাপর।
বেদের উদ্ভব বৈগ্য পঞ্চম প্রবর॥
আগ্য অত্রি অর্জ্জুন গার্গব বার্হস্পত্য।
স্বকীয় বিগ্যাতে পর উপকারী চিত্ত॥
তথা হৈতে আইলা কেহ রাজ সঙ্গী হইয়া।
বাড়ব্যাখ্যা চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিয়া॥
সে বংশে প্রপিতামহ রাঢ় জয়দেব।
তান পুত্র নিধিরাম স্বাগত পারগ॥
পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি।
তিন পুত্র লৈআ কৈল দেআঙ্গে বসতি॥
সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম।
সদাএ ভবানী পদে মানস বিশ্রাম॥

বংশ পরিচয়

কবির জ্ঞাতি বংশীয়দের নিকট যে বংশ পত্রিকা রক্ষিত আছে তাহাতে একটি সংস্কৃত শ্লোক লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও কবির সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয় পাওয়া যায়,—

"শাকে চৈব বিয়দ্বেদবাণ চন্দ্রামীতে পুরা।
আগ্য গোত্রোদ্ভবো পঞ্চ প্রবরো বৈগ্য সত্তমঃ॥
শ্রীযুক্ত যাদব রায়ঃ শম্ভুদর্শন কাম্যয়া।
সার্দ্ধং শ্রীমন্ত ভৃত্যেন চট্টলে চন্দ্রশেখরে॥

যশোহরাৎ সমায়াতঃ কালিয়া গ্রামতঃ খলু।
তদ্‌ভ্রাতা মাধবরায়স্তথৈবাত্মপুরোহিতৈঃ॥
নাম্না শ্রীলক্ষ্মীকান্তোঽসৌ ন্যায়ালঙ্কারসংজ্ঞকঃ।
যাদবেন সহায়াতৌ তীর্থদর্শনমানসৌ॥"[১]

ইহা হইতে কবির পূর্ব্ব পুরুষ যাদব রায় সম্বন্ধে জানিতে পারা যায় যে, ১৫৪০ শকাব্দ (১৬১৮ খ্রীঃ) ফাল্গুন মাসে (সম্ভবতঃ শিব চতুর্দ্দশী উপলক্ষে) তিনি সহোদর মাধব রায়, নিজের কুল-পুরোহিত লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার ও শ্রীমন্ত নামক ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পূর্ব্ব বাসস্থান যশোহর জিলার অন্তর্গত কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণ ব্যপদেশে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও চন্দ্রশেখরাধিষ্ঠিত স্বয়ম্ভুশিব দর্শনের জন্য আগমন করেন।

সম্ভবতঃ চন্দ্রশেখর দর্শনের পর তাঁহারা আর স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, চট্টগ্রামেই বসতি স্থাপন করেন। এইভাবে সেকালে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য বংশ আসিয়া চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

মুক্তারামের পূর্ব্ব পুরুষ এই যাদব রায়ের চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন সম্বন্ধে এই কাহিনী প্রচলিত আছে। যাদব রায় ও মাধব রায় যখন চন্দ্রনাথ দর্শনে আসিয়াছিলেন তখন চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রমণচাঁদ চৌধুরী সপরিবারে চন্দ্রনাথ আসিয়াছিলেন। যাদব রায় ও মাধব রায়ের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয় এবং যাদব রায়ের বিদ্যা ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার হস্তে নিজের কন্যা সম্প্রদান করেন এবং ঘর জামাই করিয়া দেবগ্রামে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া

---

১ মুক্তারাম সেনের 'সারদা মঙ্গল' (মুন্সী আব্দুল করিম সম্পাদিত) ভূমিকা, পৃঃ।৵০। বংশ পত্রিকায় উল্লিখিত এই বিবরণের সহিত কবির আত্মবিবরণীর মিল নাই দেখিয়া ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। এই সম্পর্কে কবির প্রদত্ত আত্মবিবরণীই অধিকতর বিশ্বাস যোগ্য।

দেন। অতঃপর মাধব রায় জানিতে পারেন, রমণচাঁদ চৌধুরী বৈশ্যবংশ সম্ভূত নহেন, আইচ দাস উপাধিধারী কায়স্থ বংশীয়। মাধব রায় ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া অবশেষে ভ্রাতৃবধূকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিয়া গোপনে পলায়ন করেন। রমণচাঁদ কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ এক বিরাট দীঘি খনন করাইয়া দেন, ইহা এখনও "আইচের ঝির পুনী" নামে খ্যাত।

অতঃপর যাদব রায় পুনরায় দার-পরিগ্রহ করেন, এবং তাহাতেই কবি মুক্তারামের পিতামহ নিধিরামের জন্ম হয়। নিধিরামের পুত্র মধুরাম হইতেই গোবিন্দরাম, ব্রজলাল ও কবি মুক্তারামের জন্ম হয়। মুক্তারাম চিরকুমার ছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দরামের বংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। অবশ্য উল্লিখিত কাহিনীর মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে কিনা জানা যায় না।

কবি মুক্তারাম সাধক পুরুষ ছিলেন। তিনি বিষয়-নিস্পৃহ হইয়া তীর্থ পর্য্যটন ও সাধুসঙ্গ দ্বারাই জীবন অতিবাহিত করিতেন। "সারদা-মঙ্গল"ই তাঁহার একমাত্র কাব্য গ্রন্থ।

কবির সময়

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কবির প্রপিতামহ যাদব রায় ১৫৪০ শকাব্দ বা ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে আগমন করেন। অতএব আনুমানিক কবিকে ইহার একশত বৎসর পরবর্ত্তী বা ১৭১৮ কিম্বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন সময়ের লোক বলিয়া ধরিতে পারা যায়।

কবির আত্মবিবরণীর মধ্যে 'দেশ অধিকারী' বলিয়া মহাসিংহের নামোল্লেখ রহিয়াছে। ইতিহাসে তিনি দেওয়ান মহাসিংহ নামে পরিচিত, তিনি চট্টগ্রামে মোগল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দেওয়ান ছিলেন, পরে তিনি নায়েবের পদেও অধিষ্ঠিত হন। এই মহাসিংহের সময় সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৭৪১ অব্দ হইতে ১৭৫৯ অব্দ। অতএব, কবি মুক্তারাম এই সময়ের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন বলা যাইতে পারে।

মুক্তারামের কাব্যমধ্যে দুই স্থলে গ্রন্থ-রচনার সময় নির্দ্দেশক একটি পদ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভনে ভাবিয়া ভবানী ॥"

'কাল' শব্দে তিন ধরিলে ইহার অর্থ ১৩৬৯ শকাব্দ বা ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দ হয়।[১] কিন্তু এই সময়ের সঙ্গে গ্রন্থোক্ত অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্যের সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় না। অতএব, এই কাল শব্দটিকে কেহ 'কায়' ধরিয়া ইহার অর্থ ছয় করিতে চাহেন; এই ধারণাই যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে হয়, সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদে 'কায়' 'কাল' হইয়া থাকিবে।[২] অতএব কবির নিজের উক্তি অনুসারেও দেখা যাইতেছে যে, ১৬৬৯ শকাব্দ বা ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার গ্রন্থ-রচনা সম্পন্ন করেন।

কবিত্ব

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, চট্টগ্রাম অঞ্চলে মাধবাচার্য্যের চণ্ডী বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। এই মাধবাচার্য্যের কাব্যকে আদর্শ করিয়া মুক্তারামের কাব্য রচিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার কাব্যে মাধবাচার্য্যের প্রভাবের কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। মুক্তারামের রচনা অনেকটা প্রাচীন পাঁচালীরই উন্নত এবং আধুনিক সংস্করণ বলিয়া মনে হইতে পারে।

মুক্তারামের কাব্যেরও দুইটি ভাগ, প্রথম ভাগে কালকেতুর কাহিনী, দ্বিতীয় ভাগে ধনপতি সদাগরের গল্প। উভয় কাহিনীই সংক্ষিপ্তভাবে

---

১ ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এইভাবে হিসাব করিয়া কবির কাল নির্ণয় করিয়াছেন। বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩০২

২ 'সারদা মঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশ পরিচয়', (শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪০ সাল, পৃঃ ১৬৬।

রচিত। চণ্ডীর নিকট পশুদিগের কালকেতুর বিরুদ্ধে অভিযোগের বৃত্তান্তটি এই প্রকার সংক্ষেপে সম্পন্ন করা হইয়াছে,—

"এই মত কথ কাল যদি নির্ব্বাহিল।
পশুগণে দুর্গাস্থানে কান্দিয়া কহিল॥
তিষ্ঠিতে না পারি বনে কালকেতুর শরে।
পুত্র দারা এক স্থানে রহিতে নারি ঘরে॥
বোলে তাহে মহামাএ না কর ক্রন্দন।
তোর হেতু কালকেতু লভিবেক ধন॥
সুখমনে পশুগণে যাও নিজালয়ে।
তার ঠাঁই আমি জাই না করিয় ভয়ে॥
তদন্তরে নারায়ণী গোধিকা হইলা।
অরণ্যের পন্থ মুখে আগুছি রহিলা॥"

দ্বিজ হরিরামের ভণিতাযুক্ত একখানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার কবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। তিনি কোন সময়েই যে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার কাব্য মধ্যে তাহারও কোন উল্লেখ নাই। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট ইহার যে একখানা পুঁথি ছিল তাহার লিপিকাল ১০৮০ বাংলা সাল। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন, এই "দ্বিজ হরিরাম, কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি।"[১] অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, মাধবাচার্য্য, কবিকঙ্কণ ও এই দ্বিজ হরিরামের উপাখ্যান-ভাগে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। এমন কি, এই তিন কবির মধ্যে অনেক স্থলেই অনেক পদ প্রায় অভিন্ন। ইহা হইতেই মনে হয়,

দ্বিজ হরিরাম

১ বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, পৃঃ ৩১০

এই তিন জনই হয় ত অধুনা-বিলুপ্ত কোন কবির একই কাব্য হইতে শুধু যে কাহিনী ভাগই গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে, অনেক স্থলে ভাষাও পর্য্যন্ত নিজেদের নামে চালাইয়াছেন।

দ্বিজ হরিরামের কবিত্ব অমার্জ্জিত বলা যায় না; রচনায়ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের মত চরিত্র-চিত্রণে কবি এত দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। চণ্ডীর ভগবতী রূপ ধারণের বর্ণনাটি হইতে কবির বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে,—

"ভকত বৎসলা দুর্গা ভকত লাগিয়া।
দশভুজরূপ হৈলা বীরে করি দয়া॥
ভালে শশী বিভূষা শিরে জটাজুট।
রচিত হাটক শুদ্ধ মাথায় মুকুট॥
ইন্দু মণ্ডল পূর্ণ শোভিত বয়ান।
নীলোৎপল জিনিঞা নয়ন তিনখান॥"

গ্রন্থের প্রামাণিকতা

কিন্তু নানা কারণেই পুস্তকখানির প্রামাণিকতা সম্বন্ধেই আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ হইতেছে। প্রায় পৌণে তিন শত বৎসরের প্রাচীন একখানি বাংলা পুঁথির যে ভাষা হওয়া প্রয়োজন ইহাতে তাহা নাই। গ্রন্থখানি বিরাট, কিন্তু ইহার আর কোন পুঁথি কোথাও পাওয়া যায় নাই। অতএব একখানি নিতান্ত পরিচয়হীন পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া এই সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছান নিরাপদ নহে।

ভারতচন্দ্র

মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্য্যযুগে ভারতচন্দ্র রায়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। শুধু তাহাই নহে, ভারতচন্দ্র তাঁহার অলৌকিক কবিশক্তি দ্বারা মঙ্গলকাব্যের বিধিনিয়মের গণ্ডীর মধ্যেও যে অপূর্ব্ব সাহিত্য-রসসৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের

সমগ্র কাব্য সাহিত্যের মধ্যেও একান্ত দুর্লভ। বৈষ্ণব কবিতার রস-সিঞ্চনে মঙ্গলকাব্যের রূপে এক অপূর্ব্ব লাবণ্য দান করিয়া ভারতচন্দ্র নিতান্ত সাম্প্রদায়িক প্রেরণা-মূলক একটা বৈশিষ্ট্যহীন সাহিত্যকে উচ্চতর সাহিত্য সৃষ্টির কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন।*

বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত ভুরসুট পরগণার জমিদার রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ভারতচন্দ্র রায় ১৭১২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখটী বংশ জাত ব্রাহ্মণ। পোড়া বসন্তপুর গ্রামে নরেন্দ্র নারায়ণের বাস ছিল। বর্গীর উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি তাঁহার বাটীর চারিদিক গড় দ্বারা বেষ্টন করিয়াছিলেন, এখনও সেই স্থান পেঁড়োর গড় বলিয়া বিখ্যাত। নরেন্দ্র নারায়ণের চারি পুত্র ছিল,—চতুর্ভুজ, অর্জ্জুন, দয়ারাম ও ভারতচন্দ্র।

জীবনী

কিছুদিনের মধ্যে রাজা নরেন্দ্র নারায়ণের সহিত বর্দ্ধমানরাজের বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজ্যের সীমানা-সংক্রান্ত কোন ব্যাপার লইয়া রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতা বিষ্ণুকুমারীকে কটূক্তি করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকুমারী নরেন্দ্র নারায়ণের বিরুদ্ধে বিপুল সৈন্য বাহিনী দিয়া তাঁহার দুইজন রাজপুত সেনাপতিকে পেঁড়ো বসন্তপুর অভিমুখে প্রেরণ করেন। তাহারা নরেন্দ্র নারায়ণের জমিদারী ও তাহার গড় অধিকার করিয়া লয়। নরেন্দ্র নারায়ণ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পড়েন।

ভারতচন্দ্র মঙ্গলঘাট পরগণার অধীন গাজিপুরের নিকটবর্ত্তী নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে পলাইয়া যান। তথায় বাসকালীন তিনি নিকটবর্ত্তী তাজপুর গ্রামে এক সংস্কৃত টোলে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করেন এবং মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাজপুরের নিকটবর্ত্তী সারদা গ্রামের কেশরকুণি আচার্য্যদের একটি বালিকা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পাঠাভ্যাসও সমাপ্ত হয়; তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সেকালে পারসী শিক্ষা না করিলে সামান্য কর্ম্মও কেহ লাভ করিতে পারিত না। তিনি একমাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অগ্রজগণ তাঁহাকে অনুযোগ দেন। তাঁহার উপর অভিভাবকগণ তাঁহার বিবাহের জন্যও অপ্রসন্ন ছিলেন। সেইজন্যও নানা ভাবেই তাঁহার উপর তাঁহারা বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ইহাতে অভিমানাহত হইয়া তিনি একদিন বাটী হইতে পলাইয়া যান এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর বাটীতে আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার নিকট পারসী শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। রামচন্দ্র মুন্সী জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, তিনি বালকের আগ্রহ দেখিয়া স্বগৃহে রাখিয়া তাহাকে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। তখন ভারতচন্দ্রের বয়স পনর বৎসরের অধিক নহে।

এই সময়ে একদিন মুন্সীর গৃহে সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে ভারতচন্দ্রকে পাঁচালী পড়িবার জন্য বলা হইল। ভারতচন্দ্র তাহাতে স্বরচিত পাঁচালী পাঠ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রচনা। তাহাতে এই ভাবে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন.

প্রথম রচনা

"ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ,
সদাভাব হতকংশ, ভুরশুটে বসতি।
নরেন্দ্ররায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত
ফুলের মুখুটি খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি॥
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্সী।

ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়,
হয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারসী ॥
সবে কৈল অনুমতি সংক্ষেপে করিতে পুঁতি
তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তায়, হরি হোন্ বরদায়,
ব্রত কথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা ॥”[১]

পারসী ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া ভারতচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অগ্রজেরা এইবার তাঁহার যথোপযুক্ত বিদ্যালাভ হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন ব্যাপারের তদ্বির করিবার জন্য তাঁহাকে বর্দ্ধমান রাজসরকারে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এই কার্য্যে কোন গোল-যোগের জন্য বর্দ্ধমানরাজ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়া ভারতচন্দ্র কারাগার হইতে পলাইয়া যান এবং একেবারে বর্দ্ধমানরাজের রাজ্যের সীমানার বাহিরে উড়িষ্যার অন্তর্গত কটকে গিয়া উপস্থিত হন। তখন তাঁহার একমাত্র সঙ্গী এক নাপিত ভৃত্য।

কটকের তদানীন্তন মহারাষ্ট্র সুবাদার শিবভট্ট তাঁহাকে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া বাস করিবার অনুমতি প্রদান করেন। শ্রীক্ষেত্রে তিনি এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতে থাকেন। একদা এই সন্ন্যাসীর দলের সহিত তিনি বৃন্দাবন যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে হুগলী জিলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেই গ্রামেই তাঁহার শ্যালিকা-পতির নিবাস ছিল। তাঁহারা ভারতচন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া অনেক অনুরোধ উপরোধ দ্বারা তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করাইলেন। অতঃপর, তিনি শ্বশুরালয়ে গিয়া তাহার পত্নীকেও দেশ হইতে আনাইয়া

১ ‘সনে রুদ্র চৌগুণা’ অর্থাৎ ১১৪৪ সাল বা ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ। এই সময়ে ভারত-চন্দ্রের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ।

কিছুকাল সেখানেই বাস করিলেন। তারপর পত্নীকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া কর্ম্মের সন্ধানে বাহির হইলেন।

ফরাসডাঙ্গায় তখন প্রসিদ্ধ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ফরাসী সরকারের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তিনি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব-গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার কাব্যালোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ৪০৲ টাকা বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া তাঁহার সভাকবি নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারই আদেশে ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রসিদ্ধ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের সভায়

গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে 'গুণাকর' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। এতদ্ব্যতীত গঙ্গাতীরবর্ত্তী মূলাযোড় গ্রাম তাঁহাকে সামান্য খাজানায় প্রথমতঃ ইজারা দেন; পরে মূলাযোড়ের ১৬ বিঘা ভূমি ও তাহার সন্নিকটবর্ত্তী গুস্তে গ্রামের ১০৫ বিঘা জমি তাঁহার নামে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দান করেন। ৪০ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গমন করেন ও ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন। অদ্যাপি মূলাযোড় গ্রামে তাঁহার বংশধরেরা বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল।

'গুণাকর'

ভারতচন্দ্র ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন,—

"বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥"

অন্নদামঙ্গল কাব্য দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথমতঃ মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীর অনুকরণে ভারতচন্দ্র প্রথমখণ্ড রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহারই নাম অন্নদা-মঙ্গল। দ্বিতীয় খণ্ডে

অন্নদামঙ্গল

মানসিংহের বাংলা আক্রমণ ও প্রতাপাদিত্যের সহিত তাহার যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরের কথা এই দ্বিতীয় খণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান অধ্যায়ে অন্নদামঙ্গলের একমাত্র প্রথম খণ্ডই আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর অনুকরণেই অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ড রচিত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর পৌরাণিক অংশ ও অন্নদা মঙ্গলের পৌরাণিক অংশ প্রায় অভিন্ন কিন্তু উভয় কাহিনীর লৌকিক অংশে পার্থক্য রহিয়াছে। অন্নদা-মঙ্গলের লৌকিক অংশ কাব্যের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অপ্রধান অংশ মাত্র। ইহাতে হরিহোড়ের প্রতি চণ্ডীর অহৈতুকী দয়া, তাহাকে বরপ্রদান ও পরে তাহাকে অন্যায় ভাবে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব পুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের ভবনে যাত্রা ইত্যাদির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই লৌকিক কাহিনীটুকু কাব্যের যে স্বল্পপরিসর স্থান গ্রহণ করিয়া আছে তাহার মধ্যে চরিত্র-সৃষ্টি যেমন সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই, তেমনই কাহিনীও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। অন্নদা-মঙ্গল প্রথম খণ্ডের এই লৌকিক অংশটুকুই কাহিনীর দিক দিয়া একটু মৌলিকতা দাবী করিতে পারে, কিন্তু তাহাও চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতুর কাহিনীর দ্বারা এতখানি প্রভাবিত যে তাহার জন্য কোন সত্যিকারের কৃতিত্ব ভারতচন্দ্রকে দেওয়া যাইতে পারে না।

কাহিনী ভাগের স্বাতন্ত্র্য

মুকুন্দরামের প্রায় সমসাময়িক কাল হইতেই মঙ্গলকাব্যগুলির উপর সংস্কৃত পুরাণগুলির প্রভাব ব্যাপকভাবে আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। মুকুন্দরাম নিজেও "বিচারিয়া অনেক পুরাণ" তাঁহার কাব্য-রচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার মূল কাহিনীকে পৌরাণিক প্রভাবদ্বারা আচ্ছন্ন হইতে

ভারতচন্দ্রের পৌরাণিক প্রভাব

দেন নাই। মুকুন্দরামের পরবর্ত্তীকালের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে একখানি বিশেষ সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। তাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণ। এই মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ ও সুরথরাজের দুর্গোৎসব প্রভৃতির কাহিনী লৌকিক চণ্ডীর কাহিনীর সহিত আসিয়া মিশ্রিত হইতে আরম্ভ করে এবং নাম-সামঞ্জস্যে এই উভয় দেবতা কালক্রমে একেবারে অভিন্ন হইয়া যায়। ইহাতেই সমাজে ক্রমে লৌকিক চণ্ডীর প্রভাব অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতে আরম্ভ করে এবং এই সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীই তাহার স্থান অধিকার করিয়া লইতে থাকে। কালকেতুর স্থানে সুরথ রাজাই এই কাব্যের নায়কের স্থান অধিকার করে।

এই সময় হইতেই মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী আখ্যায়িকার বাংলা অনুবাদ রচিত হইতে আরম্ভ করে, তাহাই 'দুর্গাপুরাণ' বা 'দুর্গামঙ্গল' নামে পরিচিত। এই দুর্গাপুরাণোক্ত উমা-মেনকার কাহিনী হইতেই বাংলা আগমনী-বিজয়ার গানগুলি রচিত হয়। রামায়ণ মহাভারত অনুবাদের মত এত ব্যাপক না হইলেও প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে এই মার্কণ্ডেয় পুরাণের বহু অনুবাদ বাংলার নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দুর্গাপুরাণ বা দুর্গামঙ্গলই কালক্রমে চণ্ডীমঙ্গলের স্থান অধিকার করিয়া লয়, এই জন্যও চণ্ডীমঙ্গলের কাব্য মনসা-মঙ্গলের মত এত প্রচার লাভ করিতে পারে নাই।

ভারতচন্দ্রের উপরও এই সংস্কৃত পুরাণগুলির বিশেষ প্রভাব বর্ত্তমান ছিল। এই সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবের ফলেই মুকুন্দরামের চণ্ডী ভারতচন্দ্রের অন্নদায় পরিণত হয়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল হইতে ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলে যে সমস্ত জায়গায় কাহিনীর দিক দিয়া স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় তাহা সমস্তই তাঁহার এই সংস্কৃত পৌরাণিক অভিজ্ঞতা-জাত। ভারতচন্দ্রের এই বিষয়ে কোন মৌলিকতা নাই। লৌকিক মঙ্গল-চণ্ডীর আখ্যায়িকার

অসংলগ্ন চিত্রগুলি ইতিপূর্ব্বেও সমাজে গভীর রেখাপাত করিতে পারে নাই, সেইজন্য সংস্কৃত পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া ভারতচন্দ্র অতি সহজেই তাহার অস্তিত্ব এই সমাজ হইতে মুছিয়া দিবার প্রয়াস পাইলেন।

ভারতচন্দ্র তাঁহার সংস্কৃত-জ্ঞান সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন,

"ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী।"

ভারতচন্দ্র তাঁহার এই বহুমুখী জ্ঞান অন্নদা-মঙ্গলকাব্য রচনায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তথাপি এই কাব্য-রচনায় কয়েকটি সংস্কৃত পুরাণের ঋণ তিনি বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছেন,—প্রথমতঃ তিনি একান্ন পীঠ বর্ণনার মন্ত্রে চূড়ামণিতন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,

"একমত না হয় পুরাণমত যত।
আমি কহি মন্ত্র চূড়ামণিতন্ত্র মত॥"

ব্যাসের শিবনিন্দার কাহিনী মুকুন্দরামের চণ্ডীতে নাই। এই অংশ রচনায় তিনি কাশীর মাহাত্ম্যসূচক পুরাণ কাশীখণ্ড হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,—

"শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥"

ইতিপূর্ব্বেই কাশীখণ্ড নামক কাশীর মাহাত্ম্য-সূচক শৈব পুরাণখানির কতকগুলি বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্য রচনায় এই সম-সাময়িক প্রভাবকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের এই সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব গুণের সহিত সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই রচনার বাহ্যিক

মৌলিকতার অভাবেও তাঁহার কাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ভারতের বৈশিষ্ট্য

অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত কথায় গভীরতম ভাব-দ্যোতক প্রবচনের মত এক একটি পদ রচনা করিতে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের তুলনা নাই। ভাষার উপর কতখানি অধিকার থাকিলে ভাবপ্রকাশ এত সংক্ষিপ্ত ও সরস হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার অন্নদা-মঙ্গলের নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি খনার বচনের মত শিক্ষিত বাঙ্গালী-গৃহের নিত্য সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে, প্রাচীন কি আধুনিক সমগ্র-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন গৌরব আর কেহ লাভ করিতে পারেন নাই। অন্নদা-মঙ্গলের প্রথম খণ্ড হইতে আমি মাত্র কয়েকটির দৃষ্টান্ত দিতেছি,—

১। "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ?"

২। "বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে"

৩। হাবাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়"

৪। "বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির"

৫। "খুঞা তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত।

৬। "মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে"

৭। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। ইত্যাদি

ইহা হইতেই ভারতচন্দ্রের কাব্যের লোক-প্রিয়তারও কতক আভাস পাওয়া যাইবে। ভারতচন্দ্রের ভাষার ঐশ্বর্য্য অতুলনীয়। সংস্কৃত, পারশী ও প্রাকৃত বাংলার সুন্দর সমন্বয় দ্বারা তিনি ভাষার যে শুধু লাবণ্যই বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা নহে তাঁহার অপূর্ব্ব শব্দ-বিন্যাস নৈপুণ্য দ্বারা তাহার মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ গতিবেগ দান করিয়াছেন, তাহা যেন নিজের

কাকলিতে নিজেই মুখর হইয়া চলিয়াছে। এইজন্যই তাঁহার রচনার কোন অংশই জড়তাপ্রাপ্ত হইয়া কাব্যকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে নাই। ভারতচন্দ্রের এই সুমার্জ্জিত ভাষাই রাজসভার উপযুক্ত ভাষা হইল; বঙ্গভাষা সর্ব্বপ্রথম গ্রাম্যতামুক্ত হইয়া উচ্চতর সাহিত্যিক ভাষার উপযোগিতা লাভ করিল, ভাবে ও রূপে সর্ব্বপ্রথম বাংলা কাব্য উচ্চতর আদর্শের সন্ধান পাইল। এই বিষয়ে অন্নদা-মঙ্গল সর্ব্বপ্রথম প্রাচীন মঙ্গল-কাব্যগুলির আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া নিজস্ব সৃষ্টির মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। মুকুন্দরামের কবি-কল্পনা বাংলার ধূলি মাটিতে সমাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু ভারতচন্দ্রের কল্পনা আকাশ-স্পর্শী হইয়া উঠিল।

কবিত্ব

ভারতচন্দ্রের এই ভাষার মূলে বৈষ্ণব কবিতার দান কখনই উপেক্ষণীয় নহে। বাঙ্গালা-ভাষা সর্ব্বপ্রথম বৈষ্ণব কবিতার ভিতর দিয়াই সুমার্জ্জিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহা হইতেই ভারতচন্দ্রের ভাষায় তাহার পরিণতি অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের অসীম পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃত বাংলার সুন্দর এবং সহজ শব্দগুলিকে তিনি তাঁহার কাব্যের রচনা-কালে উপেক্ষা করেন নাই। এই শব্দগুলি নৈপুণ্যের সহিত মধ্যে মধ্যে তিনি এমন ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা ভাষার গ্রাম্যতার সৃষ্টি করা দূরে থাকুক বরং ভাব প্রকাশ আরও প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। উমা তাহার জননীর নিকট আব্দার করিবার কালে,

"আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে ॥
ও মা ও মা বলি উমা কথা কন ছলে ॥"

মাতার নিকট সন্তানের আব্দার প্রকাশ করিবার মত ইহা অপেক্ষা স্বাভাবিক ও সহজ ভাষার কল্পনা করা যাইতে পারে না, ভাষার ভিতর দিয়া যেন সন্তানের সোহাগ গলিয়া পড়িতেছে।

এই অপূর্ব্ব শব্দ-যন্ত্রী ভারতচন্দ্র রতি-বিলাপের মধ্যে সংস্কৃত শব্দগুলিকেও এইভাবে সাজাইয়াছেন যে, বিলাপের কারুণ্য যেন ইহার প্রতি ছত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে,—

"শিব শিব শিব নাম, সবে বলে শিবধাম, বামদেব আমার কপালে।"

"একের কপালে রহি, আরের কপাল দহি, আগুনের কপালে আগুন।"

"চরণ রাজীব রাজে, মনঃশিলা পাছে বাজে, হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া।"

যে সংস্কৃত শব্দ রামপ্রসাদ প্রমুখ কবিদিগের রচনার ভার স্বরূপ এবং কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি প্রবাহের মধ্যে দুস্তর বাধার সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সংস্কৃত শব্দেরই শুধু প্রয়োগ-কৌশলদ্বারা ভারতচন্দ্র তাহার কাব্যে অপরূপ সৌষ্ঠব দান করিয়াছেন, মৌলিকতাহীন কাহিনীর আশ্রয় লইয়াও নিজের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র

কিন্তু এ কথাও স্বীকার্য্য যে, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। কাহিনী এমন কি স্থানে স্থানে ভাষার দিক দিয়াও মুকুন্দরামের নিকট ভারতচন্দ্রের যে অসীম ঋণ রহিয়াছে তাহা বিস্মৃত হইবার উপায় থাকে না। তবে পার্থক্যের মধ্যে এই যে, অত্যন্ত সহজ ও নিরলঙ্কারা ভাষায় মুকুন্দরাম যে কথাটি প্রকাশ করিতেন, ভারতচন্দ্র তাহাই নিজের পাণ্ডিত্য দ্বারা সুমার্জ্জিত করিয়া লইতেন মাত্র। অনেকে মুকুন্দরামের নিকট ভারতচন্দ্রের এই ঋণের মাত্রা এত অধিক মনে করেন যে, তাঁহারা ভারতচন্দ্রকে তাঁহার কাব্যের জন্য প্রায় কোন মর্য্যাদা দান করিতেই অসামর্থ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। মনীষী ৺ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "গুণাকার পত্রে পত্রে কবিকঙ্কণের নিকট ঋণী। কবিকঙ্কণের কবিত্ব পত্রে পত্রে নকল করিয়াছেন, কবিকঙ্কণের স্বাভাবিক ও সুন্দর বর্ণনাগুলি অলঙ্কার দিয়া কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন।

কবিকঙ্কণের কাব্য সরল, স্বাভাবিক ও সুখপাঠ্য ; গুণাকারের কাব্য অধিকতর সুললিত, কিন্তু অস্বাভাবিক এবং স্থানে স্থানে অপাঠ্য।"[১]

ভারতচন্দ্র যে ভাবে মুকুন্দরাম হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন দেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করি।

সতী দক্ষালয়ে যাইবার নিমিত্ত পতির নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন, মুকুন্দরাম এই সম্পর্কে অত্যন্ত সহজ কথায় প্রকাশ করিয়াছেন,

"অনুমতি দেহ হর, যাইব বাপের ঘর
যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে।" ইত্যাদি

পত্নীব এই প্রার্থনায় স্বামীর নিকট স্বাভাবিক আব্দারই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে, ভারতচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন,—

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব পিতার ভবন ॥—ইত্যাদি

দক্ষের শিব-নিন্দায় মুকুন্দরাম যেখানে বলিয়াছেন,

"পরিধান বাঘ ছাল, গলায় হাড়ের মাল
বিভূতি ভূষিত যার অঙ্গে।
শ্মশানে যাহার স্থান, তার কেবা করে মান
প্রেতভূত চলে যার সঙ্গে ॥"

ভারতচন্দ্র সেখানে বলিয়াছেন,

"সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই কেবা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ॥"

১ 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০১ সাল, পৃঃ ১৫৫

দক্ষযজ্ঞ নাশ বর্ণনায় মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন,

"লয়ে নানা রুদ্র ক্রুদ্ধ বীর ভদ্র
চলে যজ্ঞ নাশিবারে।"

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,

"মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।"

ব্যাধভবনে মুকুন্দরামের চণ্ডী আত্মপরিচয়চ্ছলে যেখানে কহিতেছেন,

"কি কব দুঃখের কথা, গঙ্গা নামে মোর সতা,
স্বামী যারে ধরয়ে মস্তকে।"

ভারতচন্দ্র তাহাই অন্নদার আত্মপরিচয়চ্ছলে অপূর্ব্ব কবিত্ব সহকারে প্রকাশ করিতেছেন,

'গঙ্গা নামে মোর সতা তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সেই স্বামী শিরোমণি॥'

মুকুন্দ যেখানে বলিতেছেন,

বিষকণ্ঠ মোর স্বামী, সহিতে না পারি আমি
পঞ্চমুখে দেয় গালাগালি।

ভারতচন্দ্র যেখানে বলিতেছেন,

'কু কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥'

এই প্রকার বহুস্থলে ভাব ও ভাষায় মুকুন্দ রামের সহিত ভারতচন্দ্রের অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক বলিয়া মনে হয়।

মুকুন্দরাম ব্যতীতও ভারতচন্দ্র তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আর একজন কবির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার কাব্যেই ভারতচন্দ্রের সুর যেন সমধিক ধ্বনিত হইয়া উঠিতে শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্মমঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি ঘনরাম

ঘনরাম ও ভারতচন্দ্র

চক্রবর্ত্তী।* তাঁহার সম্পর্কে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই স্থলে ভারতচন্দ্র তাহার কাব্য হইতে কোন কোন অংশ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই শুধু উল্লেখ করিব।

ধর্ম্মমঙ্গলের 'আখড়া পালা'য় ছদ্মবেশিনী পার্ব্বতী লাউসেনের নিকট কৌশলে আত্মপরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে কহিতেছেন,

"মমতা না করে পিতা পাষাণ শরীর।"

ভারতচন্দ্রের অন্নদার আত্মপরিচয়ে পাই,

"না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।"

ঘনরামের পার্ব্বতী এই প্রসঙ্গেই বলিতেছেন,

"যে ডাকে আদর ভাবে যাই তার কাছে।"

ভারতচন্দ্রে আছে,

"যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই।"

ঘনরামের পার্ব্বতী পতির পরিচয় সম্বন্ধে কহিতেছেন.

"ভিক্ষুক ভক্ষণ ভাঙ্গ ভস্মগুলা গায়।"

ভারতচন্দ্রে পাই,

'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।" ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্রকে তাহার এই কাহিনীগত মৌলিকতার অভাবের জন্য কতখানি দোষী বিবেচনা করা যায় এক্ষণে তাহারই বিচার করা কর্ত্তব্য। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই যুগে মঙ্গলকাব্যগুলির নির্দ্দিষ্ট গতানুগতিক কাহিনীগত ধারা অবলম্বন না করিয়া কোন কবিই কাব্য রচনা করিতে পারিতেন না। আমাদের এই রক্ষণশীল সমাজের মধ্যে প্রাচীন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা এতই অধিক ছিল যে, তাহার কোন প্রকার সংস্কার কেহ সহজে স্বীকার করিত না। সেই জন্যই যত বড়

কবিশক্তি লইয়াই কেহ জন্মগ্রহণ করুক না কেন সেই প্রাচীনকেই ভিত্তি করিয়া তাঁহার নূতন কাব্যসৌধ গড়িয়া তুলিতে হইত। ভারতচন্দ্রকেও তাহার ব্যতিক্রম করিবার উপায় ছিল না। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ইতি-পূর্ব্বেই সমাজে এত প্রচলিত ছিল যে, শত কবিত্বগুণে গরীয়ান্ হইলেও ইহার ব্যতিক্রমটি সাধারণতঃ কেহই গ্রহণ করিতে চাহিত না। ভারতচন্দ্র চরমপন্থী ছিলেন না, সেই জন্য পুরাতনের উপরই দৃষ্টি রাখিয়াই নিজের কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ'কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে কোন কবি অপেক্ষা অনেক গুণেই শ্রেষ্ঠ।

যে রুচি-দোষের জন্য ভারতচন্দ্রের সাধারণতঃ নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায় অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না।

কাব্য-নীতি

কৃষ্ণচন্দ্রের আরাধ্য দেবতার সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কবি তাঁহার কাহিনী রচনা করিয়াছেন। ভারত-চন্দ্রের 'কালিকা মঙ্গল' বা বিদ্যাসুন্দরের কথা আলোচনা সম্পর্কে কবির এই নৈতিক দৃষ্টির সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের পরেও যে কয়েকখানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল,

ভবানী শঙ্কর

তাহাদের মধ্যে ভবানীশঙ্কর দাসের কাব্যখানি উল্লেখযোগ্য। ইহার রচনা-কাল সম্বন্ধে কবি তাহার কাব্য শেষে উল্লেখ করিয়াছেন,

"ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে।
ভবানী শঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভনে॥"

ইহা হইতেই জানা যায় যে, ১৭০১ শক বা ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ভবানী শঙ্কর তাহার মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা সমাপন করেন। তাহার এই কাব্য 'জাগরণের পুঁথি' ও 'চণ্ডীমঙ্গল গীত' নামেও পরিচিত।

কবি আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে গ্রন্থমধ্যে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি আত্রেয় গোত্রীয় নরদাসের বংশধর ও কুলীন কায়স্থ কুলোদ্ভব। এই আত্রীয় গোত্রীয় নরদাস বাংলার সমাজে কৌলিন্যের প্রতিষ্ঠাতা বল্লালসেনের কুলনির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া বারেন্দ্র সমাজে চলিয়া যান এবং বারেন্দ্র সমাজেই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। এই প্রতিপত্তি দ্বারাই ক্রমে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে কৌলিন্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া লন। এই নরদাসের বংশ-ধরেরা কালক্রমে বরেন্দ্র ও বঙ্গে ছড়াইয়া পড়েন।

কবির পরিচয়

কবির পূর্ব্বপুরুষ এই নরদাসের বংশধর কৃষ্ণানন্দ ও হৃদয়ানন্দ চট্টগ্রামের অন্তর্গত সমুদ্র তীরবর্ত্তী দেবগ্রামের অনতিদূরে বটতলী গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর তাহাদের বংশধর মধুসূদন বটতলী হইতে চক্রশালার অন্তর্গত ছনহারা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই মধুসূদন কবির পিতামহ। কবি ভবানীশঙ্করের পিতার নাম শ্রীমন্ত। এই ছনহারা গ্রামেই ভবানীশঙ্করের জন্ম হয়, তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম কৃষ্ণকিঙ্কর। অদ্যাপি কবির বংশধরগণ চট্টগ্রামের নানাস্থানে বসবাস করিতেছেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় কবির বাটিতে তাঁহার কাব্যখানি গীত হইত। ইদানীং তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।[১]

ভবানীশঙ্করের কাব্যখানি আকারে সুবৃহৎ। ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী কবি হইলেও ভারতচন্দ্রের কোন প্রভাব তাহার উপর দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ তখনও ভারতচন্দ্রের প্রভাব এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়

১ 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা' (শ্রীরাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত) ভূমিকা, পৃঃ ৩

নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুকুন্দরামের কাব্যও এই চট্টগ্রাম অঞ্চলে অপ্রচলিত ছিল, সেইজন্য তাঁহারও কোন প্রভাব এই কবির উপর দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ মাধবাচার্য্যের কাব্য হইতে তিনি কাহিনীর মূল অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত পুরাণগুলির অনেক কাহিনী তিনি নানা উপায়ে তাহার কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার রচনা সংস্কৃত শব্দ, উপমা ও অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত। অনেক সময় সংস্কৃত সন্ধি সমাসের নিয়ম পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার বাংলা রচনার কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন. যেমন,

কাব্যের প্রচার

কাব্য গুণ

"কি বর্ণিব মায়ের রূপ ময়াধম দীনে।
জাহার রূপেরাভায় ত্রিভুবন জিনে॥
প্রাতরর্কেরাভা জিনি শোভে পদতল।
পদোপরে অলঙ্কারে করে ঝলমল॥" ইত্যাদি

এই সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য তাঁহার কাব্য কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি পদে পদে প্রতিহত করিয়াছে, নতুবা তাঁহার মধ্যে সত্যিকার কবি-দৃষ্টি ছিল বলিয়া অনুভব করা যায়। কবি এইভাবে ফুল্লরার বারমাসী বর্ণনা করিয়াছেন,

"ফুল্লরায়ে বলে বাক্য শুন রূপবতী।
যত ক্লেশে প্রভু সঙ্গে করিয়ে বসতি॥
মেষ রাশি মধ্যে ভাস্করোদয় হয়ে যবে।
যত ক্লেশ ক্রমে আহ্মি বঞ্চি এই ভবে॥
আতপ প্রতাপ হয়ে ধনঞ্জয় সমা।
হেন সমে মাংস লৈয়া ভ্রমি আহ্মি বামা॥
দিবাকর বৃষস্থ হয়েন যেই মাসে।
আহ্মার বিপত্তি দেখি শক্র সর্ব্ব হাসে॥" ইত্যাদি

এই সমস্ত রচনায় কবিত্ব অপেক্ষা লেখকের পাণ্ডিত্যই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

বঙ্গদেশের বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থান হইতে জনার্দ্দনের চণ্ডী নামক ব্রতকথার ন্যায় একখানি ক্ষুদ্র কাব্য পাওয়া গিয়াছে।[১] এই জনার্দ্দনের কোন পরিচয় কিম্বা তাঁহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার পুঁথির বহুল প্রচার দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে, তিনি নিতান্ত আধুনিক কবি নহেন। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার একখানা পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা "প্রায় ২৫০ শত বৎসরের প্রাচীন" বলিয়া তিনি অনুমান করেন।[২]

জনার্দ্দনের চণ্ডী

জনার্দ্দনের চণ্ডীর দুইটি অংশ; প্রথম অংশে কালকেতু ব্যাধের কাহিনী, দ্বিতীয় অংশে ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। উভয় কাহিনীই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কাহিনীর এই সংক্ষিপ্ততা হইতেই ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।[৩] তাঁহাদের বিশ্বাস, এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিই ক্রমে মাধবাচার্য্য, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবির হাতে পড়িয়া মঙ্গলকাব্যের রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা খুব নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। কারণ দেখা যাইতেছে যে, মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম প্রভৃতির প্রচারের পরেও এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি শুধু যে আত্মরক্ষা করিয়াই টিকিয়া আছে তাহা নহে, ইহার প্রচার কিছুমাত্রও হ্রাস পায় নাই। এই জনার্দ্দনের চণ্ডীর মত ব্রতকথার আকারে ক্ষুদ্র কাব্য প্রাচীনকালে

---

১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালায় ইহার অনেকগুলি খণ্ডিত ও সম্পূর্ণ পুঁথি সংগৃহীত আছে।

২ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ ১৮৪

৩ ঐ

কত যে রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, এবং এখনও বটতলার কল্যাণে ইহাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অতএব মনে হয়, পাঁচালীর উদ্ভব প্রাচীন হইলেও মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ইহাদের সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ ঘটে নাই। ইহারা ইহাদের পথে নিজেদের কার্য্য সাধন করিয়াছে। মঙ্গলকাব্য উচ্চতর সমাজে উৎসবে অনুষ্ঠানে আড়ম্বরের সহিত গীত হইত, পাঁচালী সাধারণ গৃহস্থের নিত্য পূজায় পঠিত হইত, উভয়ের ক্ষেত্র এক নহে এবং একে অন্যের স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারে নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, মঙ্গল-কাব্যের আকার বিরাট হইবার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনই এই ব্রত কথার আকারের ক্ষুদ্র পাঁচালীরও প্রয়োজন রহিয়াছে। পদ্মাপুরাণ কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সমাজে (বিশেষতঃ স্ত্রীসমাজে) স্বতন্ত্র মনসার ব্রতকথার প্রচলনও এই কারণেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কাহিনীর সংক্ষিপ্ততা হইতেই জনার্দ্দনকে মাধবাচার্য্য মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিবার উপায় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, জনার্দ্দনের পাঁচালীর কাহিনীর মত সংক্ষিপ্ত কোন কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল। তবে তাহা জনার্দ্দনেরই রচিত কাহিনী অবলম্বনে কিনা বলা যায় না।

পাঁচালী ও মঙ্গলকাব্য

জনার্দ্দনের চণ্ডীর রচনা-কাল কখন তাহা জানা না গেলেও তাহার ভাষা যে আধুনিক তাহা স্বীকার করিতে হয়। এমন কি ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে পুঁথিখানিকে ২৫০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করেন, তাহার ভাষা দৃষ্টে ইহাকে এত প্রাচীন মনে হয় না। তবে নিতান্ত অল্প কালের মধ্যে একখানি সাধারণ ব্রতকথা বা পাঁচালী জাতীয় পুঁথির এমন বিস্তৃত প্রচার হওয়াও সম্ভব নহে। অবশ্য ভাষা কালক্রমে আধুনিকতা প্রাপ্ত হওয়া

জনার্দ্দনের রচনা-কাল

কিছুই অস্বাভাবিক নহে। এই সব নানা কারণে জনার্দ্দনকে ২৫০।৩০০ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে আপত্তি থাকিতে পারে না। জনার্দ্দনের রচনা সরল, কাহিনীর স্বচ্ছন্দ বর্ণনা থাকিলেও তাহা কবিত্ব বর্জ্জিত। মৃগয়া হইতে ভগ্ন মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে কবি কালকেতুর এই বর্ণনা দিয়াছেন,—

"মৃগয়া না পাইয়া ব্যাধ হইল চিন্তিত।
সুবর্ণ গোধিকা পথে দেখে আচম্বিত॥
সুবর্ণ গোধিকা পাইয়া হরষিত মনে।
ধনুর অগ্রে তুলি লইল তখনে॥
মনে মনে ভাবে ব্যাধ ধীরে ধীরে হাঁটে।
সত্বর গমনে গেল বাড়ীর নিকটে॥"

দুর্গামঙ্গল

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, চণ্ডীর উপর সংস্কৃত পৌরাণিক প্রভাব বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের প্রচলন অনেকটা সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তখন মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া পৌরাণিক চণ্ডীর কাহিনী বাংলায় রচিত হইতে লাগিল। এই জাতীয় কাব্য রচনা মার্কণ্ডেয় পুরাণের বঙ্গানুবাদ দিয়া সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ হয় কিন্তু পরে তাহার কাহিনীটুকু অবলম্বন করিয়া স্বাধীন রচনারও সূত্রপাত হয়। এই সমস্ত কাব্য সাধারণতঃ দুর্গামঙ্গল, দুর্গাপুরাণ, দুর্গালীলা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, চণ্ডিকা-বিজয়, ভবানী-মঙ্গল ইত্যাদি নামে পরিচিত। সংস্কৃত পুরাণগুলিই ইহাদের আদর্শ ছিল বলিয়া ইহাতে সাধারণতঃ মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট রীতি অবলম্বন করা হইত না। অবশ্য কোন কোন এই জাতীয় কাব্যে মঙ্গলকাব্যের প্রভাবকেও যে স্বীকার না করা হইয়াছে, এমনও নহে।

এই অনুবাদ জাতীয় কাব্য রচনায়ও প্রাচীন বহু শক্তিমান কবি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, বহুস্থান হইতেই তাহাদের বহু কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ দুর্গোৎসবের সময় তিন দিন দুর্গামণ্ডপের সম্মুখে আসর করিয়া চামর মন্দিরা সহযোগে এই দুর্গাপুরাণ গীত হইয়া থাকে, ক্রমে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের স্থান এই শ্রেণীর কাব্যই অধিকার করিয়া লয়। এই জাতীয় কাব্য মধ্যযুগের অনুবাদের সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া এই গ্রন্থে আর তাহাদের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল না।

এতদ্ব্যতীত বাংলা রামায়ণোক্ত শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের কাহিনী লইয়াও কয়েকখানি চণ্ডীমাহাত্ম্য সূচক কাহিনী বাংলায় রচিত হয়। তাহাও মঙ্গলকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত নহে বলিয়াই আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বহির্ভূত। শিবচন্দ্র সেন প্রণীত এই জাতীয় একখানি পুস্তকের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার নাম 'সারদা-মঙ্গল'। প্রকৃতপক্ষে ইহা রামায়ণেরই কাহিনী, কেবলমাত্র রামচন্দ্রের চণ্ডী পূজার উল্লেখ হইতেই ইহার এই নামকরণ করা হইয়াছে, আমাদের আলোচ্য মঙ্গলকাব্যের সহিত ইহার কোন যোগ নাই।

কাব্য-বিচার

কাব্য হিসাবে চণ্ডীমঙ্গলের সর্ব্বাপেক্ষা ত্রুটি এই যে, ইহার কাহিনীর মধ্যে কেন্দ্রগত ঐক্যের অভাব রহিয়াছে। এই কাব্যের চরিত্র ও ঘটনাগুলি বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রমুখী না হওয়ার ফলেই ইহাদ্বারা উচ্চতর কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয় নাই। একেই ইহার মূল কাহিনীই দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহাদের মধ্যেও কাহিনী ও চরিত্রগত ঐক্য নাই; তদ্ব্যতীতও এই মূল কাহিনী দুইটিকে স্বতন্ত্র ভাবে বিচার করিলেও ইহাদের মধ্যেও অন্তর্বিরোধ প্রকাশ পায়।

ব্যাধ কালকেতুকে চণ্ডী কেন সহসা দয়া করিলেন তাহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু এই ব্যাধের জীবনে চণ্ডীর দয়া প্রকৃতই দয়া না অভিশাপ তাহা বলা যায় না। মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে স্বাধীন ভাবে কোন মানব চরিত্র বিকাশ লাভ করিতে পারিত না, তাহার এতটুকু মনুষ্যত্ব বিকাশের মূলেও দেবতার অযাচিত করুণা আসিয়া স্থান লাভ করিয়া বসিত। যতদিন কালকেতুর সঙ্গে চণ্ডীর সাক্ষাৎকার হয় নাই ততদিন এই অরণ্যচারী ব্যাধ যুবকের জীবনটি মন্দ কাটিতেছিল না। ফুল্লরার বারমাসের দুঃখের কাহিনীও ব্যাধ-জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই চলিয়াছিল। কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে ব্যাধদম্পতি এই ছলনাময়ী দেবতার নিতান্ত অকারণ সুখের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইল সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদের জীবনের এই স্বাচ্ছন্দ্যটুকুও চলিয়া গেল। ব্যাধকে রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস কবিত্বের দিক দিয়া যেমন ব্যর্থ হইয়াছে, বাস্তবকতার ক্ষেত্রেও তাহা তেমনই নিরর্থক। ব্যাধকে ব্যাধ-রূপেই যদি শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতাম, তবে বোধ হয় ইহা অপেক্ষা অধিক সুখী হইতাম, কাব্যেরও মর্য্যাদা রক্ষা পাইত। এই সামঞ্জস্যের অভাবেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রস বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, ঘন সন্নিবিষ্ট হইবার সুযোগ পায় নাই। এই সম্পর্কেই একজন সমালোচক বলিয়াছেন, "এই কাব্যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও আর্টের উদ্গম আছে, বিকাশ নাই; আকরে খাঁটি স্বর্ণের পার্শ্বে ঈষৎ স্বর্ণে পরিণত লোষ্ট্রখণ্ড যেরূপ দেখায় তেমনি এই কাব্যে কবিত্বের ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আশে পাশে বহু অপরিণত ও অস্ফুট বর্ণনা দেখিতে পাই।"

সমগ্রভাবে বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, ধনপতির কাহিনীটির কাব্যগুণ সমধিক। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই কাহিনীটির মধ্যে বিশেষ মৌলিকতা নাই, পদ্মাপুরাণের চাঁদসদাগরের চরিত্রের উপর দৃষ্টি

রাখিয়া ধনপতির চরিত্রটি কল্পনা করা হইয়াছে, খুল্লনার পরীক্ষা প্রভৃতির কাহিনীও বেহুলার পরীক্ষার কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া রচিত।[১] এতদ্ব্যতীত খুল্লনার দুঃখ বর্ণনার অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জন অত্যন্ত পীড়াদায়ক। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক নির্দ্দেশ অনুযায়ী ইহা আদ্যোপান্ত রচিত। বিষয়-বস্তু সুগ্রথিত ও সুমার্জ্জিত নহে, কোন উচ্চতর কাব্যের সৃষ্টি-উপাদানও ইহাতে নাই। ইহাকেই ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্র" বলিয়াছেন।

চরিত্র-সৃষ্টি

মূল কাহিনীগত ঐক্যের অভাবেই চণ্ডীমঙ্গলের কোন চরিত্রসৃষ্টিই সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। এই কাহিনীতে বিভিন্ন সংস্কারের একত্র সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়াই চরিত্রগুলির কার্য্যকারিতাও অনেকস্থলেই পরস্পর সামঞ্জস্যহীন। চরিত্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে ধরিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

উভয় কাহিনীতেই যে উল্লেখযোগ্য একটি প্রধান চরিত্র পাওয়া যায় তাহাই চণ্ডীর চরিত্র। চণ্ডীকে দেবতা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্রে কোন দেবত্ব দূরের কথা বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্বেরও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। মনসার চরিত্র সমালোচনা সম্পর্কে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। উন্নত আর্য্য সমাজের দেবতাদিগের পরম কারুণিক কল্যাণময় আদর্শ মঙ্গলকাব্যের নিম্নতন সমাজের অনুদার ও সংকীর্ণ দৃষ্টিদ্বারা সম্যক্ উপলব্ধি

মঙ্গলকাব্যে দেব-চরিত্র

১ স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় যখন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' প্রণয়ন করেন তখন পদ্মাপুরাণের প্রাচীনতর কোন কবির পরিচয় তিনি জানিতেন না বলিয়া পদ্মাপুরাণ কাব্যকেই 'চণ্ডীকাব্যের অনুকৃতি' বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। পৃঃ ১২০ (তৃতীয় সংস্করণ)

করা যায় নাই। অথচ এই দেবতাকে মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, তাহার হাতে ক্ষমতার অস্ত্র তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে; অতএব তাহার যথেচ্ছ অপব্যবহারও অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্যই মঙ্গলকাব্যের দেবতাগণ নীচ স্বার্থপর, ক্রূর প্রতিহিংসাপরায়ণ, অকৃতজ্ঞ ছলনাময়। তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তের মস্তক আপনা হইতে নত হইয়া আসে না, তাহাদের মহিমার প্রতি আকর্ষণ বশতঃ কেহ তাহাদের শরণাপন্ন হয় না, শুধু তাহাদের অকারণ নিগ্রহের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকিবার জন্যই ভয়ে তাহাদের নামোচ্চারণ করে মাত্র। দেবতাগণেরও এই বিষয়ে সতর্কতার অবধি নাই, কাহারও এতটুকুন অবমাননার প্রতিশোধ লইতে তাহাদের মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। বাণিজ্য করিয়া দীর্ঘ দিনের নিরুদ্দিষ্ট সদাগর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে শুনিয়া কোন মিলনোৎসুক পরিজন যদি এই দেবতার প্রসাদ অভুক্ত রাখিয়া আগ্রহাতিশয্যে সেই পথের দিকে ধাবমান হয় তাহা হইলে প্রবাসী সদাগর আর গৃহে প্রত্যাগত হইতে পারিবে না, ঘাটের পাষাণে ঠেকিয়া হইলেও তাহার তরী ডুবিবে, দেবতা তাহার প্রসাদের অবমাননার প্রতিফল স্বরূপ সেই নিরপরাধ সদাগরের প্রাণ লইতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। কিন্তু এই আশুতোষ দেবতাদিগের এমনই মহিমা যে যদি অনুতপ্ত ভক্ত পুনরায় গিয়া সেই পরিত্যক্ত প্রসাদ মাটি হইতে তুলিয়া আহার করে তন্মুহূর্ত্তেই সেই সদাগর বাঁচিয়া উঠিবে। এই সামান্য অমর্য্যাদা হইতে আত্মরক্ষার্থ মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের এত সতর্কতা হইতে কি ইহাই মনে হয় না যে, বস্তুতঃ সেকালের সমাজে কোন মর্য্যাদারই তাহারা অধিকারী ছিল না? মঙ্গলকাব্যের যে কোন দেবতারই নাম করা যায় না কেন, মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ইহারা প্রত্যেকেই একান্ত অনিচ্ছুক ভক্তদিগের নিকট হইতে একপ্রকার জোর করিয়া

পূজা আদায় করিয়া লইয়া তবে ছাড়িয়াছেন, স্বেচ্ছায় ভক্তিপরবশ হইয়া কেহই তাহাদিগকে অর্চনা করে নাই। শক্তির যথেচ্ছ প্রয়োগ দ্বারা সমাজকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া স্বপ্নদ্বারা নির্য্যাতনের হুম্‌কি দেখাইয়া নানা চক্রান্তে সমুদ্যত দণ্ডহস্তে নিজেদের পূজা আদায় করিয়াছেন। কিন্তু এই শক্তির দ্বারা আর কিছু জয় করিতে পারা গেলেও অন্ততঃ সমাজের হৃদয় জয় করিতে পারা যায় না, বিভীষিকার আতঙ্ক ক্ষণস্থায়ী কিন্তু স্বভাবজ ভক্তি চিরস্থিরা। এই মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের প্রতি নব সংস্কার দীক্ষিত হিন্দু সমাজের এই ভয়ের অস্তিত্ব থাকিলেও কোন কালেই শ্রদ্ধার লেশমাত্রও ছিল না, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

কিন্তু ভক্তেরা এই চণ্ডীকে যে কেবল ভয়ানকা বলিয়াই কল্পনা করিয়াছে তাহা নহে, তাহা হইলে ভূতপ্রেত ডাকিনীদের সঙ্গে তাহাদেব কোন পার্থক্য থাকে না, অতএব ভক্তেরা তাহাকে ভয়হরা অভয়া বলিয়াও নিজেদের অন্তরে সান্ত্বনা সন্ধান করিয়াছে। সেইজন্য কারুরাদ্ধ কালকেতুর চৌতিশা স্তব শুনিয়া, সিংহলের মশানে শ্রীমন্তের কাতর প্রার্থনা শুনিয়া তিনি তাহাদেরে শঙ্কট হইতেও ত্রাণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভক্তের এই শঙ্কটতারণ ও ভয়নিবারণ গুণের উপরই চণ্ডীর দেবত্বের যাহা কিছু প্রতিষ্ঠা তাহা সম্ভব হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে প্রকৃত পৌরুষের অভাব থাকিলেও উৎকৃষ্ট রমণী-চরিত্র বিরল নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি উল্লেখ

ফুল্লরা

করিয়াছেন, "কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থাণু মাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোনো কাজের নহে।" ইহার কারণ স্বরূপও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, বাঙ্গালীর জীবন "মানস-প্রধান, কার্য্য-প্রধান নহে; মানস-জগতে স্ত্রীলোকের প্রভাব অধিক,

কার্য্য-জগতে পুরুষের প্রভুত্ব।[১] ব্যাধ কালকেতু কিম্বা সমুদ্রবাণিজ্যরত ধনপতি সদাগরের জীবনে কার্য্যের অভাব না থাকিলেও বাঙ্গালী কবির জাতীয়তা-সুলভ অন্তর্দৃষ্টিতে তাহাদের জীবনের কর্ম্মের এই দিকটা একেবারেই পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। মানস-প্রধান স্ত্রীচরিত্রগুলিই তাহাদের কাব্যে সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া ফুটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ফুল্লরার চরিত্রই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

ফুল্লরার গুণের মধ্যে,

"বলে ব্যাধ এই কন্যা নামেতে ফুল্লরা।
কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পশরা॥
রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে।
বন্ধু মিলি রূপ গুণ ইহার বাখানে।"

ফুল্লরা ব্যাধ-স্বামীর উপযুক্ত পত্নী, বৃদ্ধ শ্বশুর শ্বাশুড়ীর প্রতিও তাহার যত্ন ও সেবার ক্রটি হয় না,—

"খাওয়ায় ফুল্লরা বধূ ক্ষীর খণ্ড দধি মধু
নিদয়ার সফল জীবন।"

শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যুর পর ফুল্লরা এই ক্ষুদ্র সংসারখানির গৃহিণী পদে অধিষ্ঠিত হইল; স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কর্ত্তব্য পালনের ভিতর দিয়া তাহার দিন যাইতে লাগিল।

যে দিন ছলনাময়ী চণ্ডী তাহার গৃহাঙ্গিনায় আসিয়া মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন সেই দিনই ফুল্লরার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের দিন। স্বামীর প্রতি তাহার অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি বুঝি আর রক্ষা পায় না! অথচ এমন নিষ্ঠুর সত্যকেই বা কিভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া যায়! সে উর্দ্ধশ্বাসে কাঁদিতে কাঁদিতে গোলাহাটে গিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল।

১ পঞ্চভুত,—'নরনারী'

সামান্য ব্যাধ-পত্নীরূপে ফুল্লরাকে যতদিন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে ততদিনই তাহার চরিত্রটি সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া ফুটিয়াছে। বস্তুতঃ রাজ্যলাভ, ধনভোগে তাহার কেমন যেন নিস্পৃহ ভাব। চণ্ডী যখন কালকেতুকে রত্নাঙ্গুরী প্রদান করিলেন ফুল্লরা তখন তাহা লইতে নিষেধ করিল।

ফুল্লরা বুদ্ধিমতী, সে বলিল,

"এক গোটা অঙ্গুরীতে হবে কোন কাম।
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম ॥"

চণ্ডী ফুল্লরার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া,

"আর কিছু ধন দিতে কৈল অনুমতি।"

মাধবাচার্য্য এই ফুল্লরাকে আরও একটু দুর্বিনীতা ও মুখরা করিয়া আঁকিয়াছেন, মুকুন্দরামের দৃষ্টিতে তাহার চরিত্র একটু নমনীয় হইয়া আসিয়াছে।

খুল্লনা

ধনপতির কাহিনীতে খুল্লনার চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। জীবনের কঠোরতম দুঃখের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াও সে তাহার স্বামি-প্রেম মুহূর্ত্তের জন্যও ম্লান হইতে দেয় নাই। পরকে বিশ্বাস করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই যেন এই চরিত্রটির ধর্ম্ম। সেইজন্য স্বামীর প্রেমে তাহার যত বিশ্বাস, কুচক্রী দাসীকর্ত্তৃক প্ররোচিত সপত্নীর কথাও তাহার তেমনই বিশ্বাস। আত্মশক্তি যেখানে দুর্ব্বল দেবতার বিশ্বাস সেখানে স্বভাবিক। ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তির তাড়নায় খুল্লনা কোন কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করে না, আত্মশক্তিতে সে বিশ্বাস করে না, সেইজন্যই সর্ব্বতোভাবেই দেবতার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। এই খুল্লনার চরিত্রে পদ্মাপুরাণের বেহুলা-চরিত্রের একটু প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া অনুভব করা যায়।

লহনার চরিত্রটিও একেবারে মন্দ চিত্রিত হয় নাই। সরল বিশ্বাস ও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি তাহারও কোন অংশেই কম নহে। এমন কি স্বামীর কথায় সপত্নীকেও পর্য্যন্ত গৃহে বরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু দাসী দুর্ব্বলা যখন তাহার সপত্নীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়া দিল তখন তাহার মনে স্বার্থপরতার সংকীর্ণ বুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। উদার সংস্কার দ্বারা তাহা জ্ঞান ও বুদ্ধি মার্জ্জিত ছিল না বলিয়াই সামান্য দাসীর প্ররোচনায়ও অসহায় একটা বালিকার এমন দুঃখের কারণ হইয়া পড়িল। একবার বিদ্বেষবুদ্ধিতে আহুতি পড়িলে তাহাকে আর নির্ব্বাপিত করা যায় না, অন্ততঃ তাহা করিবার মত মানসিক শিক্ষা লহনার মত চরিত্রের ছিল না। সেইজন্য খুল্লনার প্রতি তাহার ব্যবহারের আর কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইল না।

লহনা

পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে কালকেতুর চরিত্রটির একটু বিশেষত্ব আছে। ব্যাধ-জীবনোচিত সংস্কার একদিক দিয়া যেমন তাহার প্রবল তেমনই আদর্শ সামাজিক চরিত্র হইবার উপযুক্ততারও তাহার অভাব নাই। তাহার নৈতিক জ্ঞান অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সামাজিক বিচার ন্যায্য, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস অপরিমেয় ও পত্নীর প্রতি তাহার প্রেম কর্ত্তব্যের সংযম দ্বারা শাসিত। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ এই চরিত্রটিকে রাজসিংহাসনারূঢ় ও রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া শেষকালে একেবারে হত্যা করিয়াছেন, পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।

কালকেতু

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধনপতির চরিত্রে কোন মৌলিকতা নাই, পদ্মাপুরাণের চাঁদ সদাগরের চরিত্রের অনুরূপ তাহার পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

ধনপতি

যে একটি চরিত্রচিত্রণে চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ একটু সামাজিক বুদ্ধি-বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা এই ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র। ভাঁড়ু দত্ত

দরিদ্র। শাস্ত্রে বলে 'দারিদ্র্য-দোষো গুণরাশী নাশী'। ভাঁড়ু দত্তের হইয়াছিল তাহাই। উপস্থিত বুদ্ধির প্রখরতাই ভাঁড়ু দত্তের গুণ, কিন্তু তাহাও অত্যন্ত হীন কার্য্যে নিয়োজিত। জীবনে সে যে একটা খুব বড় রকমের স্বচ্ছলতা চায় তাহাও নহে। পরিবারের অন্ন-সংস্থানের জন্যই তাহাকে ধৃষ্টতার আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু তথাপি তাহার কিছুতেই কিছু হইয়া উঠে না। মুকুন্দরাম অপেক্ষা মাধবাচার্য্য এই চরিত্র চিত্রণে অধিকতর দক্ষতা দেখাইয়াছেন।

ভাঁড়ু দত্ত

চণ্ডীমঙ্গলের কাব্যের স্থান বর্ত্তমানে দুর্গামঙ্গলেই অধিকার করিয়া লইয়াছে। শারদীয়া দুর্গোৎসবের সময়ে অনেক গৃহেই প্রাচীন প্রথার রক্ষাকল্পে পূর্ব্বে চণ্ডীমঙ্গলের গান হইত। কিন্তু তাহার সহিত পৌরাণিক চণ্ডীর পরিকল্পনার সুদূর পার্থক্য হেতু তাহা অচিরে পৌরাণিক চণ্ডীরই বঙ্গানুবাদ এই দুর্গাপুরাণ দ্বারা স্থানচ্যুত হইয়াছে। যে দেবীকে প্রতিমাময়ীরূপে সম্মুখে দেখিতেছে তাহারই মহিমা দুর্গামঙ্গল কাব্যে শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া ব্যাধ ও সদাগরের কাহিনীতে কাহারও মন তুষ্টিলাভ করিতে পারে না। এখন ক্ষুদ্র পাঁচালীর আকারেই মঙ্গলচণ্ডীর কাহিনী বর্ত্তমান থাকিয়া স্ত্রীসমাজ কর্ত্তৃকই পঠিত হইতেছে। তবে পশ্চিম বঙ্গের স্থানে স্থানে এখনও চণ্ডীমঙ্গলের গান শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব বঙ্গে তাহা দুর্গাপুরাণের প্রভাবে একেবারেই লোপ পাইয়া গিয়াছে। দুর্গাপুরাণ রচয়িতারা অধিকাংশই পূর্ব্ব বঙ্গের অধিবাসী।

কাব্যের পরিণতি

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্ম্মপূজার ইতিহাস—ধর্ম্মমঙ্গল

আর্য্যগণ যে উন্নত দেব-পরিকল্পনা লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের এতদ্দেশীয় দ্রাবিড় ও প্রাক্-দ্রাবিড় জাতির সহিত সংমিশ্রণের ফলে কালক্রমে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। পূর্ব্ব-ভারত অঞ্চলে আর্য্যের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বিস্তৃতি লাভ করিবার পূর্ব্বেই ইহাদের প্রতিক্রিয়াশীল দুই নূতন ধর্ম্মমতের উত্থান হয়; তাহা বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম। এই উভয় ধর্ম্মমতের ব্যাপক প্রচারের ফলে এই পূর্ব্ব-ভারতে আর্য্য সংস্কার নিজস্ব দৃঢ় ভিত্তির উপর আর কোনদিনই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। এতদ্দেশে ব্যাপক-ভাবে এই বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বেও প্রাক্-আর্য্য সমাজের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোক-স্থিতি ও ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বিভিন্ন লৌকিক দেবতার অস্তিত্ব ছিল। তাহাদিগকে গ্রাম-দেবতা বলিত।[১] বৌদ্ধ ও তৎপরবর্ত্তী আর্য্যধর্ম্মের প্রভাব এই সমস্ত গ্রামদেবতার উপর বিস্তৃত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই চলিয়াছিল। এই সমস্ত দেবতার নিকট নিঃসন্তানা জননীরা সন্তানের কামনা জানাইত, অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য গ্রামের লোক সমবেত হইয়া পূজা করিত, কেহ নিজের বা আত্মীয় স্বজনের রোগ-মুক্তির প্রার্থনা

পূর্ব্ব ভারতের সংস্কৃতি

গ্রাম-দেবতা

---

১ "The worship of the village gods is the most ancient form of Indian religion. Before the Aryan invasion, the old inhabitants of India...........believed the world to be peopled by a multitude of spirits, good and bad, who were the cause of all unusual events, and especially of diseases and disasters." The Village gods of South India, Int. pg. 11, (H. Whitehead)

জানাইত, শত্রুর বিনাশ কামনা করিত ; এক কথায় ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনের যে কোন উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই তাঁহাদের শরণাপন্ন হইত। গ্রামের প্রান্তে, মাঠের মধ্যে, নদী-তীরে কিম্বা কোন নির্জ্জন বৃক্ষমূলে অপরিণত-গঠন (crude) শিলাখণ্ড বা কোথাও বৃক্ষরূপে তাঁহারা অবস্থান করিতেন। যে গ্রামে যিনি অধিষ্ঠিত থাকিতেন, সেই গ্রামের তিনিই একমাত্র সুখদুঃখ-বিধাতা বলিয়া কল্পিত হইতেন। অনেক সময় বিশিষ্ট কোন জনপদ হইতে তাঁহার প্রভাব গ্রামান্তরেও বিস্তৃত হইয়া পড়িত, কিন্তু তাহার বিশিষ্ট ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রভাব কোনদিনই অন্যত্র বিস্তৃত হইতে পারিত না। কোন সাময়িক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া এই সমস্ত গ্রাম-দেবতার উদ্ভব হইয়া থাকে। আবার কালক্রমে অনেকে লোকচক্ষুর অন্তরালেও চলিয়া যায়, আবার নূতন দেবতার উদ্ভব হয়।

গ্রামদেবতার প্রভাব

এই সমস্ত গ্রামদেবতার কেহ কেহ পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবকে আশ্রয় করিয়া সমাজে প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া লইয়াছেন ; বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম হইতে নবকলেবর লাভ করিয়া নিজের প্রকৃত স্বরূপটি প্রচ্ছন্ন করিয়া দিয়া রক্ষণশীল সমাজের বুকে নিজের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এমনই একটি দেবতার সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করিব। তাঁহার মৌলিক নাম কি তাহা জানা যায় না, কিন্তু তাঁহার বৌদ্ধ বা হিন্দু-ধর্ম্মাগত নাম ধর্ম্ম বা ধর্ম্মরাজ। রাঢ়ভূমিতেই এই পূজার উদ্ভব হইয়াছিল, সেইখানেই তাঁহার বিস্তৃতি ও প্রভাব সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, বঙ্গের অন্যত্র প্রসার লাভ করিতে পারে নাই।

উদ্ভব

গ্রাম-দেবতা ধর্ম্ম

প্রাচীনকালে ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হইতে আরম্ভ করিয়া অজয়-দামোদর প্রবাহিত ছোট নাগপুরের অরণ্যভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগ রাঢ়

নামে কথিত হইত। ইহার দক্ষিণে সুহ্ম দেশ ও উত্তরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অবস্থিত ছিল। এই বিস্তৃত অঞ্চল বীরভূম, মানভূম, সেনভূম, গোপভূম, শূরভূম, মল্লভূম, ধবলভূম, তুঙ্গভূম প্রভৃতি বিভিন্ন পরগণায় বর্ত্তমানে বিভক্ত হইয়াছে। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বহুকাল পর্য্যন্ত এই অনুর্ব্বর প্রস্তর-ভূমিতে আর্য্য সভ্যতা বিস্তৃত হইতে পারে নাই। ক্রমে পূর্ব্বভাগে ভাগীরথী-তীরে আর্য্যসভ্যতা স্থাপিত হইলেও ইহার আভ্যন্তরিক প্রদেশ নিরবচ্ছিন্ন অনার্য্য সংস্কারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্ত্তী কালে এই রাঢ়ভূমি জৈনধর্ম্মের এক প্রকার কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতক পর্য্যন্ত জৈনধর্ম্মের যে প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, সেই সময়ে রাঢ়ভূমি অসভ্য জাতি কর্ত্তৃকই অধ্যুষিত ছিল; জৈনধর্ম্মের কোন প্রভাবই তথায় বিস্তৃত হইতে পারে নাই। আচারাঙ্গসূত্র নামক জৈনসাহিত্যের একখানি প্রাচীন এবং প্রামাণ্য গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে যে, মহাবীর কেবল-জ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, এই ভ্রমণ-ব্যাপদেশে তিনি রাঢ়দেশে আসিয়া উপনীত হন। তখন এই রাঢ়দেশের অধিবাসীরা অত্যন্ত অসভ্য ছিল, তাহারা তাঁহার গায়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল ও নানাভাবে অপমান করিয়াছিল। "মহাবীরের সময় বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল ছিল অসভ্য, সুতরাং সে প্রদেশে সে সময়ে জৈনধর্ম্ম প্রসারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। বস্তুতঃ জৈন সাহিত্যে যে সমস্ত প্রাচীন গণ, শাখা ও কুলের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার কোনটির সঙ্গেই এ অঞ্চলের কোন স্থানীয় নামের সম্বন্ধ দেখা যায় না।"[১]

রাঢ়ভূমি

---

১ 'বঙ্গদেশে জৈনধর্ম্মের প্রারম্ভ' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা) ৪৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃঃ ২

যদিও আনুমানিক খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বঙ্গের প্রাচীনতম শিলালিপি এই রাঢ়দেশের অন্তর্গত বাঁকুড়া জেলার সুসুনিয়া পর্ব্বতগাত্রে খোদিত পাওয়া গিয়াছে তথাপি ইহা হইতেই সেই অঞ্চলে আর্য্য-সভ্যতা বিস্তারের কোন প্রমাণ হয় নাই। এই শিলালেখে উল্লিখিত রাজা চন্দ্রবর্ম্মা রাজপুতানা অঞ্চলের রাজা ছিলেন এবং দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া এই সুদূর প্রদেশের অরণ্যভূমি পর্য্যন্ত আসিয়া এই শিলালিপি খোদিত করাইয়া গিয়াছেন বলিয়া সকলেই অনুমান করেন।[১]

রাঢ়ের প্রাচীন সংস্কার

বৌদ্ধ পালরাজগণও রাঢ়ভূমিতে তাঁহাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই।[২] রাঢ়ভূমি হইতে তাঁহাদের একখানিও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই। খৃষ্টীয় দশম শতকের পর পালরাজত্বের যখন প্রায় অবসান হইয়া আসিতেছিল তখন সেন রাজগণ এই রাঢ়ভূমিতেই সর্ব্বপ্রথম বসতি-স্থাপন করিয়া বাংলায় স্বাধীন হিন্দুরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। মনে হয়, সেনরাজগণের পূর্ব্ব হইতেই অর্থাৎ পালরাজদিগের কাল হইতেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ক্রমে ক্রমে রাঢ়ভূমিতে বিস্তৃত হইতে থাকে। কিন্তু সেনরাজগণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই রাঢ়ভূমির আভ্যন্তরিক ভাগ কোন একচ্ছত্র বিরাট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে না পারায় ভারতের সাধারণ সংস্কার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া ইহার আভ্যন্তরিক লৌকিক সংস্কার-গুলিরই চর্চ্চা করিয়া আসিতেছিল। এই ভাবে এই লৌকিক ধর্ম্মমতগুলি যখন দেশের মধ্যে দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছিল তখন

পালরাজত্বে রাঢ়

সেন রাজত্বে

১ বাংলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) পৃঃ ৩৯। অবশ্য এই চন্দ্রবর্ম্মাকে কেহ কেহ বাঙ্গালী রাজা বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন।

২ Early History of Bengal, (P. L. Paul.) Vol. I Pg. 85.

তাহা বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের সম্মুখীন হইয়া ইহাদের মধ্যে নিজেদেরও সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া লইতে লাগিল। লৌকিক সংস্কারগুলি যদি দৃঢ়মূল হইয়া না যাইত তাহা হইলে তাহা সহজেই পরিত্যক্ত হইতে পারিত। কিন্তু রাঢ়ভূমির অভ্যন্তর-প্রদেশে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব বহু বিলম্বে বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া লৌকিক সংস্কারের সমস্যা সেই দেশে এক চিরন্তন সমস্যা হইয়া রহিয়াছে। আভ্যন্তরিক রাঢ়ভূমির এমনই একটি লৌকিক সংস্কারের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। অবশ্য ইহার বর্ত্তমান পরিচয়ের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু উপাদান এত অধিক যে তাহার মৌলিক রূপটি সন্ধান করিয়া লওয়া একপ্রকার দুষ্কর। তথাপি সতর্ক পাঠকের নিকট তাহা অসাধ্য নহে।

ধর্ম্ম ঠাকুর

রাঢ়দেশের কেন্দ্রস্থলে বিশেষতঃ মল্লভূম পরগণা ও তাহার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে অস্পৃশ্য হিন্দুসমাজে ধর্ম্মঠাকুর নামে এক দেবতার পূজা হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মঠাকুরের কোন বিগ্রহ নাই। সাধারণ একখণ্ড পাথরকেই এই ধর্ম্মঠাকুরের বিগ্রহ বলিয়া মনে করা হয়। এই প্রস্তর খণ্ডের গাত্রে কোন কোন সময় পিত্তল বা রৌপ্য শলাকা বিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহার অগ্রভাগগুলিকে ধর্ম্মঠাকুরের চক্ষু বলিয়া কল্পনা করা হয়।[১] এই শিলাখণ্ডটি সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কালে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল যে, ইহার আকৃতি কূর্ম্মের মত হইবে। কিন্তু তথাপি এখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত ধর্ম্মশিলা পাওয়া যায় তাহাদের অধিকাংশের আকৃতিই কূর্ম্মের মত নহে। কোন কোন সময় এই বিগ্রহ

---

১ দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি গ্রাম দেবতার বিগ্রহ গাত্রে এই প্রকার শলাকা বিদ্ধ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। The village gods of South India, Plate XVIII, Pg. 89. (H. Whitehead) দ্রষ্টব্য।

প্রকাশ্য ভাবে থাকে না; কোন আবরণের অন্তরালে অবস্থান করে, তাহার মূর্ত্তির কেহ পরিচয় পাইতে পারে না। এই শিলা-বিগ্রহেব পার্শ্বে আরও দুই একটি শিলাখণ্ড থাকে, তাহাদিগকে বলা হয় কামিন্যা বা সেবাদাসীর মূর্ত্তি।

'সাধারণতঃ এই দেবতাগণ বৃক্ষমূলেই অবস্থিতি করেন। সাধাবণ গ্রামবাসী বৃক্ষমূলেই তাঁহার পূজা করেন। কোন ধর্ম্মঠাকুর উন্মুক্ত মাঠের মধ্যেও অবস্থান করেন। কোন কোন ধনবান্ ভক্ত তাঁহাদেব নিমিত্ত দেউল নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। বর্ত্তমানে তদ্দেশে কোন কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দুর গৃহেও শালগ্রাম শিলার মত এই ধর্ম্মশিলাও নিত্য পূজা লাভ করিয়া আসিতেছেন।

এই ধর্ম্মঠাকুরের এক এক জায়গায় এক এক নাম। যেমন, কালুরায়, বুড়ারায়, কৌতুক রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, বাঁকুড়া রায় ইত্যাদি। ধর্ম্মমঙ্গলের একজন কবি তাঁহার পরিচিত বিভিন্ন স্থানের ধর্ম্মঠাকুরদিগের এই প্রকার নামোল্লেখ করিয়া বন্দনা করিয়াছেন,—

"প্রথমে বন্দিব জয় জয় পরাৎপর।
স্থানে স্থানে মূর্ত্তিভেদ মহিমা বিস্তার॥
বেলডিহার বাঁকুড়া রায়ে বন্দি এক মনে।
অসংখ্য প্রণতি শীতলসিংহের চরণে॥
ফুল্লরের ফতে সিং বৈতলের বাঁকুড়া রায়।
শুদ্ধ ভাবে বন্দি দোঁহে নত হয়ে কায়॥
পাণ্ডুগ্রামের বুড়া ধর্ম্মে বন্দিয়া সাদরে।
শ্যামবাজারের দলু রায়ে দিয়ে জয় জয়কারে॥
দেপুরে জগৎরায়ে জোড় করি কর।
গোপালপুরের কাঁকড়া বিছায় বন্দি তারপর॥

সিয়াসের কালাচাঁদে ক্রিদাসের বাঁকুড়া রায়।
বন্দিব বিস্তর নতি করে নত কায়॥
গোপুরের স্বরূপনারাণ স্বর্ণ সিংহাসনে।
বন্দিয়া বন্দিব মঙ্গলপুরের রূপ নারাণে॥
পশ্চিম পাড়ার যাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়া তাহায়।
বড়ুজা গ্রামেব বন্দিব মোহন রায়॥
গুছুড়া গ্রামের বন্দি শীতল নারাণে।
আলগুড়চিন্নার খুদি বায়ে বন্দি সাবধানে॥
আকুটিকুল্লার মাল্লার ধর্ম্মের করিয়া স্তবন।
বন্দিপুরের শ্যামরায়ের বন্দিয়া চরণ॥
জাড়াগ্রামে কালুরায়ে কামিন্যা সহিত।
জাজপুরে দেহারা বন্দি দার্ঢ্য করি চিত॥"

—মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল

এই ধর্ম্মঠাকুরের নিকট নিঃসন্তান গ্রামবাসীরা সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানায়। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতেও উক্ত হইয়াছে যে, নিঃসন্তানা রাণী রঞ্জাবতী পুত্র-কামনায় এই ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করিয়াছিলেন। "অনেক স্থানে লোকের বিশ্বাস আছে, অনাবৃষ্টি কালে ধর্ম্মের পূজা দিলে সুবৃষ্টি হয়। মালিয়ারা (পশ্চিম বর্দ্ধমান) হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে নিত্যানন্দপুরে এক খর্জ্জুর বৃক্ষমূলে 'ডেমুর‍্যা' ধর্ম্মরাজ আছেন। অনাবৃষ্টি হইলে ব্রাহ্মণ গিয়া পূজা করেন।'[১] কঠিন রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য, মৃত-বৎসার সন্তান নাশ রোধ ও শিশুমৃত্যু রোধ করিবার জন্য লোকে এই ধর্ম্মঠাকুরের নিকট পূজা মানসিক করে। অভীষ্ট পূর্ণ হইলে কৃষ্ণছাগ বলি দিয়া

ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য

১ 'শূণ্যপুরাণ' (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়) সা-প-পত্রিকা. ১৩৩৮ সাল, পৃঃ ৬৮

তাঁহার পূজা হয়। তাহা ছাড়া হাঁস মুরগী ও শূকর তাঁহার নিকট বলি দেওয়া হয়।[১] যে ছেলের শৈশবে অগ্রজের মৃত্যু হয় তাহার এক পায়ে ধর্ম্মের ডাঁড়ুকা নামে একটি লোহার বেড়ী পরাইয়া দেওয়া হয়, এই ছেলেকে ডাঁড়্কো ছেলে বলে; সাধারণের বিশ্বাস, যম এই ডাঁড়্কো ছেলেকে ছুঁইতে পারে না।

কোন কোন ধর্ম্মশিলার নিকট দুই একটি মাটির ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে মনে করে, ধর্ম্মঠাকুরেরা সাদা ঘোড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান। ভক্তেরা তাঁহার নিকট মাটির ঘোড়া দিয়া আশা করেন, ধর্ম্মঠাকুর ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুত গতিতে তাঁহার আহ্বানে আসিয়া সাড়া দিবেন। "কেহ কেহ মনে করেন, ঘোড়া দিলে শিশুপুত্র খট্‌খট্ করিয়া চলিয়া বেড়াইবে।" ইদানীং এই বিশ্বাস লোপ পাইতেছে।

যাঁহারা ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন,—অস্পৃশ্যজাতি-ভুক্ত ডোম। দাক্ষিণাত্যেরও কোন গ্রামদেবতার পূজারীই ব্রাহ্মণ নহেন। ধর্ম্মঠাকুরের পূজারীদিগের উপাধি, পণ্ডিত; বাঁকুড়া ও মানভূমের উচ্চারণে

ধর্ম্মঠাকুরের পূজারী

পড়িত। নিজের নামের পরে ধর্ম্মপূজারীরা এই পণ্ডিত উপাধি যোগ করিয়া থাকেন। যেমন, রমাই পণ্ডিত, গোঁসাই পণ্ডিত ইত্যাদি। ব্রাহ্মণগণ যেমন উপবীত ধারণ করেন এই ধর্ম্ম পূজারীরা তৎপরিবর্ত্তে তাম্র ধারণ করেন। তাম্র ধারণ অর্থে, বাহুতে তামার তাগা ও হাতে তামার আংটি ধারণ করা। এই তাম্র-ধারণ না করিলে কেহই ধর্ম্মের পুরোহিত হইতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবকাল হইতে এই ধর্ম্মোপাসকেরা নিজেদেরে সদ্ধর্ম্মী বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মপণ্ডিতেরা লোকের অসুখে বিসুখে বিশেষতঃ কুষ্ঠ ও নানাবিধ চর্ম্মরোগে

১ "The village deities are almost universally worshipped with animal sacrifices."—The Village gods of South India pg. 18 (H. Whitehead)

ধর্ম্মঠাকুরের নামে নানা টোট্‌কা ঔষধ দিয়া থাকে। ইহা হইতেই তাঁহাদের উপর সাধারণ লোকের শ্রদ্ধার আকর্ষণ হয়।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দুমাত্রেই ধর্ম্মের পূজারী বা পণ্ডিত হইয়া থাকে। ডোম, পোদ, হাঁড়ী বাগ্‌দী, চণ্ডাল, কেয়ট, তাঁতি, যুগী, নাপিত (জল অনাচরণীয়) ইত্যাদি সকলেই ধর্ম্মের পূজারী হইতে পারে। কিন্তু ডোম জাতির পূজারীর সংখ্যাই অধিক। বিশেষ স্থানের কোনও ধর্ম্মঠাকুর প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলে তাঁহার পূজারী পণ্ডিতও বংশপরম্পরায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া যায়। এই প্রকারে নানা জায়গায় নানা পণ্ডিতের বংশ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের কেহ ডোমপণ্ডিত, চাঁড়ালপণ্ডিত, জেল্যাপণ্ডিত ইত্যাদি নামে পরিচিত। সাধারণের বিশ্বাস, ধর্ম্মঠাকুরকে নিন্দা করিলে শ্বেতকুষ্ঠ ও মহারোগ হয়। রাঢ় অঞ্চলে এই রোগের আধিক্য হইতেই সাধারণের মধ্যে এই দেবতার প্রভাব খুব বেশী। সেইজন্য তাঁহার নিন্দা করা দূরে থাকুক অনেক সময় ভয় বশতঃ অনেক অশিক্ষিত ব্রাহ্মণও তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হন। ব্রাহ্মণ পূজারীর তাম্র দীক্ষার প্রয়োজন হয় না।

ধর্ম্মঠাকুরের পূজা সাধারণতঃ দুইভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে তাঁহার নিত্য পূজা হয়, নিত্য-পূজার দেবতারা কুল-দেবতা স্থানীয়। তাঁহার পূজায় কোন ঘটা হয় না, কিন্তু বিশেষ কোন দিনে মানসিক শোধ করিবার জন্য যে নৈমিত্তিক পূজার অনুষ্ঠান হয় তাহাতেই বিশেষ ঘটা হইয়া থাকে। মানসিক শোধের নিমিত্ত আড়ম্বরপূর্ণ যে পূজা হয়, তাহাকে বলে 'গৃহভরণ'।[১] ইহাতে আশে পাশের গ্রাম হইতে মোট বারটি ধর্ম্মশিলা আনিয়া একত্র করা হয়, তারপর একসঙ্গে তাঁহাদের পূজা হয়। এই গৃহভরণ

ধর্ম্মপূজা

[১] গৃহে ভরণ আনয়ন, ইহা হইতে গৃহভরণ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এই গৃহভরণ উৎসবকে 'ঘরভরা'ও বলে।

অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ অনুষ্ঠান। বহু লোকজনের সমবেত চেষ্টায় ইহা সফল হইতে পারে। বর্ত্তমানে ইহা একপ্রকার লোপ পাইতে বসিয়াছে। অক্ষয় তৃতীয়া (বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া) দিন ঘট স্থাপন করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বার দিনে এই পূজা শেষ হয়, এই অনুষ্ঠান-শেষে অনেকটা শিবের গাজনের অনুরূপ ধর্ম্মের গাজন হয়।

ধর্ম্মের গাজনের সন্ন্যাসীদিগকে ভক্ত্যা বলে। গাজনে সন্ন্যাসীদের মধ্যে যিনি প্রধান বা মূল সন্ন্যাসী তিনি 'শালে ভর' দেন, অর্থাৎ লৌহ শলাকার উপব শয়ন করেন, তাঁহার নাম 'পাটভক্ত্যা'।

গাজন

কোন সন্ন্যাসী 'শালে' অর্থাৎ এই লৌহ শলাকার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, অনেকে আগুনের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়, বা আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তাঁহারা অগ্নি-সন্ন্যাসী। 'বাণফোড়া' গাজনের একটি বিশেষ অঙ্গ। লৌহ-শলাকাদ্বারা দেহের নব অঙ্গ ও মোটা লোহার শিক দিয়া জিহ্বা ফুঁড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাকে বলে, 'জিহ্বা বাণ'। শিবের গাজনে যে 'পাকামন্নুই' বা 'ঘৃত-দুগ্ধ-খণ্ড-আতপ-তণ্ডুল ও নারিকেল কোরা যোগে পরমান্ন' রান্না করিয়া প্রসাদরূপে বিতরণ করা হয় ধর্ম্মের গাজনে তাহা হয় না। কারণ, ধর্ম্মের গাজনে 'পাকা মন্নুই' পাক করিবার জন্য কোন পাচক-ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণেতব জাতির গৃহে সাধারণতঃ এই ধর্ম্মপূজার অনুষ্ঠান হয় বলিয়া তাহাদের গৃহে পাকান্ন-প্রসাদ কেহ গ্রহণও করেনা। তবে লোকালয় হইতে দূরে মাঠের মধ্যে যদি ইহার অনুষ্ঠান হয় তবে কোন কোন সময় আজকাল ব্রাহ্মণ পাচকও পাওয়া যায়।

এই ধর্ম্মের গাজনে বার জন পুরুষ ভক্ত্যা ও চারিজন নারী ভক্ত্যার প্রয়োজন হয়। নারীভক্ত্যাদিগকে 'বালাভক্ত্যা' বা 'আমিনী' বলে। ধর্ম্মের গাজনে ছাগ বলি একটি বিচিত্র অনুষ্ঠান। ধর্ম্মের গাজনে যে

ছাগ বলি হয় তাহা গাজনের দুই তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্মের নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গাজনের সময় এক সঙ্গে এত অর্থের সঙ্কুলান হইয়া উঠিবে না বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার আয়োজন চলিতে থাকে। ছাগের সম্মুখের এক পায়ে খুরের উপর লোহার বোড়া বা ডাঁড়ুকা পরাইয়া দেওয়া হয়। তাহা দেখিয়াই ইহাকে চিনিতে পারা যায়। "লোহা থাকে বলিয়া সে ছাগের নাম লুয়া"।[১] এই ছাগ ক্রমে বড় হইয়া উঠে, গাজনের সময় লুয়া-বধ হয়। হাড়িকাঠে লুয়া বলি হয় না; বিগ্রহের নিকটে লুয়া ফুল বেলপাতা খাইতে থাকে, কর্ম্মকার জাতীয় বলিকর এক কোপে মুণ্ড ছেদ করে। এক হাঁড়ীতে তৎক্ষণাৎ সেই মুণ্ড তুলিয়া লওয়া হয়। কোন অপুত্রক নারী পুত্র-কামনায় এই হাঁড়ী কোলে লইয়া বসে, সারারাত্র জাগিয়া মধ্যে মধ্যে হাঁড়ির মুখের ছোট ছোট ছিদ্র দিয়া লুয়া-মুণ্ডকে দুধ খাওয়াইতে হয়। "সেই নারীর পুত্র হইলে তাহার নাম 'লুইধর' কিম্বা 'লাউসেন' রাখা হয়। এই নাম হইতে মনে হয়, 'লাউসেন' নাম বাস্তবিক লোহসেন। লোহ শব্দ হইতে লৌ। পূর্ব্বকালের উচ্চারণে 'লউ' না হইয়া 'লাউ' হইত। এইরূপে লোহসেন, লাউসেন হইয়াছে। প্রায়ই আর এক ছাগ বলি দেওয়া হয়। এই ছাগ 'কোল-লুয়া'। বোধ হয়, ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থের লাউসেনের ভাই কর্পূর, এই কোল-লুয়ার স্থানীয়, একেবারে কৃত্রিম।"[২]

---

১ মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই 'লুয়া'র সহিত আদি সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের নামের সামঞ্জস্য হেতু উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন, "রাঢ়দেশে যাহারা ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, তাহারা এখনও তাহার (লুইপাদের) নামে পাঁঠা ছাড়িয়া দেয়।" কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। আদি সিদ্ধাচার্য্যের সঙ্গে ধর্ম্মপূজার লুই'র কোন সম্পর্ক নাই।

২ 'শূন্যপুরাণ'—সা-প-পত্রিকা, ১৩৩৮ সাল, পৃঃ ৭১।

তারপর বিসর্জ্জনের পালা। লুয়ার রক্তে ঘৃতমিশ্রিত করিয়া পূর্ণহোম করা হইলে অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মীরা মুক্তি দর্শন করে। তারপর মুক্তি-বিসর্জ্জনের নানা লৌকিক ছড়া পড়িয়া হাঁস বা পায়রা দ্বারা মুক্তিমণ্ডপ ভগ্ন করাইয়া পূজার ঘট ইত্যাদি বিসর্জ্জন করা হয়। তারপর ধর্ম্মঠাকুর-দিগকে নিজেদের স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

গঙ্গার পূর্ব্বতীরে ধর্ম্মপূজা

গঙ্গার সংলগ্ন পূর্ব্বতীরেও কোন কোন যায়গায় এই ধর্ম্মঠাকুরের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহার আচার-অনুষ্ঠান ধর্ম্মপূজার কেন্দ্রস্থল পশ্চিম রাঢ়ভূমি হইতে যে বিশেষ স্বতন্ত্র তাহা নহে। মুর্শিদাবাদ জিলার কান্দি মহকুমায় প্রচলিত ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ এই সম্পর্কে উল্লেখ করিতে পারি,—"কান্দি মহকুমার গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মপূজা প্রচলিত। বৈশাখী পূর্ণিমায় ক্বচিৎ বা জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমায় ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হয়। ধর্ম্মের মন্দির কোথায়ও মাটির কুটির, কোথায়ও বা তাহার অভাব ;—অশ্বত্থাদি বৃক্ষের নীচে মন্দিরের স্থান। গ্রামের লোকে চাঁদা তুলিয়া বৎসরান্তে পূজা দেয়—গ্রামের লোকেই উদ্যোগকারী—জমিদারের নামে পূজার সংকল্প হয় (ইহা পরবর্ত্তী কালে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবের পরিচায়ক—গ্রন্থকার)। জমিদার কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি বা অর্থ দিয়া পূজার সাহায্য করেন। প্রকৃতপক্ষেই ধর্ম্ম গ্রাম-দেবতা ; গ্রামের যাবতীয় লোকে সেই পূজা নির্ব্বাহের জন্য দায়ী। ধর্ম্মের মন্দির অনেক স্থানে জমিদারের খাজনা আদায়কারী কাছারীতে, কোথায়ও বা গ্রামের টাউন হলে পরিণত।[১]

"পূর্ণিমার গাজনে নিম্নশ্রেণীর লোকই ব্রত গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হয়। ঢাকের বাদ্য ও কিঞ্চিৎ তণ্ডুলাদি পূজার প্রধান উপকরণ। কোথায়ও হোমের ও বলিদানের ঘটা আছে।

১ এইস্থানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই অঞ্চলে আজ পর্য্যন্ত কাহারও গৃহে ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা হয় না। ইহা গ্রাম-দেবতার একটি বিশেষ লক্ষণ।

"পূর্ণিমার পূর্ব্বরাত্রি 'জাগরণ'; তৎপূর্ব্বরাত্রি চোরা জাগরণ, জাগরণের দিন 'বাণ গোঁসাই' গ্রাম্য বালকের মাথায় চাপিয়া ঢাকের সহিত ভিক্ষায় বাহির হন। বাণ গোঁসাই দীর্ঘাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড—কাষ্ঠের এক প্রান্তে মানুষের মুখের অবয়ব খোদাই করা থাকে। গৃহস্থ স্ত্রীরা বাণ গোঁসাইকে তেল সিন্দুর মাখাইয়া চাউল ভিক্ষা দেন। ভিক্ষার সংগৃহীত তণ্ডুলে ধর্ম্মরাজের পূজা হয়। জাগরণের রাত্রি মণ্ডপে জনকোলাহল ও ঢাকের বাজনা। মাঝে মাঝে 'বোলান' গীত। শেষ রাত্রিতে মুখোস্ খেলা, বিকট মুখোস্ পরিয়া ভক্তেরা নৃত্য করে।[২] রাত্রিশেষে 'মড়াখেলা'—রুদ্রদেবের মড়াখেলার অনুরূপ। তাহার একটি ছড়া এইরূপ,

"সোনার আঁচির সোনার পাঁচির সোনার সিংহাসন।
তার উপর ব'সে আছেন ধর্ম্ম নিরঞ্জন ॥'

"মধ্যাহ্নে 'ভাঁড়ার আনা'—ভক্তেরা দূরে কোন জলাশয় হইতে কলসী ভরিয়া জল তোলে ও মাথায় লইয়া ঢাকের বাজনার সহিত নাচিতে নাচিতে মন্দিরে উপস্থিত হয়। নাচিবার সময় মূর্চ্ছার অভিনয়—দেবতা মূর্চ্ছাগ্রস্তে 'ভর' দেন ও তাহার মুখ হইতে নানা গুপ্ত কথা, নানা ব্যাধির চিকিৎসা প্রণালী বলিয়া ফেলেন। বৈশাখের মধ্যাহ্নে রৌদ্রে নাচ—তাহাতে সর্ব্বত্র মূর্চ্ছাভিনয় না হইতেও পারে। তৎপরে পূজা হোম ও বলিদান। সন্ধ্যার সময় 'দাতুর ঘাটা'; ধর্ম্মঠাকুর - এক বা একাধিক সিন্দূরমণ্ডিত শিলাখণ্ড, পূজারীর মাথায় চাপিয়া স্নান করিতে যান ও স্নানান্তে মণ্ডপে মিছিল সহ ফিরিয়া আসেন। মিছিলের প্রধান অঙ্গ বাণফোঁড়া। একদল লোক পেটের দুই পার্শ্বে লোহার কাঁটা বিন্ধাইয়া কাঁটার দুই অগ্রভাগ

২ এই মুখোস্ নৃত্য বহু প্রাচীন একটি ধর্ম্ম সংস্কার, আদিম অষ্ট্রো-এসিয়াটিক জাতির মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিল, এখনও আদিম অষ্ট্রিক জাতির মধ্যে ইহা প্রচলিত আছে। ইহাদের সহিত বাংলার একটা কিছু সম্পর্ক আছে বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, ইহা এখনও অনুসন্ধানের বিষয়।

একত্র করিয়া তাহাতে নেকড়া জড়ায়; নেকড়ায় তেল দিয়া আগুন জ্বালে ও আগুনের উপর ধুনা ছিটাইলে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ইহাই বাণফোঁড়া। ইহার সহিত 'শঙ্' থাকে ও বাদ্যভাণ্ডের অনুষ্ঠান থাকে।"[১]

মালদহ জিলার কোঁচ, পলীহা, নাগর, ধানুক, চাঁই প্রভৃতি অনার্য্য জাতির মধ্যেও ইহার অনুরূপ ধর্ম্মের গাজন প্রচলিত আছে।[২] বহু প্রাচীনকাল হইতেই মালদহের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এই লৌকিক অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল।

মালদহে ধর্ম্মপূজা

অতঃপর পৌণ্ড্র বর্দ্ধনে মহাযান বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তৃত হইলে পর এই লৌকিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে কতকগুলি বৌদ্ধতান্ত্রিক আচারও আসিয়া মিশ্রিত হয়, তারপর এই বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংসস্তূপের উপর যখন শৈবধর্ম্মের ধ্বজা স্থাপিত হইল তখন এতদ্দেশের প্রাচীন লৌকিক আচারগুলি বৌদ্ধপ্রভাব বহন করিয়া আসিয়া পুনরায় শৈবপ্রভাব চিহ্নিত হইয়া গেল, এইভাবে কালক্রমে গাজনের উক্ত লৌকিক অনুষ্ঠান ক্রমে ধর্ম্মের গাজন ও পরে শিবের গাজন নামে পরিচিত হইল এবং ইহা লৌকিক, বৌদ্ধ ও শৈব এই তিন সংস্কারের এক অভিনব সঙ্কররূপ পরিগ্রহ করিল।

পৌণ্ড্র বর্দ্ধন হইতেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম সম্ভবতঃ রাঢ়ভূমিতে প্রসার লাভ করে। পালরাজগণের সময়ই রাঢ়ভূমির এই বৌদ্ধ-দীক্ষার সূত্রপাত হয়। ইহার পূর্ব্বেই এতদ্দেশের লৌকিক সংস্কারগুলি সমাজে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হায়েন বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি রাঢ়ভুমির কোন উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু রাঢ়ভূমির দক্ষিণস্থ সুহ্ম প্রদেশের রাজধানী তাম্রলিপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞান বিজ্ঞানে সেই

ফা-হায়েনের কালে রাঢ়

১ 'গ্রাম-দেবতা', সা-প-পত্রিকা, ১৩১৪ সাল, পৃঃ ৪২—৪৪।

২ আদ্যের গম্ভীরা—হরিদাস পালিত।

দেশ তখন বিশেষ উন্নত ছিল। রাঢ়ভূমির সঙ্গে সুহ্মদেশের আচার ও সংস্কার-গত কোন ঐক্য প্রাচীনকালেও যেমন ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই। মল্লভূমের দক্ষিণে অর্থাৎ এই সুহ্মদেশে ধর্ম্মপূজা আজিও অজ্ঞাত, সেখানে কোন ধর্ম্মের দেউল কিম্বা ধর্ম্মশিলা আবিষ্কৃত হয় নাই। অতএব, তদানীন্তন সুহ্মদেশের উন্নত অবস্থার সহিত আভ্যন্তরিক রাঢ়ভূমির কোনই সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। এমন কি, ফা-হায়েনেব পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ চীনদেশীয় পরিব্রাজক য়ুয়ান্-চুয়াঙ্ (সপ্তম খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত এই রাঢ়ভূমির আভ্যন্তর-ভাগ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করিয়া যান নাই। তিনি অঙ্গদেশ

য়ুয়ান্-চুয়াঙের সময় রাঢ়

হইতে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা উত্তরবঙ্গে আসিয়া উপনীত হন। এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে তাঁহার সময় বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুধর্ম্ম বিশেষ প্রবল ছিল। য়ুয়ান্ চুয়াঙ্ অতঃপর কামরূপ, সমতট, কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ) ইত্যাদি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাম্রলিপ্তিতে বা সুহ্মদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার ভ্রমণে রাঢ় দেশের কোন উল্লেখ নাই। ইহা হইতেই মনে হয়, য়ুয়ান্ চুয়াঙের সময় পর্য্যন্ত রাঢ়ভূমি কোন বিষয়েই বিদেশী পরিব্রাজকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাহারা তখনও তাহাদের আদিম সংস্কারেই সমাচ্ছন্ন ছিল। ইহা হইতেই মনে হইতেছে যে, অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে রাঢ়ভূমিতে বিস্তৃত হয়। যদিও রাঢ়ভূমি মুখ্যতঃ পালরাজদিগের বশ্যতা

রাঢ়ে বৌদ্ধধর্ম্ম

কোন কালেই স্বীকার করে নাই তাহা হইলেও রাঢ়ভূমিতে নিজেদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পাল রাজগণ সর্ব্বদাই চেষ্টিত ছিলেন।[১] মধ্যে মধ্যে পালরাজের

১ "If there was no permanent and direct authority of the Palas over Vanga and Radha, there were occasional attempts

সৈন্য রাঢ়দেশ আক্রমণ করিত, কিন্তু প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইত। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতেও রাঢ়ের স্বাধীন রাজা ইছাই গোয়ালার নিকট একজন পালরাজের পরাজয় ও তৎপর একজন সামন্তরাজের পুত্র লাউসেনের সাহায্যে উক্ত ইছাই গোয়ালার নিধনের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গলের এই কাহিনী হইতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তদানীন্তন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত উক্ত পালরাজের সহিত রাঢ়ভূমির যোগ স্থাপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্ভবতঃ বৃহত্তর জগতের সহিত আভ্যন্তরিক রাঢ়ভূমির ইহাই সর্ব্বপ্রথম সংযোগ স্থাপনের নিদর্শন।

বৌদ্ধ পালরাজদিগের সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে বৌদ্ধধর্ম্মের নূতন প্রাণ সঞ্চার হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সেই সময়ই পাল রাজদিগের সৈন্যসামন্ত ও অন্যান্য লোকজনকর্ত্তৃক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম রাঢ়ভূমিতে নীত হয়। তাহার ফলে রাঢ়ভূমির সামাজিক জীবনে এক পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়। রাঢ়ভূমির লৌকিক দেবতারা বৌদ্ধছায়ায় আত্মগোপন করিতে থাকে। এই যুগেই রাঢ়ভূমির লৌকিক দেবতা ধর্ম্মঠাকুরের নূতন বৌদ্ধ সংস্কারে দীক্ষা লাভ হয়। রাঢ়ের অধিবাসীরাও নিজেদের ঘরের দেবতাকে এই বৌদ্ধ নামে গ্রহণ করিয়া কালের প্রভাব স্বীকার করিয়া লইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ধর্ম্ম নামটিও বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে আসিয়াছে। বুদ্ধদেবের এক নাম ধর্ম্মরাজ। অমরকোষে আছে, 'সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ'। তাহা ছাড়াও ধর্ম্ম বা ধম্ম বৌদ্ধ ত্রিশরণের অন্যতম। নেপালী বৌদ্ধেরা বুদ্ধকে ধর্ম্ম নামেই পূজা করে। কখনও কখনও বা তাঁহাকে স্ত্রীদেবতারূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে আদিধর্ম্ম, ধর্ম্মদেবী, প্রজ্ঞাপরিমিতা, আর্য্যতারা প্রভৃতি নামে সম্বোধন করে। তাহারই

to bring them under their sphere of influence"—Early History of Bengal, (P. L. Paul) Pg. 85. Vol. I.

প্রভাব বশতঃ ঝাড়ের এই লৌকিক দেবতার নামও ধর্ম্ম, ধর্ম্মরাজ বা ধর্ম্মঠাকুরে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ তাঁহার প্রাচীন প্রাগ্‌ বৌদ্ধ একটা কোন নাম ছিল, তাহা এখন আর জানিবার উপায় নাই।

ধর্ম্মঠাকুরে বৌদ্ধপ্রভাব

এই বৌদ্ধপ্রভাবের ফলেই ধর্ম্মবিগ্রহ শিলাখণ্ডটিকে কচ্ছপের আকৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা দেওয়া হইতে লাগিল।[১] ইহার কারণ, কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশের আকৃতি অনেকটা বৌদ্ধ স্তূপ বা চৈত্যের অনুরূপ। ইহার চারিপদ ও মস্তককে চৈত্যমধ্যস্থ পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি বলিয়া কল্পনা করা হয়। এইভাবে এই ধর্ম্মঠাকুর ক্রমে নিরঞ্জন, নিরাকার, ত্রিগুণাতীত, জ্ঞানময়, অনাদি প্রভৃতি বৌদ্ধনামে অভিহিত হইতে লাগিলেন।

কচ্ছপাকৃতি শিলাখণ্ডের পরিবর্ত্তে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন পূজার অনুরূপ ধর্ম্ম ঠাকুরের পাদুকা কল্পনা করিয়াও পূজা হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ পূজা-পার্ব্বণে যে সমস্ত আচার প্রতিপালিত হয় ক্রমে তাহাও এই ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজায় নিয়োজিত হইতে লাগিল। নেপালের বুদ্ধ-মন্দিরের পার্শ্বেই অন্যতম বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী হারিতী বা শীতলার মন্দির ও প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়, তাহারই অনুকরণে এইরূপে কোন কোন ধর্ম্মশিলার পার্শ্বে শীতলার মূর্ত্তিও নিয়া স্থাপিত করা হইল। অবশ্য সর্ব্বত্র এই নিয়ম অনুসৃত হইতে দেখা যায় না। নেপালে বৌদ্ধেরা পূজায় চূণ ব্যবহার করিয়া থাকে। হিন্দুর দেবপূজায় চূণ ব্যবহৃত হয় না। ধর্ম্মঠাকুরকেও চূণ দিয়া পূজা করিবার ব্যবস্থা হইল। শূন্যতা কিম্বা

১ অবশ্য ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, সমস্ত ধর্ম্মশিলাই কচ্ছপাকৃতি নহে। যদি বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই এই ধর্ম্মঠাকুরের পূজার সম্পূর্ণ উদ্ভব হইত তাহা হইলে সমস্ত ধর্ম্মশিলাই বৌদ্ধস্তূপানুরূপ কচ্ছপাকৃতি করিয়া গঠন করা হইত।

মহাশূন্যতা বৌদ্ধধর্ম্মের চরম লক্ষ্য, ইহারই প্রভাব বশতঃ ধর্ম্মের পূজারীরাও তাহাদের লৌকিক দেবতাকে শূন্যমূর্ত্তি বলিয়া ধ্যান করিতে লাগিল ,—

"শূন্যেতে ভরমন পরভুর শূন্যে করি ভর।"

ক্রমে এই রাঢ়দেশে বুদ্ধ ও ধর্ম্ম সম্পূর্ণ একার্থবাচক হইয়া পড়িল। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপত্তি হইতে এই বুদ্ধ বা ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-সূচক কাহিনীতে উক্ত হইল,

'শ্রীধর্ম্ম দেবতা সিংহলে বহুত সমান।'—শূন্যপুরাণ

এই বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সংমিশ্রণের পূর্ব্বে ধর্ম্মপূজারীদের সিংহল সম্বন্ধে কোনই অভিজ্ঞতা থাকিবার কথা ছিল না। তারপর আরও দেখিতে পাওয়া যায়,

'ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে।'

এই কথাই জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধ-বন্দনায় পাওয়া যায়,

'নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।'

ক্রমে বৌদ্ধ সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের নিয়মে ধর্ম্ম ঠাকুরেরও পূজার নিয়ম লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল, বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুকরণে ধর্ম্ম ঠাকুরেরও সাহিত্য রচনার প্রয়োজন দেখা দিল। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম রাঢ়দেশ আসিবার পূর্ব্বেই তাহা তদ্দেশেই নাথপন্থের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। অবশ্য বৌদ্ধ মন্ত্রযান হইতেই নাথ ধর্ম্মেরও উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, তাহা না হইলেও যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধ-মতের সহিত যে তাহার সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। যাহা হউক, বৌদ্ধধর্ম্ম উত্তরবঙ্গ হইতে রাঢ়ভূমিতে আসিবার কালে তাহার মধ্যে নাথপন্থেরও স্বতন্ত্র প্রভাব-চিহ্ন লইয়া আসিয়াছিল এবং তাহা ক্রমে ধর্ম্মপূজার সঙ্গেও আসিয়া সংমিশ্রণ লাভ করিল। তখনই বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও

নাথ সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব উভয়ের সংমিশ্রণে ধর্ম্মসাহিত্যেও এই সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী রচিত হইল,—

ধর্ম্মসাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্ব

সর্ব্বপ্রথমে কিছুই ছিল না, এক অনন্ত মহাশূন্যের অস্তিত্ব ছিল মাত্র,

"নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি শশী নাহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কইলাস॥
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল॥
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আঁবর॥" শূন্য পুরাণ।

এই শূন্যে আশ্রয় করিয়া মহাশূন্যে ভ্রমণ করিতে করিতে 'পরভুর' সৃষ্টির বাসনা জন্মিল। তখন,

"মহাশূন্য মধ্যে পরভুর জনমিল পবন।
তাহা হইতে জনমিল অনিল দুইজন॥"—ঐ

অনিল হইতে বুদ্বুদের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রভু আসনস্থ হইয়া বসিলেন কিন্তু বুদ্বুদ ভার সহিতে না পারিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সৃষ্টির উপর প্রভুর মায়া হইয়া গিয়াছে, তিনি নিজেই নিজের কায়া সৃষ্টি করিলেন। তাহাই নিরঞ্জন ধর্ম্ম। কিন্তু—

"জনমিল পুরুষ তার নাহিক হাত পাও।"

তিনি চৌদ্দ যুগ এক ব্রহ্মধ্যানে কাটাইলেন। তারপর তাঁহার হাই হইতে উল্লূকের জন্ম হইল। উল্লূককে আসন করিয়া তিনি বসিলেন, আবার তপস্যায় মগ্ন হইলেন। উল্লূক আর ভার সহিতে পারে না,

তখন ধর্ম্ম নিরঞ্জন তাহাকে মুখের অমৃত দিলেন, উল্লূক মুখ পাতিয়া লইতে গেল, কিছু লইল, কিছু শূন্যে পড়িয়া গেল, নিরঞ্জনের এই মুখামৃত হইতেই জলের সৃষ্টি হইল। উল্লূক প্রভুকে পিঠে লইয়া জলের উপর ভাসিতে লাগিল, কিন্তু আবার ভার অসহ্য হইয়া উঠিল, উল্লূক রসাতলে যাইতে লাগিল, তাহার বীর পাখ খসিয়া পড়িল। তাহা হইতেই পরম হংসের জন্ম হইল। ধর্ম্ম হংসের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, হংসও প্রভুকে ফেলাইয়া পলাইল, তখন জলের উপর হস্ত স্থাপন করিয়া ধর্ম্ম কূর্ম্মকে সৃষ্টি করিলেন এবং তাহার পিঠে বসিয়া পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইলেন। ক্রমে কূর্ম্মেরও ভার অসহ্য হইয়া উঠিল, কূর্ম্মও পলাইল। তখন উল্লূক ধর্ম্মকে বলিল, এইভাবে জলের উপর আর কত ভাসিয়া বেড়াইবেন, এই জলের উপর সৃষ্টির স্থাপন করুন।

ধর্ম্ম তাহাতে সম্মত হইলেন। নিজের কনক পৈতা ছিঁড়িয়া জলে ফেলিলেন, তাহাতে বাসুকির জন্ম হইল। বাসুকির আহারের জন্য প্রভু কর্ণ হইতে কুণ্ডল জলে ফেলিয়া দিলেন, তাহাতে ভেকের জন্ম হইল, বাসুকি সন্তুষ্টচিত্তে প্রভুর মাথার উপর দণ্ডধারণ করিয়া দাঁড়াইল। তখন ধর্ম্ম তিল পরিমাণ গলার মলা লইয়া বাসুকির মাথায় স্থাপন করিলেন, ইহাতেই বসুমতীর সৃষ্টি হইল।

ধর্ম্ম ও উল্লূক বসুমতীর সীমা সন্ধান করিতে বাহির হইলেন। বসুমতীও দ্রুত বাড়িয়া চলিল। তাহার সীমার আর সন্ধান করিতে পারেন না। ভ্রমণের পরিশ্রমে ধর্ম্ম ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিলেন, তিনি গায়ের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহা হইতেই আদ্যাশক্তির জন্ম হইল।

আদ্যাশক্তিকে গৃহে রাখিয়া ধর্ম্ম ও উল্লূক বল্লুকা নদী সৃষ্টি করিতে গেলেন। ধর্ম্ম বল্লুকা নদী সৃষ্টি করিলেন। ধর্ম্ম তখন জগৎ সৃষ্টি করিবার মানসে সেই বল্লুকা-তীরেই ধ্যানস্থ হইলেন। চৌদ্দ বৎসর

কাটিয়া গেল, আদ্যাশক্তি যৌবনে পদার্পণ করিলেন, তথাপি ধর্ম্ম গৃহে প্রত্যাগত হন না। আদ্যাশক্তি নিজের কথা ভাবিতে লাগিলেন, সহসা কামদেবের জন্ম হইল। আদ্যাশক্তি কামদেবকে বল্লুকাতীরে ধর্ম্মের সন্ধানে পাঠাইলেন। কামদেবের আগমনে ধর্ম্মনিরঞ্জনের তপস্যা ভগ্ন হইল। উল্লূক তাহাকে তপস্যা ত্যাগ করিয়া গৃহে যাইতে পরামর্শ দিল। ধর্ম্ম ঘরে ফিরিলেন। আদ্যার যৌবন দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, অবশেষে তাঁহার জন্য বরের সন্ধান করিতে চলিলেন। যাইবার সময় আদ্যা ধর্ম্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার জন্য কি রাখিয়া গেলে? ধর্ম্ম বলিলেন, এক পাত্রে মধু ও এক পাত্রে বিষ রাখিয়া গেলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় পান করিও।

আদ্যা যৌবন ভার আর সহ্য করিতে পারেন না, একদিন মনের দুঃখে বিষ পান করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু মরিলেন না বরং গর্ভবতী হইলেন এবং তাঁহার গর্ভ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা জন্মিয়াই কারণ-সমুদ্রতীরে তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন।

নিরঞ্জন ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য দুর্গন্ধ শবরূপে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। প্রথমে তিনি গেলেন ব্রহ্মার কাছে, ব্রহ্মা নিরঞ্জনের মায়া বুঝিতে না পারিয়া ঘৃণাভরে শব ভাসাইয়া দিলেন, বিষ্ণুও তাহাই করিলেন, কিন্তু পরম জ্ঞানী শিব সমস্তই বুঝিলেন, তিনি শব কাঁধে লইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের বরে শিবের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবের মুখামৃতে নূতন দৃষ্টি লাভ করিলেন।

তাঁহারা সকলে তখন আদ্যাশক্তির নিকটে গেলেন, নিরঞ্জন ধর্ম্ম ব্রহ্মাকে সৃষ্টির, বিষ্ণুকে পালনের ও শিবকে সংহারের ভার দিলেন, আদ্যাশক্তিকে নরলোকের জন্মের জন্য মন দিতে বলিলেন। ধর্ম্মের কথায় শিব আদ্যাশক্তিকে বিবাহ করিলেন।

মালদহের কবি মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অঞ্চলে সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ কাহিনী বিশেষ প্রচলিত ছিল। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে বৌদ্ধধর্ম্ম ও নাথপন্থের প্রসার হেতু তদ্দেশেই এই শূন্যবাদ ও যোগতান্ত্রিক ধর্ম্মমতের একত্র সংমিশ্রণে সৃষ্টিতত্ত্বের এই কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছিল। ইহার প্রভাব এত ব্যাপক হইয়াছিল যে, পরবর্ত্তী কতকগুলি সংস্কৃত পুরাণেও [১] সৃষ্টিতত্ত্বের অনেকাংশে প্রায় এই কাহিনীই যেন গৃহীত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অঞ্চল হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর দিয়া রাঢ়দেশেও সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ কাহিনী প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া গৌড়ের মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল ও রাঢ়ের প্রাচীন ধর্ম্মমঙ্গলগুলির সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় বড় বেশি পার্থক্য নাই।

সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীর উদ্ভব

ক্রমে বৌদ্ধ শূন্যবাদের আদর্শে ধর্ম্ম ঠাকুরের ও এই প্রকার ধ্যান-মন্ত্র রচিত হইল,—

"যস্যান্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরণৌ নাস্তিকায়ো নো নাদঃ
নাকারো নৈব রূপং ন চ ভয়মরণে নাস্তি জন্মানি যস্য।
যোগেন্দ্রৈর্ধ্যানগম্যং সকলজনময়ং সর্ব্বলোকৈক নাথম্
ভক্তানাং কাপূমরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিম্॥"—ধর্ম্মপূজাবিধান

বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে নিরঞ্জনের পরিকল্পনা ও উল্লিখিত সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীই প্রধানতঃ এই লৌকিক ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজায় গৃহীত হইয়াছিল এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল নির্দ্দেশ অহিংসার আদর্শ ধর্ম্ম পূজায় স্থা[ন] লাভ করিতে পারে নাই। এখানে আদিম লৌকিক সংস্কারই জয়[ী] হইয়াছে। ধর্ম্ম পূজায় রীতিমত পশুবলির ব্যবস্থা আছে, শূন্য পুরাণ ও ধর্ম্ম পূজাবিধানে দেখিতে পাওয়া যায়, গণ্ডার, অশ্ব, অজ, হংস, কবুত[র]

১ বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, মধ্য খণ্ড, ১ম অধ্যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৮১।৬৫

প্রভৃতি ধর্ম্ম ঠাকুরের নিকট বলি দিতে হয়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব অনুমান করিয়াছেন, "হইতে পারে এ'গুলি পরবর্ত্তী কালের যোজনা।"[১] কিন্তু ধর্ম্ম পূজার ইতিহাস সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ইহা পরবর্ত্তী কালের যোজনা নহে, বরং এই লৌকিক দেবতার উপর বৌদ্ধ প্রভাব স্থাপিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই ইহা প্রচলিত ছিল। রাঢ়ের রক্ষণশীল সমাজ বাহ্যতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া লইলেও অন্তরে অন্তরে নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, ইহার ভিতরেই তাহার প্রকৃত পূর্ব্ব পরিচয় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

রাঢ়ে সেন রাজগণ

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণাত্য হইতে আগত সেন রাজগণ রাঢ়ভূমিতে বসতি স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ বীরভূম জেলাই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম বসতি স্থান ছিল। পূর্ব্বে বিজয় সেনের যে মনসা মূর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছি[২] তাহাও বীরভূম জেলাতেই পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই মনে হয়, তাঁহাদের সময়েই বীরভূমকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রভাব রাঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সেন রাজদিগের সময় হইতেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া ও হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থান আরম্ভ হয় এবং বঙ্গদেশের মধ্যে রাঢ় ভূমিই সর্ব্বপ্রথম এই নূতন ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে দীক্ষা লাভ করে। রাঢ়ভূমির প্রাচীন লৌকিক সংস্কারগুলি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে আগত বৌদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এইবার আর এক নূতন আদর্শের সম্মুখীন হইল। তাহা হিন্দু পৌরাণিক আদর্শ। রাজকীয় সহায়তায় এই প্রভাব ক্রমে এত বলবান হইয়া উঠিল যে, অচিরকাল মধ্যে রাঢ়ের

১ 'শূন্য পুরাণ' (চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), ভূমিকা পৃঃ ১২

২ পৃঃ ১২০

লৌকিক ধর্ম্ম সংস্কারগুলি বৌদ্ধ প্রভাবের উপরই আবার এই নবাগত হিন্দু প্রভাবকেও স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইল। এই ভাবে রাঢ়ের একটি নিতান্ত স্থানীয় গ্রাম্য দেবতার উপর আসিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কার স্তরে স্তরে তাহাদের আসন জুড়িয়া বসিল। তখন এই ধর্ম্ম ঠাকুর আর নিরঞ্জন বুদ্ধ দেবতা নহেন, তিনি সম্পূর্ণ ভাবে পৌরাণিক বিষ্ণু। তিনি বিশ্ব সৃষ্টির কারণ নহেন, তিনি পালনকর্ত্তা; তাঁহার আবাস বল্লুকা তীরে নহে, তিনি বৈকুণ্ঠবাসী। তাঁহার ভক্তকে তিনি বৈকুণ্ঠে লইয়া যান, তাঁহার আদি গীতি রচয়িতা ময়ূর ভট্টকেও তিনি বৈকুণ্ঠেই স্থান দিয়াছেন,

ধর্ম্ম ঠাকুরে হিন্দু প্রভাব

"ময়ূর ভট্টের কথা মন দিয়া শুন॥
বৈকুণ্ঠে রেখেছি তারে বিষ্ণুভক্তি দিয়া।
অদ্যাপি তাহার যশ অখিল ভরিয়া॥"

—মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল।

তাঁহার রূপ তখন শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন। তিনি এই ভাবে নিজের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হন,

"শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজ ধারী।
আঁখির নিমেষে হ'লো সেই ব্রহ্মচারী॥
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ শ্রবণে কুণ্ডল।
গলায় কৌস্তভ মণি ভকত বৎসল॥
নবঘন শ্যাম অঙ্গ গরুড় বাহনে।
কর্পূর দেখিল আর সতী চারিজনে॥"

—ঘনরামের ধর্ম্ম মঙ্গল, পৃঃ ১৯৮

পৌরাণিক বিষ্ণুর এই ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তির পার্শ্বে বৌদ্ধ শূন্যমূর্ত্তির পরিকল্পনা মায়া-মরীচিকার মত কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। ক্রমে ভাস্কর্য্যে

বিষ্ণুমূর্ত্তি গঠনের আদর্শে দুই একটি এই "নিরাকার" ধর্ম্মের প্রস্তর মূর্ত্তি পর্য্যন্ত গঠন আরম্ভ হইল। অবশ্য এই প্রকার কোন মূর্ত্তি ধর্ম্মপূজার কেন্দ্রস্থল রাঢ়দেশে আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার প্রণীত Archaeological Survey of Mayurbhanja (vol. I) নামক পুস্তকে (Pg. XCVI) একটি ধর্ম্মমূর্ত্তির পরিচয় দিয়াছেন। মূর্ত্তিটি দেখিলে মনে হয়, ইহা বুদ্ধ ও পৌরাণিক বিষ্ণুর মিশ্র আদর্শানুযায়ী গঠিত। ইহা অর্দ্ধেক বিষ্ণু ও অর্দ্ধেক বুদ্ধ। বুদ্ধের আদর্শই ইহাতে প্রবল, এমন কি তাঁহারও চৈত্য বা মন্দিরের পার্শ্বে নেপালের অনুরূপ বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী হারিতী বা শীতলারও একটি মূর্ত্তি পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ প্রভাবের যুগেও রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত কতকগুলি লৌকিক ছড়া লইয়াই ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা হইত। সমস্ত গ্রাম্য দেবতার তাহাই হয়, কিন্তু হিন্দু প্রভাবের পর হইতে হিন্দু দেবদেবীর পূজা বিধানের অনুকরণে নব্য রঘুনন্দন কর্ত্তৃক ধর্ম্ম পূজারও বিধান রচিত হইল। এই পূজা বিধানে ধর্ম্ম ঠাকুরের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার হিন্দু পরিণতি পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তরগুলির স্পষ্ট সন্ধান করিতে পারা যায়। ইহাতে ধর্ম্ম ঠাকুরের আবরণ-দেবতারূপে মহাযান বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের প্রায় প্রধান প্রধান দেবতা দিগকেই স্থান দেওয়া হইয়াছে, ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা সম্পর্কে তাহাদের ও পূজা করিতে হয়। ইহার মধ্যে মগর পণ্ডিত, কালু ঘোষ, ভট্ট ধরাধর, ভাস্কর নৃপতি, মন্তির ঘোষ, সাধুপুর দত্ত, তাম্বুলি, আশোয়া চাণ্ডাল, আদিনাথ, দীননাথ, চৌরঙ্গীনাথ, গোরনাথ (গোরক্ষনাথ ?) হইতে আরম্ভ করিয়া, ষষ্ঠী, বিষহরী, বাসুলী, বিশালাক্ষী, চামুণ্ডা ও গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা লক্ষ্মী প্রভৃতিরও পূজার নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ইহা হইতেই এই

ধর্ম্মপূজা বিধান

লৌকিক দেবতার উপর যে কি ভাবে পর্য্যায় ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভাব কার্য্যকরী হইয়াছিল তাহাই অনুমিত হইবে।

ধর্ম্ম ও যম

হিন্দু যুগে এই ধর্ম্মঠাকুর শুধু যে বিষ্ণুর সহিতই অভিন্ন কল্পিত হইয়াছেন তাহা নহে, পুরাণে যমের এক নাম ধর্ম্মরাজ বলিয়া তাঁহাকে এই যমের সহিতও অভিন্ন করিয়া লইবার প্রয়াস হইয়াছিল। তখন লৌকিক ধর্ম্মঠাকুরের সামাজিক অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, একটা কিছু আবরণ পাইলেই তিনি আত্মগোপন করিয়া ফেলেন। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যাপক প্রভাবের ফলে তাঁহাকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন কল্পনা করা খুবই স্বাভাবিক হইয়াছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সম্ভবতঃ তাঁহাকে পৌরাণিক ধর্ম্মরাজ বা যমরাজ বলিয়াও একটা ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "রাঢ়-ভ্রমণ" অভিজ্ঞতার[১] যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার একাংশ উদ্ধৃত করিয়া রাঢ়ে বর্ত্তমান ধর্ম্মপূজায় নিরঞ্জন ধর্ম্মঠাকুরের যমরাজে পরিণতির দৃষ্টান্ত দেখাইব,—"বৈদ্যপুরে ধর্ম্মতলার একখানি চালাঘরে ধর্ম্মঠাকুরের স্থান। ধর্ম্মপ্রতিমা তিন পোয়া উচ্চ একখণ্ড পাষাণ মাত্র। বৈশাখী পূর্ণিমায় অত্যন্ত সমারোহে ধর্ম্মের গাজন হয়। সন্ন্যাসীরা মৃতদেহ আনয়ন করে না। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিতে ধর্ম্মঠাকুরের পূজার মানসিক করিয়া থাকে। প্রায়ই বলিদান হয়। ধর্ম্মঠাকুরের অধিকারী শ্রীক্ষেত্রনাথ পাল, জাতিতে কুম্ভকার। পূজার জন্য ১৫ বিঘা দেবোত্তর আছে। নিত্য ভোগ পাঁচ পোয়া আতপ চাউল ও এক পোয়া পাটালি। বিশেষ অনুরোধে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (ধর্ম্মঠাকুরের পুরোহিতগণ বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণের পদবী গ্রহণ

১ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৪ সাল, পৃঃ ১৬৬।

করিয়াছেন) পূজার ধ্যান ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিলেন। আমিও তাহা লিখিয়া লইলাম। পাঠকগণ অর্থ করিয়া লইবেন, কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিতে সমস্ত কথা উপস্থিত হয় নাই। ধ্যান :— 'ওঁ যস্যান্তো নদিরূপো ন চ কর চরণং নাস্তি কায়ানিনাদ নদিরূপো মরণং নাস্তি যোগান্ত্যগমনগম্যো যো নাতু গত সর্ব্বসঙ্কল্লো পাতালে ছিন্নমূর্ত্তি, নমস্তে বহুরূপায় যমায় ধর্ম্মরাজায়।"[১] সর্ব্বশেষে এই ধর্ম্মঠাকুরকে 'বহুরূপ' বলিয়া দিয়া তাঁহার সঙ্কর পরিকল্পনার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

ধর্ম্মঠাকুরের পূজায় উপরি-উক্ত কোন কোন বৌদ্ধপ্রভাবের লক্ষণ দেখিতে পাইয়া কেহ কেহ ইহাকে "বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ" অবস্থা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, কেহ আবার ইহার পূজাবিধানে তেত্রিশ কোটি হিন্দু দেবতার নাম দেখিয়া ইহাকে বৈদিক হিন্দু আচারেরই অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন, আবার শিবের গাজনের অনুরূপ ধর্ম্মের গাজনের অনুষ্ঠান দেখিয়া কেহ ইহাকে "শিবেরই পূজা" বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বস্তুতঃ ধর্ম্মঠাকুরের পরিচয় সম্বন্ধে মতের এই অনৈক্যই তাঁহার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দেয়। এক্ষণে উপরি-উক্ত মতগুলির মূলে কি কি যুক্তি আছে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

ধৰ্ম্মপূজা ও বৌদ্ধধৰ্ম্ম

মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে "Discovery of Living Buddhism in Bengal" নামে একখানি ইংরেজি পুস্তিকা প্রকাশ করেন ; তাহাতেই তিনি সর্ব্বপ্রথম এই মত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশে "ধর্ম্মপূজাই বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ।" ইহার পূর্ব্বেও তিনি সাহিত্য পরিষৎ সভায় এক বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তারপর তাঁহার

---

১ ৩৪২ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত ধ্যানের সহিত তুলনীয়।

ইংরেজি পুস্তিকায় এই মতই নানা যুক্তি তর্ক দ্বারা স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। তাহার পর হইতে এদেশের সাধারণ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এই বিশ্বাসই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং সাধারণ বিশ্বাসের অনুকূল বলিয়া এই গ্রন্থের ভূমিকা-ভাগেও এই ভাবেই এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। প্রায় সকলেরই বিশ্বাস, ধর্ম্মঠাকুরের পূজা সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহাই একমাত্র সত্য। কিন্তু এই বিষয়ে আরও একটু বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার প্রয়োজন আছে।

অবশ্য এই সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের উপরি-উক্ত অভিমত যে সকলেই গোড়া হইতেই মানিয়া লইয়াছেন তাহা বলিতে পারা যায় না। এই সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম প্রবন্ধ যে সময় সাহিত্য পরিষৎ সভায় পঠিত হয় তখন তাহা সকলে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা প্রবন্ধ-লেখকের নিজের ভাষাতেই প্রকাশ করিতেছি, ... "যখন এই প্রবন্ধ পড়া হয়, তখন অনেকেই ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। একজন বলিয়াছিলেন,— ছিঃ! জেলে মালারা যে ধর্ম্মঠাকুরেয় পূজা করে, সে ঠাকুর কিনা বৌদ্ধ! ছিঃ!"[১]

কথাটা এই প্রকার লঘুভাবে উড়াইয়া দিবার নহে, ইহার মধ্যে বাস্তবিকই আপত্তি করিবার কিছু আছে কিনা তাহাও বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

এ'কথা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, এই "জেলে মালা" শ্রেণীর লোকই প্রত্যেক দেশেই আদিম সামাজিক সংস্কারগুলির প্রতিপালক। বাহিরের প্রভাবে সাধারণতঃ সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকই সর্ব্বাগ্রে আকৃষ্ট হয়, নিম্ন শ্রেণীর সমাজকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। বৌদ্ধ-

১ বৌদ্ধ গান ও দোঁহা, ভূমিকা, পৃঃ ৪।

ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের মতই বাংলার বাহির হইতে আসিয়াছিল, এবং স্বভাবতঃই তাহা তৎকালীন সমাজের অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্তরের সমাজের মধ্যেই নিজের অধিকার স্থাপন করিয়া লইয়াছিল। কারণ, বিদেশীয় একটা সংস্কারকে আয়ত্ত করিয়া লইতে যতখানি সামাজিক শিক্ষার প্রয়োজন তাহা এই "জেলে মালার" সমাজের মধ্যে আশা করা যায় না। অতএব তাহারা প্রাচীনতম সংস্কারের ধারাটিকেই যতদূর সম্ভব অবলম্বন করিয়া থাকে। সেইজন্য আমাদের দেশের অস্পৃশ্য সমাজই সর্ব্বাপেক্ষা রক্ষণশীল। অতএব এই "জেলে মালা"র সমাজের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার কতদূর সার্থকতা লাভ করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ বহুকাল পর্য্যন্ত রাঢ়ভূমির সহিত বহির্জগতের কোন সম্পর্কই স্থাপিত হয় নাই। এতকাল পর্য্যন্ত যে এই দেশের সমাজ কোন প্রকার সংস্কার বিবর্জ্জিত ছিল তাহাও মনে করা যাইতে পারে না। এতকাল নিশ্চিতই তাহারা নিজস্ব স্থানীয় লৌকিক সংস্কার-গুলিই প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে। ধর্ম্মঠাকুর নামটি পরবর্ত্তী কালে আসিয়া ইহাতে জুটিলেও ইহা নিঃসন্দেহেই মনে করা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম এই স্থলে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই এই জাতীয় একটি লৌকিক দেবতার পূজা এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। তাহা পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধধর্ম্ম দ্বারা সামান্য প্রভাবিত হইয়াছে মাত্র। সেইজন্য আজিও এই "জেলে মালা"র সমাজের মধ্যেই এই পূজার প্রচলন রহিয়াছে।

অস্পৃশ্য সমাজ ও বৌদ্ধধর্ম্ম

বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মঠাকুরের পূজার আভ্যন্তরিক যে কোন সম্পর্ক নাই, সেই সম্বন্ধে আর একটি যুক্তির অবতারণা করিব,—ইহার গুরুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ধর্ম্মঠাকুরের পূজা যদি বৌদ্ধধর্ম্মের শেষই হইত তাহা হইলে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ আশ্রয় স্থল চট্টগ্রাম কিম্বা ত্রিপুরা অঞ্চলে ইহার প্রচলন

থাকিবার কথা ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় রাঢ়ের কেন্দ্রস্থল ব্যতীত এই পূজা আর কোথায়ও প্রচলিত নাই। অবশ্য কালক্রমে রাঢ়ের সহিত যখন তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ দেশেরও পরিচয় হইল তখন মালদহ ও মুর্শিদাবাদেরও পূর্ব্ব অঞ্চলে ইহা প্রসার লাভ করিয়াছিল সত্য কিন্তু এতদ্ব্যতীত ইহার প্রভাব আর কোথায়ও বিস্তৃত হইতে পারে নাই। এমন কি, কেন্দ্রীয় রাঢ়ের সংলগ্ন দক্ষিণভাগ অর্থাৎ মল্লভূমের দক্ষিণে সুহ্ম প্রদেশেই ইহা সম্পূর্ণ অপ্রচলিত। বৌদ্ধধর্ম্মেরই যদি ইহা স্বাভাবিক শেষ পরিণতি হইবে তাহা হইলে ইহা বৌদ্ধ-প্রভাবিত সমগ্র বাংলাদেশের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়া একস্থানে, (বিশেষতঃ যে স্থানের বৌদ্ধ সংস্কারেব ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়) কেন্দ্রীভূত হইবার বা কি যুক্তি থাকিতে পারে? এই ধর্ম্মঠাকুরের পূজা কেন্দ্রীয় রাঢ়ের একটি স্থানীয় বা লৌকিক অনুষ্ঠান বলিয়া ইহা কোন কালেই ইহার উদ্ভব স্থানের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। অতএব ইহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের মত একটা ব্যাপক ধর্ম্মের শেষ পরিণতি বলিবার পক্ষে কোন যুক্তিই থাকিতে পারে না।

ধর্ম্মপূজা কি বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ?

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব বলিয়াছেন, "নিরঞ্জনের কল্পনা ও সৃষ্টিতত্ত্ব ভিন্ন ধর্ম্মপূজার আর কোন বৌদ্ধ-প্রভাব দেখা যায় না।"[১] এই নিরঞ্জনের কল্পনা ও সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধ-প্রভাবের

---

১ শূন্য-পুরাণ (চারু বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত) ভূমিকা, পৃ ১১। স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ও লিখিয়াছেন, "The word Sunyamurti points to a Buddhistic origin of the deity. The Hindus never believed in Sunya as the origin of the world, while Sunyamurti and Mahasunyata are the great goals of the Buddhistic religion,"—Discovery of Living Buddhism in Bengal, pg. 13.

যুগে যখন ধর্ম্ম পূজাবিধি রচিত হয় এবং ধর্ম্ম-সাহিত্য গড়িয়া উঠে তখন এই ধর্ম্মপূজার সঙ্গে গিয়া সংযুক্ত হইয়াছিল। সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ কাহিনী ধর্ম্ম-সাহিত্য ব্যতীত মধ্য যুগের অন্যান্য বহু সাম্প্রদায়িক সাহিত্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতেও দেখা যাইবে যে, তাহার বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীও এই ধর্ম্ম-সাহিত্যের কাহিনীরই অনুরূপ, এতদ্ব্যতীত দুই একটি পরবর্ত্তী পদ্মাপুরাণেও এই প্রকার কাহিনী বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই দেশে যোগ তান্ত্রিক নাথ ও শৈব ধর্ম্মের ব্যাপক প্রচারের ফলে সৃষ্টিতত্ত্বের এই কাহিনীরও ব্যাপক প্রচার হইয়াছিল, সেই জন্য যখনই যে কোন কবি মঙ্গল-কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখনই সমাজে প্রচলিত এই কাহিনীটিকে নিজেদের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া লইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। অতএব শুধু ইহা হইতেই সমাজে প্রচলিত বিশেষ কোন দেবতার সহিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মৌলিক সম্পর্ক কল্পনা করা ভুল হইবে।

নিরঞ্জনের কল্পনা ও ধর্ম্ম-পূজার আচারের মধ্যে কোন ঐক্য নাই। নিরাকার নিরঞ্জনের মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াও ধর্ম্ম-পূজায় সাকার মূর্ত্তিরই উপাসনা করা হইয়া থাকে। অবশ্য পরবর্ত্তী মহাযান বৌদ্ধ সমাজেও এই নিরঞ্জনের কল্পনা ও তাহাদের পূজার আচারে কোনই ঐক্য ছিল না। ইহারই ব্যাখ্যা স্বরূপে ধর্ম্ম-পূজা বিধানে উক্ত হইয়াছে, (পৃঃ ৯৬৫)—

নিরঞ্জনের কল্পনা ও ধর্ম্ম-পূজা

"বাড়ী কোথা পণ্ডিতের কোন দেব ভজ।
কন্ মূর্ত্তি ধ্যান কর কন্ দেব পূজ॥
কন্ মুখে পূজা কর কন্ বেদ পড়।
শীঘ্র গতি কহিলাম চতুরালি ছাড়॥

বাড়ী মোর বল্লুকার।
পূজি ধর্ম্ম নৈরাকার॥
স্বন্যমূর্ত্তি ধ্যান করি।
সাকার মূর্ত্তি ভজি॥"

পরবর্ত্তীকালে যখন এই নিরাকারের কল্পনায় সাকারের উপাসনা চলিতেছিল তখন এই উভয় সংস্কারের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া এই প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। অতএব নিরঞ্জনের কল্পনাও ধর্ম্ম-পূজার একটি একান্ত আবশ্যক অঙ্গ নহে।

অতএব দেখা যাইতেছে, নিরঞ্জনের কল্পনা ও সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজার বাহ্যিক আবরণ মাত্র, ইহাদের সঙ্গে এই পূজা অনুষ্ঠানের আভ্যন্তরিক কোন যোগ নাই। অতএব স্বচ্ছন্দেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহা পরবর্ত্তীকালে ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজার উপর আসিয়া বাহির হইতে জুড়িয়া বসিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্ম ঠাকুরের উপর পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম পুনরুত্থানের যুগে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের উপরই আবার হিন্দু-ধর্ম্মের প্রভাব স্থাপিত হইয়াছিল। সেই জন্য পরবর্ত্তী ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যগুলি ধর্ম্মঠাকুরকে হিন্দু পুরাণের অন্যতম প্রসিদ্ধ দেবতা বিষ্ণুর সহিতই অভিন্ন করিয়া লইয়াছে। এই পরবর্ত্তী ধর্ম্ম-মঙ্গলগুলির উপর নির্ভর করিয়া এই ধর্ম্মঠাকুরের পূজা পৌরাণিক বিষ্ণু-পূজারই প্রকার ভেদ বলিয়া কেহ কল্পনা করিয়াছেন। ময়ূর ভট্ট রচিত "শ্রীধর্ম্ম পুরাণের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "মুখ্যতঃ ইনি শঙ্খ-পদ্ম-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু দেবতা। ইঁহার ভক্তগণ বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া থাকেন" ইত্যাদি।[১] কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত (ঘনরাম চক্রবর্ত্তী

বিষ্ণু ও ধর্ম্মঠাকুর

১ 'শ্রীধর্ম্ম পুরাণ' (শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত) ভূমিকা, পৃঃ ১৷৹/

প্রণীত) একখানি ধর্ম্মমঙ্গল হইতে এই সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই যুগে উচ্চতর সমাজের ব্রাহ্মণ কবিদিগের হাতে পড়িয়া ধর্ম্মমঙ্গলকাব্য পৌরাণিক দেবতারই লীলা-জ্ঞাপক গ্রন্থ হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব এই পূজার প্রকৃত পরিচয় সন্ধান করিতে অন্ততঃ সেই যুগের কোন কাব্য হইতেই যে কোন সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে না, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে যদি এই গ্রন্থগুলিও একটু বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলেও ধর্ম্মঠাকুরের প্রকৃত পরিচয় তাহা হইতেও উদ্ধার করা যাইতে পারে।

মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক নিয়মানুসারে ধর্ম্মমঙ্গলের কবিরাও স্বপ্নাদেশে তাঁহাদের কাব্য-রচনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মনসা-মঙ্গল কিম্বা চণ্ডী-মঙ্গলের কবিরা এই স্বপ্নাদেশকে দেবতার প্রসাদ বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গলের কবিরা দেবতার এই স্বপ্নাদেশ পাইয়া প্রত্যেকেই জাতিনাশের আশঙ্কা করিয়াছেন। মাণিক গাঙ্গুলী তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গলে লিখিয়াছেন,

"এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ।
জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে।
স্বপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষে পাছে হাসে॥
জগত ঈশ্বর কন আমি তোর জাতি।
তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি॥
আমি যার সহায় এতেক ভয় কেন।
ময়ুর ভট্টের কথা মন দিয়া শুন॥

বৈকুণ্ঠে রেখেছি তারে বিষ্ণুভক্তি দিয়া।
অদ্যাপি যাহার যশ অখিল ভরিয়া॥"

ঘনরাম চক্রবর্ত্তীও অনুরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন,

"শুনি অসম্ভব ভাষে লোকে পাছে উপহাসে
তায় তুমি আপনি প্রমাণ।"—পৃঃ ২

তিনি এই লোক-লজ্জা-ভয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এই কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন,

"যশ অপযশ ভাষ, ইথে কিবা উপহাস
লৌকিক সঁপিনু তব পায়।"—পৃঃ ২

যে জন্য ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করিয়া মানভূম জেলায় কোন কোন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত হইয়াছেন,[১] সেই জন্যই রাঢ়ের ব্রাহ্মণ কবিগণ এই দেবতার কাব্য রচনা করিতেও জাতি-নাশের আশঙ্কা করিয়াছেন। ধর্ম্ম ঠাকুর যদি কোন পৌরাণিক দেবতা হইবেন তাহা হইলে তাঁহাদের এমন আশঙ্কার কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে, তাহার কোন উত্তর পাওয়া যায়না। অতএব ইহা হইতে মনে হয় যে, ধর্ম্ম ঠাকুর গ্রাম্য দেবতা বলিয়াই নিম্ন শ্রেণীর পূজ্য, নিম্ন শ্রেণীর সামাজিক ক্রিয়া ও আচার পালন করিয়াই উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা সমাজে পতিত হইয়াছেন, তথাপি "এখন উত্তম ব্রাহ্মণের কেহ অজ্ঞানতঃ, কেহ লোভ ও ভয় বশতঃ ধর্ম্মপূজা করিতেছেন।" [২] সেইজন্য তাঁহাদের হাতে পড়িয়া ধর্ম্মঠাকুর বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন কল্পিত হইতেছেন। অতএব ধর্ম্ম ঠাকুরের বর্ত্তমান রূপ ও তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত আধুনিক কোন কাব্য হইতে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করিতে পারা যায় না।

---

১ 'শূন্য পুরাণ' (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়) সা-প-পত্রিকা, পৃঃ ৯০, ১৩৩৮ সাল।

২ শূন্য পুরাণ, সা-প-পত্রিকা পঃ ৯০,৩৮ ভাগ

ধর্ম্ম ঠাকুর যে পৌরাণিক কোন দেবতা নহেন তাহা তাঁহার দেবত্বের অনিশ্চয়তা হইতেও স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। কারণ, "স্থানে স্থানে, যেখানে ব্রাহ্মণে ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন, সেখানে 'নমঃ শিবায়' বলিয়া ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা করিবার ব্যবস্থা আছে।"[১] আবার পূর্ব্বোল্লিখিত বৈদ্যপুর গ্রামে প্রচলিত ধর্ম্ম ঠাকুরের ধ্যানে "যমায় ধর্ম্মরাজায়" এমন উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি। মাণিক গাঙ্গুলী ধর্ম্মের সেবকের জন্য বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ঘনরামের সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে পর্য্যন্ত আছে, এই ধর্ম্ম ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্মদাতা। অতএব দেখা যাইতেছে, এই ধর্ম্ম ঠাকুর কোথাও বিষ্ণু, কোথাও শিব, কোথাও আবার আদিদেব নিরঞ্জনরূপে কল্পিত হইয়াছেন। তাঁহার দেবত্ব সম্বন্ধে এই অনিশ্চয়তাই সাধারণতঃ তাঁহার বিশিষ্ট পৌরাণিক কোন পরিচয়ের বিরোধী। নিশ্চিত করিয়া তাঁহার কোন পরিচয় জানা নাই বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে যে যাহা পারে ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়া পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ধর্ম্ম ঠাকুর যে বিষ্ণু নহেন তাহার আর একটি প্রমাণ, "ধর্ম্ম ঠাকুর নিরামিশাষী বৈষ্ণব দেবতা নহেন।... ইনি 'লুয়ে' নামক উৎকৃষ্ট ছাগকে বলিরূপে গ্রহণ করিয়া তুষ্ট হন।" বিষ্ণুপূজায় কিম্বা বৈষ্ণবের কোন অনুষ্ঠানে পশুবলির কোন ব্যবস্থা থাকিবার কথা নহে। ইহা তদ্দেশীয় সমাজের একটি অতি আদিম সংস্কারেরই নিদর্শন। বৈষ্ণবী দুর্গাদেবী হইতে শাক্ত বিষ্ণুদেবতার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ হইতে পারে না। ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যে যে সৃষ্টি-তত্ত্বের কাহিনী ও নিরঞ্জনের পরিকল্পনার উল্লেখ আছে তাহা যে পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য ও ধর্ম্মপূজা বিধান রচনার সময়ে আসিয়া ইহাতে যুক্ত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অতএব ইহা "ঋগ্‌বেদীয় নাসদীয় সূক্তের"

ধর্ম্ম, বিষ্ণু শিব না যম ?

[১] 'শ্রীধর্ম্ম পুরাণ' (শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত) ভূমিকা, পৃঃ ১৷৷/০

অনুরূপই হউক [১] আর বৌদ্ধ শূন্যবাদের অনুকূলই হউক [২] তাহা দ্বারা ধর্ম্মপূজার প্রকৃত উদ্ভব নিরূপণের কোনই সহায়তা করে না।

আমাদের উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে, ধর্ম্মশিলার পূজা আর্য্যেতর সমাজেই সর্ব্বপ্রথম উদ্ভূত হয়। অতএব এই আদিম সমাজের সাধারণ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির মধ্যে ইহার উৎপত্তি সন্ধান করা যাইতেছে।

আদি মানবের প্রস্তর পূজা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মের প্রকৃত মূর্ত্তি একটি অপরিণত-গঠন (Crude) শিলাখণ্ড। মহাযান বৌদ্ধ কিম্বা হিন্দু পৌত্তলিকতার আদর্শেও ইহার মূর্ত্তি গঠিত হয় না। অতএব আদিম সমাজের বস্তু-পূজা (Fetishism)র অন্তর্ভুক্ত প্রস্তরোপাসনারই ইহাতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, হিন্দু সমাজে প্রচলিত শালগ্রাম-শিলার পূজাও আদিম সমাজের এই প্রস্তরোপাসনার প্রবৃত্তি হইতেই জাত। পরবর্ত্তী কালে নানা পৌরাণিক আখ্যানদ্বারা বিষ্ণুর এই শালগ্রাম শিলায় পরিণতির অনেক ব্যাখ্যা দেওয়া হইলেও ইহার মধ্যেও আদিম সমাজেরই একটি লুপ্তপ্রায় সংস্কার প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই শালগ্রাম শিলার মত ধর্ম্মও একটি শিলাখণ্ড মাত্র। কিন্তু শালগ্রামের যেমন বিশিষ্ট একটি রূপ আছে, ধর্ম্মশিলার তেমন নাই। ইহাতে মনে হয়, প্রাচীনতর সমাজ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আদিম সমাজের মধ্যে এই প্রস্তরোপাসনা প্রচলিত আছে।[৩] উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বত্রই প্রায় গ্রামে গ্রামেই আদিম সংস্কারের এই একটি নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান থাকিতে দেখিতে পাও[য়া]

১ শ্রীধর্ম্মপুরাণ (শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত) পৃঃ ২৸৹

২ Discovery of Living Buddhism in Bengal (Mm. H. P. S[astri]) Pg. 13.

৩ "Lectures (Rhys)) Pg. 206 ; Customs and Myth" (Long) P[g.]

যায়।[১] এই প্রস্তর-দেবতারা সাধারণতঃ গ্রামদেবতারূপেই পূজা পাইয়া থাকেন।

প্রস্তরের প্রতি আদিম সমাজের শ্রদ্ধার কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমতঃ প্রস্তরই আদিমানবের অস্ত্রের কাজ করিত; তদুপরি প্রস্তর হইতে অগ্নি জ্বলিত, কোন কোন প্রস্তর-ধৌত জলপান করিয়া কোন কোন রোগ হইতে মুক্তি লাভ করা যাইত। এই সমস্ত কারণে প্রস্তর আদি মানবের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির স্থান লাভ করিয়াছিল। এই ভাবে ইহার পূজাও সমাজে প্রবর্ত্তিত হইল।

আদি সমাজের এই প্রস্তরোপাসনার প্রবৃত্তি হইতেই ধর্ম্মশিলার পূজাও সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সমাজের ক্রমবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে যত আচার ও অনুষ্ঠানের বিকাশ হইয়াছে তাহা সমস্তই এই উপাস্য শিলাখণ্ডটিকে কেন্দ্র করিয়াই পুষ্টি লাভ করিয়াছে। তাহারই ফলে অনেক সময় ইহার প্রকৃত পরিচয় লইয়া পরবর্ত্তী কালে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

ধর্ম্মপূজার প্রসার

কিন্তু একটি প্রশ্ন হইতেছে যে, ধর্ম্মশিলা যদি গ্রাম-দেবতাই হইবে তাহা হইলে তাহার পরিচয় এত ব্যাপক হইল কেমন করিয়া? এত কবি তাহার সম্বন্ধে কাব্য লিখিলেন, এত সাধক তাহার পূজায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সমাজেরও কত কল্যাণ

১ Worship of fetish stones prevails in all parts of the world. There is hardly a village in Nothern India without a fetish of this kind, which is very often not appropriated to any special deity, but represents the Gramadevata, the collective local divine cabinet which has the affairs of the community under its charge.—(W, Crooke). The Popular Religion and Folklore of Northern India, Vol. II, p. 163-64.

করিলেন! সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে কয়টি গ্রাম-দেবতার এই সৌভাগ্য হইয়াছে? ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, এই বিশেষ গ্রামদেবতাটি সহজেই বৌদ্ধ ও পরে হিন্দুদেবতার সঙ্গে অভিন্ন কল্পিত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার নিজস্ব ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও বাহিরের জগতের সঙ্গেও একটু পরিচয় লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সৌভাগ্য তাঁহার এই হইয়াছিল যে, রাঢ়ের মত জয়দেব-চণ্ডীদাস-মুকুন্দ-ভারত-নিনাদিত কবি-ভূমিতেই তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। সেইজন্য কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবির সহায়তায়ও কাব্য ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া তিনি নিজস্ব এলেকার মধ্যেও যথেষ্ট লোকপ্রীতি অর্জ্জন করিতে পারিলেন। সমাজে মঙ্গলকাব্যের প্রভাবও তাঁহার দেবত্ব প্রচারে সহায়তা করিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁহার পূজা কিম্বা তাঁহার সাহিত্য সেকালে তাঁহার নিজস্ব ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিল না।

ভূমিকা-ভাগেই উল্লেখ করিয়াছি, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য শুধু যে মধ্যযুগের সাম্প্রদায়িক সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত তাহা নহে, ইহা প্রকৃত পশ্চিম রাঢ়ভূমির জাতীয় মহাকাব্য। বিশিষ্ট ধর্ম্মোপাসনার মাহাত্ম্য বর্ণনা ব্যতীতও ইহাতে ক্রমে ক্রমে এমন জিনিস গিয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যাহাতে ইহার সত্যিকার সাম্প্রদায়িক রূপটি প্রায় প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিই ইহার প্রমাণ। ইহাদের মধ্যে ইছাই গোয়ালার বীরত্ব, কালুডোমের প্রভুভক্তি, কানড়ার তেজস্বিতা ইত্যাদি এত আকর্ষণীয় হইয়া উঠিল যে, ইহাদের প্রভাবে পড়িয়া ধর্ম্মঠাকুরের উদ্ভবের অগৌরব সকলে বিস্মৃত হইয়া গেল। ইহার কাহিনী একেবারে কাল্পনিক নহে বলিয়াই ইহাতে বর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্য দিয়া পশ্চিম রাঢ়ের বিশিষ্ট লোক-চরিত্রের মহিমাই পরোক্ষে কীর্ত্তিত হইল। এই ভাবে ইহা প্রকৃত

মানুষেরই মহিমা-জ্ঞাপক কাব্য বলিয়া একটি লৌকিক গ্রাম্য দেবতাকে আশ্রয় করিয়া হইলেও ইহার প্রসার একটু ব্যাপক হইয়া পড়িল। কাব্যের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার নামও প্রচার লাভ করিল। অন্যান্য গ্রাম্য দেবতার মত ইহার প্রচার একেবারে নিজস্ব গ্রামের সীমা-মধ্যেই আবদ্ধ রহিল না। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী মানভূম চব্বিশপরগণা এই সমস্ত জিলার অনেক স্থলেই এইজন্য এই ধর্ম্ম ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।

এই কাব্য প্রচারের কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণও ছিল। যে সময়ে সাধারণতঃ এই ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি বিশেষভাবে রচিত হইতে আরম্ভ করে সেই সময়ের রাঢ়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, তখন সে দেশে অরাজকতার যুগ। যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা দেশের আভ্যন্তরিক শান্তি একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছিল। তখন স্বভাবতঃই "দেশের লোক লাউসেনের লড়াইয়ের গান শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল।" এই সমস্ত কারণেও এই বিশেষ লৌকিক গ্রাম-দেবতাটির নাম তিন চারিটি জিলার মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিল। জাতীয় কাব্য রস-পিপাসার নিবৃত্তিই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ধর্ম্মঠাকুরের নাম একটা উপলক্ষ হইল মাত্র। অন্যান্য সাধারণ প্রস্তররূপী গ্রামদেবতার সহিত পশ্চিম রাঢ়ের ধর্ম্ম ঠাকুরের এইজন্যই এই পার্থক্যটুকু লক্ষ্য করা যায়।

ধর্ম্মমঙ্গলের কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাহার উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা করা যাইতেছে।

ধর্ম্মমঙ্গলের গল্প

ধর্ম্মপালের পুত্র তখন গৌড়ের রাজা; তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর নাম মহামদ। একদিন গৌড়েশ্বর হস্তীতে আরোহণ করিয়া শীকারে বাহির হইয়াছেন, দেখিলেন, তাঁহার একজন অত্যন্ত অনুগত প্রজা সোমঘোষ

তাঁহারই মন্ত্রীর চক্রান্তে কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি মন্ত্রীকে ভর্ৎসনা করিয়া অচিরে তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন এবং অজয়নদের তীরবর্ত্তী ত্রিষষ্ঠীর গড়ে তাঁহার অন্যতম সামন্তরাজ কর্ণসেনের উপরে তাঁহাকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। সোম ঘোষ তাঁহার শিশু পুত্র ইছাইকে লইয়া নূতন কর্ম্ম-স্থানে চলিয়া গেলেন।

কারামুক্তি

কর্ণসেন সোম ঘোষকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। কালক্রমে সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল, সে কর্ণসেনকে তাড়াইয়া দিয়া নিজেই গড়ের মালিক হইয়া বসিল, নূতন গড় নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নামকরণ করিল, ঢেঁকুর। গৌড় হইতে রাজকর আদায় করিতে আসিলে রাজার লোককে অপমানিত করিয়া দূর করিয়া দিল।

ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য গৌড়েশ্বর তাঁহার নবলক্ষ সৈন্য লইয়া ঢেঁকুর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ইছায়ের নিকট পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেলেন। যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হইল, পুত্রবধূরা সহমরণে গেল, রাণীও আত্মঘাতিনী হইলেন। শোকে দুঃখে কর্ণসেন পাগল হইয়া গেলেন।

প্রতিদানে পরাজয়

গৌড়েশ্বর কর্ণসেনের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহার পরমা সুন্দরী শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে কর্ণসেনের নিকট বিবাহ দিতে চাহিলেন। এই বিবাহের প্রতিবন্ধকও অনেক ছিল,—একে কর্ণসেন বৃদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ রঞ্জাবতী মহামদ পাত্রের অতি আদরের ভগ্নী। সে কিছুতেই বৃদ্ধ কর্ণসেনের নিকট এই ভগ্নীর বিবাহে সম্মত হইবে না। তাই রাজা রাণীর সঙ্গে যুক্তি করিয়া মহামদ পাত্রকে অন্যত্র

রঞ্জার বিবাহ

প্রেরণ করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন কর্ণসেনকে ময়নানগরের সামন্তরাজ নিযুক্ত করিয়া সস্ত্রীক সেখানে পাঠাইয়া দিলেন।

মহামদপাত্র এই সংবাদ জানিতে পারিয়া অতিশয় দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হন এবং কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধের পত্নী রঞ্জাবতীর আর মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। এদিকে রঞ্জাবতী বাড়ীর সংবাদ জানিবার জন্য মহা ব্যাকুল হইয়া উঠেন, কর্ণসেনও বিনা নিমন্ত্রণে যাইতে চাহেন না। পরে স্ত্রীর উপর্য্যুপরি অনুরোধে গৌড় যাত্রা করেন।

প্রবাসে পতিগৃহে

গৌড়েশ্বরের দরবারে প্রকাশ্যভাবে মহামদপাত্র কর্ণসেনকে অপমানিত করেন ও রঞ্জাবতীকে বন্ধ্যা বলিয়া বিদ্রূপ করেন। কর্ণসেন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাণীর নিকট সমস্ত কথা সবিস্তারে বলিলে রাণী অতিশয় মর্ম্মাহত হন এবং পুত্রলাভের জন্য নানারূপ ঔষধাদি ব্যবহার করিতে থাকেন। এই সকল চেষ্টায় ব্যর্থ মনোরথ হইয়া তিনি পুত্র লাভার্থ ধর্ম্মের পূজা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে তিনি রামাই পণ্ডিতের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করেন। রামাই পণ্ডিতের উপদেশ মত তিনি পুত্র লাভের জন্য নানারূপ কৃচ্ছ্র সাধন করিতে প্রস্তুত হন। ইহা শুনিয়া কর্ণসেন তাঁহাকে এই সমস্ত কৃচ্ছ্রসাধনে নিবারণ করেন। রঞ্জাবতী পুত্র লাভের জন্য মরিয়া হইয়া উঠেন। তিনি হরিশ্চন্দ্র রাজার রাণী মদনার কথা উল্লেখ করিয়া স্বামীর মত লইয়া শালে ভর দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে বদ্ধপরিকর হন। কর্ণসেন রঞ্জাবতীর এত আগ্রহ দেখিয়া অবশেষে এই বিষয়ে আর বারণ করেন নাই। রঞ্জাবতী ধর্ম্মের গাজন করিয়া প্রফুল্ল মনে শালে ভর দিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইহাতে দেবতাগণ মুগ্ধ হন এবং তাঁহার ভক্তিতে ধর্ম্মরাজ

পুত্র কামনায়

রঞ্জাবতীকে পুত্রলাভের বর দেন। রঞ্জাবতী জীবন ফিরিয়া পান এবং যথাসময়ে তাঁহার গর্ভে এক অতি সুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার নাম লাউসেন।

মহামদ পাত্র লাউসেনের জন্মের কথা শুনিয়াই ইন্দামেটে নামক চোরকে ময়নানগরে নবজাতশিশুকে হরণ করিয়া নিবার জন্য প্রেরণ করেন।

কুচক্রী ভ্রাতা

ইন্দামেটে লাউসেনকে হরণ করিয়া লইয়া যায় এবং পথে বিশ্রাম করিতে বসিলে হনুমানের সাহায্যে ধর্ম্মরাজ লাউসেনকে তাহার হাত হইতে রক্ষা করেন। পরে ধর্ম্মঠাকুর লাউসেনের সঙ্গে খেলার দোসর স্বরূপ কর্পূরসেনকে রঞ্জাবতীর দ্বিতীয় পুত্ররূপে দান করেন। রঞ্জাবতী পুত্রদ্বয়কে লইয়া পরম সুখে জীবন যাপন করিতে থাকেন।

যথাসময়ে লাউসেন ও কর্পূরকে মল্লবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। স্বয়ং বৈকুণ্ঠ হইতে ধর্ম্মরাজ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া হনুমান তাঁহাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ধর্ম্মঠাকুরের কৃপায় অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা মল্লবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। লাউসেনের চরিত্র-বল পরীক্ষা করিয়া একদিন পার্ব্বতী অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে নিজের হাতের অজেয় অসি দান করেন।

লাউসেন কর্পূরকে সঙ্গে লইয়া গৌড় যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী পুত্রকে গৌড় যাইতে বারণ করেন। অবশেষে তাঁহার বিশেষ অনুরোধে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অনুমতি দেন। তবে মাতার মনে বড় ভয় রহিয়া গেল, পাছে সন্তানের কোন বিপদ হয়। কর্পূর লাউসেনকে পথের নানারূপ বিপদের কথা বলিলেও লাউসেন এই সকল ভয়ে কিছুমাত্র ভীত হন না। শুভদিন দেখিয়া দুই ভাই গৌড় যাত্রা করেন।

পথে লাউসেনের কামদল বাঘের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই বাঘটী পার্ব্বতীর প্রিয় ছিল, তাই তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে লাউসেনকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। তারপর এক ভীষণ কুম্ভীরের সঙ্গেও তাঁহার যুদ্ধ হয়। কিন্তু পরিণামে ধর্ম্মঠাকুরের কৃপায় তিনিই জয়লাভ করেন। এই সকল যুদ্ধের সময় ভীরু কর্পূর প্রাণের ভয়ে ভাইকে ছাড়িয়া নিরাপদ স্থানে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতেন।

গৌড়ের পথে

অতঃপর দুই ভাই জামতিতে প্রবেশ করেন। এই স্থান অতি ভীষণ। এখানকার মেয়েরা সকলেই কুচরিত্রা। পতির নিন্দা তাহাদের দৈনন্দিন ব্যাপার। নবাগত কোন পুরুষকে পাইলেই তাহারা তাহাকে বশ করিতে চেষ্টা করে। এই নগরের নয়ানী সব চেয়ে পাপিষ্ঠা। নয়ানী লাউসেনকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, পরে ব্যর্থ মনোরথ তাহার নিজ সন্তানকে কূপে নিক্ষেপ করিয়া লাউসেনের নামে রাজদ্বারে মিথ্যা অভিযোগ করে। লাউসেন নিরুপায় হইয়া পরে ধর্ম্মের কৃপায় মৃত সন্তানের মুখে প্রকৃত সত্য কথা প্রকাশ করিয়া মিথ্যা অভিযোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন। এইবার লাউসেন গোলাহাটের দিকে যাত্রা করেন। এই গোলাহাটও স্ত্রী-প্রধান স্থান। এখানকার নারীরা স্বৈরাচারিণী। এখানে আসিলে এখানকার রাণী সুরিক্ষা লাউসেনকে বশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। অবশেষে লাউসেন সুরিক্ষার কতকগুলি হেঁয়ালির উত্তর দিয়া ধর্ম্মের কৃপায় জয়ী হইয়া পুনরায় গৌড়াভিমুখে চলিতে থাকেন।

স্ত্রীরাজ্যে

পথে এই সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া লাউসেন গৌড়ে উপস্থিত হন। এই সংবাদ মহামদ পাত্রের নিকট পৌঁছিলে তিনি

লাউসেনকে অপমানিত করিবার জন্য নানারূপ কুচক্র করিতে থাকেন। তিনি লাউসেন ও কর্পূরকে চোর বলিয়া ঘোষণা করিয়া নগরে প্রচার করিয়া দেন যে, যে চোর ধরিয়া দিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং যে চোরকে আশ্রয় দিবে তাহাকে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। লাউসেন এক তামুলির গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া তামুলিকে নিরাপদ করিবার ইচ্ছায় লাউসেন বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। এদিকে কর্পূর ভাইকে সম্মুখ বিপদে রাখিয়া নিজে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল। মহামদ পাত্রের আদেশে রাজার পাট হস্তী লাউসেনের নিকট বাঁধিয়া রাখা হইল এবং পরদিন লাউসেনকে হাতি চোর বলিয়া রাজার কারাগারে বন্দী করা হইল। লাউসেন ধর্ম্মঠাকুরের কৃপায় হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হন ও পরে মৃত হস্তীর প্রাণ দান করেন। মহামদ পাত্রের সমস্ত চক্রান্ত ধরা পড়ে। গৌড়েশ্বর লাউসেনকে চিনিতে পারিয়া যারপর নাই সুখী হন ও অশ্বশালা হইতে তাঁহাকে একটি উত্তম অশ্ব বাছিয়া লইতে আদেশ দেন। লাউসেন অশ্বশালা হইতে ইন্দ্রের অশ্বটী বাছিয়া লন এবং অবশেষে জয়মাল্যে ভূষিত ও সম্মানিত হইয়া নিজ দেশে যাত্রা করেন। পথ হইতে তিনি কালু প্রভৃতি তের জন ডোমকে সঙ্গে করিয়া নিজ দেশে ফিরেন। রঞ্জাবতী ও কর্ণসেন পুত্রদ্বয়কে পাইয়া পরম আনন্দিত হন।

মাতুলের চক্রান্ত

প্রত্যাবর্ত্তন

মহামদ পাত্র সর্ব্বদা লাউসেনের অমঙ্গল খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি লাউসেনকে হতপ্রভ করিবার ইচ্ছায় নূতন নূতন ফন্দি বাহির করিতে লাগিলেন। লাউসেন গৌড়েশ্বরের দরবার হইতে বাড়ী ফিরিবার কিছুদিন পরই মহামদ পাত্র লাউসেনকে দিয়া কামরূপের কর আদায় করিয়া আনিবার জন্য গৌড়েশ্বরকে পরামর্শ দেন। গৌড়েশ্বর

ব্যক্তিত্ব-হীন পুরুষ; মহামদ পাত্রের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। মহামদ পাত্র যখন যাহা বলেন তিনি তখনই তাহা করিতে প্রস্তুত হন। তাই মহামদ পাত্রের পরামর্শে তিনি লাউসেনকে কামরূপ প্রেরণ করেন। লাউসেন কালু ডোম সহ সসৈন্যে কামরূপ যাত্রা করেন। এদিকে ব্রহ্মপুত্রের তীরে আসিয়া দেখেন, নদীর জল কানায় কানায় পূর্ণ। এমতাবস্থায় ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া যাওয়া কঠিন। অবশেষে তিনি জানিতে পারেন যে, গৌড়েশ্বরের মাতার নিকট একটি কাটারি ও একটি জপমালা আছে; এই কাটারির স্পর্শে ব্রহ্মপুত্রের জল শুকাইয়া যায় এবং জপমালার সাহায্যে সহজেই কামরূপ জয় করা যায়। এই সংবাদ তিনি ধর্ম্মরাজ প্রেরিত হনুমানের সাহায্যে জানিতে পারেন। পরে গৌড়েশ্বরের মাতার নিকট হইতে লাউসেন কাটারি ও জপমালা চাহিয়া আনেন এবং কাটারির সাহায্যে ব্রহ্মপুত্র অতি সহজেই অতিক্রম করিয়া ও জপমালার সাহায্যে কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে মন্দির হইতে দূর করিয়া অতি সহজে কামরূপ জয় করেন। কামরূপের রাজা লাউসেনের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পরমা সুন্দরী কন্যা কলিঙ্গাকে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দেন। লাউসেন যুদ্ধে মৃত সৈন্যদিগকে প্রাণদান করিয়া সগৌরবে গৌড় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গৌড় হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে মঙ্গলকোটের রাজা গজপতির কন্যা অমলাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যান। বর্দ্ধমানের রাজাও তাঁহার কন্যা বিমলাকে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দেন। লাউসেন নব বিবাহিত পত্নীদিগকে লইয়া গৃহে ফিরিলে মাতাপিতা তাহাদিগকে পরম আহ্লাদের সহিত বরণ করিয়া লন।

কামরূপ বিজয়ে

সিমুলার রাজা হরিপালের কন্যা কানড়ার রূপ-যৌবনে মুগ্ধ হইয়া গৌড়েশ্বর বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া

ঘটক প্রেরণ করেন। পিতা বিবাহে সম্মতি দিলেন কিন্তু কানড়া তাহাতে আপত্তি করিল এবং গৌড়েশ্বরের ঘটককে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল। গৌড়েশ্বর এই অবমাননায় ক্রুদ্ধ হইয়া নব লক্ষ সৈন্য সহ যুদ্ধার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন। কানড়া গৌড়েশ্বরকে একটি লৌহ গণ্ডা দিয়া বলেন যে, যে এই লৌহ গণ্ডা এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিবে তিনি তাঁহাকেই বিবাহ করিবেন বলিয়া পণ করিয়াছেন। রাজা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য ও হাস্যাস্পদ হন। ফলে মহামদ পাত্রের পরামর্শে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে ডাকিয়া পাঠান। লাউসেন তথায় উপস্থিত হইয়া অনায়াসে গণ্ডা দ্বিখণ্ডিত করেন। কানড়া তাঁহাকেই স্বামি-রূপে বরণ করিতে চাহে। তাহাতে গৌড়েশ্বরও লাউসেনের উপর অসন্তুষ্ট হন। অবশেষে লাউসেনের সঙ্গে কানড়ার এই চুক্তিতে যুদ্ধ হয় যে, লাউসেন যদি কানড়ার হাতে পরাজিত হন তবে কানড়াকে বিবাহ করিবেন। যুদ্ধের সময় পার্ব্বতীর ছলনায় লাউসেন কানড়ার হস্তে পরাজিত হইয়া কানড়াকে বিবাহ করেন। অতঃপর কানড়াকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

কানড়ার স্বয়ম্বর

মহামদ পাত্র এইভাবে বার বার চেষ্টা করিয়াও যখন লাউসেনের কোন ক্ষতি করিতে পারিলেন না তখন আবার এক নূতন ফন্দি বাহির করিলেন। মহামদ পাত্র গৌড়েশ্বরকে ঢেকুরের কর আদায় করিয়া আনিবার জন্য লাউসেনকে প্রেরণ করিতে পরামর্শ দিলেন। গৌড়েশ্বর লাউসেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রঞ্জাবতী ও কর্ণসেন এই সংবাদ শুনিয়া অতিশয় শঙ্কাযুক্ত হইলেন; কারণ, এই ঢেকুরেই ইছাই ঘোষের হস্তে একদিন কর্ণসেন পরাজিত হইয়া ছয় পুত্রকে হারাইয়াছিলেন। লাউসেন সকলের আপত্তি অবহেলা করিয়া গৌড়েশ্বরের অনুমতি লইয়া নবলক্ষ সৈন্যসহ

অজয় নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় ইছাইর সেনাপতি লোহাটা বজ্জরের সঙ্গে তাঁহাদের ভীষণ যুদ্ধ হয়। লাউসেন লোহাটা বজ্জরের ছিন্ন মস্তক গৌড়েশ্বরের নিকট প্রেরণ করিলেন। মহামদপাত্র এই মস্তকদ্বারা লাউসেনের একটি মায়া মুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া ময়নানগরে প্রেরণ করেন। এই মায়া-মুণ্ড দেখিয়া লাউসেনের মাতাপিতা পুত্রশোকে কাতর হইয়া পড়েন এবং লাউসেনের স্ত্রী-গণ চিতায় আত্মবিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হন। এমন সময় হনুমান তাঁহাদিগের ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিয়া আশু বিপদ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন।

ইছাই বধ

ইছাই ঘোষের সঙ্গে লাউসেনের ভীষণ যুদ্ধ হয়। দুই জনই সমান বীর। লাউসেন ধর্ম্ম ঠাকুরের অনুগৃহীত আর ইছাই পার্ব্বতীর আশ্রিত। তাই এখানে মানবে মানবে যুদ্ধের চেয়ে দেবতা দেবতায়ই যুদ্ধ। একদিকে ধর্ম্ম ঠাকুর লাউসেনকে রক্ষা করিবার জন্য মহা ব্যস্ত, অপরদিকে পার্ব্বতীও তাঁহার আশ্রিতের ছিন্ন মস্তক বার বার সংযোগ করিয়া জীবিত করিতেছেন। অবশেষে লাউসেন যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে কালুডোম চরম বীরত্ব প্রকাশ করে।

এদিকে গৌড়েশ্বর মহামদপাত্রের পরামর্শে ধর্ম্মপূজার অনুষ্ঠান করিতে বিরাট আয়োজন করেন। এই পূজায় নানা কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মঠাকুর ঝড় বাদল দ্বারা পূজার সমূহ বিঘ্ন ঘটান; এই পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গৌড়েশ্বর মহামদপাত্রের পরামর্শে লাউসেনকে গৌড়েশ্বরের দরবারে আসিতে আদেশ করেন। লাউসেন রাজ্যের সমস্ত পাপ দূরীকরণের জন্য পশ্চিমে সূর্য্যোদয় করিতে হাকন্দ গমন করেন। এই পশ্চিমোদয় ধর্ম্মপূজার শ্রেষ্ঠ সাধনা। লাউসেন ধর্ম্মঠাকুরের উপর নির্ভর করিয়া এই দুরূহ

পশ্চিমোদয়

ব্রতে অগ্রসর হন। তিনি ধর্ম্মঠাকুরের নামে নিজের দেহ নবখণ্ডে ভাগ করিয়া তাহাদ্বারা আহুতি দিয়া তপস্যা করেন। যখন লাউসেন এইভাবে নিজের প্রাণপাত তপস্যায় নিমগ্ন তখন মহামদপাত্র পুনরায় নূতন এক চক্রান্ত বাহির করিলেন। এইবার স্বয়ং মহামদপাত্র লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে ময়নানগর আক্রমণ করেন। লখাই ডোমনীর সঙ্গে মহামদপাত্রের সৈন্য-বাহিনীর ভীষণ যুদ্ধ হয়। একা লখাই ডোমনী এই বিপুল সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া শত্রুসৈন্যকে নদীর অপর তীরে তাড়াইয়া দেয়। কালু নিজের সত্য রক্ষার্থে বিশ্বাসঘাতকের হাতে নিজ প্রাণ বলি দেয়। পরে কানড়া পার্ব্বতীর বরে মহামদপাত্রকে পরাজিত করিয়া বাঁধিয়া লইয়া যায় এবং মুখে চূণকালী দিয়া অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

এই যুদ্ধের সংবাদ শুনিয়া লাউসেন অতিশয় দুঃখিত হন। ধর্ম্মঠাকুর তাঁহার অক্লান্ত সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া অমাবস্যার রাত্রে সূর্য্য দেবকে পশ্চিম দিকে উদিত হইতে আদেশ দেন। তারপর লাউসেন সগৌরবে গৌড়েশ্বরের দরবারে উপস্থিত হন। এদিকে পহামদপাত্র লাউসেনের পশ্চিমে সূর্য্যোদয় যে মিথ্যা এই বিষয় প্রমাণিত করিবার জন্য ঘুস দিয়া হরিহর বাইতিকে বাধ্য করিয়া রাখেন। কিন্তু হরিহর ধর্ম্মভয়ে সত্য কথা বলিয়া ফেলে। মহামদপাত্র নিজের সাক্ষীর কথায় নিজেই লজ্জিত হন। মহামদ পাত্রের এই সকল অপকর্ম্মের জন্য ধর্ম্মঠাকুর তাহার উপর অসন্তুষ্ট হন, ফলে তাহার সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠরোগ হয়। লাউসেন তাঁহার প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া ধর্ম্মের কৃপায় তাহাকে রোগ হইতে আরোগ্য করেন বটে, কিন্তু তাহার দুষ্কর্ম্মের শাস্তিস্বরূপ তাহার মুখে একটী চিহ্ন থাকিয়া যায়। লাউসেন এইভাবে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা মর্ত্ত্যে প্রচার করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

মহামদের পরিণাম

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মমঙ্গলের এই কাহিনী ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে তাহা শুধু কবি-কল্পনায় কিছু কিছু পল্লবিত হইয়াছে, এই মাত্র। ধর্ম্মমঙ্গলের বিভিন্ন কবিগণ ইহার কাহিনীগত ঐক্য সর্ব্বত্রই প্রায় রক্ষা করিয়াছেন। অবশ্য এই কাব্য একই স্থানে বিকাশ লাভ করিয়াছিল বলিয়া ইহাতে কাহিনীর এই ঐক্য নষ্ট হইবার কোন কারণও ছিলনা। এই কাব্যোক্ত চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আলোচনা করা যাইতেছে।

কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য

কাহিনীভাগে উল্লিখিত আছে যে, ধর্ম্মপালের পুত্র যখন গৌড়ের অধিপতি তখন তাঁহার সামন্তরাজ সোম ঘোষের পুত্র ইছাই বিদ্রোহী হয়। কিন্তু কোন ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেই ধর্ম্মপালের পুত্রের নামটির উল্লেখ নাই।

গৌড়েশ্বর

ঘনরাম চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,

> "ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।
> প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর॥
> পৃথিবী পালিয়া স্বর্গ ভুঞ্জে নৃপবর।
> বীর্য্যবন্ত পুত্র তার গৌড়ের ঈশ্বর॥"

রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গলেও পাই

> "মহী নব রাজা সুধর্ম্মপাল রায়।
> তার পুত্র রাজা হয় শুনিতে উল্লাস॥" [১]

তাহা হইলে এই ধর্ম্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বর কে? পাল রাজদিগের বংশতালিকা লইয়া ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে গোলযোগ আছে সেইজন্য এই সম্বন্ধেও নানাজনে নানামত পোষণ করেন।

---

১ "সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন পুঁথিশালায় রক্ষিত রূপরামের পুঁথি।

সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত শূন্যপুরাণের ভূমিকায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাংলার প্রাচীন বংশাবলীর উপর নির্ভর করিয়া এই ধর্ম্মপালের পুত্র দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল বলিয়া একজন গৌড়ের পালরাজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ হইতে দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল বলিয়া কাহাকেও উদ্ধার করা যায় না। এই পালরাজদিগের বংশাবলী সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যতদূর আলোচনা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ধর্ম্মপালের পুত্র দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল বলিয়া কেহ নাই।

পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল পালরাজদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে পাল-সাম্রাজ্য উত্তর ভারতে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। রাজা ধর্ম্মপাল 'পরম ভট্টারক', 'পরমেশ্বর', 'মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি রাজগৌরব সূচক পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী সমাজে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল, সেজন্য তাঁহার পুত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁহারই নামোল্লেখ করা হইয়াছে।

ধর্ম্মপাল

এই ধর্ম্মপালের পুত্রের নাম দেবপাল। তিনি আনুমানিক ৮১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। তিনি তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা জয়পালের সাহায্যে উৎকল বা কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় করেন।[১] পালরাজদিগের ভাগলপুর তাম্র শাসনে উল্লিখিত আছে যে, দেবপালের সেনাপতি জয়পাল উৎকলের রাজাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজাকেও পরাজিত করেন। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে গৌড়েশ্বরের একজন সামন্ত রাজপুত্রকর্ত্তৃক এই দুইটি উল্লেখযোগ্য অভিযানের কথাই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। তবে কলিঙ্গ বিজয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে

দেবপাল

১ Early History of Bengal (P. L. Paul) Pg. 47.

কিছু উল্লেখ নাই; সামান্য একটি ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, ধর্ম্মমঙ্গলের কবিগণ ইহা হইতে লাউসেনকর্ত্তৃক কলিঙ্গ বিজয়ের কথাই উল্লেখ করিতেছেন। ইঙ্গিতটি এই যে, তাঁহারা লিখিয়াছেন, কামরূপের রাজা কর্পূর ধলের কন্যার নাম কলিঙ্গা। কিন্তু কামরূপ-পতির কন্যার নাম কলিঙ্গা হইতে পারে না। ইহা দ্বারা বিজিত' কলিঙ্গ রাজেরই কন্যার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তবে ধর্ম্মমঙ্গলের কবিদিগের ভ্রমবশতঃ কামরূপের অধিপতির সঙ্গে কলিঙ্গ রাজ কন্যার নাম আসিয়া যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। লাউসেন কর্ত্তৃক কলিঙ্গ ও কামরূপ বিজয়ের দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনী একত্র মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

কলিঙ্গরাজ কন্যার নাম

স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত রামচরিতের ভূমিকায় ধর্ম্মমঙ্গলোক্ত ধর্ম্মপালের পুত্র এই গৌড়েশ্বরকে দেবপাল বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, লাউসেন ও ইছাই ঘোষ এই দেবপালেরই দুইজন সামন্ত রাজা ছিলেন। ইতিহাসে দেবপালের সহিত কামরূপ ও কলিঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতেও তদনুরূপ কাহিনীর সমাবেশ হইতেই অনেকে এই মতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।[১]

কিন্তু ইহার মধ্যে একটু গোলযোগ আছে। একখানি তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঢেক্করী বিষয়ের সামন্ত রাজা মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ নিব্বোক শর্ম্মা নামক একজন ব্রাহ্মণকে দিগ্‌ঘ্যাসোদিয়া নামে একখানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর দান করিতেছেন। তাম্র শাসন খানিতে কোন তারিখের উল্লেখ নাই, কিন্তু স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ লিপিবিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন, ইহা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই ঈশ্বর ঘোষ

ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন

১ শ্রীধর্ম্মপুরাণ, (শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়) ভূমিকা, পৃঃ ১।.

ও ধর্ম্মমঙ্গল কাহিনীর ইছাই ঘোষ অভিন্ন; ঢেক্করী ও ঢেকুর একই স্থানের নাম। তাম্র শাসনে উল্লিখিত আছে, ঈশ্বর ঘোষের পিতার নাম ধবল ঘোষ, কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গলের কাহিনীতে ইছাই ঘোষের পিতার নাম সোম ঘোষ। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করেন, "একজনের দুইরূপ নাম থাকা অসম্ভব নয়। কিম্বা ময়ূর ভট্ট প্রকৃত নাম বিস্মৃত হইয়া অর্থ চিন্তা করিয়া 'সোম' নাম রাখিয়াছেন।"[১]

ধর্ম্মমঙ্গলের ইছাই ও তাম্র শাসনের ঈশ্বর ঘোষ যদি অভিন্ন হয় এবং খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে যদি ঈশ্বর ঘোষ তাম্র শাসন লিখাইয়া থাকেন তাহা হইলে এই সময়ে গৌড়েশ্বর দেবপালকে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, দেবপালের সময় আনুমানিক নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ বলিয়া ঐতিহাসিকেরা অনুমান করিয়াছেন। অতএব ধর্ম্মমঙ্গল কাহিনীর মতে এই তাম্র-শাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষ দেবপালের সামন্ত রাজা হইতে পারেন না। দেখা যাইতেছে, ঈশ্বর ঘোষ আরও প্রায় তিন শত বৎসর পর আবির্ভূত হন।

সেইজন্য কেহ আবার অনুমান করেন, হয়ত এই গৌড়েশ্বর বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেন।[২] তিনি দ্বাদশ শতকেই গৌড়ের অধিপতি ছিলেন, তাঁহারই সামন্ত রাজা ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার সেনাপতি লাউসেনের হস্তে পরাজিত হন।[৩]

গৌড়েশ্বর কি লক্ষ্মণসেন ?

১ 'শূন্যপুরাণ'—সা-প-প (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়) ১৩৩৮ সাল, পৃঃ ৭৯।

২ ঐ,

৩ "লক্ষ্মণসেনদেব কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। হয়ত লাউসেন তাঁহার এক সামন্ত সেনাপতি ছিলেন, উভয়ের নামে সেন দেখিয়া মনে হয়, তাঁহাদের মধ্যে বন্ধু-সম্বন্ধ ছিল।"—সা-প-পত্রিকা, ১৩৩৮ সাল, পৃঃ ৮০। 'শূন্যপুরাণ' (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়)।

কিন্তু এই ধারণা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সেনরাজদিগের রাঢ়ভূমির উপরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব ছিল। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম রাঢ়েই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তথাকার কোন সামন্ত রাজের সঙ্গে লক্ষ্মণসেনের যুদ্ধ বিগ্রহের কোন ইঙ্গিত ইতিহাসেও পাওয়া যায় না। অথচ পালরাজদিগের সঙ্গে এই রাঢ়ের নিত্য যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পালরাজগণ উত্তর ভারতে বহুদূর রাজ্য বিস্তৃত করিলেও তাঁহাদের রাঢ় ও বঙ্গে অধিকার স্থাপন করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে। বস্তুতঃ ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি পাল রাজদিগের রাঢ়ে এই বিদ্রোহ দমনের কাহিনী লইয়াই রচিত। একথা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি।

বিশেষতঃ ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি এক বাক্যে গৌড়েশ্বরকে ধর্ম্মপালের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিতেছে। লক্ষ্মণসেন বহু পরবর্ত্তী কালের লোক। অথচ ধর্ম্মমঙ্গলের কবিদিগের তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী একজন রাজার নামোল্লেখ করিবারও কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারেনা।

অতএব মনে হয়, তাম্র-শাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বিশেষতঃ ধর্ম্মমঙ্গল সমূহে প্রদত্ত তাঁহার পিতার নামের সহিত এই তাম্র-শাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষের পিতার নামের ঐক্য নাই। সোম ঘোষও সংস্কৃত নাম,

ঈশ্বর ঘোষ কে ?

অতএব ইহাও অসম্ভব যে, ইছাই ঘোষ নিজের নামকে সংস্কৃত করিয়া যেমন ঈশ্বর ঘোষ করিয়াছেন তেমনই পিতারও লৌকিক নামের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত নাম ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম সোম ঘোষ হইলে তিনি স্বচ্ছন্দে তাঁহা সংস্কৃত তাম্র শাসনে ব্যবহার করিতে পারিতেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুমান করেন, এই তাম্রশাসনোক্ত ঢেক্করী রাঢ়ের অন্তর্গত নহে বরং আসাম-প্রদেশের অন্তর্গত

গোয়ালপাড়া জিলায় অবস্থিত। আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের অনেকেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।[১] এই ঈশ্বরঘোষ তাঁহার তাম্রশাসনে কোন সার্ব্বভৌম রাজার অধীনতার কথা উল্লেখ করেন নাই, ইহাতে মনে হয়, দ্বাদশ শতাব্দীতে পালরাজগণ যখন হতবল হইয়া পড়িতেছিলেন তখন তাঁহাদের এই একজন সামন্ত রাজা নিজেকে স্বাধীন বলিয়াই বিবেচনা করিতেছিলেন। মনে হয়, তিনি রামপালের সমসাময়িক, অতএব দ্বাদশ শতাব্দীতে তাঁহার পক্ষে উক্ত তাম্রশাসন লিপিবদ্ধ করা কিছুই অসম্ভব নহে।

তাহা হইলে ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যোক্ত গৌড়েশ্বর দেবপাল হইবার পক্ষে আর কোন বাধা নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেবপাল কামরূপ এবং উৎকল জয় করিয়াছিলেন। ভাগলপুরের তাম্রশাসনে পাওয়া যায় এই উৎকল ও কামরূপ বিজয়ে তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা জয়পালই সেনাপতির কার্য্য করিয়াছেন। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায়, কামরূপ বিজয়ে তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল, এক সামন্ত রাজের পুত্র লাউসেন। এই লাউসেন ও জয়পাল কি এক?

লাউসেন

কিন্তু জয়পালের পিতৃ-পরিচয় আছে। জয়পালের পিতা পালরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের দ্বিতীয় পুত্র বাক্‌পাল। গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল হইতে যেমন দেবপাল, তেমনি বাক্‌পাল হইতে জয়পাল; এই সূত্রে দেবপাল ও জয়পাল খুল্লতাত ভ্রাতা। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গল কাহিনীতে

---

১ "Isvaraghosa was most probably a feudatory ruler on the North-eastern frontier of the Pala empire and issued his gran during the troublesome days of the Kaivarta revolt. This i in a way strengthened by the fact that after the suppression o the Kaivarta rebellion Ramapala sent a general to conque Kamrupa." Early History of Bengal (P. L. Paul) Pg. 150

লাউসেনের পিতা কর্ণসেন। অতএব জয়পাল ও লাউসেন এক হইতে পারে না। ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্য ব্যতীত লাউসেনের কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমন কি, শূন্য পুরাণেও লাউসেনের নাম নাই। অতএব ঐতিহাসিক কোন সূত্রে তাঁহার পরিচয় সন্ধান করা অসম্ভব।

কিন্তু লাউসেনের কাহিনী একেবারেই অনৈতিহাসিক বলিয়াও উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলির একমাত্র নায়কই এই লাউসেন, অতএব একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া এত বড় একটা ঐতিহাসিক কাব্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। সেইজন্য মনে হয়, ইহার মূলে সামান্য হইলেও ঐতিহাসিক ভিত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গলের রচয়িতৃগণ তাহার উপরে কল্পনার এত বিরাট সৌধ তুলিয়াছেন যে, তাহার নীচ হইতে তাহার চরিত্রের ঐতিহাসিক পরিচয়টি উদ্ধার করা একপ্রকার দুস্কর হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য অনেকেই তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান হইয়াছেন।

কিন্তু লাউসেনের নাম যে একমাত্র ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতেই উক্ত হইয়াছে তাহা নহে, বাঙ্গালা পঞ্জিকায় কলিকালের রাজচক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে লাউসেনের নামও অদ্যাবধি উক্ত হইয়া থাকে। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ লবসেন নামক গৌড়ের একজন রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, অবশ্য তারানাথের উক্তির কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই, তথাপি তিনি যে বিশেষ একটি লোক-প্রবাদ হইতেই তাঁহার ইতিহাসে লবসেনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেকে এই লবসেন ও লাউসেনকে অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন। "বর্দ্ধমান জেলার অজয় নদের দক্ষিণে ইছাই ঘোষের দেউল আছে। ইহার নিকটে 'লাউসেন কুণ্ড' নামে এক পুকুর আছে। সে অঞ্চলের ডোমেরা ১৩ই বৈশাখ এই পুকুরে স্নান করিয়া

স্বজাতি কালুবীরের তর্পণ করিয়া থাকেন।”[১] ধর্ম্মের নিকট মানসিক করিয়া পুত্র লাভ করিলে সাধারণতঃ রাঢ়ভূমিতে সেই ছেলের নাম রাখা হয় লুইধর কিম্বা লাউসেন।

এই সমস্ত কারণে মনে হয়, লাউসেন নিতান্তই অনৈতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না। তবে তাঁহার পরিচয় কি, কোন কালেই বা তিনি বর্ত্তমান ছিলেন?

শূন্যপুরাণে লাউসেনের কোন উল্লেখ নাই। এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। কিন্তু অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দীতে সঙ্কলিত ধর্ম্মপূজার মাহাত্ম্যসূচক এই গ্রন্থখানিতে ধর্ম্মভক্ত লাউসেনের কোন উল্লেখ না দেখিয়া মনে হয়, ধর্ম্মপূজার স্বতন্ত্র কোন কাহিনীর ধারা (tradition) হইতে তিনি আসিয়াছেন, ধর্ম্মপূজার মৌলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার কোন সংযোগ ছিল না। প্রাচীনতম ধর্ম্মসাহিত্যের কাহিনীর নায়ক এক পৌরাণিক রাজা হরিশ্চন্দ্র, তাঁহার সম্বন্ধেও পরে আলোচনা করিয়াছি। সম্ভবতঃ ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্টই লাউসেনের কাহিনীর সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। কারণ, পরবর্ত্তী সমস্ত ধর্ম্মমঙ্গলের কবিই এই বিষয়ে আদি কবি ময়ূরভট্টের পথানুসরণ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লাউসেন ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে প্রবেশ করিবার পর উক্ত হরিশ্চন্দ্র রাজার অনৈতিহাসিক কাহিনী ইহাতে অত্যন্ত অপ্রধান হইয়া পড়িল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনীই ধর্ম্মসাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ধর্ম্ম-সাহিত্যের উদ্ভবের কিছুকাল পরে লাউসেনের আবির্ভাব হয়।

---

১ 'শূন্যপুরাণ', সা—প—পত্রিকা, ১৩৩৮, পৃঃ ৮৩; 'বীরভূম বিবরণ', ১ম খণ্ড, 'শ্যামারূপার গড়' দ্রষ্টব্য।

লাউসেনের পিতার নাম কর্ণসেন। তিনি গৌড়েশ্বরের অধীন ত্রিষষ্ঠীর গড় বা ঢেকুরের সামন্ত রাজা ছিলেন। বর্দ্ধমান জিলার পশ্চিম সীমান্তে সেন পাহাড়ী পরগণায় বর্ত্তমান গৌরাণ্ডি গ্রামের নিকট কর্ণগড় নামে একটি স্থান প্রাচীন মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই কর্ণগড়েই কর্ণসেনের বাস ছিল। অতঃপর ইছাই ঘোষ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া তিনি দক্ষিণে ময়নানগরে চলিয়া যান এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র লাউসেন গৌড়ের অধীনস্থ সামন্ত রাজা হন।

ইতিহাসে পাই, দেবপাল উৎকল বা কলিঙ্গ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মেদিনীপুরের দক্ষিণ পশ্চিম অংশ প্রাচীন উৎকলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ দেবপাল লাউসেনকে তাঁহার এই বিজিত রাজ্যের সামন্ত রাজা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ময়নানগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

ময়নানগর কোথায়?

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, ময়নানগর রাঢ়ভূমির দক্ষিণে এবং সমুদ্রের একেবারে তীরবর্ত্তী। ঘনরাম চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,

"ময়নানগর বাটি সাগর সমীপ।" পৃঃ ১২৯

ইহা হইতেই কেহ কেহ তাহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমার দক্ষিণভাগে অবস্থিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। অবশ্য ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর ভৌগোলিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া এই স্থানের সন্ধান করিলে যে সুফল পাওয়া যাইবে না, তাহা নিশ্চিত। সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, যাহা দক্ষিণে বহু দূরে অবস্থিত তাহাই সমুদ্রের তীরে হইবে। এই অনুমান হইতেই যে ঘনরাম এই রকম উক্তি করিয়াছেন তাহাতে কোন ভুল নাই। অতএব ইহাকে

একেবারে গিয়া প্রকৃতই সমুদ্রের তীরে সন্ধান করিবার কোন কারণ দেখি না। বিশেষতঃ তমলুক মহকুমার কোন স্থানে ধর্ম্মপূজা প্রচলিত নাই, অতএব ধর্ম্মের একজন প্রধান সেবক এমন 'পাণ্ডব-বর্জ্জিত' দেশে গিয়া পড়িবেন, ইহা কখনই কল্পনা করা যায় না। প্রাচীন ভগ্নস্তূপই একমাত্র প্রমাণ হইতে পারে না; স্থানীয় সংস্কারও ইহার মধ্যে একটি অতি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। সেইজন্য আমাদের মনে হয়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন [১] তাহা কতকটা সমীচীন। তিনি বলিয়াছেন, বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বর্ত্তমান "ময়নাপুরই ময়নানগর। কারণ, এই গ্রামে রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ এতকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়া আছেন। গ্রামে পাঁচটি ধর্ম্মশিলা প্রতিষ্ঠিত আছেন—যাত্রাসিদ্ধি, বাঁকুড়া রায়, ক্ষুদি রায়, শীতল নারায়ণ ও চাঁদ রায়।" এই গ্রামে বিষ্ণুপুর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ এখনও বর্ত্তমান আছেন। অতএব ইহার স্থানীয় সংস্কার হইতেও মনে হয়, ইহার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। লাউসেনের ময়নানগর এখানে থাকা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

ইছাই ঘোষ

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাম্রশাসনের ঈশ্বর ঘোষ ও ধর্ম্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষ এক ব্যক্তি নহে। অনেকে অবশ্য লিপি বিশেষজ্ঞদিগের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়াও তাম্রশাসনের ঈশ্বর ঘোষকে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে লইয়া গিয়া ধর্ম্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষের সঙ্গে অভিন্নতা সম্পাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, লিপি-বিশেষজ্ঞদিগের মত অগ্রাহ্য করিবার পূর্ব্বে তাহার যথেষ্ট কারণ প্রদর্শন করাইয়া লওয়া প্রয়োজন। শুধু

১ শূন্য পুরাণ, ভূমিকা (চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) পৃঃ ৭৩

ইছাই ঘোষ ও ঈশ্বর ঘোষের নামের সামঞ্জস্য হইতেই বিজ্ঞান-সম্মত একটি প্রমাণকে এত সহজে উপেক্ষা করা যায় না। তদুপরি সোম ঘোষ ধবল ঘোষ, ঢেক্করী ঢেকুর ইহাদের মধ্যেও নিঃসন্দেহে অভিন্নতা কল্পনা করা যায় না।

কেহ আবার এই তাম্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষকে ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যের ইছাই গোয়ালার বংশধর বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর পালবংশের রাজা রামপালের সভায় আগত যে ঢেক্করীর এক সামন্ত রাজা প্রতাপ সিংহের [১] উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনিও সেই মতে ঈশ্বর ঘোষেরই বংশধর। কিন্তু নামের পদবী দিয়া মনে হয় প্রতাপ সিংহ স্বতন্ত্র বংশের লোক, অতএব ঢেকুর ও ঢেক্করী এক নহে।

তাহা হইলে ইছাই ঘোষ কি একেবারে কাল্পনিক? এই সম্বন্ধে একমাত্র প্রাচীন কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করা ছাড়া আর উপায় নাই। কিম্বদন্তীর মূলেও কিছু না কিছু সত্য থাকে। সেইজন্য এই সম্বন্ধেও যথাসম্ভব আলোচনা করা যাইতেছে।

অজয় নদের তীরবর্ত্তী জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুলির পূর্ব্বদিকে এক বিস্তীর্ণ অরণ্য আছে। এই অরণ্যের নাম শ্যামরূপার গড়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, ইহাই ঢেকুর বা ত্রিষষ্ঠীর গড়। এখানে ইছাই গোয়ালার পূজিত ভবানীর দেউল ছিল; অরণ্যমধ্যে এখনও একটি চতুষ্কোণ ভগ্ন দেউল আছে, লোকে বলে, ইহাই সেই প্রাচীন দেউল। কিন্তু মন্দির বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন, দেউলটি আধুনিক। দেউলের ভিতরেও কোন দেবতা নাই, আবদ্ধ একটি কৌটার মত জিনিসের পূজা হয়। প্রাচীন

১ 'রামচরিত' (৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত) ২।৫ শ্লোক।

মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,[১] এখানেই কর্ণগড় অবস্থিত ছিল। কেহ মনে করেন, "এখানে কর্ণসেনের বাড়ী ছিল, এবং এখানে তিনি পরাজিত হইয়া দক্ষিণে পলায়ন করিয়াছিলেন"।[২]

বঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে অজয় নদের দক্ষিণ-তীরে সেন পাহাড়ী পরগণার অন্তর্গত গৌরাণ্ডি নামে একটি স্থান আছে। এখানে ইছাই গোয়ালার রাজধানী ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ইহার অদূরে অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী বর্ত্তমান। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য হইতে জানিতে পারা যায়, ইছাই গোয়ালার গড় পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ঘনরাম লিখিয়াছেন,

"চৌদিকে পাহাড় বেড়ি বাড়ী গড়
দুর্গম গহন কাটি।
করিয়া চত্বর বসাল নগর
রাজার বসত বাটি॥"—পৃঃ ১৫

এখানে একটি আনুমানিক ৫০০ শত বৎসরের প্রাচীন মন্দির আছে। সেন পাহাড়ী পরগণার নামেও সেন রহিয়াছে, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, "গৌরাণ্ডির কিম্বদন্তী সত্য হইতে পারে"।[৩]

অবশ্য সেন পাহাড়ী কিম্বা সেনভূম পরগণার নাম হইতেই ইহার সহিত কর্ণসেনের কোন সম্পর্ক কল্পনা করা সমীচীন নহে। কারণ, একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাংলার সেন রাজবংশের প্রথম কয়েকজন রাজা এই অঞ্চলেই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। অতএব লক্ষ্মণ সেন, বল্লাল সেনের পূর্ব্ব পুরুষের নাম অনুসারেই যে স্থানীয় পরগণাগুলির নাম

১ Major Rennellএর Bengal Atlas দ্রষ্টব্য।

২ 'শূন্যপুরাণ' (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়) সা-প-পত্রিকা, পৃঃ ৭৯, সাল ১৩৩৮।

৩ 'শূন্যপুরাণ' (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়) সা-প-পত্রিকা, ৩৮ ভাগ, পৃঃ ৭৯ পাদটীকা।

সেনভূম ও সেনপাহাড়ী হইয়াছে, এ বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারি। কারণ, তাঁহারাই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই বিষয়ে বর্দ্ধমান গেজেটিয়ারে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাও সমর্থনযোগ্য নহে।[১]

উক্ত কিম্বদন্তী দুইটি বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, সম্ভবতঃ ইছাই গোয়ালা বর্ত্তমান গৌরাণ্ডির নিকটেই তাঁহার পার্ব্বত্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তবে যে মন্দিরটি বর্ত্তমানে তথায় ভগ্নদশায় পতিত হইয়া আছে, তাহা ইছাই গোয়ালার ভবানী-মন্দির ছিল না, তাহা নিশ্চিত। অবশ্য মন্দির পরবর্ত্তী কালেও নির্ম্মিত হইতে পারে।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেনের পিতা কর্ণসেনকেও কেহ কেহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। মালদহে অনুষ্ঠিত শিবের গাজনে যে লৌকিক ছড়া গীত হইয়া থাকে তাহাতে উক্ত হয়,

"কাউসেন দত্তের বেটা নয়সেন দত্ত।
যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত॥"[২]

সাধারণের বিশ্বাস, এই কাউসেন কর্ণসেন ও নয়সেন লাউসেন। অবশ্য ধর্ম্মঠাকুরের সঙ্গে শিব যে সময় অভিন্ন হইয়াছিলেন তখনই

কর্ণসেন

লাউসেনকে শিবপূজার প্রবর্ত্তক বলিয়াও কথিত হওয়া আশ্চর্য্য কিছুই নহে। এই সমস্ত লোক-প্রবাদেরও বিশেষ একটা মূল্য আছে। মনে হয়, লাউসেনের পিতৃপরিচয়ও সাধারণের অজ্ঞাত ছিল না, অতএব কর্ণসেনও সমসাময়িক সমাজে বিশেষ পরিচিত

১ বর্দ্ধমান গেজেটীয়ারে উক্ত হইয়াছে যে, বর্দ্ধমানের রাজা চিত্রসেনের নামানুসারে এই পরগণাগুলির এই মত নামকরণ হইয়াছে।

২ বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, পৃঃ ১৫৭।

ব্যক্তিই ছিলেন এবং পুত্রের প্রতিষ্ঠা কতকটা এই পিতৃ-পরিচয়ের উপরও নির্ভর করিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ময়ূর ভট্টের ধর্ম্মপুরাণ বলিয়া একখানি পুস্তক সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লাউসেনের পূর্ব্বাপর এই প্রকার বংশ পরিচয় পাওয়া যায়,

'কনকসেনের পুত্র নাম কর্ণসেন।
গৌড়ের অধীন প্রজা পালন করেন॥
ধর্ম্মের কৃপায় তার হইল তনয়।
লাউসেন নাম ধরে সর্ব্বগুণময়॥
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য তিনি প্রকাশ করিল।
চিত্রসেন নামেতে তাহার পুত্র হইল॥
চিত্রেসেনের পুত্র নাম ধর্ম্মসেন।
রামের সমান প্রজা পালন করেন॥"—পৃঃ ২

অবশ্য এই পুস্তকখানির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে, সে কথা পরে আলোচনা করিয়াছি। অতএব স্বতন্ত্র কোন ঐতিহাসিক সমর্থন ব্যতীত ইহা হইতে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্যের আবিষ্কার করা যায় না।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ণসেনকে বল্লাল সেনের বংশের কেহ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[১] কিন্তু কর্ণসেন যদি গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালের সমসাময়িক লোক হন তাহা হইলে দেখা যায় তখনও সেন বংশের পূর্ব্বপুরুষেরা কেহই বাংলাদেশে আগমন করেন নাই। অবশ্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ণসেনের পুত্র লাউসেনকে লক্ষ্মণ-

১ শূন্যপুরাণ সা-প-পত্রিকা, ৩৮ ভাগ, পৃঃ ৭৯

সেনের সেনাপতি ও তাঁহার আত্মীয় বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহার মতে কর্ণসেন সেন বংশের কেহ হইতে পারেন, কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই যুক্তি সমর্থন যোগ্য নহে। অতএব কর্ণসেনের সঙ্গে বাংলার সেন রাজ বংশের কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কর্ণসেনেরও অস্তিত্বের কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, লাউসেনের মত তাঁহারও ব্যক্তিত্ব অনুমানের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

হরিশ্চন্দ্র রাজার গল্প

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে হরিশ্চন্দ্রের পালা নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। লাউসেন যেমন নিজের দেহ নবখণ্ড করিয়া কাটিয়া ধর্ম্মের পূজা করিয়াছিলেন, এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে রাজা হরিশ্চন্দ্রও তেমনই ধর্ম্মের আদেশে নিজের পুত্রকে বলিদান করিয়াছিলেন। লাউসেনের কাহিনী ধর্ম্ম সাহিত্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই তাহাতে কীর্ত্তিত হইত, বলিয়া মনে হয়। কারণ প্রাচীনতর ধর্ম্ম সাহিত্যে এই লাউসেনের কাহিনী নাই, হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই আছে। এই কাহিনীটির কতকগুলি বিষয়ে একটু বিশেষ গুরুত্ব আছে। সেইজন্য সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করিতেছি,—নিঃসন্তান রাজা হরিশ্চন্দ্র (বা হরিচন্দ্র) মহিষী মদনাকে লইয়া একদিন মনের দুঃখে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে বল্লুকা নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল, সন্ন্যাসী ছদ্মবেশী ধর্ম্ম। সন্ন্যাসীর নিকট রাজা তাঁহার দুঃখের কথা জানাইলেন, শুনিয়া সন্ন্যাসী রাজাকে পুত্রলাভের বর দিলেন, কিন্তু সর্ত্ত রহিল, পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে বলি দিতে হইবে। রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। যথা সময়ে তাঁহার এক পুত্র হইল, তাহার নাম রাখিলেন, লুইচন্দ্র (বা লুইদাস)। পুত্র পাইয়া রাজা অঙ্গীকারের কথা বিস্মৃত হইলেন।

একদিন সেই ধর্ম্মরূপী সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া রাজবাড়ীতে আসিয়া অতিথি হইলেন। রাজাকে জানাইলেন, রাজপুত্র লুহিচন্দ্রের মাংস ব্যতীত অন্য কিছু তিনি আহার করিবেন না। রাজা ও রাণীর অনেক কাতর অনুনয় সত্ত্বেও তিনি নরমাংস ভক্ষণের অভিলাষ ত্যাগ করিলেন না। অগত্যা রাজারাণী লুইচন্দ্রকে কাটিয়া তাহার মাংস রন্ধন করিয়া অতিথিকে পরিবেশন করিলেন। অতিথি সেই মাংস তিন থালে পরিবেশন করিতে বলিলেন, তিনি একা সেই মাংস খাইবেন না, রাজা ও রাণীকেও তাঁহার সঙ্গে বসিয়া খাইতে হইবে। তিন জনেই খাইতে বসিলেন, রাজা গ্রাস তুলিতে যাইবেন, এমন সময় অতিথি রাজার হাত ধরিয়া ফেলিয়া আত্ম-পরিচয় দিলেন। রাজদম্পতির ভক্তিতে অসীম সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বর দিতে চাহিলেন। রাজারাণী পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। ধর্ম্ম বলিলেন, লুইচন্দ্র জীবিত আছে, সে গাজনে বেত হাতে করিয়া নাচিতেছে। রাজারাণী পুত্র ফিরিয়া পাইলেন।

এই কাহিনীটি অত্যন্ত প্রাচীন। কারণ, বাংলা দেশে প্রচলিত দাতাকর্ণের উপাখ্যানটিও এই কাহিনীরই অনুরূপ এবং তাহাও এই হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী হইতেই আসিয়াছে বলিয়া কেহ অনুমান করিয়াছেন।[১] কর্ণের নামের সহিত এই কাহিনী পরবর্ত্তী কালে এই দেশে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে বলিয়া সংস্কৃত মহাভারতে এই কাহিনী দৃষ্টিগোচর হয় না। এমন কি, কাশীরাম দাসের মহাভারতেও ইহা নাই। ১০৬২ বঙ্গাব্দের একখানি বাংলা পুঁথিতে দ্বিজ কবিচন্দ্র রচিত দাতাকর্ণের কাহিনীটি পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনি হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীকে একটা বিশেষ আভিজাত্য দিবার জন্য তাহার সহিত আনিয়া কর্ণের নাম সংযোগ করিয়াছেন।

১ 'ধর্ম্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র পালা' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্) বঙ্গশ্রী, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩১৭,

কেহ কেহ আবার মনে করেন, এই হরিশ্চন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের মতে এই হরিশ্চন্দ্র ঢাকা জিলার অন্তর্গত সাভারের রাজা ছিলেন। তাঁহারই দুই কন্যা অদুনা ও পদুনাকে ত্রিপুরার রাজা গোপীচন্দ্র বিবাহ করেন। কিন্তু কতকগুলি কারণে এই মত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। প্রথমতঃ সাভারের এই হরিশ্চন্দ্র রাজা যে পুত্র বলিদান করিয়াছিলেন এই সম্পর্কে কোন লোক-প্রবাদ পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত নাই। বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্মঠাকুরের পূজাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অতএব পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন একটি রাজবংশের একজন খ্যাতনামা রাজা এই ধর্ম্ম ঠাকুরের এত বড় একজন ভক্ত হইবেন তাহা কখনই অনুমান করা যাইতে পারে না। তাহা হইলে গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের মত নানা লোক-গাথায় রাজার এই অপূর্ব্ব অতিথি-সৎকারের কথা পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত হইয়া পড়িত, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের কোন সাহিত্যেই তাহার কোন প্রমাণ নাই; বিশেষতঃ সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র যে সময়ের লোক তাহার পূর্ব্বেই হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী পশ্চিম বঙ্গের ধর্ম্মসাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অতএব এই মত কোন ক্রমেই গ্রহণ করা যায় না।

হরিশ্চন্দ্র কি ঐতিহাসিক ব্যক্তি?

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করিয়াছেন, এই হরিশ্চন্দ্র রাজা বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত অমরার রাজা ছিলেন। তাঁহার মতে রাজা হরিশ্চন্দ্র খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের শেষ পাদে বর্ত্তমান ছিলেন। কোন কোন ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়, হরিশ্চন্দ্র রাজার রাজধানীর নাম অমরা। ইহা হইতেই শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় অনুমান করিয়াছেন, এই "অমরা দামোদরের উত্তরে, বর্দ্ধমানের দিকে হইবে।"[১]

১ শূন্যপুরাণ, সা-প-পত্রিকা, ৩৮ ভাগ, পৃঃ ৭৭।

অবশ্য ইহাই ধর্ম্মপূজার একপ্রকার কেন্দ্রস্থল ছিল, কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী এই স্থানেই যে হইবে তাহার প্রমাণ কি? তিনি এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "বর্দ্ধমান জেলার দামোদরের উত্তরে, মানকর রেল ষ্টেসনের ঈশান কোণে অমরা-গড় জানিতেছি। সেখানে পুরাতন গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। লোকে বলে, অমরার গড়; কেহ বলে, মহেন্দ্রের গড়, এবং কুতুহলী জনে রাজা মহেন্দ্রের পাটরাণীর নাম অমরাবতী রাখিয়া সেই রাণীর নামে গড়ের নাম কল্পনা করিয়াছে।"

কিন্তু এই অমরার রাজার বংশধরদিগের নিকট যে কুলপঞ্জী আছে তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র নামে কাহারও উল্লেখ নাই। তাঁহাদের আদি পুরুষ রাঘব সিংহ ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্য স্থাপন করেন। রাঘবসিংহের পুত্র গোপাল, তাঁহার পুত্র শতক্রতু ও শতক্রতুর পুত্র মহেন্দ্র ইত্যাদি। এই মহেন্দ্রের নামানুসারেই অমরার গড়কে কেহ কেহ মহেন্দ্রের গড় বলিয়া থাকে। বর্ত্তমানে এই বংশের আদিপুরুষ হইতে ত্রিংশ পুরুষ চলিতেছে। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় অনুমান করেন, গোপালের পুত্র "শতক্রতু নাকি শত যজ্ঞ করিয়া এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শতক্রতু তাঁহার প্রকৃত নাম নয়। বোধ হয় তাঁহার প্রকৃত নাম হরিশ্চন্দ্র।" কিন্তু বংশপঞ্জীতে প্রকৃত নামের উল্লেখ না করিয়া তাঁহার গুণবাচক একটি 'উপাধি' উল্লেখ করিবার রীতি স্বীকার করা যায় না, বিশেষতঃ যদি তাহাও স্বীকার করিয়া লওয়া যায় তবে তাঁহার নাম যে হরিশ্চন্দ্রই ছিল তাহারই বা প্রমাণ কি? অতএব বংশপঞ্জিকায় যখন একটি স্বতন্ত্র নাম পাইতেছি তখন তাহা অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিয়া একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক নামকে সেখানে স্থান দান করা কোন মতেই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

সেইজন্য কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, এই হরিশ্চন্দ্র পৌরাণিক ব্যক্তি।[১] প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে এক অপুত্রক রাজা হরিশ্চন্দ্রের এক গল্প দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বরুণের বরে একটি পুত্র লাভ করেন, তাহার নাম রোহিত। হরিশ্চন্দ্র পুত্রকে বরুণের নিকট বলি দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। রোহিত একথা জানিতে পারিয়া বনে পলাইয়া যায়। সেখানে অর্থের বিনিময়ে এক লোভী ব্রাহ্মণের একটি পুত্র ক্রয় করিয়া লইয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসে। হরিশ্চন্দ্র নিজের পুত্রের পরিবর্ত্তে তাহাকেই বলি দিয়া বরুণের ক্রোধ-শান্তির আয়োজন করেন। কিন্তু নরবলি দিবার জন্য কোন ঘাতক পাওয়া গেল না, অতঃপর সেই ব্রাহ্মণ অধিকতর অর্থলোভে নিজের পুত্রকেই বলি দিতে প্রস্তুত হইল। হস্ত-পদ বদ্ধ অবস্থায় যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণ-পুত্র বরুণের স্তব করিতে আরম্ভ করিল, বরুণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ-পুত্রও বিশ্বামিত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশ করিল এবং কালক্রমে বেদের কতকগুলি মন্ত্র রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, কৌষীতকী ব্রাহ্মণ প্রমুখ বৈদিক সাহিত্য হইতে এই কাহিনী ক্রমে মহাভারত ও পুরাণে প্রবেশ লাভ করে এবং কালক্রমে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হইতে থাকে। ধর্ম্ম-সাহিত্যে তাহারই আর এক রূপের সহিত আমরা পরিচয় লাভ করি। এই কাহিনীর সহিতই আবার প্রসিদ্ধ পৌরাণিক কাহিনী—বারানসীর রাজা হরিশ্চন্দ্র, তৎপুত্র রোহিতাশ্ব ও মহিষী

বৈদিক সাহিত্যে হরিশ্চন্দ্র

---

১ শ্রীধর্ম্মপুরাণ, (শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়) পৃঃ ২৪।

২ 'ধর্ম্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র পালা' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্) বঙ্গশ্রী, ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৮।

শৈব্যার কাহিনীর সুদূর সম্পর্ক রহিয়াছে।[২] উপরোক্ত একই বৈদিক কাহিনীর এই সমস্তই পৌরাণিক রূপান্তর মাত্র। ইহাদের সহিত ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই।

ধর্ম্মপূজার আদিস্থান

হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী হইতে জানিতে পারা যায়, হরিশ্চন্দ্র রাজা বল্লুকা নদীর তীরে ছদ্মবেশী ধর্ম্মের সহিত সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন। ইহার পূর্ব্ব হইতে বল্লুকা-তীর ধর্ম্মপূজার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, নতুবা ছদ্ম-বেশী ধর্ম্ম সেখানে বাস করিবেন কেন? রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত শূন্যপুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়,

"বৈকুণ্ঠেতে জীয়ে ধর্ম্ম বল্লুকাতে স্থিতি।"

এইমত উল্লেখ রহিয়াছে। ধর্ম্মসাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্বের যে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেও উক্ত হইয়াছে আদিদেব সর্ব্বপ্রথম বল্লুকারই সৃষ্টি করিলেন। ধর্ম্মনিন্দক মার্কণ্ড মুনি কুষ্ঠরোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বল্লুকা তীরেই চন্দন কাঠের ধুনা জ্বালিয়া ধর্ম্মপূজা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপূজা বিধানেও আছে, "শনিবার ব্রত করিল বল্লুকার তীরে।" অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই বল্লুকা নদীর সঙ্গে ধর্ম্মপূজার প্রাচীনতম ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে।

বল্লুকা

এই বল্লুকা নদী কোথায়? ধর্ম্মপূজা-বিধানের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—(পৃঃ ৪) "বল্লুকা নদী বর্দ্ধমানের নিকট দামোদর হইতে উঠিয়া মৃজাপুরের খালে পড়িয়াছে। নদীটি এখন মজিয়া গিয়াছে; সব জায়গায় জল থাকে না; কিন্তু বড়োর্ষানে, বিশেষ ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরের নীচে, একটি বাঁওর হইয়া বেশ চটাল নদীর মত দেখা যায়। উহার জল অতি পরিষ্কার। এই বল্লুকা নদীই ধর্ম্মঠাকুরের তীর্থস্থান।" বর্দ্ধমান শহরের দক্ষিণে দামোদর নদের উপর বাঁধ নির্ম্মাণ হওয়ার পর

হইতে এই নদীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, এখন তাহার চিহ্ন একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। মেমারি রেল ষ্টেসনের দক্ষিণে একটি খাল এখনও বল্লুকা নামে কথিত হয়, ইহাই প্রাচীন বল্লুকার স্মৃতি বহন করিতেছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, বর্দ্ধমান শহরের পূর্ব্ব দিক দিয়া যে বাঁকা নদী প্রবাহিত হয়, তাহাই প্রাচীন বল্লুকা।[১] মনে হয়, এই বল্লুকা-তীরেই রামাই পণ্ডিতের আশ্রম ছিল;— শূন্যপুরাণেও পাই,

"রামাই পণ্ডিত করে নিত গীত
পসন্ন হইল বল্লুকা।" —চনা-পাবন

এখনও বল্লুকা-তীরে বড়োযাঁনে এক অতি প্রাচীন ধর্ম্মঠাকুর আছেন।

মনে হয়, অপর কোন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপূজারী হইতে বর্দ্ধমানের দক্ষিণে আর একটি স্থান ধর্ম্মপূজার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে; তাহা চম্পা নদীর ঘাট।

চম্পানদীর ঘাট

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে পাই, রঞ্জাবতী পুত্র-কামনায় এই চাঁপায়ের ঘাটে শালে ভর দিয়া ধর্ম্মপূজা করিয়াছিলেন। শূন্যপুরাণেও আছে, "স্তান সন্ধ্যা গোঁসাঞির চাম্পা নদীর ঘাট।" —(ধর্ম্মস্থান)

দামোদর নদের দক্ষিণে প্রায় সমান্তরাল ভাবে দ্বারকেশ্বর নদী প্রবাহিত। ইহা কোতুলপুর পর্য্যন্ত আসিয়া দক্ষিণে ক্রমে ঝুমঝুমি ও পরে রূপনারায়ণ নাম গ্রহণ করিয়া হুগলী ও মেদিনীপুর জিলার উপর দিয়া গিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলার পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে বর্দ্ধমানের কোতুলপুর পর্য্যন্ত এই নদী চাঁপাই নদী বলিয়াই কথিত হইত। এখন রূপনারায়ণ পর্য্যন্ত সমস্ত নদীই দ্বারকেশ্বর বলিয়া কথিত হয়। এই চাঁপাই

১ শূন্যপুরাণ (শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়) সা-প-পত্রিকা, ৩৮ ভাগ, পৃঃ ৭৬

নদীর তীরেই এক স্থান ধর্ম্মপূজার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, "কোতুলপুরের ঈশান কোণে দ্বারকেশ্বরের কূলে খন্নগর ও বিহার গ্রাম আছে। বিহারে কালুরায় ধর্ম্মরাজ আছেন। ইঁহার মন্দির পুরাতন নয়। কিন্তু নিকটে মাটী খুঁড়িতে গিয়া প্রাচীন মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, আশে পাশে পুরাতন ইটও পড়িয়া আছে। এইখানে চাঁপায়ের প্রসিদ্ধ ঘাট ছিল। অন্য কোথায়ও দেহারার চিহ্ন নাই, বিহার নামও নাই।[১]" সম্ভবতঃ এই স্থানেই রঞ্জাবতী পুত্র-কামনায় ধর্ম্মপূজা করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের বর্ত্তমান কাহিনী অর্থাৎ লাউসেনের গল্প পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্ম সাহিত্যের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীনতর

কাহিনী রচনার কাল

ধর্ম্মসাহিত্যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, এই প্রাচীন ধারারই অনুবর্ত্তন করিতে গিয়া খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে পর্য্যন্ত কবি সহদেব চক্রবর্ত্তী এই লাউসেনের কাহিনীকে তাঁহার কাব্যে স্থান দান করেন নাই। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী তাঁহারও কাব্যের উপজীব্য। অতএব লাউসেনের গল্পটি ধর্ম্মসাহিত্যের মুখ্য কাহিনী নহে। ইহাতেই মনে হয়, রাজা হরিশ্চন্দ্রকে লইয়াই ধর্ম্মমঙ্গল কাহিনীর সূত্রপাত হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হরিশ্চন্দ্র পৌরাণিক ব্যক্তি ; অতএব তাঁহার কাল নিরূপণ করিয়া এই কাহিনীর উদ্ভবকাল সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছান যাইতে পারে না।

এই ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, রামাই পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

১ 'শূন্যপুরাণ' সা-প-পত্রিকা, ৩৮ ভাগ, পৃঃ ৭৮

অবশ্য অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মঠাকুরের পূজার প্রবর্ত্তক না হইলেও তিনি এই লৌকিক সংস্কারের উপর বৌদ্ধ প্রভাবের কালে তাহার বিশিষ্ট একটি পূজা-পদ্ধতির রচয়িতা ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার কালেই হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী ধর্ম্মপূজার সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথম কীর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে। তাঁহার নামে প্রচলিত ধর্ম্মপূজা পদ্ধতিতে এই হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর আংশিক উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব তাহার কাল নিরূপণ করিতে পারিলেই প্রাচীনতম ধর্ম্মসাহিত্যের উদ্ভব-কাল সম্বন্ধে একটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

রামাই পণ্ডিত

অবশ্য এই রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকিলেও[১] তাঁহার নামে প্রচলিত ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি প্রকৃতই তাঁহার রচিত কিনা এ' বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ধর্ম্মমঙ্গল কাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি পূজার পুরোহিত মাত্র, সম্ভবতঃ তিনি এই পূজার একটা বিশেষ বিধির প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই পরবর্ত্তীকালে তাহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইতে আরম্ভ করে। মূলতঃ ধর্ম্মসাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার কোন সংশ্রব ছিল না। পরবর্ত্তী কালে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার নামে কতকগুলি ছড়া-পাঁচালী রচনা করিয়া ধর্ম্মপূজার আনুষঙ্গিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেগুলি ব্যবহার করিতে থাকে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখক কর্ত্তৃক রচিত ভারতীয় সমগ্র পৌরাণিক সাহিত্যের মূলে যেমন বেদব্যাসকে কল্পনা করা হইয়া থাকে তেমনি ধর্ম্মপূজার সমস্ত লৌকিক ছড়াই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্মপুরোহিত কর্ত্তৃক রচিত হইয়াও একই

১ ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি নামক ধর্ম্মঠাকুরের ডোম পূজারীরা নিজেদেরে রমাই পণ্ডিতের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এই রমাই পণ্ডিত ও ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তক রামাই পণ্ডিত যে এক ব্যক্তি নহেন, সে বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ।

রামাই পণ্ডিতের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। অতএব রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত ধর্ম্মপূজা পদ্ধতিতে কোন সময়ে যে হরিশ্চন্দ্র রাজার গল্প গিয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহাও নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে একটা অনুমান করা যায়, এই মাত্র।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায়, রামাই পণ্ডিত কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর সমসাময়িক লোক। তাঁহারা গৌড়েশ্বর দেবপালের সমসাময়িক বলিয়া তিনিও খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অবশ্য এই সম্পর্কে পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলের কবিদিগের ঐতিহ্য গ্রহণ করার পূর্ব্বে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ, তাহাদের অধিকাংশই ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাব্য রচনা করিতে গিয়া অনৈতিহাসিক লোক-শ্রুতিরই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য। তবু ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, রাঢ়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই রামাই পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন। কারণ, তিনি অস্পৃশ্য জাতির লোক হইয়াও তৎকালীন সমাজে এতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন দেখিয়া মনে হয়, কোন ব্রাহ্মণ্য আদর্শ সেই যুগের তদ্দেশীয় সমাজের সম্মুখে বর্ত্তমান ছিল না। সেইজন্য রামাই পণ্ডিত গৌড়ের পালরাজদিগের সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি দেবপালের সমসাময়িক কালে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলির এই উক্তি এই ক্ষেত্রে মানিয়া লইতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। অতএব মনে হয়, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পর রামাই পণ্ডিত কর্ত্তৃক ধর্ম্মঠাকুরের পূজার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি স্থাপিত হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে এই ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-সূচক নানা কাহিনী লোক-গাথায় রচিত হইতে আরম্ভ করে। অতঃপর প্রাচীনতম মঙ্গলচণ্ডীর গীত ও বিষহরীর গীতের মত তাহা

রামাইর আবির্ভাব-কাল

ক্রমে কাব্য-কাহিনীবদ্ধ হয়। কবি ময়ূর ভট্টই সর্ব্বপ্রথম এই কাহিনীকে মঙ্গলকাব্যের মর্য্যাদা দান করেন।

উপরোক্ত রামাই পণ্ডিতের নাম দিয়া 'শূন্য পুরাণ' বলিয়া একখানি পুস্তক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৺ নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রামাই পণ্ডিত রাঢ়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক হইলেও তাহার নামে প্রচলিত এই গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেও মনে হয়, তিনি এই গ্রন্থের রচয়িতা নহেন,—পরবর্ত্তী কালের ধর্ম্ম-পূজারীরা ইহার সহিত তাঁহার নাম সংযোগ করিয়া দিয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে কোথাও ইহাকে শূন্যপুরাণ বলিয়াও উল্লেখ করা হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় ৺ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার নাম দিয়াছিলেন, 'রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি।' বাস্তবিক ধর্ম্মপূজার নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান 'গৃহভরণ' বা 'ঘরভরা' উৎসবের ইহা একটি পদ্ধতি মাত্র। সেইজন্য এই নামই গ্রন্থখানির পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে বৌদ্ধ শূন্যবাদের কথা দেখিয়া ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গ্রন্থ-সম্পাদনকালে ইহার নাম দিয়াছিলেন, 'শূন্যপুরাণ'। গ্রন্থমধ্যে একস্থানে ইহাকে 'আগম পুরাণ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে,—

শূন্যপুরাণ

"রামাই পণ্ডিত কহএ আগম পুরাণে।"

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, গ্রন্থখানি একজনের রচনা নহে। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিভিন্ন ধর্ম্মপূজারী ইহার বিভিন্ন অংশ স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কোন কোন অংশ গোঁসাই পণ্ডিত নামক কোন ধর্ম্মপূজারীর রচিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীরও পরবর্ত্তী কালে ইহা

বর্ত্তমান আকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল। অতএব ইহা হইতে প্রাচীন কোন তথ্য সন্ধানের উপায় নাই।

এই শূন্যপুরাণ সম্পর্কে একটি বিষয় আমাদের আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে এই যে, ইহা কি আমাদের আলোচ্য মঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত? ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়,—প্রথমভাগে দেবতা খণ্ড বা সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী, দ্বিতীয়ভাগে পূজা প্রবর্ত্তনের ইতিহাস ও তৃতীয় ভাগে চরিতখণ্ড বা লাউসেনের কাহিনী। কিন্তু শূন্যপুরাণে একমাত্র প্রথম খণ্ডটি আছে, তাহাও সুগ্রথিত নহে। মঙ্গলকাব্যের এই দেবতাখণ্ড মুখ্য বিষয় নহে বরং চরিতখণ্ডই ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এ কথা সত্য যে, এই শূন্যপুরাণে পরবর্ত্তী কালে সমসাময়িক মঙ্গলকাব্যগুলির প্রভাবও আসিয়া কতক পড়িয়াছিল। সেইজন্য দেখিতে পাই, ইহার কবিও মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ ভক্ত ও নায়েকের জন্য দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন,—

শূন্যপুরাণ কি মঙ্গলকাব্য?

"গাএন পণ্ডিত রামএ ধর্ম্মপদতলে।
ভকত নাএকে পরভু রাখিব কুশলে॥"
"গাএন পণ্ডিত রাম ভাবি নিরঞ্জনে।
ভকত নাএকে ধর্ম্ম রাখিব কল্লানে॥"

দুই এক জায়গায় ইহাকে গীত ও পাঁচালী বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন,

"ধর্ম্মর চরণে গীত পণ্ডিত রামাই গাএ।"
"পরভুর চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীজুত রামাই রচিল পাচালী সঙ্গীত॥"

কিন্তু এই সমস্ত লক্ষণ প্রায় মধ্যযুগের সমস্ত রচনা-মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। অতএব ইহা হইতেই শূন্যপুরাণকে কাব্যের মর্য্যাদা দেওয়া যাইতে পারে না। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহা ধর্ম্মপূজার নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান 'গৃহভরণে'র পদ্ধতি মাত্র। অতএব ইহা আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নহে।

ধর্ম্মমঙ্গলের আদি রচয়িতা

তাহা হইলে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলির আদি রচনা কি ও তাহার রচয়িতা কে? পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহার কাহিনীর দুইটি স্বতন্ত্র ভাগ আছে। একটি হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী ও অপরটি লাউসেনের কাহিনী। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীটিই প্রাচীনতর। লাউসেনের কাহিনী পরবর্ত্তী কালে হইতে সংযোজিত হইয়া ইহার মুখ্য বিষয়-বস্তু হইয়া পড়িলেও তৎপূর্ব্বে মার্কণ্ড মুনি ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই এই জাতীয় কাব্যের উপজীব্য ছিল। 'ধর্ম্মপূজা-বিধান' ও 'শূন্যপুরাণে' মার্কণ্ড মুনি ও হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্ম্মপূজার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাতে হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র লাভ, ছদ্মবেশী অতিথির নর-মাংস প্রার্থনা ইত্যাদি বিস্তৃত কাহিনীর উল্লেখ নাই। পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলগুলিতে হরিশ্চন্দ্র-পালায় এই কাহিনী কতকটা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তবে ধর্ম্ম সাহিত্যে এই হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী কে আনিল?

গোঁসাই পণ্ডিতের গ্রন্থ

ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্র পালায় দেখিতে পাওয়া যায়, রাণী রঞ্জাবতী কর্ণসেনকে হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র-বলিদানের কাহিনী শুনাইতে গিয়া পণ্ডিত গোঁসাই রচিত কোন গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন।,—

"তবে রঞ্জাবতী বলে করি নিবেদন।
পণ্ডিত গোঁসাই গ্রন্থে কহিল যেমন॥"

অতএব মনে হইতেছে, পণ্ডিত গোঁসাই ধর্ম্ম সাহিত্যে হরিশ্চন্দ্র কাহিনীর

আদি রচয়িতা। এই গোঁসাই পণ্ডিত শূন্যপুরাণোক্ত পঞ্চম পণ্ডিত বলিয়াই মনে হয়। ইনি রামাই পণ্ডিত নহেন, কিম্বা 'পণ্ডিত গোঁসাই গ্রন্থ' বলিতে 'শূন্যপুরাণ'কেও বুঝাইতেছে না। কারণ, শূন্যপুরাণে হরিশ্চন্দ্র রাজার বিস্তৃত কাহিনী নাই, কেবল তাঁহার ধর্ম্মপূজার কথাই উল্লেখ আছে। অতএব মনে হয়, গোঁসাই পণ্ডিতের অধুনা-বিলুপ্ত কোন গ্রন্থই ধর্ম্মসাহিত্যের আদি-রচনা। অতঃপর পরবর্ত্তী লাউসেনের বিস্তৃত কাহিনীর লোকপ্রীতির ফলে তাহা কালক্রমে সংক্ষিপ্ত হইয়া ধর্ম্মসাহিত্যে হরিশ্চন্দ্র পালায় কোনভাবে আত্মরক্ষা করিয়া আছে।

ময়ূর ভট্ট

পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলের কবিগণ লাউসেনের কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী একজন কবিকে এই কাহিনীর আদি-রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার নাম ময়ূর ভট্ট। তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত কিছুই জানিতে পারা যায় না, একমাত্র পরবর্ত্তী কবিদিগের কাব্য হইতেই তাহার নামের সহিত পরিচয় লাভ করা যায় মাত্র।

মাণিক গাঙ্গুলী লিখিয়াছেন,

"বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট কবি সুকোমল।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥"—পৃঃ ১১৬, ১২০
"বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্ম্মগুণগান॥"—পৃঃ ১৮১

ঘনরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার গীতারম্ভে লিখিয়াছেন,

"হাকন্দ পুরাণ মতে, ময়ূর ভট্টের পথে,
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম্ম সভায়।"—পৃঃ ৫
"স্থানে স্থানে বন্দিব যতেক দেবদেবী।

ময়ূর ভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি ॥"—পৃঃ ৫

"ময়ূর ভট্টে বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥"—পৃঃ ২৬, ১৪৭

গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গলে লিখিয়াছেন,

"আছিল ময়ুর ভট্ট সুকবি পণ্ডিত।
রচিল পয়ার ছান্দে অনাদ্যের গীত ॥
ভাবিয়া তাঁহার পাদপদ্ম-শতদল।
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্ম্মের মঙ্গল ॥"

বঙ্গসাহিত্য পরিচয় পৃঃ ৩৮২

সীতারাম দাস লিখিয়াছেন,

"ময়ুর ভট্টকে বন্দিয়া মস্তকে
সীতারাম দাসে গায় ॥"—ঐ, পৃঃ ৪১০

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন পুঁথিশালায় রক্ষিত একখানি নাম-তারিখহীন খণ্ডিত ধর্ম্মমঙ্গল পুঁথিতে পাওয়া যায়,

'যথা তুমি উপনীত তথাই * গীত
তোমা বিনু আনন্দে চঞ্চল।
দ্বিজ ময়ুর ভট্ট বঙ্গে (বন্দে ?) * * গায়ন স্কন্ধে
গাই গীত মঙ্গল ॥"[১]

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল হইতে উপরে যে পদ দুইটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার শেষটিতে ময়ূর ভট্টের সঙ্গে রূপরাম বলিয়া একজন কবিরও বন্দনা রহিয়াছে। কিন্তু এই রূপরামও ময়ূর ভট্টের পরবর্ত্তী কবি এবং তিনিও যে তাঁহাকে বন্দনা করিয়া লইয়া নিজের কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন পুঁথিশালায় রক্ষিত রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। রূপরাম লিখিতেছেন, "ময়ুর ভট্টের পদ মনে অনুমানি'।"

১ সা-প-পত্রিকা, ১৩১৭ সাল, অতিরিক্ত সংখ্যা পৃঃ ১৭০।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, 'ধর্ম্মমঙ্গলের সমস্ত কবিই তাঁহাদের কাহিনী মূলতঃ এই ময়ূর ভট্টের কাব্য হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।' কিন্তু এই ময়ূর ভট্ট কে? তাহার পরিচয়ই বা কি?

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্ম্ম পুরাণ' নাম দিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মূল পুঁথি কিম্বা তাহার কোন অনুলিপি পাওয়া যায় না।

নব্য ময়ূর ভট্ট

১৩১০ সালে লিখিত একখানি মাত্র পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ-সম্পাদক ইহাকেই ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূর ভট্টের কাব্য বলিয়া মনে করেন। ইহাতে কবির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, কবি ময়ূর ভট্ট লাউসেনের পৌত্র ধর্ম্মসেনের সম-সাময়িক। গ্রন্থ-সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করেন, ময়ূর ভট্ট খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক।

কিন্তু নানা কারণে এই পুস্তকখানির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।[১] একাদশ শতাব্দীর একজন কবির একখানি গ্রন্থ সহসা বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিলে ইহার সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া তাহা গ্রহণ করা উচিত। পুস্তকখানির ভাষা ও ভাবভঙ্গি অত্যন্ত আধুনিক। কিন্তু একখানি এতকাল অপ্রচলিত পুঁথির ভাষা এত আধুনিক হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। চণ্ডীদাসের পদগুলি ব্যাপক প্রচলনের জন্য আধুনিকতা প্রাপ্ত হইয়াছে স্বীকার করা যায়, কিন্তু এত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের মধ্যে এই ময়ূরভট্টের আর একখানিও সম্পূর্ণ কিম্বা খণ্ডিত পুঁথির পাতাও

১ 'শূন্য পুরাণ' (সা-প-পত্রিকা) ৩৮ ভাগ' পৃঃ ৬৭

আবিষ্কৃত হয় নাই, অতএব যদি ইহা খাঁটি পুথিই হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের মত ইহারও ভাষার প্রাচীনত্ব রক্ষা পাইত। বিশেষতঃ এই আধুনিক পুস্তকখানি যাহার নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাহার যে ব্যক্তিগত পরিচয় আবিষ্কার করিয়াছেন [১] তাহাও এই পুস্তকখানির উপর বিশ্বাস স্থাপনের অনুকূল নহে। অতএব এই পুস্তকখানিকে কোনমতেই মাণিক-ঘনরাম-বন্দিত ময়ূরভট্টের রচিত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহা সম্ভবতঃ অত্যন্ত আধুনিককালে ময়ূরভট্টের নামের উপর অন্য কোন কবি রচনা করিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই রকম প্রয়াস আমাদের দেশে নূতন নহে।

কিন্তু পুস্তকখানির রচনা আধুনিক হইলেও ইহাতে ধর্ম্মমঙ্গল কাহিনীর প্রাচীনতর ধারাটিরই অনুসরণ করা হইয়াছে। পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নহে, চরিতখণ্ড বা লাউসেনের কাহিনী ইহাতেও নাই। তবে সংজাত খণ্ডের শেষে চরিতখণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত সূচী দেওয়া হইয়াছে, পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ বলিয়াই পরবর্ত্তী কাহিনী ইহাতে পাওয়া যায় না। এমনও হইতে পারে যে, ময়ূরভট্টের কোন বিলুপ্ত-প্রায়, স্মৃতি-অবশেষ কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ইহা আধুনিক কালে রচিত হইয়াছে, কারণ ময়ূরভট্টের কোন পুঁথি আবিষ্কৃত না হইলেও তাহার রচিত অসংলগ্ন কতকগুলি পদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। [২] মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ময়ূরভট্টের একখানি পুঁথি দেখিয়াছিলেন বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছিলেন। [৩] তাঁহার

---

১ ঐ

২ 'বীরভূমি', আষাঢ়. ১৩০৭ সাল।

৩ বৌদ্ধগান ও দোঁহা ভূমিকা, পৃঃ ৩

অনুমান, পুঁথিখানি পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখা। ময়ূরভট্ট এই সময়ের লোক হওয়াই খুব সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শাস্ত্রী মহাশয় পুঁথিখানির আর কোন সন্ধান দিতে পারেন নাই, পুস্তকখানি প্রকাশিতও হয় নাই। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় 'মাণিক গাঙ্গুলী ও ধর্ম্মমঙ্গল' নাম দিয়া ১৩১২ (১ম সংখ্যা) সালে এক ভদ্রলোক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, ময়ূরভট্টের "গ্রন্থ এখনও বাঁকুড়া জেলায় প্রচলিত আছে।"

অতএব দেখা যাইতেছে, ময়ূরভট্টের নাম ও কাব্যকীর্ত্তি যে একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল তাহা নহে; হয় ত কোন কোন ধর্ম্মমঙ্গলের কবির কাব্য-মধ্যে তাঁহার রচনাও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। নব্য ময়ূরভট্ট তেমনই মূল ময়ূরভট্টের প্রাচীন কোন অসংলগ্ন কাব্যকাহিনীকে ভিত্তি করিয়া হয়ত তাহার নূতন কাব্য গড়িয়াছেন, কিন্তু তাহা হইতে প্রাচীন ময়ূরভট্টের প্রকৃত কোন পরিচয় উদ্ধারের উপায় নাই।

ময়ূরভট্টের পরিচয়

ময়ূরভট্ট জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোন কোন ধর্ম্মমঙ্গলের কবি তাঁহাকে "দ্বিজ ময়ূরভট্ট" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।' বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকায় ভট্টশালী গাঞির আদি পুরুষ মহীধরের পুত্র এক ময়ূরভট্টের উল্লেখ আছে।[১] ইনিই ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি ময়ূরভট্ট বলিয়া কেহ অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এই ময়ূরভট্ট কবি ছিলেন, এমন প্রসিদ্ধি নাই। বিশেষতঃ তিনি বরেন্দ্রভূমির লোক, সেখানে ধর্ম্ম-পূজাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অতএব, এই ময়ূরভট্টের সহিত ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি ময়ূরভট্টের কোন সম্পর্ক কল্পনা করা যাইতে পারে না।

১ কুল-শাস্ত্র-দীপিকা, (শ্রীযাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত) পৃঃ ২৬০

এই ময়ূরভট্টই ব্রাহ্মণ কবিদিগের মধ্যে ধর্ম্মমঙ্গল রচনার পথ-প্রদর্শক। তাঁহারই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া পরবর্ত্তী কালের মাণিকরাম, ঘনরাম প্রভৃতি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কবি এই কাব্য রচনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন।

ময়ূরভট্টের কাব্যের নাম 'হাকন্দ-পুরাণ।' ঘনরাম চক্রবর্ত্তী এই সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, "হাকন্দ পুরাণ মতে, ময়ূরভট্টের পথে।"

হাকন্দ পুরাণ

হাকন্দ পুরাণ বলিয়া স্বতন্ত্র কোন কবির লেখা কোন কাব্য ছিল না। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের নামও হাকন্দ-পুরাণ নহে। কারণ, শূন্যপুরাণে পশ্চিমোদয়ের কোন কথা নাই, অথচ ঘনরাম উল্লেখ করিয়াছেন,

"হাকন্দ পুরাণে লেখা, সাক্ষাৎ আমার দেখা
কলিকালে পশ্চিম উদয়।"—পৃঃ ৮

লাউসেন যেখানে দেহ নবখণ্ড করিয়া কাটিয়া ধর্ম্মের পূজা করিয়াছিলেন সেই স্থানের নামই হাকন্দ,

"দিবস দ্বাদশ দণ্ডে হাকন্দেতে নব খণ্ডে
হবে যবে রঞ্জার তনয়।"—ঐ

ময়ূরভট্টই এই হাকন্দ-কাহিনীর রচয়িতা বলিয়া তাঁহার কাব্যের নামও হাকন্দ-পুরাণ। পূর্ব্বোল্লিখিত ময়নাপুর গ্রামে হাকন্দ পোখর নামে এক "অতি পুরাতন ও বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। বারুণীর সময় ইহার পাড়ে মেলা বসে। যাত্রীরা ইহাতে স্নানের জল পায়না, কাদা জলই মাথায় দেয়।" ময়ূরভট্টের বর্ণিত হাকন্দের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে। নব্য ময়ূরভট্ট তাঁহার কাব্যখানিকে সর্ব্বত্রই 'ধর্ম্মপুরাণ', 'শ্রীধর্ম্মপুরাণ' কোথাও বা 'অনাদি পুরাণ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন কোথাও

হাকন্দ-পুরাণ বলেন নাই। ইহা হইতেও এই পুস্তকের অর্ব্বাচীনত্বই প্রমাণিত হয়।

ময়ূরভট্টের পথানুসরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম কোন কবি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিলেন তাহা নিঃশংসয়ে বলিবার উপায় নাই। তবে মানিক গাঙ্গুলীর কাব্যেই ময়ূরভট্টের নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে আর একজন কবিরও নাম উল্লেখ রহিয়াছে, তাঁহার নাম রূপরাম। মানিকরাম তাঁহাকে আদি রূপরাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন,

রূপরাম

"বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্ম্মগুণগান।"

ইহাতে মনে হয়, মাণিক রামের সময়ে কিম্বা তাঁহার কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী কালে রূপরাম নামে আরও একজন ধর্ম্মমঙ্গলের কবি বর্ত্তমান ছিলেন, সেইজন্য ইঁহাদের মধ্যে যিনি প্রাচীনতর তাঁহাকেই তিনি আদি রূপরাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে দুইজন রূপরামের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, রূপরাম ভণিতার যে সমস্ত পুঁথি এ' যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা একজনের রচনা বলিয়াই মনে হয়। অতএব এখানে 'আদি' শব্দ স্বতন্ত্র কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।

রূপরামের সমগ্র ও খণ্ডিত কাব্য রাঢ়ের নানা স্থান হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। রূপরাম ময়ূরভট্টের অনতিকাল ব্যবধানেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, তিনি ময়ূর ভট্টের পদই 'মনে অনুমানি' নিজের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজে তাঁহার গ্রন্থ-রচনার যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সহজ-বোধ্য নহে। তিনি লিখিয়াছেন,

"সাকে সিমে জড় হৈলে জত সক হয়।
চারি বাণ তিন যুগে বেদে যত রয়॥

রসের উপরে রস তাহে রস দেহ।
এই শকে গিত হইল লেখা কর‍্যা লেহ॥"[১]

ইহার কোন সঙ্গত অর্থ উদ্ধার করা যায় না। মনে হয়, ইহার মধ্যে যথেষ্ট লিপিকর-প্রমাদ রহিয়াছে, সেইজন্য অর্থ-পরিগ্রহ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় ইহার যথাসম্ভব একটা অর্থ গ্রহণ করিয়া ইহাতে ১৬৪৮ শক বা ১৭২৬ খৃষ্টাব্দ পাইয়াছেন।[২] শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার অর্থ ১৬৪১ শকাব্দ বা ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[৩] ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় রূপরামকে পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক মনে করেন।[৪] রূপরামের কাব্যের যথেষ্ট প্রচার হইয়াছিল, সেই জন্য ভাষা হইতে তাহার কালনিরূপণ অসম্ভব. তবে যতদূর মনে হয়, তিনি পঞ্চদশ না হইলেও ষোড়শ শতাব্দীর লোক হইতে পারেন।

রূপরামের জীবনী

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জন্মস্থানের অনতিদূরবর্ত্তী বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত রায়না থানার এলেকায় কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে রূপরামের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা একজন পরম পণ্ডিত ছিলেন, শতাধিক ছাত্র তাঁহার স্বগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। রূপরামের আর তিন সহোদর ছিল, জ্যেষ্ঠের নাম রত্নেশ্বর, তিনি রূপরামের লেখাপড়ায় ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা ভৎর্সনা করিতেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া রূপরাম খুঙ্গি পুথি লইয়া পাঠাভ্যাসের জন্য কবিচন্দ্রের

১। ইহার একটি পাঠান্তর এইরূপ,—"তিন বাণ চারি জুগ বেদে জত রয়। শাকে সনে জড় করিলে জত সন হয়॥ রসের উপরে রস তার রস দেয়। এই সনের গীত হইল লেখা কর‍্যা নেয়॥"

২। 'ধর্ম্মের গান কতকালের? প্রবাসী, ভাদ্র, পৃঃ ৬৪২, সাল ১৩৩৪।

৩। 'শ্রীধর্ম্মপুরাণ' পৃঃ ॥৵০ পাদটীকা।

৪। বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় পৃঃ ৩৮৫।

পুত্র রঘুরাম ভট্টাচার্য্যের টোলে আসিয়া ভর্ত্তি হইলেন। রূপরাম অত্যন্ত দুর্বিনীত ছাত্র ছিলেন, গুরুর সঙ্গে একদিন বচসা আরম্ভ করিলেন, ক্রুদ্ধ হইয়া গুরু তাঁহাকে এক ঘা পুঁথির বাড়ি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। রূপরাম নবদ্বীপে বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্যের টোলে পড়িতে চলিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে জননীর কথা মনে হওয়ায় গৃহের মুখে ফিরিলেন। রূপরাম তাঁহার আত্মবিবরণী ও গ্রন্থোৎপত্তির কারণে লিখিয়াছেন, এই সময়েই ধর্ম্মঠাকুর পথিমধ্যে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হ'ন,—

"সুবর্ণ পইতা গলে পতঙ্গ-সুন্দর।
কলধৌত কাঞ্চন কুণ্ডল ঝলমল॥
তরাসে কাঁপিল তনু প্রাণ দুর দুর।
আপুনি বলেন ধর্ম্ম দয়ার ঠাকুর॥
আমি ধর্ম্ম ঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম।
বারদিনের গীত গাও শুন রূপরাম।
চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব্ব মাদুলি।
তুমি গেছ পাঠ পড়িতে আমি খুজে বুলি॥"

পথিমধ্যে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া কবির "তরাসে কাঁপিল তনু চঞ্চল পরাণ।" তিনি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া একেবারে নিজের বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রত্নেশ্বর পুনরায় তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন, বলিলেন, "কালি গিয়াছ পাঠ পড়িতে আজি আইলা ঘরে।" রূপরাম পুনরায় গৃহত্যাগ করিলেন, নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গোপভূমের রাজা গণেশের আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা গণেশ কবিকে চামর মন্দিরা উপহার দিয়া গানের দল বাঁধিয়া দিলেন, রূপরাম বলিয়াছেন, "সেই হত্যে গীত গাই ধর্ম্মের আসরে॥" পাঠে আর মনঃসংযোগ করেন নাই। রূপরাম সর্ব্বত্র নিজেকে দ্বিজ

বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সেই যুগে ব্রাহ্মণেরা এই বৃত্তি গ্রহণ করিলে সমাজে পতিত হইতেন, সম্ভবতঃ তিনিও পতিত হইয়াছিলেন। এই গোপভূমের রাজা গণেশ কবে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা জানা যায় নাই, তাহা হইলেও কবির কালনিরূপণের অনেকটা সাহায্য হইত।

মানিক গাঙ্গুলী এই রূপরামকে আদর্শ করিয়াই তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, অনেক স্থলে রূপরামের সহিত মানিকরামের একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় কবির ইছাই বধ পালাটি প্রায় অভিন্ন, এই জন্য মানিকরামই রূপরামের নিকট ঋণী, না উভয় কবিই তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ময়ূরভট্টের কাব্য এইভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন, ময়ূর ভট্টের পুঁথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা বলিবার উপায় নাই।

রূপরাম ও মানিক

ভট্টাচার্য্যের টোলে অধ্যয়ন শেষ না করিলেও রূপরাম যে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার রচনা হইতেই প্রকাশ পায়। জামতি পালায় কুলটা নয়ানীর রূপ-সজ্জার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যথেষ্ঠ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে,—

রূপরামের পাণ্ডিত্য

"কপালে সিন্দুর পরে তপন-উদয়।
চন্দন-চন্দ্রিমা তার কাছে কাছে রয়॥
চন্দ্র-কোলে শোভা যেন করে তারাগণ।
ঈষৎ করিয়া দিল বিন্দু বিচক্ষণ॥
এক ঠাঞি রবি শশী তারাগণ যুতা।
আনন্দ অঙ্কুরকুলে বিজুরীর লতা॥"

মধ্যে মধ্যে রূপরামের রচনায় এই প্রকার পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে সত্য কিন্তু প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় তাঁহার কাব্য মধ্যে খুব সুলভ নহে। অন্যত্র প্রায়ই তাঁহার বর্ণনা সরল, রচনাও মধ্যে মধ্যে শ্রুতি-মধুর।

খেলারাম

রূপরামের পর সম্ভবতঃ খেলারাম তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য প্রণয়ন করেন। অবশ্য পরবর্ত্তী কোন কবি এই খেলারামের কথা উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার কাব্যে গ্রন্থ-রচনার কাল নির্দ্দেশক যে পদটি পাওয়া যায় তাহা হইতেই অনুমিত হয় তিনি এই বিষয়ের একজন অতি প্রাচীন কবি। তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথি হইতে গ্রন্থরচনার কাল-সম্বন্ধে এই পদ দুইটি সাধারণতঃ উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

"ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন ॥
হে ধর্ম্ম এ দাসের পূরাও মনস্কাম।
গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম ॥"

'ভুবন' অর্থে চতুর্দ্দশ, বায়ু উনপঞ্চাশ। অতএব দেখা যাইতেছে, ১৪৪৯ শক অর্থাৎ ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে খেলারাম গ্রন্থরচনা আরম্ভ করেন। 'শরের বাহন' বলিতে তিনি সম্ভবতঃ কার্ত্তিক মাস মনে করিয়া থাকিবেন। কেহ কেহ মনে করেন, শরের বাহন ধনু অর্থাৎ উহা পৌষ মাস।

খেলারামের কাব্যে তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, তিনি একস্থানে লিখিয়াছিলেন,

"তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ সাঙ্গ হয়।
অষ্টমঙ্গলায় দিব আত্ম পরিচয় ॥"

কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের শেষ ভাগ পাওয়া যায় নাই।

মাণিকরাম

ইহার পরই সম্ভবতঃ মাণিকরাম গাঙ্গুলীর প্রসিদ্ধ ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। তাঁহার পুস্তক মুদ্রিত হইয়া সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মাণিকরাম তাঁহার কাব্য-মধ্যে গ্রন্থ-রচনার কাল সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা

কালক্রমে লিপিকর প্রমাদে এত বিকৃত হইয়াছে যে বর্ত্তমানে ইহা হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় নিরূপণ করা একপ্রকার দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে।* সাহিত্য পরিষৎ হইতে মুদ্রিত পুস্তকে তাঁহার গ্রন্থ-সমাপ্তির কাল এইভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—

"সাফেরী ও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ সহ যুগ দক্ষে যোগতার সনে॥"—পৃঃ ২২৭

বলা বাহুল্য, এই পদে কোথাও কোনও মারাত্মক লিপিকর প্রমাদ রহিয়াছে। তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় কবির বর্ত্তমান বংশধরের গৃহে এই কাব্যের যে একখানি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে তাহা হইতে এই গ্রন্থ-সমাপ্তির কাল নির্দ্দেশক পদটির একটি নকল আনাইয়াছিলেন। তাহাতে উক্ত পদটি এইভাবে পাওয়া যায়,

"সাকে রীত্ত সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সির্দ্ধসহ জ্জোগ দক্ষে যোগ তার সনে॥
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
সর্ব্বরি সরাগ্নি দণ্ডে ষাঙ্গ হল্য গীত॥"

ইহা হইতে এই পদটির প্রকৃত পাঠ সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহার প্রকৃত পাঠ এই প্রকার হইবে,—

শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ (বা সিদ্ধি) সহ যুগ পক্ষে যোগ তার সনে॥
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহৃত।
শর্ব্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হইল পুঁথি॥

তাহা হইলে মাণিকরামের গ্রন্থ সমাপ্তির এই সময় পাওয়া যাইতেছে,

রচনা-কাল

'ঋতু' ৬, তাহার সঙ্গে 'বেদ' অর্থাৎ ৪ এবং তাহার দক্ষিণে বা ডাইনে 'সমুদ্র' বা সাত, ইহাতে ৬৪৭

পাওয়া যাইতেছে, ইহার সহিত পরবর্ত্তী পদে যে রাশির উল্লেখ আছে তাহা যোগ করিতে হইবে। পরবর্ত্তী পদে আছে 'সিদ্ধ' ৭ বা সিদ্ধি ৮, তাহার ডাইনে 'যুগ' আর 'পক্ষ' অর্থাৎ ৪ ও ২, অতএব ইহাতে হয়, ৮৪২, এই উভয় রাশি যোগ করিলে ১৪৮৯ শক পাওয়া যায়। ইহাতে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ হয়।

কিন্তু মাণিক রামের এই সময় সম্বন্ধে সকলেই একমত নহেন। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উক্ত 'সিদ্ধ' শব্দের অর্থ ঋষি ধরিয়া ইহার অর্থ ৭ বলিয়া বিবেচনা করেন।[১] তাহাতে মাণিক রামের সময় আরও একশত বৎসর পিছাইয়া যায়। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় মাণিক রামের ভাষা, বংশলতা ও গীতসাঙ্গকালের উদ্ধৃত উক্তি বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন, মাণিকরাম দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।[২] তিনি উক্ত পদের সিদ্ধা শব্দের অর্থে ২৪ ধরিয়াছেন, কিন্তু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, সিদ্ধা শব্দে ২৪ অর্থে "প্রয়োগ অধিক পাওয়া যায় না।"

এই হিসাবে তাঁহার মতে মাণিকরামের গ্রন্থ সমাপ্তি-কাল ১৭০৩ শক বা ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু মাণিক রামের কাব্য পড়িয়া তাঁহাকে এত আধুনিক বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ যে মূল পুঁথিখানি হইতে সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার "বিতারিখ ১০ই ফাল্গুন শকাব্দা ১৭৩১।" কিন্তু কাব্য রচনার ২৭।২৮ বৎসরের মধ্যেই ইহার রচনা-কাল নির্দ্দেশক পদটি এত বিকৃত হইতে পারে না। এমন কি তখন পর্য্যন্ত কবির বংশধরদিগের গৃহে মূল পুঁথিটি পর্য্যন্ত থাকিবার কথা, কিন্তু তাঁহার বংশধরদিগের গৃহে ইহার অনুলিপিই আছে, মূল পুঁথি নাই।

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ ৪৩৫, পাদটীকা।

২ 'প্রবাসী' কার্ত্তিক ১৩৩৩ ও ভাদ্র ১৩০৪; সা-প-পত্রিকা, ১৩১৫ সাল।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন, "মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল, বিষ্ণুপুরে মদনমোহন-মন্দির প্রতিষ্ঠা (১৬৯৪ খ্রীঃ)র পর এবং মদনমোহন ঠাকুরের বিষ্ণুপুর ত্যাগের (১৭৪৮—৭৮ খৃঃ) পূর্ব্বে রচিত।"[১] কারণ, তাঁহার কাব্য মধ্যে এই তুইটি পদ পাওয়া যায়,—

"বিষ্ণুপুরের বন্দিব শ্রীমদনমোহনে।
পূর্ব্বেতে আছিলা প্রভু বিপ্রের সদনে॥"

কিন্তু মনে হয়, এই পদ তুইটি মাণিক রামের রচনা নহে, ইহা পরবর্ত্তী কোন গায়েনের বন্দনা মাত্র। মঙ্গলকাব্যের প্রায় এই জাতীয় বন্দনার কোন পদই মূল কবি কর্ত্তৃক রচিত হইত না, হইলেও তাহার মধ্যে পরবর্ত্তী কালে সমসাময়িক প্রভাব বশতঃ গায়েনের অনেক রচনাও আসিয়া প্রবেশ করিত। এই তুইটিও তেমনই কোন পরবর্ত্তী গায়েন মূল কবির কাব্য মধ্যে যোজনা করিয়া দিয়াছে অতএব ইহা অবলম্বন করিয়া মূল কবির সময় নিরূপণের প্রয়াস সমীচীন নহে।

প্রক্ষিপ্তরচনা

"সুরিক্ষার পাটে বন্দী বিদগধ বিদেশী পুরুবের তালিকায় কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, খেলারাম, ঘনরাম প্রভৃতি নামগুলি" এই ভাবেই তাঁহার কাব্যমধ্যে পরবর্ত্তী কালে কোন রসিক গায়েন কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। মাণিকরাম যদি খেলারাম, ঘনরাম প্রমুখ ধর্ম্মমঙ্গল কবিদিগের নাম জানিতেন তবে তিনি স্থানান্তরে ময়ূরভট্ট ও রূপরামের সঙ্গে ইহাদেরও নাম উল্লেখ করিতেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীতুল্লাহ সাহেব অনুমান করেন, "মাণিক রাম ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল লিখেন।" আমাদের গৃহীত সময়ের সঙ্গে ইহার মাত্র তুই বৎসরের পার্থক্য, এই মত সমীচীন বলিয়াই গ্রহণ করা যায়।

মাণিক রাম কাব্য মধ্যে এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,

১ শ্রীধর্ম্মপুরাণ, ভূমিকা, পৃঃ ।৶৹—।৶৹

"বাঙ্গাল গাঙ্গুলি গাঁই পিতা গদাধর।
স্বসাহীন সম্প্রতি ছয় সহোদর॥
দুর্গারাম দ্বিতীয় বিখ্যাত গুণধাম।
মুক্তারাম তৃতীয় চতুর্থ ছকুরাম॥
রামতনু পঞ্চম রসিক রসে পূর্ণ।
সর্ব্বানুজ নয়ান সকল লোক ধন্য॥
এক কন্যা অভয়া আখ্যাত অতি ভব্যা।
শান্তমতি সুলক্ষণা সীমন্তিনী সখা॥
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে কাত্যায়নী সুত।
সত্যগুণে ধর্ম্ম জাগে সদয় সদত॥"

কবির পিতামহ অনন্তরাম প্রপিতামহ সুদাম, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম গোপাল। কবির পিতামহ একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের বংশ অত্যন্ত প্রাচীন, তাঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের বংশ বাঙ্গাল মেল গাঙ্গুলী গাঁই নামে পরিচিত। বেলডিহা গ্রাম কবির জন্মস্থান।

গ্রন্থ-রচনার কারণ সম্বন্ধে কবি এক বিস্তৃত কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। কবি নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অবশেষে তর্কশাস্ত্র পড়িতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তুঙ্গারি গ্রামে গমন করেন।

গ্রন্থোৎপত্তির কারণ

পাঠ আরম্ভ করিবেন, এমন সময় রাত্রিতে এক দুঃস্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। তিনিও আর কাল বিলম্ব না করিয়া পর দিবসই 'খুঙ্গি পুঁথি' বাঁধিয়া বাটি রওয়ানা হইলেন। গৃহে ফিরিবার পথে তিনি দৈবক্রমে পথ ভুলিয়া যান। একে দুশ্চিন্তায় তাঁহার মন অস্থির, তাহাতে আবার পথশ্রমে দেহ অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এমন অবস্থায় এক নির্জ্জন মাঠের মধ্যে এক অপরিচিত বৃদ্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ যুবকের মূর্ত্তি

ধারণ করিলেন। অতঃপর উভয়ে শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ কবির শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং কবিকে

"সঙ্গোপনে কহিলেন সাবধান হইবে।
অধ্যয়ন করিতে আমার কাছে যা'বে॥
জগতে তোমার যশ হবেক যেরূপে।
সেই বিদ্যা দিব আমি সত্যের স্বরূপে॥"

এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মণ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কবি বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। এমন সময় ধর্ম্মের দুইটি পাদুকা গলায় বাঁধিয়া লইয়া এক পণ্ডিত আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। কবির নিকট পণ্ডিত এই পথে কোন ব্রাহ্মণকে যাইতে দেখিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিল। কবি তাহার কোন জবাব দিতে পারিলেন না, পণ্ডিতকে সেই ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, পণ্ডিত বলিল,—

"চিনিতে নারিছ বাছা দ্বিজবর কেবা।
পদ্মতুল্য সম্প্রতি পাদুকা কর সেবা॥
পরে তাঁর পরিচয় পাবে অচিরাৎ।
সত্য মিথ্যা মোর কথা বুঝিবে সাক্ষাৎ॥"

কবি এই কথার কোন অর্থ পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ সম্মুখে এক দিব্য সরোবর দেখিতে পাইলেন। তাহাতে গিয়া কবি তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন কিন্তু বৃক্ষতলে ফিরিয়া দেখেন, পাদুকা সহ পণ্ডিত অদৃশ্য হইয়াছে। অবশেষে কবি নিজের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অপরিচিত ব্রাহ্মণ কবিকে তাঁহার নিকট গিয়া অধ্যয়ন করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন ইহা স্মরণ করিয়া তৃতীয় দিবসে কবি সেই ব্রাহ্মণের নিবাস রঙ্গাপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যেই এক দীঘির তীরে

ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এইবার ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি বড় ভয়াবহ, হস্তে এক দীর্ঘ যষ্টী, মুখে ক্রুদ্ধভাব। কবি দেখিয়া ভয় পাইলেন।

"বিপ্র কন তোর পারা না দেখি বর্ব্বর।
দস্যুবৃত্তি করেছেন বাল্মীকি মুনিবর॥
বুঝি তোর আজি হল বিঘোর মরণ।
এত শুনি মোর হল অঘোর নয়ন॥"

কোন অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য হয়ত ব্রাহ্মণ তাঁহার উপর অপ্রসন্ন হইয়া থাকিবেন ভাবিয়া কবি তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। এইবার ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অভয় দিলেন, বলিলেন, রঞ্জাপুরে আমার গৃহে গিয়া অপেক্ষা কর, আমি এখনই ফিরিব। কিন্তু কবি রঞ্জাপুরে গিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন এমন কোন ব্রাহ্মণ সেই গ্রামে নাই। কবি নিরাশ লইয়া স্বগৃহে ফিরিলেন, পথশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন, নিদ্রায় অভিভূত হইলে পর এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিলেন, যেন সেই ব্রাহ্মণ শিয়রে আসিয়া বসিয়া বলিতেছেন,

"কহেন কিসের চিন্তা কিসের ব্যামোহ॥
উঠ বাছা আমার বচনে মন দেহ॥
গীত রচ ধর্ম্মের গৌরব হবে বাড়া।
নকল লেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া॥
বিশ্বের কারণ আমি বাঁকুড়া রায় নাম।
না করিবে প্রকাশ হইবে সাবধান॥
সঙ্কটে সদয় হব করিলে স্মরণ।
অন্তকালে দিব দুটি অভয় চরণ॥"

বাঁকুড়া রায় আরও বলিলেন যে, বার দিনে এই বারমতি সম্পূর্ণ করিতে হইবে, অন্যথায় তাঁহার সমূহ বিপদ, তিনি তাঁহার বীজমন্ত্র লিখিয়া দিলেন,

ইহাতেই কবির লেখনী হইতে অনর্গল কবিতা বাহির হইবে বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। মাণিকরামের চতুর্থ সোদর ছকুরামকে এই গানের গায়েন হইবার জন্য তিনি কবির নিকট বলিয়া গেলেন। এই নির্দ্দেশ মত অগত্যা কবি কাব্য-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন, বাধ্য হইয়া কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তানকে গায়েন হইয়া আসরে নামিতে হইল।

মাণিকরামের গ্রন্থ অন্যান্য ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের মতই ২৪ পালায় সম্পূর্ণ। প্রথম পালায় কবি গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ, ধর্ম্মের বন্দনা, তন্মধ্যে মার্কণ্ড মুনির ধর্ম্ম পূজার কথা, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাই ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের স্থাপন পালা, পরবর্ত্তী আরও ২৩টি পালায় লাউসেনের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

কাব্য পরিচয়

কাহিনী ভাগে দুই এক স্থলে অন্যান্য ধর্ম্মমঙ্গল হইতে একটু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় কিন্তু অন্যত্র প্রায় অভিন্ন। দুই এক স্থলে যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় তাহা মাণিক রামের প্রাচীনত্বেরই পরিচায়ক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্ম্মমঙ্গলের কবি ঘনরামের কাব্যে মার্কণ্ড মুনির ধর্ম্মপূজার কোনই উল্লেখ নাই, হরিশ্চন্দ্র রাজার উল্লেখ রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মার্কণ্ড মুনি ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই ধর্ম্ম সাহিত্যের প্রাচীনতর উপজীব্য। লাউসেনের কাহিনী পরবর্ত্তী যোজনা মাত্র। অতএব মাণিকরামে এই মার্কণ্ড মুনির উল্লেখ হইতেই তাহার প্রাচীনত্বের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। মাণিক রামে গৌড়েশ্বরের মাতার নাম সাফুল্লা, ঘনরামে বল্লভা। সাফুল্লা নামটি প্রাচীনতর, মাণিকরামে লাউসেনের অশ্বের নাম অস্থিরপাথর, ঘনরামে আণ্ডির পাথর। আরও কয়েকটি বিষয় মাণিকরাম ও পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলের কবিদিগের মধ্যে সামান্য অনৈক্য রহিয়াছে। এই সমস্ত ব্যতিক্রম দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের সময়ের অনেক ব্যবধান।

মাণিকরাম যে কেবল একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাহাই নহে, তিনি একজন সুকবিও ছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গল বীর রসাত্মক কাব্য।

কবিত্ব

তাঁহার কাব্যে এই বীররস ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যেমন স্থানে স্থানে ওজস্বিনী ভাষা ও দৃশ্যের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন তেমনই আবার তিনি নিপুণ চিত্রকরের দৃষ্টিদ্বারা সামাজিক চরিত্র চিত্রণের প্রয়াসও সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। পাণ্ডিত্যের প্রভাবে তাঁহার রচনা কোথাও ব্যাহত হইয়া পড়ে নাই। তবে সংস্কৃত রচনার আদর্শানুযায়ী তাঁহার রচনায় নানা অলঙ্কারের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য হইতে আহৃত এই উপকরণ রাশি বাংলা ছন্দের সূত্রেও এমন ভাবে গাঁথিয়াছেন যে ইহাতেও বাংলা ছন্দেরই বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইয়াছে, সংস্কৃতের অন্ধ অনুকৃতিতে পর্য্যবসিত হয় নাই।

"কলুষ নাশিনী কালরাত্রি করালিনী।
নৃসিংহনাশিনী নমোস্ততে নারায়ণী॥
দক্ষের দুহিতা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী।
নাগারিবাহিণী নমোস্ততে নারায়ণী॥" ইত্যাদি

মাণিকরামের এই সমস্ত রচনা হইতেই তাঁহার সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি লাউসেনের বিদ্যাভ্যাস সম্পর্কে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একমাত্র তাহার সম্পর্কেই প্রযুজ্য হইতে পারে,—

"অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল।
মুরারি ভারবি ভট্ট নৈষধ পিঙ্গল॥
কালিদাস কৃত কাব্য অন্য কাব্য কত।
অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্ক শাস্ত্র॥
ছন্দ শাস্ত্র পুরাণ পড়িল তারপর।
উত্তম হইল বিদ্যা নয় দশ বচ্ছর॥"

এই সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে কবি জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রচুর রসও আহরণ করিয়াছিলেন তাঁহার কাব্য হইতে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। মাণিকরামের কবি-কল্পনায় চরিত্র সৃষ্টিও সার্থক হইয়াছে। লখ্যা ডোমনীর চরিত্র তাঁহার কাব্যের এক অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

আদিরস বর্ণনায় মাণিকরাম অন্যান্য ধর্ম্মমঙ্গল কবিদিগের তুলনায় একটু বিশেষ অগ্রসর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও তাঁহার সংস্কৃত রস শাস্ত্র জ্ঞানের ফলই বলিতে হইবে।

সীতারাম দাস ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি। তাঁহার যে সমস্ত প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় তাহাদের তারিখ ১০৩৪ মল্লাব্দ (১৭২৪ খৃষ্টাব্দ), ১০৫৪ মল্লাব্দ (১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ) ১৩৬০ মল্লাব্দ (১১৪৫ খৃষ্টাব্দ)। এই পুথিগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথি-শালায় রক্ষিত আছে। সীতারামের ধর্ম্মমঙ্গল রচনা-কাল ১০০৪ সাল বলিয়া তাঁহার পুঁথিতে উল্লেখ আছে। ইহাকে বঙ্গাব্দ ধরিয়া কেহ কেহ ১৫৯৭ খৃঃ এই কাব্যের রচনাকাল বলিয়া অনুমান করেন। আবার ইহাকে মল্লাব্দ ধরিয়া ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দ গ্রন্থ রচনা কাল বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। মল্লভূম অঞ্চলে মল্লাব্দের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল, অতএব শেষোক্ত মতও সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গাব্দ ও শকাব্দের প্রচলনও সে দেশে অজ্ঞাত ছিলনা, অতএব এই সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উপায় নাই।

সীতারাম

বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত ইন্দাস গ্রামে সীতারাম দাসের জন্মস্থান। কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে তাঁহার স্বগ্রামের ধর্ম্মঠাকুরের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, "ইন্দাসের দেহারা বন্দিব সাবধান" কোন কোন খণ্ডিত পুঁথিতে কবির এই প্রকার পরিচয় পাওয়া যায়,—তাঁহারা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ জাতিভুক্ত। তাঁহার আদি-

পরিচয়

পুরুষের নাম গোপীনাথ দে, গোপীনাথের তিন পুত্র, মথুরা, মদন ও ধর্ম্মদাস। কনিষ্ঠ ধর্ম্মদাসের চারি পুত্র ছিল, তাঁহার জ্যেষ্ঠ মদনের এক পুত্রের নাম দেবীদাস, দেবীদাসের পুত্র সীতারাম দাস। সীতারামের এক ভ্রাতা ছিল, নাম সভারাম।

গ্রন্থোৎপত্তি

সীতারামও স্বপ্নাদেশেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এই স্বপ্নাদেশের মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে। স্বপ্নাদেশের কর্ত্তা এখানে ধর্ম্মঠাকুর নহেন বরং 'গজলক্ষ্মী মা'। ইনিই বৌদ্ধ আত্মা বা চণ্ডী। কবি লিখিয়াছেন,—

"শিওরে বসিল মোর গজলক্ষ্মী মা।
উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখ গা॥"

অবশ্য এই স্বপ্নের মধ্যে বিবিধ বিগ্রহের সঙ্গে ধর্ম্মও আবির্ভূত হইয়াছিলেন, "ধর্ম্ম দেখা দিল জামকুড়ির বনে।" খণ্ডঘোষ নিবাসী অযোধ্যারাম চক্রবর্ত্তী ও নারায়ণ পণ্ডিত সীতারামের সমসাময়িক লোক। তাঁহারা সীতারামকে কাব্য রচনায় উৎসাহ দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

কাব্য-বিচার

সীতারামের রচনা সরল। ধর্ম্মমঙ্গলের পরবর্ত্তী কবিরা রচনা-বিষয়ে যেমন আলঙ্কারিক পারিপাট্য দেখাইয়াছেন, সীতারামের রচনায় তাহা দৃষ্ট হয় না। ইহাতে তাঁহার আপেক্ষিক প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়। মনে হয়, বঙ্গভাষা তখনও সংস্কৃত অলঙ্কার-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই। তাঁহার রচনা অনেকটা প্রাচীন পাঁচালীর লক্ষণাক্রান্ত, কাহিনী কিম্বা চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়াও কোন বৈশিষ্ট্য তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। তবে কাহিনীর অনাড়ষ্ট বর্ণনা স্বচ্ছন্দগতিতে সর্ব্বত্রই সহজভাবে অগ্রসর হইয়া চলিতে দেখা যায়।

সীতারামের রচনা কবিত্ব-বর্জ্জিত, পাণ্ডিত্যও তাঁহার রচনায় যে খুব প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও নহে, কাহিনী বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে তিনি গতানুগতিকতারই অনুসরণ করিয়াছিলেন।* তাঁহার কাব্যের খুব বিশেষ প্রচার হইয়াছিল বলিয়াও মনে হয় না।

সীতারামের সহজ বর্ণনা ও সরল ভাষার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার কামরূপের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"গড় দেখি সমুখে একাশী হাত খাওা।
সাড়ি পথ ঘোড়ার বলিতে নাঞি দাণ্ডা॥
তারপর বেতগড় ষাটি হাত গানা।
কেআ বনে দেখি কত পিব্যাসীর থানা॥
গুয়া-গড় গভীর দেখিয়া প্রাণ উড়ে।
সাতহাত দরিয়া পঞ্চাশ হাত আড়ে॥"

ইহার পর রামদাস আদকের ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যখানি প্রণীত হয়। তাঁহার কাব্যের প্রকৃত নাম 'অনাদি-মঙ্গল।' রামদাস কৈবর্ত্ত বংশোদ্ভব।* তাঁহার পিতার নাম রঘুনন্দন! হুগলী জেলার হায়ৎপুর গ্রামে কবির আদি নিবাস ছিল, পরে, তাঁহারা সেই জেলার অন্তর্গতই পাড়াগ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। কবি আত্মপরিচয়চ্ছলে লিখিয়াছেন,—

রামদাস আদক

"ভুরস্থটে রাজা রায় প্রতাপ নারায়ণ।
দানদাতা কল্পতরু কর্ণের সমান॥
তাঁহার রাজত্বে বাস বহুদিন হ'তে।
পুরুষে পুরুষে চাষ চষি বিধিমতে॥"

এই প্রতাপ নারায়ণ রায় কবি ভারতচন্দ্র রায়ের পূর্ব্বপুরুষ। ইহাতেই মনে হয়, কবি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। কবি

তাঁহার গ্রন্থোৎপত্তির যে কারণ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইল,—কবির স্বগ্রামে এক অতি অত্যাচারী তহ্‌শীলদার ছিলেন।' তাঁহার নাম চৈতন্য সামন্ত। পিতার ঋণের জন্য তিনি তাঁহার কারাগারে আবদ্ধ হন। কবি দ্বারবানের হাতে পায়ে ধরিয়া অবশেষে সেখান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। কিন্তু মাতুলালয়ে পলাইয়া যাইবার পথে এক সিপাহী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অশেষ অত্যাচারিত হন। তারপর পিপাসার্ত্ত হইয়া জলপানের নিমিত্ত সম্মুখস্থ এক দীঘিতে অবতরণ করেন, দীঘি তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায়, কবি দারুণ নৈরাশ্যে সেই স্থানেই বসিয়া পড়েন, তখনই এক দিব্য পুরুষ স্বর্ণভৃঙ্গারে করিয়া জল লইয়া তাঁহার সম্মুখস্থ হ'ন। তিনি তাঁহাকে জলপান করাইয়া সুস্থ করিয়া বলেন,—

গ্রন্থোৎপত্তি

"জলপানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি।
ধর্ম্মের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি॥"

রামদাস এই বিষয়ে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করাতে সেই দিব্য পুরুষ আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন,

"আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি।
ঝাড়গ্রামে কালুরায় ধর্ম্ম হই আমি॥
আসরে জুটিবে গীত আমার স্মরণে।
সঙ্গীত কবিতা ভাষা ভাসিবে বদনে॥"

এই দৈব নির্দ্দেশ ক্রমে রামদাস তাঁহার কাব্য রচনা করিলেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে এই কাব্য তাঁহার স্বগ্রামে সর্ব্বপ্রথম গীত হয় বলিয়া প্রকাশ।

অনাদিমঙ্গলের ভাব ও ভাষার মধ্যে পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর নাই। ইহা সীতারামের কাব্য হইতেও অনেকাংশে সরল। তবে ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, সীতারামে তাহার অভাব আছে।

সম্ভবতঃ ইহার পরই ১৭১১ খৃষ্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা সম্পূর্ণ হয়। তিনি তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে এইভাবে ইহার রচনা-কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

ঘনরাম

"সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাহিক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপন॥
শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর॥
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি॥"—পৃঃ ২৭৩

ইহাতে দেখা যায়, ১৬৩৩ শক অথবা ১৭১১ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে তাঁহার পুস্তক রচনা সম্পূর্ণ হয়। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় প্রাচীন পঞ্জিকার সাহায্যে এই শক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লিখিয়াছেন,[১] "মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসের আদ্য অংশে হংস সূর্য্য ছিলেন (১লা কি ২রা), শুক্রবার, সুলক্ষণ শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথি। পাঁজি গণিয়া দেখিতেছি, ১৬৩৩ শকে ১লা অগ্রহায়ণ শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়া। ১লা হওয়াতে আদ্য অংশেও বটে। 'যাম সংখ্য দিনে'—যাম অর্থে প্রহর। এক প্রহর বেলার সময় সঙ্গীত সাঙ্গ হয়।" কিন্তু ইহার অর্থটি পরিষ্কার হইল না। যাম সংখ্য দিনে অর্থাৎ যাম অর্থে যদি প্রহর ধরি তাহা হইলে ৮ সংখ্যা[২] (অষ্ট প্রহর) হয়, কিন্তু ৮ই তারিখে অন্যান্য

রচনা-সমাপ্তি

১ প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৬ পৃঃ ৬৪১

২ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই হিসাব মত "৮ই তারিখে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়" বলিয়া লিখিয়াছেন। (শ্রীধর্ম্মপুরাণ, ভূমিকা পৃঃ।৵০) কিন্তু ৮ই তারিখে শুক্লা তৃতীয়া তিথি হয় না।

তিথি-নক্ষত্র পাওয়া যায় না, অতএব 'দিন' শব্দটিকে যদি 'দণ্ড' ধরি তাহা হইলে বেলা ৮ দণ্ডের সময় পুঁথি সম্পূর্ণ হয় এরূপ বলা যাইতে পারে। ইহাতে শেষ পদটির অর্থও সুসঙ্গত হয়। সম্ভবতঃ দণ্ড লিপিকর প্রমাদে দিন হইয়া থাকিবে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য্য-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি যেমন ভারতচন্দ্র ঘনরামও তেমনই ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য্য যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, ভারতচন্দ্রও অনেকাংশে তাঁহার নিকট ঋণী।

বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কইয়ড় পরগণায় কৃষ্ণপুর গ্রামে কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর জন্ম হয়। তিনি এইভাবে নিজের বংশ পরিচয় দিয়াছেন,

"ঠাকুর পরমানন্দ কৌশল্যার বংশে।
ধনঞ্জয় পুত্র তার সংসারে প্রশংসে ॥
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত।
তার সুত ঘনরাম গুরু পদাক্রান্ত ॥"—পৃঃ ৪৪

মাতার পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।" কবির এই মাতামহের কুল রাজবংশসম্ভূত। তিনি লিখিয়াছেন,

"কৌকুসাবি অবতংশে কুশধ্বজ রাজবংশে
দ্বিজ গঙ্গাহরি পুণ্যবান,
তাঁহার দুহিতা সীতা, সত্যবতী পতিব্রতা
তার সুত ঘনরাম গান।"

ঘনরামের চারি পুত্র, রামপ্রিয়, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ। কবি তাহাদের জন্যও তাঁহার কাব্য মধ্যে দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন। কবির অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র বর্ত্তমানে জীবিত আছেন। ঘনরাম তাঁহার কাব্যে বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্রেরও কল্যাণ কামনা করিয়াছেন,

পরিচয়

"অখিল বিখ্যাত কীর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তী
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তার রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রসগান॥"

সম্ভবতঃ কীর্ত্তিচন্দ্র কবির পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক ছিলেন। কিন্তু কীর্ত্তিচন্দ্রের সহিত তাঁহার মুখ্য কি সম্পর্ক ছিল তাহা তাঁহার কাব্যপাঠে জানা যায় না। তিনি কীর্ত্তিচন্দ্রের আদেশে এই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এমন কথা কোন স্থানেও উল্লেখ করেন নাই, কিম্বা তিনি কীর্ত্তিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন এমন উক্তিও কোথাও নাই। তবে সম্ভবতঃ কীর্ত্তিচন্দ্রের রাজ্যের প্রজা বলিয়া এবং নিজেও ব্যক্তিগত ভাবে কোন উপায়ে তাঁহার নিকট হইতে উপকৃত হইয়া কৃতজ্ঞতাভরে এই রাজার নাম তাঁহার কাব্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এতদতিরিক্ত তাঁহার সহিত কীর্ত্তিচন্দ্রের আর কোন সম্পর্ক ছিল না।[১]

ঘনরাম ও কীর্ত্তিচন্দ্র

ঘনরাম তাঁহার কাব্য-রচনার মূলে একজনের কথা শ্রদ্ধার সহিত বার বার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার গুরু,—

"গুরুপদে হয়ে যত্ন ঘনরাম কবিরত্ন
বিরচিল শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল।"

এই গুরু তাঁহার টোলের অধ্যাপক। গ্রন্থোৎপত্তির মূলে কবি কৃতজ্ঞতাভরে এই গুরুর ঋণ স্মরণ করিয়াছেন। ধর্ম্মের বন্দনায় তিনি লিখিয়াছেন,

১ এই কথা বিশদভাবে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, অনেকেই ঘনরামকে কীর্ত্তিচন্দ্রের সভাকবি ও তাঁহারই আদেশে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত ঘনরামের এই সৌভাগ্য হয় নাই।

"ভাবি তব পদদ্বন্দ্ব তুই এক ভাষা ছন্দ
কবিতা করিতাম পূর্ব্বফলে।
শুনে হয়ে কৃপান্বিত বর্ণিতে বলিলা গীত
গুরু ব্রহ্ম বদন-কমলে ॥"

ঘনরামের কাব্য-রচনায় দেবতার স্বপ্নাদেশের কোন উল্লেখ নাই। এখানে গুরুর আদেশই দেবতার স্বপ্নাদেশের কার্য্য করিয়াছে। এই গুরুই তাঁহাকে কবিরত্ন উপাধিতে ভূষিত করেন,—তিনি লিখিয়াছেন, "নিজ গুণে করি যত্ন, নাম দিলা কবিরত্ন, কৃপাময় করুণা-আধার।" কবিরত্ন তাঁহার রাজ-দত্ত উপাধি নহে। ঘনরাম শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন, তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই লিখিয়াছেন, "প্রভু যার কৌশল্যা-নন্দন কৃপাবান।" সেইজন্য তাঁহার লাউসেনের চরিত্র অঙ্কনেও শ্রীরামচন্দ্রের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। এই সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিয়াছি।

ঘনরাম বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা করিতেন, তদুপরি তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে সঞ্চিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান তাঁহার স্বভাব কবিত্বের উপর পাণ্ডিত্যের প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছে। লাউসেনের বিদ্যাভ্যাস বর্ণনা সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাও একমাত্র তাঁহার নিজের উপরই প্রযুজ্য,—

পাণ্ডিত্য

"বেদবাণী বিজ্ঞ হ'ন পড়িয়া পাণিন।
কাব্য অলঙ্কার কোষ আগম নিগম।
ভক্তিযোগ সার যার ঘুচে মনোভ্রম ॥"

স্বভাব-কবিত্বের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের সংযোগই ঘনরামের কাব্যকে সকল বিষয়ে সার্থকতা দান করিয়াছে।

পাণ্ডিত্যের প্রভাব ঘনরামের সহজ কবিত্বকে কোন স্থানে প্রতিহত করিতে পারে নাই, এই বিষয়ে তাঁহার একমাত্র পরবর্ত্তী কবি

ভারতচন্দ্রের সহিতই তুলনা হইতে পারে। তাঁহার কাব্যে ভারতচন্দ্রের ভাষা ও ভাবের সূচনা দেখিতে পাই। ঘনরামের ভাষা অত্যন্ত মার্জ্জিত এবং উন্নত রুচির পরিচায়ক। অনুপ্রাস প্রয়োগ-বাহুল্য তাঁহার রচনাকে অনেক সময় শ্রুতিমধুর করিয়াছে। তাঁহার কাব্যের যে কোন জায়গা হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে,—

"কর পুটে এ' সঙ্কটে, কাতর কিঙ্কর রটে
উর ঘটে পূর অভিলাষ।"
'নিশি-নাশে নয়নে ছাড়িল নিদ্রা-মায়া।"
"জগতে জাগাবে যশ যদি জিন খেয়ে।"
"গদ গদ গরুড় গোবিন্দ গুণ গায়।
গুড়ি গুড়ি গরুড় গমনে গুড়ি যায়॥
ঘোর রবে ঘুঘু যেন ঘন ঘন ডাকে।
চঞ্চল চড়ুই চিল লিখে চক্রবাকে।
চকোর চকোরী নাচে চাহিয়া চপলা।
মনে হৈল নিকটে আইল মেঘমালা॥"

অবশ্য এই সমস্ত স্থলেও অনেক সময় তিনি অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া রচনার অর্থপরিগ্রহ দুর্ঘট করিয়া তুলিয়াছেন। উত্তর দিক বুঝাইতে কোথাও লিখিতেছেন, "বিরাট-তনয়-মুখ"; প্রাতঃকাল অর্থে উষা শব্দ বুঝাইতে লিখিয়াছেন, "গোবিন্দ-তনয়-সুত-জায়া," দশ বাণ সোনা বুঝাইতে লিখিয়াছেন, "ইন্দু বিন্দু বাণ হেম" ইত্যাদি। প্রবচনের মত সংক্ষিপ্ত কথায় গভীর ভাব প্রকাশ করিতে ভারতচন্দ্র যে রচনার দক্ষতা দেখাইয়াছেন এই ঘনরামেই তাহার সূচনা দেখিতে পাই। অবশ্য ঘনরামের রচনার আপেক্ষিক অপ্রচলনের জন্য তাহা লোকমুখেও বিশেষ প্রচার লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু এই ধরণের রচনার ঘনরামই পথপ্রদর্শক। তাহার

কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, ইহা হইতে কবির গভীর সামাজিক অভিজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যাইবে,—

১। "রোগ-ঋণ-রিপু-শেষ দুঃখ দেয় র'য়ে"

২। "হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাই খুঁজি"[১]

৩। "না করে মিথ্যারে ভয় বিশেষে ঘটক"

৪। "বিবাহ বিষয়ে মিথ্যা দোষ নাহি তায়।"

৫। "কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব।"

৬। "সুব্যঞ্জন ঝোল ঝালে, কুটুম্বিতা হালাহোলে, পরকালে কেহ কার নয়।"

লখাইর সপত্নী সনকার মুখ দিয়া মাত্র একটি কথায় কবি বাঙ্গালী সংসারের যে একটি চিত্র দিয়াছেন তাহা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। শত্রু আসিয়া নগর আক্রমণ করিলে লখাই তাহার সপত্নীর নিকট নগর রক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু এই সনকা ছিল কালুর উপেক্ষিতা পত্নী, সে এই সুযোগে শুনাইয়া দিল,—

"মোর গায়ে উড়ে খড়ি তোর গায়ে চুয়া।
দাসীতে যোগায় পান গালে গোটা গুয়া॥"

—ঘনরাম, পৃঃ ২৪০

অতএব এখন বিপদের সময় সাহায্য প্রার্থনা নিষ্ফল। কথাগুলিতে কবির আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি নূতন মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সৃষ্টিতেও ঘনরাম কয়েক স্থানে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই পরবর্তী

১ ইহার সহিত নিম্নোদ্ধৃত প্রাচীন সাহিত্যে প্রচলিত উক্তিগুলি তুলনীয়,—
"হত্থকঙ্কণং কিং দপ্পণেণ পেক্খীয়দি।"—কর্পূর মঞ্জরী
"হাথেরে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ"—বৌদ্ধগান
"হাথক কাকন আরসী কাজ?"—বিদ্যাপতি

কালে গিয়া ভারতচন্দ্রে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। মৌলিকতাহীন গতানুগতিক কাহিনীর মধ্যেও ঘনরাম কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কর্পূরের চরিত্রটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এই ভীরু বাঙ্গালীর চরিত্রটি এক ঘেয়ে বীররসাত্মক ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে একটি বিপরীতধর্ম্মী সৃষ্টি। ইহার সংযোগে কাব্যের আখ্যান-ভাগের মধ্যে অনেক স্থানেই একটু বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। বীর লাউ-সেনের পার্শ্বে এই ভীরু বাঙ্গালীর চরিত্রটি অঙ্কিত করিয়া ধর্ম্মমঙ্গলের কবিগণ দুইটি চরিত্রকেই পরস্পরের সান্নিধ্যে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ঘনরামের এই কর্পূর চরিত্রটি একটি অতি সুন্দর বাস্তব চরিত্ররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। বীরত্বের আদর্শ বাঙ্গালী কবির পরিকল্পনায় যে কত নিষ্ফল তাহা কর্পূর চরিত্রের সার্থকতা হইতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। লাউসেন ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের আদর্শ সৃষ্টি কিন্তু এই কর্পূরই একমাত্র বাস্তব সৃষ্টি। ঘনরামের সামাজিক চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস এই কর্পূরের চরিত্র সৃষ্টিতে সুসঙ্গত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছে।

কর্পূর চরিত্রের সার্থকতা

ঘনরামের কাব্যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকজন কবির সামান্য প্রভাব বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট নহে, কিম্বা তাহা একেবারে তাঁহার কাব্যের মূলেও নিহিত নহে। দেবতাদিগের ছলে আত্মপরিচয় প্রদান করা মুকুন্দ-রামের পরবর্ত্তী কাল হইতে মঙ্গলকাব্যের একটা বিশেষ লক্ষণ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়া কবিরা পাণ্ডিত্যের কৌশল দেখাইতেন। ঘনরামেও অনেক স্থলে কালকেতু ভবনে চণ্ডীর আত্মপরিচয় দানের মত দেবতাদের আত্মপরিচয় দানের কথা আছে, তাহাতে সাধারণতঃ মুকুন্দরামেরই পথ অনুসরণ করা

অন্যান্য প্রভাব

হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঘনরামের নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি মুকুন্দরাম হইতেই গৃহীত হইয়াছে,—

১। "গজ পৃষ্ঠে সাজি' চলে ভূপতির মামা,"

২। "আন্ধারের মণি তুমি অন্ধকের নড়ি"।

৩। হরি-হর-হিরণ্য গর্ভের তুমি মূল,"

৪। "ননদী সতিনী নাই বচনের জ্বালা।"

ঘনরামের নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনুবাদ হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়,

'মিছা বাণী সেঁচা পানী কতক্ষণ রয়।
কতক্ষণ জলের তিলক রয় ভালে।
কতক্ষণ রয় শিলা শূন্যেতে ফেলিলে॥"

এতদ্ব্যতীত ঘনরাম অসংখ্য সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক সুন্দর ও সহজ ভাবে অনুবাদ করিয়া তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—

১। "মৃতদেহ দাহ করে চিতার অনলে।
সজীব শরীর সদা দহে চিন্তানলে॥"

('চিতাচিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে')

২। "রাজা বলে দূর নহে যেবা যার বন্ধু।
দুই লক্ষ যোজন অন্তর দেখ ইন্দু॥
কেমন কুমুদ ফুটে চন্দ্র দরশনে।
সরোরুহ বিকশিত সূর্য্যের কিরণে॥"

—('গিরৌকলাপী…')

৩। "তেজীয়ান্ যা করে করিতে পারে তাই।"

('তেজিয়বাং ন দোষায়')

৪। "সুবৃক্ষ চন্দন গন্ধে সুশোভিত বন।
সুপুত্র হইলে গোত্রে প্রকাশে তেমন॥"—
('একেনাপি সুবৃক্ষেণ')

৫। "কুপুত্র হইলে কুলে কুলাঙ্গার কহে।
কুবৃক্ষ কোঠরে অগ্নি উঠে বন দহে॥"
—('একেনাপি কুবৃক্ষেণ'…)

অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীতে তাঁহার কাব্য একেবারে পরিপূর্ণ। গৌড়পতির পুরাণপাঠ শ্রবণ-প্রসঙ্গে কত পৌরাণিক কাহিনী যে তিনি আমাদিগকে শুনাইয়াছেন তাহার অন্ত নাই। তবে এই কাহিনীগুলি বর্ণনাতেও কবি বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন, যথেচ্ছ-ভাবে তাহা বর্ণনা করিয়া যান নাই। পুরাণের অনুরূপ একটি ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া তিনি এক একটি সুদীর্ঘ পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। একদিকে মঙ্গলকাব্যের বিধিনিয়মের গণ্ডী, অন্যদিকে সংস্কৃত পৌরাণিক আদর্শ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া পড়িয়া ঘনরামের বিপুলায়তন কাব্য আর নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পায় নাই।

পুরাণের প্রভাব

ঘনরামের কাব্যে কেহ কেহ করুণ-রসের অভাব বোধ করিয়াছেন। অবশ্য প্রাচীন বাংলা কাব্যে করুণ-রস বলিতে যাহা বুঝায়,—অর্থাৎ লাচারী ছন্দে দীর্ঘ বিলাপোক্তি, তাহা ঘনরামের কাব্যে একেবারেই নাই। বিলাপ করিবার চরিত্রগুলি অর্থাৎ স্ত্রীচরিত্রগুলি ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যে পুরুষের অপেক্ষাও বীর, সম্মুখ যুদ্ধে সর্ব্বদাই তাহারা সশস্ত্র অগ্রসর হইয়া যায়, অতএব ধর্ম্মমঙ্গলে গতানুগতিক করুণরস সৃষ্টির অবকাশ হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া স্বাভাবিক মানবীয় প্রবৃত্তিগুলি বিমূঢ় করিয়া লইয়া কোন ধর্ম্মমঙ্গলের কবিই কাব্য লিখিতে

করুণরস

বসেন নাই, সেইজন্য করুণরসও তাহাতে প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা কর্ত্তব্যের শাসনে অত্যন্ত সংযত। ইহাদ্বারা প্রাচীন বাঙ্গালাকাব্যের একটা নূতন দিক উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ইহা কোন কবির বিশেষ কোন রস বর্ণনার ক্ষমতার অভাব-জাত নহে, ইহা এই জাতীয় কাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য হইতেই জাত। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহত হইয়া লাউসেনের পত্নী কলিঙ্গা প্রাসাদ-দ্বারে ফিরিয়া আসিয়াই প্রাণত্যাগ করিল। সপত্নীর শোকে কানড়া কাঁদিয়া আকুল হইল। যোদ্ধবেশিনী কলিঙ্গার মৃত দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া কানড়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু সেই কান্না এক মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র, হয়ত অশ্রুও তাহাতে নির্গত হয় নাই, দুর্ম্মুখা দাসী আসিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিল,—

"এলা'ল কবরী কেশ ধূলায় লুটায়।
মুখানি মুছায়ে দাসী দুর্ম্মুখা পেতায়॥
কেঁদনা সুন্দরি শুন উঠ বুক বেঁধে।
মরিলে কে কোথাকারে প্রাণ দিল কেঁদে॥
শোকের সময় নয় শত্রু আসে পুরে।
সংহার সংগ্রামে সাজি শোক ত্যজ দূরে॥"

যে যুদ্ধে পুত্র নিহত হইয়াছে সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই আত্মাহুতি প্রদান করিয়া জননী পুত্র শোক ভুলিতেছে, ভ্রাতা মৃত ভ্রাতার পরিত্যক্ত যুদ্ধাশ্ব গ্রহণ করিয়া সেই যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভ্রাতৃশোক ভুলিতেছে, অতএব এই কর্ম্ম-তৎপরতার মধ্যে ধর্ম্মমঙ্গলের কবিরা কোন চরিত্রের জন্যই আর অলস বিলাপের দীর্ঘ অবকাশ রচনা করেন নাই। কিন্তু তথাপি কোন চরিত্রকেই যে তাঁহারা হৃদয়হীন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন তাহাও নহে। মাতার মুখ হইতে যুদ্ধে ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মাতার আদেশেই যুদ্ধ সজ্জা করিতে করিতে শুকা বলিতেছে,

"শুকা বলে শুন মা সমরে সেজে যাব।
শত্রুত সংহারি রণে ভাই কোথা পাব॥
যে শোকে ব্যাকুল রাম অখিলের নাথ।
হেন শেল বুকেতে বাজিল বজ্রাঘাত॥
এত বলি কাঁদে শুকা লখে দেয় বোধ।
শোক তেজে সমরে ভেয়ের ধার শোধ॥"

প্রাচীন বঙ্গের জাতীয় চরিত্রের ইহা আর একটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ দিক, অতএব ইহার মধ্যে কোন বস্তুর যে অভাব আছে তাহা বলা যায় না।

রামচন্দ্র

চামট গ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মল্লভূমের রাজা গোপাল সিংহের সময়ে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই কবির স্বহস্ত-লিখিত পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৩৬ সালের পৌষ মাসের অধুনা-লুপ্ত পঞ্চপুষ্প পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁহার আরও খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কাব্য মধ্যে তিনি রাজা গোপাল সিংহের নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা হইতেই নিশ্চিত ভাবে কবির কাল নিরূপণ করা সম্ভব হইয়াছে।

রচনা-বৈশিষ্ট্য

রামচন্দ্রের রচনা বৈশিষ্ট্য বর্জ্জিত, অত্যন্ত সাধারণভাবে তিনি কাহিনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন মাত্র, তাঁহার রচনা অনেকটা প্রাচীন পাঁচালীর লক্ষণাক্রান্ত। তবে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের বিরাট কাহিনী ইহাতে কোথাও অনাবশ্যক রচনা-ভারে ভারাক্রান্ত নহে বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহা সহজ গতিতে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। গল্প-পিপাসু পাঠকের মন কোথাও পড়িতে পড়িতে পীড়িত হইয়া পড়ে না।

রামচন্দ্রের মধ্যে প্রকৃত কবিত্বের অভাব থাকিলেও পাণ্ডিত্যের অভাব ছিলনা। ইছাইর বিরুদ্ধে গৌড়েশ্বরের যুদ্ধাভিযানের বর্ণনাটি এইরূপ,—

"নানা বাদ্য বাজে সাজে নৃপ সেনাগণ।
তোলপাড় করে রাজ্য গৌড্ড ভুবন॥
রায়বেলি গন্ধবেলি জম্বুরা ক্রলান।
ক্ষমরি মোহরি কাড়া ফুকরে কাহান॥
দগড় দগড়ী বেণু রুদ্ধ বীণা বাঁশী।
কাংস্য করতাল ঘণ্টা ঘোর শব্দ কাসী॥
সিন্ধু আনবরোল ভেরী রণভেরী কালী।
জয় ঢাক বীর ঢাক কর্ণে লাগে তালি॥ ইত্যাদি

এই পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরের সহিত যদি একটু প্রকৃত কবিত্বের সংযোগ হইত তাহা হইলে রামচন্দ্রের মহাকাব্য রচনা সার্থক হইত।

সহদেব

১১৪১ সাল ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দ ৪ঠা চৈত্র তারিখে সহদেব চক্রবর্ত্তী কালুরায় ধর্ম্মের স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন,

দ্বিজ সহদেব গান পূর্ব্বত ফলে।
যাহারে করিলে দয়া একচল্লিশ সালে॥
চৈত্রের চতুর্থ দিন পূর্ণিমার তিথি।
হেন দিনে যারে দয়া কৈলা যুগপতি॥

পাঁজীর গণনায় দেখা গিয়াছে, ১১৪১ সাল ১৬৫৬ শকাব্দের ৪ঠা চৈত্র পূর্ণিমা তিথি ছিলনা, কৃষ্ণা চতুর্থী তিথি ছিল, ইহার একশত বৎসর পূর্ব্বে কিম্বা পরেও এই তারিখে পূর্ণিমা ছিলনা, অতএব পূর্ণিমার তিথি বলিতে পূর্ণিমার পর এই চতুর্থীর তিথিই হয়ত কবি মনে করিয়া থাকিবেন।[১]

১ ধর্ম্মের গান কত কালের? (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়) প্রবাসী, ১৩৩৪, ভাদ্র, পৃঃ ৬৪১

হুগলী জেলায় বালিগড় পরগণার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে কবি সহদেব চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার এই কাব্য রচনায় কালুরায় ধর্ম্মের কথা বারবার শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। কোথাও লিখিয়াছেন, "দয়া কৈলে কালুরায় স্বপনে শিখালে যারে গীত" আবার কোথাও লিখিয়াছেন, "দ্বিজ সহদেব ভণে, বিল্বমূলে যেই জনে দয়াবান্ হৈলে কালরায়।" লাউসেনের কাহিনী ইহাতে নাই। ধর্ম্ম সাহিত্যের প্রাচীনতর কাহিনী অর্থাৎ হরিশচন্দ্র রাজা ও তৎপুত্র লুইচন্দ্রের গল্প ইহাতে সংক্ষিপ্ত ভাবে পাওয়া গেলেও লৌকিক শিবের প্রাচীনতম কাহিনী, পৌরাণিক শৈব কাহিনী, মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রমুখ সিদ্ধাচার্য্যদিগের জীবনী তদুপরি পৌরাণিক দেব-দেবীর কাহিনীও ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। পৌণ্ড বর্দ্ধন হইতে পাল রাজত্বের সময়ে বৌদ্ধ প্রভাব যখন এই দেশে বিস্তৃত হয় তখন তাহার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যোগতান্ত্রিক নাথদিগের ধর্ম্মের কথাও এই দেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের জামতি পালা ও গোলাহাট পালা যে এই নাথ-সাহিত্যের প্রভাবেই ধর্ম্ম সাহিত্যে গিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে এই বিষয়ে প্যুরে আলোচনা করিয়াছি। সহদেবের কাব্যেও এই নাথ সাহিত্যেরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত নাথ-সাহিত্যের সহিত ধর্ম্ম সাহিত্যের আভ্যন্তরিক কোন সম্পর্ক নাই।

কাব্য-পরিচয়

কতকগুলি স্বতন্ত্র বিষয় বস্তুর একত্র সমাবেশের জন্য সহদেবের কাব্য কোন দিক দিয়াই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহাকে সমগ্রভাবে বিচার করিবারও উপায় নাই, ইহাতে চরিত্র সৃষ্টির কোন প্রয়াস নাই, কাহিনীর ঘটনা সন্নিবেশেও কোন কৃতিত্ব নাই; ইহাতে কতকগুলি অসংলগ্ন উপকরণ আনিয়া একত্র সংকলনের চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। অতএব কাব্য হিসাবে ইহা নগণ্য।

কাব্য-বিচার

তবে সহদেবের রচনার যে একটা বিশেষত্ব ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার ভাষা সুমার্জ্জিত না হইলেও স্থানে স্থানে সরল ও মর্ম্মস্পর্শী। বৈষ্ণব কবিতার ভাষার প্রভাব তাঁহার রচনায় অনুভব করা যায় এবং তাহাই তাঁহার ভাষাকে সরসতা দান করিয়াছে। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভাষা গ্রাম্যতা দোষ দুষ্ট ; পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁহার স্বভাব কবিত্ব সকল সময় সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। অনেক সময় তিনি অনেক গ্রাম্য-উপমা প্রয়োগ করিয়া কোন কোন উন্নত কবিত্বপূর্ণ চিত্র ম্লান করিয়া দিয়াছেন। এই একটি ত্রুটি অন্ততঃ সংস্কৃত পুরাণ প্রভাবিত সেই যুগের একটু বিশেষ ত্রুটি বলিয়াই মনে করিতে হয়।

নিম্নোদ্ধৃত রচনাটি হইতে সহদেবের কবিত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা যাইবে,—

"মিছা মায়া মধুরসে বন্দী হয়্যা মায়াপাশে
হরিপদে না রহে ভকতি।
তসরের পোকা যেন লূতায় বলিয়া কেন
নিজ সুখে মজে লঘু গতি॥
যোগীর পরম ধন গোবিন্দের পদে মন
শুনেছি সনক সনাতন।
না শুনি ব্রহ্মার কথা সবে হ'লো ঊর্দ্ধরেতা
সাক্ষাৎ পাইল নারায়ণ॥
মস্তকেতে জটা ধরি গাছের বাকল পরি
বিভূতি ভূষণ ধরি গায়।
কি করিব রাজ্যধন পরম সুন্দরীগণ
উহা কি আমারে শোভা পায়॥"

১৬৫৯ শকাব্দ বা ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে নরসিংহ বসুর ধর্ম্মমঙ্গল রচনা আরম্ভ হয়।[১] নরসিংহের পিতামহ মথুরা বসু বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্রের সময়ে বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী শাঁখারীতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। মথুরা বসুর তিন পুত্র, তাঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁহার নাম ঘনশ্যাম। নরসিংহ এই ঘনশ্যামের পুত্র।

নরসিংহ

নরসিংহ নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে বীরভূমের তদানীন্তন নবাব আসাদুল্লাহ্ খাঁয়ের ওকালতি পদ লাভ করেন। বহুকাল তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদা তিনি নবাব আসাদুল্লাহ্ খাঁয়ের মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের দেয় একলক্ষ টাকা খাজানা লইয়া শিবিকারোহণে মুর্শিদাবাদ যাইতেছিলেন পথিমধ্যে সহসা ঝড় বৃষ্টিতে আক্রান্ত হইয়া আউস গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় তাঁহার এক আত্মীয়-বাড়ীতে তিনি অত্যন্ত আদর সম্ভ্রম লাভ করেন। তাহার অনতিদূরেই একস্থানে ধর্ম্মপূজার অনুষ্ঠান হইতেছিল, তিনি তাহা অবগত হইয়া তথায় তাহা দেখিবার নিমিত্ত গমন করেন। এক সন্ন্যাসীর সহিত তথায় তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, সন্ন্যাসী তাঁহাকে ধর্ম্মের সঙ্গীত রচনা করিতে আদেশ করেন। নরসিংহ মুর্শিদাবাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই সন্ন্যাসীর আদেশ বৃত্তান্ত তাঁহার পরিজনের নিকট প্রকাশ করেন, তাঁহারাই তাঁহাকে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনায় উৎসাহ প্রদান করেন।

গ্রন্থোৎপত্তি

কবি নরসিংহ বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যতীতও পারসী, হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার কাব্যের মধ্যে এই সমস্ত পাণ্ডিত্যের কোথাও অযথা প্রকাশ দেখিতে

পাণ্ডিত্য

---

১ বঙ্গসাহিত্যে পরিচয়, পৃঃ ৪৫৬

পাওয়া যায় না। তাঁহার কাব্যখানি আকারে সুবৃহৎ।* কিন্তু ইহার কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি কোথাও পাণ্ডিত্যে প্রতিহত হইয়া পড়ে নাই। যে কোন স্থান হইতেই তাঁহার সামান্য একটু রচনা গ্রহণ করিয়া দেখাইলেই ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কর্ণসেন লাউসেনকে পশ্চিমোদয় করিয়া গৌড়রাজ্যের সমস্ত পাপ দূর করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন,

"এত শুনি মহারাজ সেন পানে চান।
হাতে ধর‍্যা বচন বলেন বিদ্যমান॥
অনেক কর‍্যাছ কার্য্য প্রাণধন বাপ।
এ'বার ঘুচাইয়া লহ মোর এই পাপ॥
অস্তাচলে যাইয়া দেহ পশ্চিমে উদয়।
তোমা বিনে এ' কার্য্য অন্যের সাধ্য নয়॥"

নরসিংহের ভাষা মার্জ্জিত; কোথাও গ্রাম্যতা দোষ-দুষ্ট নহে।

*গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত একখানি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে কবির কোন পরিচয় কিম্বা তাঁহার রচনাকাল সম্বন্ধেও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহাকে ময়ূর ভট্টের পরবর্ত্তী কবি বলিয়াই মনে করিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার যে হস্তলিখিত খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া যায়, তাহা ১০৭১ সালে লিখিত। কেহ মনে করেন, ইহা বঙ্গাব্দ, আবার কেহ মনে করেন ইহা মল্লাব্দ; মল্লাব্দ হইলে পুঁথির বয়স আরও ১০০ শত বৎসর কম হয় অর্থাৎ ১০৭১ বঙ্গাব্দে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ ও ইহা মল্লাব্দ হইলে ইহাতে ১৩৬৬ খ্রীষ্টাব্দ হয়।

গোবিন্দরাম

কিন্তু কতকগুলি কারণে গোবিন্দরামকে ধর্ম্মমঙ্গলের একজন প্রাচীন কবি বলিয়াই মনে হয়। রচনায় তখনও অষ্টাদশ শতাব্দীর মত পারিপাট্য দেখা দেয় নাই, ভাষাও সংস্কৃত শব্দ দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে নাই; চরিত্রগুলির পরিচয়ও একটু প্রাচীনতা-গন্ধী। অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন কবির প্রভাব তাঁহার উপর খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় না। রচনায় একটা গ্রাম্যতাগন্ধী স্বাভাবিক সরলতা আছে। বিশেষতঃ ময়ূর ভট্টের স্মৃতি তাঁহার মন হইতে তখনও বিলুপ্ত হয় নাই, সেইজন্য তিনি কৃতজ্ঞতাভরে সুদীর্ঘ বন্দনায় ময়ূর ভট্টের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘনরাম ও অপর কদাচিৎ কেহ অতি সংক্ষেপেই তাঁহার নাম স্মরণ করিয়াছেন।

প্রাচীনত্বের প্রমাণ

তাঁহার কাব্য হইতে সামান্য কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিলেই গোবিন্দ-রামের রচনার বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যাইবে। 'ইন্ধা' মেটে ময়নানগর জুড়িয়া নিছুটি লাগাইয়াছে,

"যাবন্ত গড়ের লোক হল্য নিদ্রাতুর।
নিদ্রা গেল পক্ষী মৃগ বিড়াল কুকুর॥
কালুসিংহ নিদ্রা গেল যত বীরগণ।
চারি নারী সেনের নিদ্রায় অচেতন॥
সুখে নিদ্রা গেল ঘোড়া আণ্ডির পাথর।
দুয়ারী পহরী দাসী যতেক নফর॥
সন্তান মায়ের কোরে কত নিদ্রা যায়।
সামন্তের বৌ একা গড়েতে বেড়ায়॥"

গোবিন্দরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক না হইলেও তাঁহাকে আনুমানিক মঙ্গলকাব্যের সৃজন যুগের লোক বলা হইতে পারে।

রামনারায়ণ নামক আর একজন ধর্ম্মমঙ্গলের কবির পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পুঁথির মধ্যে তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি সপ্তদশ কিম্বা অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। তাঁহার যে প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় তাহা ১১৯৩ বঙ্গাব্দ বা ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত। কাব্যের রচনা অনেকাংশে আধুনিক বলিয়া মনে হয়, ভাষায়ও পারিপাট্য আছে। অতএব মনে হয়, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ও মার্জ্জিত ভাষার একটু নিদর্শন দেখান যাইতেছে। ইছায়ের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার আরাধ্যা কালী তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন,—

রামনারায়ণ

"মন্ত্রের অধীন আর ভক্তের কারণ।
নিজ মূর্ত্তি ধরি কালী দিলা দরশন॥
মুক্তকেশী চতুর্ভুজা করাল বদনা।
লহ লহ বদনেতে লম্বিত রসনা॥
কোটর নয়ন তিন গলে মুণ্ডমাল।
ঊর্দ্ধ বাম ভুজে খড়্গ শোভিত বিশাল॥"

এই মার্জ্জিত ভাষা ও পরিণত কল্পনা হইতেই কবিকে মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্য্যযুগের লোক বলিয়া অনুমিত হয়।

যে সমস্ত ধর্ম্মমঙ্গলের কবির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের সম্বন্ধেই যথাসম্ভব আলোচনা করা গেল। এতদ্ব্যতীতও শ্যামপণ্ডিতের নামে একখানি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়। তাঁহার সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছুই আলোচনা হয় নাই, তাঁহার কাব্যও সামান্যই কয়েকখানি এই পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শ্যাম পণ্ডিত বীরভূম জেলার অধিবাসী; অজয় নদের উত্তর তীরে ইনিই

অন্যান্য কবি

একমাত্র ধর্ম্মমঙ্গলের কবি। ধর্ম্ম পুরোহিত বলিয়াই তিনি পণ্ডিত উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ, সেন পণ্ডিত, প্রভুরাম, দ্বিজ ভগীরথ ইত্যাদি কয়েকজন কবিও ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, কিন্তু তাঁহাদের কাব্য কিম্বা জীবন সম্বন্ধে কোন পরিচয় লাভ করা যায় না। ধর্ম্মমঙ্গলের কবিদিগের পরিচয় হইতে জানা যাইতেছে যে, ধর্ম্মমঙ্গলকাব্য একই স্থানে উৎপত্তি ও প্রসার লাভ করিয়াছিল, এমন কি ধর্ম্মপূজা মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ময়ূরভঞ্জ, মানভূম, বীরভূম অঞ্চলে সামান্য প্রসার লাভ করিলেও সেই সমস্ত দেশে কোন ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্য রচিত হয় নাই। ধর্ম্মমঙ্গলের কাহিনী রাঢ়ের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বতন্ত্র দেশে ও সমাজে তাহা লোকপ্রীতি লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি ধর্ম্মঠাকুরের পূজাও রাঢ়ের সংলগ্ন প্রদেশগুলিতেও তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

ধর্ম্ম সাহিত্যের প্রসার

রাঁচি জেলার ওরাওঁ মুণ্ডা সমাজের মধ্যে ধর্ম্ম ও শিবের গাজনের অনুরূপ এক উৎসব প্রচলিত আছে। ইহা মাণ্ডা-পরব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন, মানভূম ও তাহার সংলগ্ন অঞ্চল হইতে এই উৎসব উক্ত সমাজে গিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে।[১] কিন্তু গাজন, মুখোস-নৃত্য ইত্যাদিও অনার্য্য-উৎসব; সম্ভবতঃ তাহা মুণ্ডা-সমাজ হইতেই বাংলার সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, অবশ্য এই সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে বিস্তৃত আলোচনা এখনও হয় নাই। সেইজন্য মুণ্ডা এবং মুণ্ডা-প্রভাবিত সমাজে ইহার বিশেষ

মুণ্ডা সমাজের গাজন

১ 'রাঁচি জেলার একটি উৎসব' (শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু) প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৪৪ সাল।

প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব ইহা রাঢ়ের হিন্দু সমাজ হইতে উক্ত সমাজে গিয়াছে, এই অনুমান সমর্থন-যোগ্য নহে। যদি রাঢ়-অঞ্চল হইতেই এই উৎসব মুণ্ডা-সমাজে যাইত তাহা হইলে তাহাতে রাঢ়ের বৈশিষ্ট্যটুকু বর্ত্তমান থাকিত। কিন্তু তাহাদের এই অনুষ্ঠানের সহিত ধর্ম্মঠাকুরের কোনও নাম সংশ্রব নাই। তবে 'ধরম' নামে এক দেবতা কোলমুণ্ডা সমাজে বর্ত্তমান আছে।[১] এই 'ধরমের' আর এক ভাই 'করম'। বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী মুণ্ডা সমাজে এই 'ধরম-করমে'র পূজা হইয়া থাকে। অবশ্য এই 'ধরম' নামটি মুণ্ডা নাম নহে, এই নামটি রাঢ়ের বৌদ্ধ প্রভাবিত সমাজ হইতে মুণ্ডা সমাজে গিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মঠাকুর এই 'ধরম' নামে মুণ্ডা জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহাদের এই পূজার অনুষ্ঠান রাঢ়ে প্রচলিত ধর্ম্মপূজার অনুষ্ঠান হইতে স্বতন্ত্র। রাঢ়ের অনুরূপ ধর্ম্ম পূজার কাহিনীও তথায় অপ্রচলিত।

মুণ্ডা সমাজের 'ধরম-করম'

রাঢ়ের চতুস্পার্শ্বস্থ সমাজে কালক্রমে এইভাবে ধর্ম্মঠাকুর একটু বাহ্যিক পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই পরিচয়কে সুদৃঢ় করিয়া লইবার প্রয়াস আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু রাঢ়দেশে ধর্ম্ম সাহিত্যের প্রভাব এত ব্যাপক হইয়াছিল যে, সমসাময়িক অন্যান্য বিষয়ক মঙ্গলকাব্যেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মল্লভূমের মনসা-মঙ্গলের কবি দ্বিজ রসিক তাঁহার কাব্যে হনুমানের সঙ্গে বেহুলার কথোপকথন প্রসঙ্গে এই ধর্ম্মমঙ্গলের কাহিনীর উল্লেখ করিতেছেন,—

১ এই বিষয়ে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

"ময়নার সেন রাজা করিত ধর্ম্মের পূজা
চলে সেন হাকণ্ড নগরী।
এই ত গঙ্গার নীরে বিড়ম্বনা করি তারে
ঢেউ নিল পাতাল নগরী॥
পালে লাউসেন গিয়া কয় ধর্ম্ম ধেয়াইয়া
পড়ে গেল বিষম সঙ্কটে।
ধর্ম্মের আদেশ পাঞা তুমি আইলা দূত হঞা
উদ্ধার করিলে জলবাটে॥"

—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, পৃঃ ২৯৪

এতদ্ব্যতীত রাঢ়ের সমসাময়িক সাহিত্যে আরও নানাভাবে ধর্ম্মমঙ্গলের কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের উপরেও বাংলার সমসাময়িক সাহিত্যের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। অনেকগুলি অপ্রধান চরিত্র-পরিকল্পনায় ধর্ম্মমঙ্গলের কবিগণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিলেও মূল কাহিনীর গাঁথুনীতে যেমন ধারাবাহিক গতানুগতিকতাকে আশ্রয় করা হইয়াছে তেমনই ঘটনা বিন্যাসেও অনেক স্থানেই সমসাময়িক একখানি বিশেষ কাব্যকে ভিত্তি করিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

ধর্ম্ম-মঙ্গলে রামায়ণের প্রভাব

অবশ্য কৃত্তিবাসের খাঁটি রামায়ণ পাওয়া যায় না, বর্ত্তমানে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রচলিত আছে তাহাতে অনেক অংশই পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্ত। অতএব সাধারণভাবে ইহাও মনে হইতে পারে যে, সম্ভবতঃ ধর্ম্মমঙ্গলের কাহিনী হইতেই তাহা গিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্য নহে, কারণ, ধর্ম্মমঙ্গল যে সমস্ত স্থানে রামায়ণ কর্ত্তৃক প্রভাবিত বলিয়া অনুমিত হয়, সেই সমস্ত স্থানের কোন কোন চরিত্র বিশেষভাবে রামায়ণেরই চরিত্র। যেমন হনুমান। অতএব ইহা ধর্ম্মমঙ্গলের উপর

রামায়ণেরই প্রভাব বলিয়া অনুমিত হয়, ইহা রামায়ণের উপর ধর্ম্মমঙ্গলের প্রভাব-জাত নহে।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের একটি সমগ্র পালার নাম মায়ামুণ্ড পালা। নব্য ময়ূর ভট্টের শ্রীধর্ম্ম পুরাণের শেষভাগেও পরবর্ত্তী চরিত খণ্ডের যে সূচী পাওয়া যায় তাহাতেও বারমতির নবম মতি মায়ামুণ্ড বলিয়া উল্লিখিত আছে। তিনি বলিয়াছেন, "নবমেতে মায়ামুক্ত (মুণ্ড) ইছাই নিধন।" অতএব ধর্ম্মমঙ্গলের প্রাচীনতম যে কাহিনীর ধারা তাহার মধ্যেও মায়ামুণ্ড পালার উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি। ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূর ভট্টই লাউসেনের কাহিনীকে লইয়া বারমতি বা চতুর্বিংশতি পালায় বিভক্ত করিয়া কাব্য রচনা করেন। অতএব মায়ামুণ্ড পালা তাঁহারই সৃষ্টি। ইহাতেও মনে হয়, ময়ূর ভট্ট কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী লোক। ধর্ম্মমঙ্গলের এই মায়ামুণ্ড পালাটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের একটি কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া রচিত। রামায়ণের কাহিনীটি এই যে, রাবণ রামচন্দ্রের এক মায়ামুণ্ড রচনা করিয়া অশোক বনে সীতার নিকট উপস্থিত করেন। সীতা ইহা দেখিয়া স্বামীর শোকে কাঁদিয়া অধীর হন। অতঃপর হনুমানের নিকট হইতে প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া আশ্বস্ত হন। মায়ামুণ্ড পালাতেও লাউসেনের একটি মায়ামুণ্ড রচনা করিয়া তাহা তাঁহার পত্নীদিগের সম্মুখে আনিয়া স্থাপন করার কাহিনী আছে। অতএব দেখিতে পাইতেছি, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ই রামায়ণের কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রামায়ণের ছোট বড় কত ঘটনা যে ধর্ম্মমঙ্গলের মধ্যে গিয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

মায়ামুণ্ড পালা

ধর্ম্মমঙ্গলের কতকগুলি চরিত্র সৃষ্টিতেও কৃত্তিবাসী রামায়ণের কতকগুলি চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া লওয়া হইয়াছে। রামায়ণের হনুমান চরিত্রটিকে

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য হনুমানের উল্লেখ একমাত্র যে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেই দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, পরবর্ত্তী মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলেও এই হনুমান চরিত্রের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। অবশ্য তাহাও রামায়ণেরই প্রভাব-জাত।

চরিত্র গঠনে রামায়ণের আদর্শ

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যে রুচি দুষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা আকস্মিক বস্তু নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য অর্থাৎ পদ্মাপুরাণগুলির আদর্শ ছিল কতকগুলি শৈব পুরাণ। এই শৈব পুরাণগুলির নৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত দূষিত ছিল। ইহা হইতেই মঙ্গল কাব্যের নায়কের রূপ দর্শনে নারীদিগের নিজেদের পতিনিন্দা ইত্যাদি অতি প্রাচীন কাল হইতেই মঙ্গলকাব্য রচনার বিধিনিয়মের অন্তবর্ত্তী হইয়া পড়ে। কিন্তু ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যগুলি এই বিষয়ে আরও একটুকু অগ্রসর হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে জামতি ও গোলাহাট পালা নামে যে দুইটি স্বতন্ত্র পালা বা অধ্যায় আছে তাহা বিশেষ ভাবেই এই দূষিত নৈতিক দৃষ্টির পরিচায়ক। অবশ্য এই অধ্যায়ের পরিকল্পনা যে ধর্ম্মমঙ্গল কবিদিগের মৌলিক কল্পনা-প্রসূত তাহা বলা যায় না। নাথ-সাহিত্য হইতেই তাহা ধর্ম্ম সাহিত্যে সংক্রমিত হইয়াছে। নাথ সাহিত্যে মীননাথের যে কাহিনী আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি স্ত্রীরাজ্য কদলী পত্তনে গিয়া ব্যভিচারে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কদলী-পত্তন স্ত্রীরাজ্য

রুচি দুষ্টির সূচনা

জামতি ও গোলাহাট পালা

"কদলিত দেখে জুবতি সব প্রজা।
স্ত্রীরাজ্য হয় সে জে স্ত্রী হএ রাজা॥"—গোরক্ষবিজয় পৃঃ ২৪

ধর্ম্মমঙ্গলের গোলাহাট পালার পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ ইহারই অনুরূপ। কর্পূর লাউসেনকে গোলাহাটের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিতেছে,

"এ বড় বিষম বাট বামে রাখ দূরে।
নারী রাজা দারী তায় বৈসে ঐ পুরে॥"—ঘনরাম পৃঃ ১১৪

মঙ্গলা কমলা যেমন মীননাথকে কুহক জালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তেমনই লাউসেনকেও সুরীক্ষা নানা কৌশলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। গোরক্ষনাথ কতকগুলি হেঁয়ালীর উত্তর দিয়া যেমন মীননাথকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তেমনই লাউসেনও কতকগুলি হেঁয়ালীর জবাব দিয়া সুরীক্ষার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

নাথ সাহিত্যের প্রভাব

নাথ সাহিত্যে যেমন পাই যে, গোরক্ষনাথ মীননাথের সন্ধান করিতে করিতে কদলী পত্তনে গিয়া উপস্থিত হইলে তথাকার এক যোগিনী গোরক্ষনাথের পরম সুন্দর কান্তি দেখিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল,

"নাথের দেখিয়া রূপ জোগিনিএ পাএ শোক
চল চল পরদেশী জোগাই।
জথ কিছু কহি আহ্মি মনে ভাবি চাহ তুহ্মি
আহ্মার বাড়ীতে চল যাই॥—গোরক্ষবিজয় পৃঃ ৬২

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের জামতি পালায় তেমনই দেখিতে পাই যে, লাউসেনের সুন্দর কান্তি দেখিয়া নয়ানী তাঁহাকে নানা ছলনায় প্রলুব্ধ করিয়া নিজের গৃহে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে,—

"বচনে মিশাল মধু মন্দ মন্দ বলে।
কোন্ দেশে ঘর বঁধু কেন তরুতলে॥
এসো এসো আমার মন্দিরে উত্তরিবে।
যে কিছু বাসনা কর সকলি পাইবে॥" ঘনরাম, পৃঃ ১০৭

অতএব অন্যান্য মঙ্গলকাব্য হইতে স্বতন্ত্র ধর্ম্মমঙ্গলের কবিগণ এই জামত্তি ও গোলাহাটপালা রচনায়ও অশ্লীলতার দিক দিয়া কোন রকম মৌলিকতা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। মায়ামুণ্ড পালা যেমন রামায়ণ হইতে গৃহীত, জামতি ও গোলাহাটপালার পরিকল্পনাও সম্পূর্ণভাবেই নাথ সাহিত্য হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বিষয়েও ধর্ম্মমঙ্গলের কবিদিগের কোন মৌলিকতা নাই। ধর্ম্মসাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্বের যে কাহিনীর পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেই ধর্ম্মসাহিত্যের উপর নাথ সাহিত্যের প্রভাব অনুভব করা গিয়াছে। ইহাও ধর্ম্মসাহিত্যের উপর নাথ সাহিত্যের প্রভাবের অন্যতম নিদর্শন। নাথ সাহিত্য বিশেষতঃ গোরক্ষ-বিজয়-মীন-চেতন প্রমুখ কয়েকখানি মধ্যযুগের কাব্যে দুর্নীতির যে নগ্ননৃত্যের অবতারণা করা হইয়াছে তাহারই ফলে মধ্যযুগের বহু সাম্প্রদায়িক সাহিত্যই কলুষিত হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ের কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কথা প্রসঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি।

এতদ্ব্যতীত আখড়া পালার একটি প্রসঙ্গও নাথ সাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। নাথ সাহিত্যে পাই, পার্ব্বতী গোরক্ষনাথকে ছলনা করিবার জন্য তাঁহার প্রণয় যাচ্ঞা করেন কিন্তু গোরক্ষনাথ চরিত্রবলে তাঁহার ছলনা-জাল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হন। ধর্ম্মমঙ্গলের আখড়া পালার বর্ণনাতেও পাই, লাউসেনকে ছলনা করিবার জন্য পার্ব্বতী মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রণয় যাচ্ঞা করেন। লাউসেনও নিজের চরিত্রবলে তাঁহার ছলনা হইতে আত্মরক্ষা করেন। অতএব মনে হয়, ধর্ম্মসাহিত্যের এই লাউসেন নাথ সাহিত্যের গোরক্ষনাথেরই প্রকার-ভেদ মাত্র। এই চরিত্রের পরিকল্পনায় ধর্ম্মমঙ্গলের কবিগণ কোনও মৌলিকতা দেখাইতে পারেন নাই।

ধৰ্ম্মমঙ্গল কাব্যের বিশেষত্ব সম্বন্ধে ভূমিকা-ভাগেই সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়াছি, এখন ইহার চরিত্রগুলির বিচার সম্পর্কে তাহা একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করা যাইতেছে।

চরিত্র-বিচার

লাউসেন ধৰ্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলির নায়ক। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা নায়ক-চরিত্রের জন্য যে সমস্ত গুণ নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, লাউসেনের তাহার একটিরও অভাব নাই। তিনি ধীর এবং উদাত্ত গুণ-সম্পন্ন, কখনও কর্ত্তব্য-বিমুখ নহেন। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ তাঁহাকে যদি দেব-সম্পর্ক হইতে একটু স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতেন তাহা হইলে তাঁহার মহত্ত্ব আরও প্রকাশ পাইত। কিন্তু এই বীর চরিত্রটি কোন কারণে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াই যখন ধর্ম্মের স্তব করিতে আরম্ভ করে তখনই তাঁহার উপর হইতে নিরপেক্ষ পাঠকের সমগ্র সহানুভূতি দূর হইয়া যায়। কারণ, এইখানে তাঁহার আত্মশক্তির উপর কবিগণ দারুণ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি এই দেব-প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়াও এই চরিত্রটির মধ্যে মহানুভবতার সন্ধান করা যায়। অতএব দেবতাই তাঁহার সমগ্র কর্ম্মজীবন নিয়ন্ত্রিত এবং পরিণামে সার্থকতা মণ্ডিত করিয়া দিলেও ইহার মধ্যে যে ব্যক্তিগত একটা সংযম ও উদারতার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। পার্ব্বতী তাঁহার চরিত্রবল পরীক্ষা করিতে গেলে লাউসেন মাত্র সংক্ষেপে ছদ্মবেশিনী পার্ব্বতীকে বলিলেন,

লাউসেন

"সকল তীর্থের ফল ঘরে বসি' করতল,
পতি পদে ভক্তি বল যার।
পৃথিবী পবিত্র যা'র পায়ের ধূলায় আর
আমি কি মহিমা ক'ব তার॥"

সমগ্র ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যের দূষিত নৈতিক আবহাওয়া এই প্রকার কয়েকটি উক্তি হইতেই যথাসম্ভব বিনষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যে কাব্যে সমাজের পতিগণ স্ত্রীকর্তৃক অহর্নিশি নিন্দা ও অসন্তুষ্টির ভাজন সেই কাব্যেই এই প্রকার নৈতিক জ্ঞান-সম্পন্ন চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়া কাব্য ও সমাজ উভয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাসুন্দরের নায়ক ও ধর্ম্মমঙ্গলের নায়কে এই পার্থক্য।

লাউসেনের দেবতার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা মাতাপিতার প্রতিও তেমনই ভক্তি-শ্রদ্ধা বর্ত্তমান। সকল সময়ই গৃহ হইতে যাত্রা করিবার কালে তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া তারপর নিজের সংকল্প সাধন পথে অগ্রসর হয়।

লাউসেন সৎসাহসী ও নির্ভীক কিন্তু দুঃসাহসী নহেন। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আছে বলিয়াই যে কোন অবস্থার মধ্যে আত্মসমর্পণ করেন এবং এই আত্মশক্তির সহিত দৈবশক্তির সহযোগে প্রায় সকল প্রতিকূল অবস্থা হইতেই মুক্তি লাভ করিয়া আসেন। গৌড়ের পথে সমস্ত বিপদেব কথা অবগত থাকিয়াও তাহা হইতে কখনও তাঁহাকে পশ্চাৎপদ হইয়া আসিতে দেখা যায় না। এই নির্ভীক সাহসিকতাই তাঁহাকে একটি কাব্যের নায়ক-চরিত্রের উপযুক্ততা দান করিয়াছে। লাউসেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল, যখন কর্পূর সুরীক্ষার "কাটিল লোটন নাক ঘষাড়িল ভূঞে।" তখন "দয়ার ঠাকুর সেন জল দেন মুঞে।" একদিকে নাথ সাহিত্যের গোরক্ষনাথের প্রভাব ও অপর দিকে রামায়ণের রাম-চরিত্রের প্রভাব এই উভয় প্রভাবের মধ্যবর্ত্তী হইয়া লাউসেন এই উভয়েরই বিশিষ্ট গুণাবলীর অধিকারীরূপে কল্পিত হইয়াছেন।

লাউসেনের বিচার-বিচক্ষণতা প্রশংসনীয়। গৌড়ের পথে লাউদত্ত কর্ম্মকারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া শুনিলেন, মহামদ পাত্র প্রচার করিয়া

দিয়াছেন যে, যাহার ঘরে প্রবাসী কোন পুরুষকে পাওয়া যাইবে তাহার রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যে একাগ্রতা ও সত্যনিষ্ঠা থাকিলে জগতের যে কোনও কার্য্যেই জয়লাভ করা যায় লাউসেনের তাহাই ছিল। পশ্চিমোদয় কবির রূপক মাত্র; কিন্তু যে নিজের দেহকে নবখণ্ড করিয়া কাটিয়া একটা আদর্শের পূজা করিতে পারে তাহার পক্ষে সংসারের যে কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা আশ্চর্য্য কিছুই নহে। কারণ একমাত্র সাধনা দ্বারাই জগতের যত অসম্ভাব্য বস্তুও সম্ভব হইয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের চরিত্রকে একটা আদর্শরূপে কল্পনা করা হইলেও এই ভাবেই সেই আদর্শের পরিকল্পনাও সার্থক হইয়াছে।

রঞ্জাবতী

লাউসেনের ব্যক্তিগত জীবনের সমগ্র সাধনার মূলে তাঁহার জন্মের ইতিহাস জড়িত হইয়া আছে। যে দুশ্চর তপশ্চর্য্যা দ্বারা লাউসেনকে তাঁহার জননী সন্তানরূপে লাভ করিয়াছিলেন লাউসেনের জীবনেও সেই দুশ্চর তপশ্চর্য্যার শক্তিলাভের তাহাই মূলীভূত কারণ। আদর্শের সন্ধানে জননীর যে সাধনা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল তাহাই সন্তানে নূতনরূপ লাভ করিয়াছিল মাত্র।

কিন্তু পুত্রমুখ দর্শন করিয়াই রঞ্জাবতী তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের কঠোরতা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিলেন বলিয়াই মনে হয়। বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি রঞ্জাবতীর কোনদিনই অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই এমন কি স্বামীর অপমানের জন্য ভ্রাতার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,

"কিছু হক আজ হতে ঘুচিল মমতা।
শুনে রঞ্জাবতী বলে মোর ঐ কথা॥
আজ হতে ও'পথে আপনি দিনু কাঁটা।
সোদর বচন বুকে বাজে যেন জাঠা॥"

অভিমানিনী ভগিনীর এই দুই দুঃখ যে ভাই তাহাকে বন্ধ্যাও বলিয়াছে,

'বয়স বছর বার বন্ধ্যা বলি হেলে।
প্রাণনাথে সভায় বিন্ধেছে বাক্‌ছলে॥
সেই অগ্নি উঠে নিত্য অন্ন নাহি রুচে।
কাণা খোঁড়া পুত্র হক তবু দুঃখ ঘুচে।"—ঘনরাম, পৃঃ ২৯

এই অভিমানের জন্য তিনি শালে ভর দিয়া দেহত্যাগ করিয়া পর্য্যন্ত পুত্রলাভে সঙ্কল্প করিলেন, এই দুঃখাভিমান-জাত ঐকান্তিকী নিষ্ঠার জন্যই তাঁহার একাগ্র সাধনায় সিদ্ধিলাভও সম্ভব হইয়াছে।

এত সাধনার ধন এই পুত্র লাভ করিয়া রঞ্জা তাঁহার পূর্ব্ব প্রকৃতি একেবারে বিস্মৃত হইলেন। অতঃপর তাঁহার যে চরিত্রের সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটে তাহা কোনমতে কোন বীর নায়ক চরিত্রের জননী হইবার ধৃষ্টতা রাখিতে পারে না। বিশেষতঃ ধর্ম্মমঙ্গলের স্ত্রীচরিত্রের যে বিশেষত্ব সম্বন্ধে ভূমিকাভাগে আলোচনা করিয়াছি, রঞ্জাবতীর চরিত্রের মধ্যে তাহার লেশমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। এই চরিত্র-চিত্রণে রাঢ়ের জাতীয় চরিত্রের প্রভাব অপেক্ষা গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের নায়ক-জননীর চরিত্রের আদর্শই জয়ী হইয়াছে। পদ্মাপুরাণের সনকা, চণ্ডীমঙ্গলের খুল্লনা ও ধর্ম্মমঙ্গলের রঞ্জা এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিন্ন। বরং এই রঞ্জাবতী ইহাদের তুলনায় অধিকতর সন্তান-স্নেহাতুরা। লাউসেন যখন গৌড়যাত্রা করিবার অনুমতি চাহিলেন তখন তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত হীন কৌশলে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিয়া মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন,

"বরঞ্চ এমন কেহ মহামল্ল থাকে।
বিক্রমে বাছারে মোর খোঁড়া করি রাখে॥
চরণ ভাঙ্গিলে ঘুচে গমনের আশ।
ঘরে বসে চাঁদমুখ দেখি বারমাস॥"—ঘনরাম, পৃঃ ৭৮

সমগ্র মধ্য যুগের বঙ্গসাহিত্যে মাতৃস্নেহের এমন শোচনীয় দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না। একটা গতানুগতিকতার অনুকরণ করিতে গিয়া ধর্ম্ম-মঙ্গলের কবিগণ রাজমহিষী ও বীরমাতা রঞ্জাবতীর চরিত্র এত হীনভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু এই কাব্যের কবিগণ এতদ্দেশের জাতীয় বাস্তব চরিত্র সৃষ্টিতে যে অসীম কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। নিম্নলিখিত কয়েকটি স্ত্রী চরিত্রই তাহার প্রমাণ।

কামরূপের রাজমহিষী

কেবলমাত্র রাজোচিত আভিজাত্য রক্ষা করিয়া কোন উচ্চাদর্শের চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা যে ধর্ম্মমঙ্গলের কবিদিগের ছিলনা রঞ্জাবতীর দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বলিবার উপায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রঞ্জার চরিত্রটি গতানুগতিকতার অনুকরণে বিনষ্ট হইয়াছে, নতুবা কামরূপের রাজমহিষীর সংক্ষিপ্ত একটি চরিত্রও কি এক অপূর্ব্ব উদাত্ত গুণ সম্পন্ন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কামরূপরাজ কর্পূর ধবল লাউসেনের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া নিজের কন্যা তাঁহার নিকট বিবাহ দিয়া দীনতা স্বীকার করিতে চাহিলেন, শুনিয়া রাজমহিষী বলিলেন,

"রাণী বলে কুলের পদ্মিনী ওই বালা।
না করো মাথায় নাথ কলঙ্কের ডালা॥
এ' বড় অবনীযুড়ে অতিশয় লাজ।
পরাজয় হয়ে কন্যা দিলা মহারাজ॥
কলঙ্ক না করো কুলে কন্যা কর বই।
বরঞ্চ সকল ছেড়ে দেশান্তরী হই॥
কোথাকার বরে তুমি দিতে চাও ঝি।
বাপ হ'য়ে জলে ফেলে আনে কব কি॥"

অবশ্য মঙ্গলকাব্যে প্রকৃত পুরুষ চরিত্রের অভাব আছে, সেইজন্য রাণীর এই নিতান্ত সুযুক্তিপূর্ণ উদ্দীপনাময়ী বাণীও অরণ্যে রোদনের মত হইল।

গৌড়েশ্বরের চরিত্রে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য সুন্দর রক্ষা পাইয়াছে। তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ। মন্ত্রীর হাতের পুতুল মাত্র। বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে এই অবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে; কারণ তিনি বয়সে বৃদ্ধ, কোন বিষয়ে নিজে অগ্রসর হইয়া কিছু করিবেন সেই ক্ষমতা নাই, সেইজন্য মন্ত্রীর উপরই সকল বিষয়ে নির্ভর করিতে হয়। তিনি একটু স্ত্রৈণ প্রকৃতির লোক, কোন কোন সময় মন্ত্রীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়াও এই বলিয়া তাহার উপর কোন শাসন করিতে পারেন না যে তিনি তাঁহার স্ত্রীর 'কুটুম্ব।'

গৌড়েশ্বর

"অন্য যদি পাত্র হত পেত বড় দাব।
কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব॥"

তবে তিনি ন্যায়পরায়ণ ও স্নেহশীল। সোমঘোষকে কারামুক্ত করিয়া দিয়া, লাউসেনকে তাহার যোগ্যতার জন্য বার বারই পারিতোষিক দিয়া তিনি এই ন্যায়পরায়ণতা ও সৌজন্যেরই পরিচয় দিয়াছেন।

মহামদ পাত্রই ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের খল-চরিত্র (villain)। কাব্যের সার্থকতার জন্য এই চরিত্রটির পরিকল্পনা বড় সুন্দর হইয়াছে। লাউসেনকে হতপ্রভ করিবার জন্য তিনি যত চক্রান্তের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়াই লাউ-সেনের পৌরুষ জীবন্ত রহিয়াছে, এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহা স্তিমিত হইয়া পড়িতে দেয় নাই। স্বভাবতঃই ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের কবিদিগের সহানুভূতি-বঞ্চিত এই চরিত্রটি নিজের মধ্যে নিজেই এক সুন্দর ও সুসঙ্গত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। চরিত্রটির আদ্যোপান্ত সামঞ্জস্যও রক্ষা পাইয়াছে।

মহামদ পাত্র

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাঢ়ের কতকগুলি জাতীয় স্ত্রীচরিত্র-পরিকল্পনায় ধর্ম্মমঙ্গলের কবিগণ সমগ্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছেন। লাউসেনের কোন কোন পত্নীর চরিত্রের মধ্যেও রাঢ়ের এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে প্রথমেই

কানড়া

কানড়ার চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। কানড়া বীর-রমণী। গৌড়েশ্বরের আক্রমণে পিতা সপরিবারে দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন, কিন্তু সে যোদ্ধবেশ ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইল। এই চিত্রের স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া কোন লাভ নাই, শুধু ইহাতে যে বাঙ্গালী স্ত্রী-চরিত্রের গতানুগতিকতা-বর্জ্জিত নূতন একটা দিকের সন্ধান পাইলাম তাহার কথাই উল্লেখ করিতেছি।

রণক্ষেত্রে তাহার প্রতিপক্ষের সেনাপতি লাউসেনের নিকট কানড়া এইভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিল,

"এতেক বলিল যদি ময়নার নাথ।
ঘুঁড়ি পিঠে কানড়া যুড়িল দুটি হাত॥
বার সাত অমনি চরণে দণ্ডবৎ।
বদনে বসন দূর করিল ঈষৎ॥
বলিতে লাগিল বালা বিনয় বচন।
শুন মহাশয় রায় মোর নিবেদন॥
হরিপাল দুহিতা আমি প্রমাদে পড়িয়া।
পিতামাতা ভাই বন্ধু গেল পলাইয়া॥
কানড়া আমার নাম স্বামী ভাবি তোমা।
পঞ্চম বৎসর হতে সেবি শিব উমা॥"

মেসো গৌড়েশ্বর যাহাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া লাউসেন কর্ণ রুদ্ধ করিলেন কিন্তু অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিতে বাধ্য হইলেন যে, "বলে ধরে তোমারে পাঠাব রাজধানে। হারি যদি এখনি বিবাহ এইখানে॥" শুনিয়া কানড়া বলিল,

"ভবানী ভাবিয়া বালা বলে ভালো ভালো।
কোপে বিধুবদন ঈষৎ হ'লো আলো॥
বলে ধ'রে নিতে পারে কার এ'ত বুক।
বলিতে বলিতে কোপে ধরিল ধনুক॥
এখন বাঁচাই নাথ অনুমতি দে।
না হয় দাসীর এক বাণ সয়ে নে॥
মরি যে তোমার হাতে মোক্ষ ফল পাব।
হানি যে তোমার শির সহমৃতা হব॥"

সংস্কার ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধির মধ্যবর্ত্তী এই নারীচরিত্রটির সামান্য কয়টি মুখের কথায় এই যে অকৃত্রিম আন্তরিকতার প্রকাশ পাইয়াছে সমগ্র মধ্য-যুগের কাব্য সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। এই চিত্র অঙ্কনে ধৰ্ম্মমঙ্গলের কবিগণ কোন অমূলক আদর্শকে অনুসরণ করেন নাই বলিয়াই ইহার মূর্ত্তি এত জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে হয়।

নিম্নশ্রেণীর চরিত্র

নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলিকে ধৰ্ম্মমঙ্গলের কবিগণ অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত করিয়া কল্পনা করিয়াছেন; শৌর্য্যবীর্য্যে, কর্ত্তব্যজ্ঞানে, ধৰ্ম্মবুদ্ধিতে তাহাদের যে কোন দিক দিয়া কোন অভাব নাই, বৈষম্যমূলক সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও সেই যুগের ব্রাহ্মণ কবিগণ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সমুন্নত ও উদার মানব চরিত্রের কল্পনাই ধৰ্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলির রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য হিসাবে সার্থকতার কারণ। অস্পৃশ্য ডোম জাতীয় চরিত্রের

মধ্যেও যে কত মহত্ত্ব থাকিতে পারে লাউসেনের সেনাপতি কালুডোমের চরিত্রটিই তাহার প্রমাণ। অবশ্য এই চরিত্রটি রামায়ণের হনুমান-চরিত্রের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়া রচিত, কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গলের কবিদিগের কল্পনায় তাহা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। জাগরণ পালায় বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ-কল্প কাম্বাডোম যখন কালুকে সত্যে আবদ্ধ করিয়া তাহার মস্তক প্রার্থনা করিল তখন কালুডোম বলিল,

কালুডোম

"কি করিব কোথা হ'তে পরকাল মজে।
এ পাবে পরশে পাছে সেন মহারাজে॥
এ পাপে না হয় পাছে পশ্চিম উদয়।
সেনের কঠোর সেবা পাছে ব্যর্থ হয়॥
সত্য না লঙ্ঘিনু আমি ইহার কারণ।
অতেব অধম তোর বাঁচিল জীবন॥" ঘনরাম, পৃঃ ২৪৫

কালু ডোমের পত্নী লখাইর চরিত্রেও অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নারীর বাঙ্গালী-সুলভ স্বাভাবিক মনোবৃত্তিগুলির ইহাতে বিকাশ লাভ সম্ভব হয় নাই। কর্ত্তব্যের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিগত হৃদয়-বেদনা পুরুষের মত নারীও যে অনেক সময় বলি দিতে সক্ষম হয়, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের এই চরিত্রগুলিই তাহার প্রমাণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মমঙ্গলে পুরুষ চরিত্রের চরম অবমাননা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার স্থলে নারী-চরিত্রই মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। ময়না-নগর শত্রুতে আক্রমণ করিয়াছে, লাউসেন নগরে অনুপস্থিত। কালুর হস্তে নগরের ভার অর্পিত আছে, কিন্তু কালু মায়া-নিদ্রায় অভিভূত। তখন লখাই স্বামীর কর্ত্তব্যভার নিজে গ্রহণ করিল। পুত্রকে যুদ্ধে যাইবার জন্য বলিল, কিন্তু পুত্র অস্বীকৃত হইল। লখাই বলিল,

লখাই ডোম্‌নী

"মোর দুগ্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হ'লি।
তু বেটা তখনি তবে হ'য়ে না মরিলি॥"

স্ত্রী আসিয়া স্বামীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল,

"ময়ূরা বলেন নাথ তুমি কৈলে কি॥
দেশের বিপত্তি এই শ্বশুরের সেই।
শাশুড়ী বিকল কাঁদে শত্রু দেশ লেই॥
মহাগুরুবচন রাজার লুণ খেলে।
পাতক সঞ্চয় কেন কর বুক হেলে॥
জগতে জাগাবে যশ যদি জিন যেয়ে।
মরত মুকুন্দ পাবে মুক্তিপদ পেয়ে॥"

বাঙ্গালী নারী-চরিত্রের এই মহিমায় ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য সমুদ্ভাসিত। যাই হউক, মাতা এবং স্ত্রীর ভৎর্সনায় শাকা নিজের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিল। যুদ্ধে সে নিহত হইল। তখন মাতা লখাইর আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাই,—

"শোয়ায়ে সোনার খাটে শাকায়ের শির।
ছোট পো শুকায় ডাকে চক্ষে বহে নীর॥"

একে একে সমস্ত পুত্র যখন যুদ্ধে নিহত হইল তখন মাতা নিজে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করিয়া শত্রুর বিনাশ দ্বারা পুত্র শোক ভুলিতে গেল। বাঙ্গালী নারী-চরিত্রের এই একটি বিশেষ দিক ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য-গুলির মৌলিকতাহীন গতানুগতিক কাহিনীর মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গল ঘটনা-বহুল কাব্য, ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে কাহিনী অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, কোথাও তেমন আড়ষ্ট হইয়া পড়ে নাই, পড়িতে পড়িতে নূতন নূতন চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, তাহাই কাহিনীর শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়।

কাব্যের পরিণতি

এত উচ্চাঙ্গের কবিত্ব থাকা সত্ত্বেও একমাত্র স্থানীয় ও লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য বলিয়া ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। কারণ, সেই যুগে দেবতাই ছিল লক্ষ্য, কাব্য-রসাস্বাদন মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, সেই জন্য দেবতার লোকপ্রিয়তা দ্বারা কাব্যের জনপ্রিয়তা অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত হইত। তবে লোকের মুখে মুখে আজও অনেক স্থলেই 'ধর্ম্মের দোহাই' শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয় অজ্ঞানতঃ এই ধর্ম্ম ঠাকুরকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকে।

তৃতীয় ভাগ

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য সমূহ

কাহিনীর পরিকল্পনা ও কবিত্ব সৃষ্টির দিক দিয়া আর কোন মঙ্গলকাব্যই তেমন বৈচিত্র্য দেখাইতে পারে নাই। পূর্ব্বালোচিত প্রধান তিনখানি মঙ্গলকাব্য অবলম্বন করিয়াই তাহাদের কাহিনীগুলি সাধারণতঃ গ্রথিত হইয়াছে; উপরন্তু চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যেও এই কাব্যোক্ত চরিত্রগুলির প্রভাব অনেকাংশেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্যের সাম্প্রদায়িক মূল্য ব্যতীত জাতীয়তার যে একটা দাবী আছে এই অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে তাহা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না, ইহা প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিরই কাহিনীগত ব্যর্থ অনুকরণে পর্য্যবসিত মাত্র। কোন কোন কাব্যে দেবতাই একমাত্র লক্ষ্য, কাহিনী উপলক্ষ মাত্র; আবার কোন কোন কাব্যে কাহিনীই একমাত্র লক্ষ্য, দেবতা উপলক্ষ। ইহার কোনটির মধ্যেই উভয়ের একত্র সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া লইবার প্রয়াস দেখা যায় নাই। 'শীতলামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দরের কথা'ই ইহার প্রমাণ; একটির মধ্যে দেবতাই আছে, আর একটির মধ্যে কাহিনীই আছে, দেবতা অপ্রধান মাত্র। কোন শক্তিমান কবিও এই শ্রেণীর কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। অনেক সময় দেখা যায় যে, বিষয় বস্তুগুলি প্রকৃত মঙ্গলকাব্যের আদর্শোপযোগী নহে, তথাপি সমসাময়িক প্রভাবকে স্বীকার করিয়া কোন না কোন উপায়ে ইহাদিগকে মঙ্গলকাব্যের পর্য্যায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই চেষ্টাও অনেক সময়ই সফল হয় নাই। এই অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির উপরই পৌরাণিক প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শুধু কাহিনীভাগে প্রসঙ্গতঃ যে পৌরাণিক প্রভাব আসিয়াছে তাহা নহে, অনেক সময় পৌরাণিক চরিত্র লইয়া লৌকিক

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের বিশেষত্ব

কাহিনী রচনারও প্রয়াস দেখা গিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই কাহিনীর কোন নির্দ্দিষ্ট জাতীয় আদর্শ সম্মুখে না থাকার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবি হয়ত বিভিন্ন প্রণালীতে একই কাব্য রচনা করিয়াছেন। তথাপি ইহাদের মধ্যে একখানি কাব্য কয়েকজন শক্তিমান কবির হাতে পড়িয়া যে একটু বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহার কথাই সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করিব। ইহার নাম কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কথা।

কালিকামঙ্গল

তন্ত্র শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে কালী শক্তিদেবতা চণ্ডীরই রূপভেদ মাত্র। অবশ্য নিম্নস্তরের অনার্য্য সমাজ হইতেই যে কালিকাদেবীর উদ্ভব হইয়াছে তাহা তাঁহার দেবত্বের প্রকৃতি হইতেই উপলব্ধি করা যায়। তন্ত্রের ভিতর দিয়া ইনি ক্রমে পৌরাণিক সাহিত্যেও প্রবেশ লাভ করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী পৌরাণিক সম্পর্কের ফলেও তাহার অনার্য্য প্রকৃতির মূলে বিন্দুমাত্রও আর্য্যের প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়না। অতএব অনার্য্য সমাজের মধ্যে তিনি যে একজন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্না দেবী ছিলেন তাহাই মনে হয়। লিঙ্গপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, কালিকাপুরাণ ইত্যাদিতে অনেক কাহিনীর অবতারণা করিয়া কালীর সহিত একটা মৌলিক আর্য্যসম্পর্ক স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; পুরাণে চণ্ডীর সহিতও কোন কোন স্থানে তিনি অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার বিশিষ্ট অনার্য্য প্রকৃতি অত্যন্ত স্পষ্ট।

কালীর অনার্য্য উদ্ভব

বহির্বাংলার কোন অনার্য্য সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়া এই দেবী ক্রমে তন্ত্র ও পুরাণের ভিতর দিয়াই বাংলার সমাজে আসিয়া প্রবেশলাভ করিয়াছেন, এই দেবী অনার্য্য বাংলার নিজস্ব লৌকিক সৃষ্টি বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্যেও তাঁহার সম্বন্ধে গতানুগতিক

নিয়মে মঙ্গলকাব্য রচনার প্রয়াস দেখা যাইত। তন্ত্র ও পুরাণের ভিতর দিয়া আসার ফলেই রঘুনন্দনের স্মৃতিতেও তিনি সহজেই স্থান লাভ করিয়াছেন। কালিকামঙ্গলে কালিকার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করা মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, অন্য কোন দেবতার সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বও ইহাতে বর্ণিত হয় নাই, বিদ্যা ও সুন্দরের গুপ্ত প্রণয় কাহিনীই এই কাব্যের মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয়, এই কাহিনীর মধ্যে মঙ্গলকাব্যের আধ্যাত্মিকতা আরোপ করিবার জন্যই এই দেবতার নাম আনিয়া ইহাতে সংযুক্ত করা হইয়াছে।

চণ্ডীর মত কালীরও প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্নতা আছে। চণ্ডীর মত বিভিন্ন অনার্য্য সমাজের স্বতন্ত্র ধর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতে বিভিন্ন দেবতার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল ; কালক্রমে সকলেই কালীনামের সাধারণ পদবী গ্রহণ করে।

কালীর বিভিন্ন প্রকৃতি

ভদ্রকালী, রক্ষাকালী, দক্ষিণাকালী, শ্মশানকালী, নিশিকালী, মহাকালী, উন্মত্তকালী প্রভৃতি সকলেই এক কালীর সাধারণ নামের অন্তর্গত হইলেও মূলতঃ ইহাদের উদ্ভব ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র।[১] অবশ্য অনেকের উদ্ভব পরবর্ত্তী হইলেও ইহাদের মধ্যে যিনি মূল তিনি অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভৈরব শিবের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লইয়াছেন। আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে খোদিত পশ্চিম ভারতের ইলোর গুহা-ভাস্কর্য্যে শিবের সহিত কালীর মূর্ত্তিও পাওয়া যায়। ইহাই কালীর প্রাচীনতম রূপ বলিয়া মনে হয়। তন্ত্রসারে ভদ্রকালীর যে ধ্যান বর্ণিত আছে তাহার সহিত ইহার অনেক ঐক্য দেখিতে পাওয়া

১ ...... it will be seen that there is one goddess with a number of different names. But the critical eye will see that they are not merely names, but indicate different goddesses who owed their conception to different historical conditions but who were afterwards identified with the one goddess by the usual mental habit of the Hindus—Vaisnavism, Saivaism and minor religious systems. (Bhandarkar) pp. 143—144.

যায়,[১] ধ্যানটি এইরূপ,—"ক্ষুৎকামা কোটরাক্ষী মসীমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী। নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি॥" হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জ্বলদনলসন্নিভং পাশমুগ্রম্। দন্তৈর্জম্বূফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু মাং ভদ্রকালী।" এই পরিকল্পনাকে আশ্রয় করিয়া পরবর্ত্তীকালে সম্ভবতঃ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লৌকিক পরিকল্পনার সৃষ্টি হইয়াছিল। কলিকাতা কালীঘাটের কালীও তাহাদেরই অন্যতম।

ইহাদের মধ্যে বিশেষ প্রকৃতির এক কালী দস্যু-তস্করের দেবতা ছিল। তান্ত্রিক আচারে তাহার পূজা হইত এবং তান্ত্রিক সমাজেই এই দেবতার উদ্ভব হইয়াছিল, তন্ত্রসারে তাহার বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্য ভাগবতে দেখিতে পাই, দুই চোর শিশু চৈতন্যকে হরণ করিবার জন্য এই দেবীর শরণাপন্ন হইতেছে।[২] ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেও আছে যে, শিশু-লাউসেনকে হরণ করিবার উদ্দেশ্যে ইন্দা মেটে নিশাযোগে কালী পূজা করিয়া লইতেছে। এই বিশেষ প্রকৃতির কালীকে লইয়াই প্রাচীন বাংলায় অনেক পাঁচালী রচিত হইয়াছিল। তাহা চোরের পাঁচালী নামে পরিচিত। কালিকামঙ্গলও এই প্রকৃতির দেবীকে লইয়াই রচিত। কালিকামঙ্গলের কাহিনীটি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া এই সম্বন্ধে অন্যান্য প্রশ্নের বিচার করা যাইতেছে,—

চোরের দেবতা

গভীর রাত্রে এক রাজপুত্র ভদ্রকালীর পূজা করিতেছিল, রাজপুত্রের নাম সুন্দর। পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া কালী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাহাকে বলিলেন, 'যে বর প্রার্থনা কর তাহা লইতে পার।' রাজপুত্র বলিল, নিভৃতে রাজকন্যা বিদ্যার সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করি।' কালী বলিলেন, 'তথাস্তু'।

কালিকা-মঙ্গলের গল্প

১ A History of Fine Art in India and Ceylone. (V. A. Smith) Plate XLIII. Pg. 210.

২ চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়।

বলিয়া তাহাকে একটি শুকপক্ষী দিলেন, বলিলেন, এই পক্ষীটি তাহার এই কার্য্যের সহায় হইবে।

সুন্দর শুকপক্ষী লইয়া অদৃশ্য প্রণয়িণীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল, অবশেষে তাহার প্রণয়িণীর পিতৃ-রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে সুন্দর রাজধানীতে আসিয়া পহুঁছিল।

সুন্দর এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছিল। তথায় এক মালিনী ফুল বেচিতে আসিল। মালিনী রাজ-অন্তঃপুরে ফুল জোগায়। সুন্দরের সহিত মালিনীর পরিচয় হইল। মালিনী তাহাকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিল। সুন্দর মালিনীকে মাসী বলিয়া ডাকিল।

মালিনীর নিকট সুন্দর বিদ্যার বিস্তৃত পরিচয় পাইল, তাহার বিবাহের প্রতিজ্ঞার কথাও শুনিল, শুনিয়া সুন্দর বিদ্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল।

প্রত্যহ মালিনী রাজবাড়ীতে ফুল লইয়া যায়, সেদিনও গেল। ফুলের মধ্যে সুন্দর এক ছড়া অতি চিকণ মালা গাঁথিয়া সঙ্গে দিয়া দিল, মালার সঙ্গে একটি লিখনে নিজের পরিচয় লিখিয়া দিল।

মালার সঙ্গে লিখন পাইয়া বিদ্যা সুন্দরের প্রতি আসক্ত হইল, মালিনীকে বলিল, "সরোবরে স্নানের সময় তোর ভাগিনাকে দেখিতে চাই।" স্নানের ঘাটে দুই জনের দেখা হইল, সঙ্কেতে আলাপও হইল। সুন্দর সঙ্কেতে জানাইল, সেই রাত্রেই তাহার সহিত সে সাক্ষাৎ করিবে। কিন্তু কি ভাবে সুন্দর রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না, অনন্যোপায় হইয়া কালীকে ডাকিতে লাগিল। কালী সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন; বলিলেন, আমার বরে মালিনীর গৃহ হইতে বিদ্যার গৃহ পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ হইয়া যাইবে, তুমি সেই সুড়ঙ্গ পথে গিয়া বিদ্যার সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিবে।

সুড়ঙ্গ-পথে সুন্দর বিদ্যার শয়ন গৃহে প্রত্যহ যাতায়াত করিতে লাগিল। গান্ধর্ব্বমতে তাহাদের বিবাহ হইল, কালক্রমে বিদ্যা গর্ভবতী হইল। এক দাসী গিয়া রাণীর নিকট এই সংবাদ দিল। শুনিয়া রাণী মহাক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্যাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন, তারপর রাজাকে গিয়া এই সংবাদ জানাইলেন। শুনিয়া রাজা কোটালকে আহ্বান করিয়া বিদ্যার গৃহে যে গোপনে যাতায়াত করে তাহাকে ধরিবার জন্য আদেশ দিলেন। বহু অনুসন্ধানেও চোর ধরা পড়িল না। সুন্দরের যাতায়াত তেমনই চলিতে লাগিল। অবশেষে কোটাল এক কৌশল অবলম্বন করিল। বিদ্যার সমস্ত গৃহ সিন্দূরে রাঙ্গাইয়া দিল, সুন্দর তাহার গৃহে আসিলে তাহার বস্ত্রও রঞ্জিত হইল। রজকের গৃহে রঞ্জিত বস্ত্রের সন্ধান করিয়া কোটাল সুন্দরকে ধরিল। রাজা তাহার শিরশ্ছেদ করিবার আদেশ দিলেন। সুন্দরকে বাঁধিয়া দক্ষিণ মশানে লইয়া যাওয়া হইল। সুন্দর মশানে কালীর স্তব পাঠ করিল। কালী আবির্ভূত হইলেন এবং সুন্দরের হস্তে বিদ্যাকে সমর্পণ করিতে রাজাকে আদেশ করিলেন। রাজা সুন্দরের পরিচয় পাইয়া সাগ্রহে তাহাতে সম্মত হইলেন। সুন্দর বিদ্যাকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

কাহিনীর লৌকিক উদ্ভব

বহু প্রাচীন কাল হইতে এই দেশের সাহিত্যে চোরের বুদ্ধির প্রখরতা সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে। 'চতুর' শব্দ হইতেই 'চৌর' শব্দ জাত। ইহাতে উপস্থিত বুদ্ধির অনুশীলন হইয়া থাকে বলিয়া ইহা একটি শিক্ষণীয় ও উচ্চশ্রেণীর বিদ্যা বলিয়া কল্পিত হইত। বাংলার অনেক রূপকথায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজপুত্র অন্যান্য বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে চৌর্য্য বিদ্যায়ও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দেশান্তরের রাজকন্যাকে কৌশলে হরণ করিয়া আনিতেছেন। প্রাচীন বাংলায় চোরের এই বিচিত্র জীবন

কাহিনী সম্বলিত পাঁচালী আকারে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য রচিত হইয়াছিল। বীর কাশীশ্বর রচিত 'চোর চক্রবর্ত্তী' নামক একখানি কাব্য বহুবার বটতলায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন পুঁথিশালায় 'চৌর চক্রবর্ত্তী কথা' নামে এই শ্রেণীর আর একখানি পাঁচালি আকারে ক্ষুদ্র কাব্য রক্ষিত আছে। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (৪৫শ ভাগ, পৃঃ ২১৫—২১) ইহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহার চোর-নায়ক বিজয়নগরের রাজমন্ত্রীর পুত্র, নাম খরবর, "কাব্য জ্যোতিষ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া খরবর 'কৌতুকে শিখিল উত্তম অধম চৌরবিদ্যা'। যে চতুঃষষ্ঠীকলা লোকের নিকট বিশেষ আদর ও সম্মান পাইত, তাহার মধ্যে চুরি বিদ্যারও স্থান দেখিতে পাওয়া যায়।"[১] এই খরবর কালীর সহায়তায় রাজার শয়ন গৃহ হইতে রাণীকে চুরি করিল, বহু অনুসন্ধানেও কোটাল চোরের সন্ধান পাইল না। ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জে শ্যামসুন্দরের আখড়ায় কতকগুলি বৈষ্ণব পুঁথি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে চোরের পাঁচালী জাতীয় একখানি ক্ষুদ্র প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাইয়াছিলাম। তাহাতে চোর নায়কের এই ভাবে বুদ্ধির প্রশংসা করা হইতেছে,

"চোরার পুত চোরারে ছেইচা চোরার নাতি।
দিন দুপুরে করলি চুরি মাথায় দিয়া ছাতি॥"

বাংলা দেশের বাহিরেও চোরের এই প্রকার বুদ্ধি-বিচক্ষণতা সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত রহিয়াছে।[২] উড়িষ্যায় প্রায় বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর

---

১ 'চোরের পাঁচালী' -সা-প-পত্রিকা, ৪৫ ভাগ, পৃঃ ২১৭-১৮

২ "The Art of Stealing in Hindu Fiction" (Bloomfield)—American Journal of Philosophy. Vol 44. Pg. 97—133, 193—229.

অনুরূপ মুঘলমারীর রাজকন্যা শশীসেনার গল্প প্রচলিত আছে।[১] এই শ্রেণীর গল্প যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে তাহার বিস্তৃত উল্লেখ হইতেই জানিতে পারা যায়। 'কথাসরিৎসাগর', 'দশকুমারচরিত'; ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থে রাজপুত্রের চুরিবিদ্যা শিক্ষা বিষয়ক অনেক গল্প বর্ণিত হইয়াছে। কালক্রমে চোর্য্য শাস্ত্র নামে এক বিশেষ শাস্ত্র সম্বন্ধে সংস্কৃতে কতকগুলি সম্পূর্ণ গ্রন্থও রচিত হয়। ইহাদের একখানির নাম 'ষন্মুখকল্প' ও অপর এক খানির নাম 'চোরচর্য্যা' বা 'চৌর্য্যস্বরূপ'। সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাসুন্দরের একখানি সমগ্র কাব্যও রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। অনেকগুলি বাংলা বিদ্যাসুন্দর লেখা হইবার পর ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বররুচিই এই সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের লেখক বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু তাহা লোকশ্রুতি মাত্র। বেহুলার কাহিনী লইয়াও সংস্কৃতে কাব্য রচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই জন্য বেহুলার সংস্কৃত কাহিনীকেই পদ্মাপুরাণের মূল বলা যাইতে পারেনা। কিন্তু বররুচি প্রণীত এই সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরকে বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মূল বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[২] তাহা অনেকেই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তবে সংস্কৃত হইতেই যে ইহার কাহিনীর কতক অংশ বাংলার পূর্ব্বোল্লিখিত কোন লৌকিক চোরের কাহিনীর সঙ্গে আসিয়া মিশিয়া বিদ্যাসুন্দরের বর্ত্তমানরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা নিশ্চিত। তবে এই সংস্কৃত গল্পাংশটি কি এবং কোথা হইতে আসিল?

সংস্কৃতে বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনী

কাহিনীর মূল

১ Archaeological Survey of Mayurbhanja. Vol. I. Pg. 112—119.

২ The Long-lost Sanskrit Vidyasundar (S. K. Mitra) Proceedings of the Oriental Conference, Second Session, pg. 215-220.

কাশ্মীরের বিখ্যাত কবি বিল্হণ রচিত 'চৌর পঞ্চাশিকা' একখানি সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। ইহার পঞ্চাশটি শ্লোকে কবি তাঁহার প্রেমিকার উদ্দেশ্যে গভীর হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেন। ইহা সম্পূর্ণ ধর্ম্মভাব-বিবর্জ্জিত।

চৌরপঞ্চাশিকা

কথিত আছে যে, এই কবি বিল্হণ কোন রাজকন্যার সহিত গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ ছিলেন। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া তাহার প্রাণবধে উদ্যত হন। তিনি তখন এই পঞ্চাশটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া রাজকন্যার প্রতি তাঁহার অন্তরের গভীর প্রণয় জ্ঞাপন করেন। ইহাই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মূল বলিয়া মনে হয়। কাশ্মীরী কবি বিল্হণ আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। অতএব দ্বাদশ শতাব্দীতেই ইহা রচিত হইয়াছিল; পরে সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করে। কাশ্মীরে প্রচলিত কাহিনীতে রাজকন্যার পিতার নাম বীরসিংহ, বাংলা বিদ্যাসুন্দরেও রাজার নাম তাহাই। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত এই কাহিনীতে ইহার নামগুলি একটু স্বতন্ত্র, অবশ্য ইহা স্থানীয় প্রভাব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

ক্রমে চৌরপঞ্চাশিকার কাহিনীটি বাংলা দেশেও আসিল এবং এতদ্দেশে পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত একটি গুপ্ত প্রণয় কাহিনীর মধ্যে তাহাও অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল। সুন্দর মশানে নীত হইয়া চৌর পঞ্চাশিকার অনুরূপ সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি করিলেন। অবশ্য দুইজন বাঙ্গালী বিদ্যাসুন্দরের লেখক কঙ্ক ও কাশীনাথ সম্ভবতঃ বাংলার অবিমিশ্র

বাংলার বিদ্যাসুন্দর

প্রাচীন লৌকিক কাহিনীটি লইয়াই কাব্য রচনা করিলেন, বিল্হণের চৌরপঞ্চাশিকা তাহাদের কাব্যে স্থান লাভ করিল না। এই প্রণয় কাহিনীর মধ্যে একটি গুপ্ত চৌর্য্যের বৃত্তান্ত জড়িত আছে বলিয়া ক্রমে কালিকা দেবীকে এই কাহিনীর মধ্যে আনিয়া স্থান দান করা হইল। কিন্তু শক্তি-দেবতা কালীর মাহাত্ম্যই

যে এই কাহিনীর মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয় নহে তাহা একজন বৈষ্ণব কবি লিখিত বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী হইতেও জানিতে পারা যায়।

বাংলায় বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর আদি-রচয়িতা কে? এই পর্য্যন্ত বিদ্যাসুন্দরের যত পুথি সম্বন্ধে জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অধিবাসী কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরই প্রাচীনতম।[১] কিন্তু ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী একজন কবি প্রাণারাম তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দর রচয়িতাদিগের কথা এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে কঙ্কের নাম নাই—

আদি-রচয়িতা

"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ।
বিরচিলা কৃষ্ণরাম নিমিতা যার বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদা-মঙ্গলে।
রচিলেন উপন্যাস প্রসঙ্গের ছলে॥"

তাঁহার মতে কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দরের আদি রচয়িতা। এই কৃষ্ণরাম সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণরামের পূর্ব্বেও যে বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছিল, তাহা কৃষ্ণরামের এই উক্তি হইতেই জানা যাইতেছে,—

১। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরের আবিষ্কর্ত্তা। ইহার একখানি পুঁথি তিনি ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে দেন, আরও একখানা তাঁহার সন্ধানে আছে বলিয়া তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই পুঁথিখানি আজিও প্রকাশিত হয় নাই। তিনি ১৩২৫ ও ১৩২৬ সনের ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'সৌরভ' পত্রিকায় কঙ্কের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন।

"মহা মহা কবি যথা তথায় আমার কথা,
কোকিলেরে ভাঙ্গায় বায়সে।
যেন মুকুতার সাথে শঙ্খ কাটি হার গাঁথে
জউপালা প্রবালের সাথে॥"

—(সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত কৃষ্ণরামের
পুঁথি, পত্র সংখ্যা ৩খ)

প্রাণারাম তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার বিশেষ স্থানের পরিচিত কবিদিগেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র।

কবি কঙ্কের রচনা হইতে জানিতে পারা যায়, তিনি চৈতন্যের সমসাময়িক। তিনি এই বিষয়ে তাঁহার কাব্য মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন,

"কবে বা হেরিব আমি গৌরার চরণ।
সফল হইবে মোর মনুষ্য জনম॥
পাপী তাপী মুঞি প্রভু আমি অল্প মতি।
হইব কি প্রভুর দয়া অভাগার প্রতি॥
হউক বা না হউক পদ না ছাড়িব।
বাজন্ত নূপুর হইয়া চরণে লুটিব॥"

কঙ্ক তাঁহার আত্ম-পরিচয়ে বলিয়াছেন, তাঁহার পিতার নাম গুণরাজ, মাতা বসুমতী। রাজ্যেশ্বরী নদীর তীরবর্ত্তী বিপ্রগ্রাম তাঁহার জন্মভূমি; ব্রাহ্মণবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শৈশবেই মাতৃপিতৃহীন হ'ন। সংসারে তাঁহাকে দেখিবার মত কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না, এক চণ্ডালের গৃহে তিনি মানুষ হইতে লাগিলেন।

কঙ্কের জীবন

চণ্ডালিনী মাতাই তাঁহার নাম রাখিলেন কঙ্ক। চণ্ডালের নাম মুরারি এবং তাহার পত্নীর নাম কৌশল্যা। তাহারাই কবির মাতাপিতার স্থান পূর্ণ করিল।

বাল্যে গর্গ নামক এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তিনি রাখালের কার্য্যে নিযুক্ত হন। গর্গ পরম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পত্নীর নাম গায়ত্রী। তাঁহারা কঙ্ককে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজ তাহার বিরোধিতা করেন। গর্গের কন্যা লীলার সহিত কঙ্কের প্রণয় কাহিনী বর্ণনা করিয়া পূর্ব্ব ময়মনসিংহের গীতিকাব্যে কবি রঘুসুত কর্ত্তৃক এক পালাগান রচিত হইয়াছিল, তাহা 'কঙ্ক ও লীলা' নামে 'মৈমনসিংহ গীতিকায়' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কিছু সত্যতা থাকাও অসম্ভব নহে।

কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর কালিকার মাহাত্ম্য-প্রচারক কাব্য নহে, বিপ্রগ্রাম-বাসী এক পীরের আদেশে কঙ্ক তাঁহার কাব্য রচনা করেন, সেইজন্য তাঁহার কাব্যের উদ্দিষ্ট দেবতা সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ। তিনি তাঁহার কাব্যকে 'পীরের পাঁচালী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, "গুরুর আদেশে গাহি পীরের পাঁচালী।" অবশ্য এতদ্ব্যতীত কাহিনীর মধ্যে আর কোন পার্থক্য নাই। বিদ্যাসুন্দরের কবিদিগের মধ্যে কাব্যোক্ত স্থান সমূহ উল্লেখের কোন স্থিরতা ছিল না। বিদ্যা ও সুন্দরের নাম ব্যতীত অন্যান্য নামগুলিতেও অনেক সময় অনৈক্য দেখা যায়। অবশ্য ইহাতে মূল কাহিনীর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না; কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কালিকা-মঙ্গলে দেবতা মুখ্য নহে। কঙ্কের কাব্য ও পরবর্ত্তী কালিকা-মঙ্গল কাব্যের কতকগুলি বিষয়ে একটু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মূল কাহিনী মধ্যে বর্ণনায়ও সামান্য একটু ব্যতিক্রম আছে।

কাব্যবিচার

কঙ্কের কাব্য আদিরস-প্রধান নহে, চৈতন্যে আসক্তি দেখিয়াই মনে হয়, তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, সেইজন্য রচনায় নীতির সংযম তিনি কোথাও লঙ্ঘন করেন নাই। কঙ্কের রচনা সরল ও মধুর, অনেক স্থানে বৈষ্ণব কবিতার

ুরেও ধ্বনিত হইয়া উঠিতে শোনা যায়; তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত "বাজন্ত নুপুর য়্যা চরণে লুটিব" পদটি লোচন দাসের প্রসিদ্ধ "বাজন নুপুর হয়্যা, রণে রহিব গো" পদটির সহিত তুলনা করা যায়। ময়মনসিংহ অঞ্চলে ঙ্কের বিদ্যাসুন্দরের অত্যন্ত ব্যাপক প্রচলন হইয়াছিল।

১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী কবি গোবিন্দ াসের কালিকা-মঙ্গল রচিত হয়।[১] ইহার কাহিনী-ভাগেও একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। ইহাতে বিদ্যার পিতা রত্নপুরের রাজা, সুন্দর পশ্চিম বঙ্গের কাঞ্চননগরের অধিবাসী মালিনী মাসীর নাম রম্ভা, হীরা নহে। চট্টগ্রাম অঞ্চলেই তাঁহার পুস্তকের চার সীমাবদ্ধ ছিল, অন্যত্র প্রসার লাভ করিতে পারে নাই।

গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাসের কাব্য-মধ্যে কালীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসই ধিক দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয় কাহিনী ইহার পলক্ষ মাত্র। কঙ্কের রচনার মত ইহার মধ্যেও অল্পাধিক ভক্তি রস টিয়া উঠিয়াছে। আদিরসের নগ্ন তাণ্ডব ইহাতে একপ্রকার নাই লিলেই হয়। কবি গোবিন্দ দাস পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার রচনার ধ্যেও এই পাণ্ডিত্য যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার শিবস্তোত্রটি নিম্নে দ্ধৃত করিতেছি,

"নৌমি নন্দিকেশ ঈশ, কণ্ঠে কালকূট বিষ,
নীলকণ্ঠ নাম রাম দেব দেব বন্দনী।
অর্দ্ধ অঙ্গ গৌরীসঙ্গ, মৌলী কেলি চতুরঙ্গ,
অঙ্গভঙ্গ অতিরঙ্গ, সোহি জহ্নু নন্দিনী॥
রঙ্গনাথ লোকপাল, অর্দ্ধঅঙ্গ বাঘছাল,
ব্যোমকেশ শেষ মাল ভালে ইন্দুমোহিনী।"

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন) পৃঃ ৫০৪ (ষষ্ঠ সংস্করণ)

অতঃপর কবি কৃষ্ণরাম দাসের কালিকা-মঙ্গল রচিত হয়।

কৃষ্ণরাম

কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।[১] কালিকামঙ্গলেও তিনি তাঁহার গ্রন্থ রচনার কাল এই ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

"সারসা সানের নেত্র, ভীমাক্ষিবর্জ্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর নাম, রচনাতে কহিলাম,
বুঝ সকল বিচারিয়া সভে॥" পরিষদের পুঁথি পৃঃ ৩খ

রচনা-কাল

ইহার অর্থ সম্ভবতঃ এই প্রকার, 'সারসা সানের' অর্থাৎ শরাসনের, 'শরাসন' শব্দের অর্থ ধনু, ধনু নবম রাশি, অতএব ধনুতে ৯, তাহা হইতে নেত্র অর্থাৎ ৩ বর্জ্জিত, তাহা হইলে ৬; ভীমাক্ষি বর্জ্জিত মিত্র, অর্থাৎ মিত্র বা ১২ হইতে ভীম ও অক্ষি একত্রে ৪ বর্জ্জিত হইল, তাহা হইলে ৮ রহিল; 'তেজিয়া ঋষির পক্ষ অর্থাৎ ৭ হইতে ২ বাদ যাইবে, তাহা হইলে পাই ৫; তারপর বিধুর নাম অর্থাৎ ১। এখন "অঙ্কস্য বামা গতিঃ"তে ইহা হইতে পাই, ১৫৮৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ। এই সময়ের সমর্থক আর একটি ঐতিহাসিক উক্তি তাঁহার কাব্য-মধ্যে আছে। তিনি সায়েস্তা খাঁ ও আওরঙ্গজেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন,

"অরংসাহা ক্ষিতিপাল, রিপুর উপরে কাল
রামরাজা সর্ব্বজনে বলে।
নবাব সারিস্তা (সায়িস্তা ?) খাঁ, আদি কবি সাতগাঁ,
বহু সরকার করতলে॥"

১ ৫১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

সায়েস্তা খাঁ ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুবেদার ছিলেন। অতএব এই সময়েই কবি কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল রচিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করিয়াছেন, রায়মঙ্গল কৃষ্ণরামের প্রথম বয়সের রচনা, "তাঁহার কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর ইহার পরে রচিত।"[১] কিন্তু রায়মঙ্গলের আলোচনা সম্পর্কে দেখাইয়াছি, যে রায়মঙ্গলই কালিকা-মঙ্গলের পরে রচিত হয়। কালিকা-মঙ্গল হইতে দেখা যায়, ইহাই কবির প্রথম বয়সের রচনা, বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ও প্রথম বয়সের রচনা হওয়া স্বাভাবিক। রামপ্রসাদের জীবনেও তাহাই দেখিতে পাই। কৃষ্ণরাম তাঁহার কালিকা-মঙ্গলেও উল্লেখ করিয়াছেন, এই কাব্য রচনার সময় তাঁহার বয়স মাত্র বিংশতি বৎসর, বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে কবি আর কোন কাব্য লিখিয়াছিলেন বলিয়াও মনে করা যাইতে পারেনা,—

"সেই গ্রামের মধ্যে বাস, নাম ভগবতী দাস,
কায়স্থ কুলেতে উৎপত্তি।
তাঁহার তনয় হই, নিজ পরিচয় কই,
বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি॥
শুন সভে একচিত, যেমনে হইল গীত
কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি ;
প্রথম বৈশাখ মাসে, সপনে আপন বাসে,
দেখিনু সারদা ভগবতী॥" পরিষদের পুঁথি, পত্রসংখ্যাতক

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নিমিতাগ্রাম কবির বাসভূমি। রায়মঙ্গলের আলোচনা সম্পর্কে তাহার বিস্তৃত পরিচয় উল্লেখ করিয়াছি।[২]

---

১ 'কবি কৃষ্ণরাম' সাহিত্য, ১৩০০ সাল, পৃঃ ১১৫

২ পৃঃ ৫১৪ দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণরামের কাব্যে বর্দ্ধমানের উল্লেখ নাই, রাজার নাম বীরসিংহ কিন্তু 'বীরসিংহের দেশ' বর্দ্ধমান নহে, বীরসিংহপুর। মালিনীর নাম বিমলা। কৃষ্ণরামের রচনা সরল কিন্তু পাণ্ডিত্য-বর্জ্জিত নহে। রচনা সরল হইলেও তাহা মাজ্জিত ও সম্পূর্ণ গ্রাম্যতা-মুক্ত। সুন্দরের বীরসিংহপুর যাত্রার বর্ণনাটি এইরূপ :—

"জনকেরে না বলিল না জানে জননী।
একাকী করিল গতি কবি শিরোমণি॥
জয়পত্র যুবক বিচিত্র ছত্র ধরি।
দিব্য বস্ত্র ভূষণ দ্বিজেরে দান করি॥
কবি পণ্ডিতের বেশে প্রতাপের শূর।
সারদা সহায়ে যায় বীরসিংহপুর॥"

বলরাম চক্রবর্ত্তী

সম্ভবতঃ তারপর কবিশেখর বলরাম চক্রবর্ত্তীর কালিকামঙ্গল রচিত হয়। তাঁহার সময় সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কিছু জানা না গেলেও তিনি যে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি এই বিষয়ে অনেকে নিঃসন্দেহ।[১] ইহার প্রমাণ এই যে, বলরামের কাব্য-মধ্যে কাহিনীর দিক দিয়া প্রাচীনত্বের লক্ষণ আছে। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে,ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনার পর অন্য কেহ এই কাহিনী লইয়া কাব্য রচনায় প্রয়াসী হইলেও ভারতচন্দ্রের প্রভাবকে অস্বীকার করিতে পারিতেন না, বিশেষতঃ কাহিনীর দিক দিয়া হইলেও ভারতচন্দ্রের সঙ্গে কোন না কোন সঙ্গতি লক্ষ্য করা যাইত, কিন্তু এই বিষয়ে রামপ্রসা

১ ইহার পুঁথি শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে—(পরিষদ্ গ্রন্থাবলী সংখ্যা ৭৯) কবির কাল সম্বন্ধে আলোচ জন্য সম্পাদকীয় মন্তব্য ৮/০ দ্রষ্টব্য।

ও ভারতচন্দ্রের কোন প্রভাবই তাঁহার কাব্যের উপর দৃষ্টিগোচর হয় না। অবশ্য বলরামকে কেহ কেহ পূর্ব্ববঙ্গের কবি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[১] তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের প্রভাব তাঁহার উপর না থাকিবারই কথা, কারণ, একেবারে সমসাময়িক কালেই ভারতচন্দ্রের সুদূর পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত প্রচার হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু বলরাম পূর্ব্ববঙ্গের কবি ছিলেন, তাহা মনে করিবার পক্ষে কোন সারবান্ যুক্তি নাই। পরিষদ সম্পাদিত গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয়ের একমাত্র যুক্তি এই যে, তাঁহার "পুস্তকের অনেক স্থানে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত শব্দাদি ব্যবহৃত হইয়াছে।"[২] কিন্তু সম্পাদক মহাশয় যদি এই প্রকার শব্দের একটি পৃথক্ তালিকা দিতেন তাহা হইলে শব্দগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইত, কিন্তু তিনি তাহা না করাতে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত শব্দ ও পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গে প্রচলিত শব্দে যে তিনি কি ভাবে পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। আমরা এই কাব্য মধ্যে এমন বিশেষ কোন শব্দের ব্যবহার পাইলাম না যাহা একমাত্র পূর্ব্ববঙ্গেই প্রচলিত আছে, পশ্চিমবঙ্গে নাই; এমন কি তাহা যদি থাকিতও তাহা হইলেও পুঁথিখানি যখন গ্রন্থকারের স্বহস্ত লিখিত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই তখন উহার ভাষা দেখিয়া কবির বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া সমীচীন বোধ হইত না, অনুলিপিকারেরাও ভাষা বিকৃত করিয়া থাকে।

কবির নিবাস

---

১ ঐ

২ ঐ ৮৶৹, ১৩৩৬ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (পৃঃ ৬৭) 'বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকা-মঙ্গল' নামক প্রবন্ধে তিনি একটি "অধুনা অপ্রচলিত ও অল্প প্রচলিত" শব্দের তালিকা দিয়াছেন। "ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি আজ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত" থাকিলেও প্রাচীনকালে এই সমস্ত শব্দ সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হইত। ইহাদের কতকগুলি শব্দ আধুনিক পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় রক্ষিত হইয়াছে মাত্র।

কিন্তু আমাদের অনুমান হয়, বলরাম পশ্চিমবঙ্গেরই কবি। দেবদেবী-বন্দনায় তিনি যে সমস্ত দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের কোন দেবতারই নাম নাই। এক বিক্রমপুরের বিশালাক্ষীর কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু বিক্রমপুরের বিশালাক্ষীর খ্যাতি বহুকাল হইতেই যে অনেক দূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা ধর্ম্মমঙ্গলের কবি রামদাস কৈবর্ত্তের উল্লেখ হইতেও জানা যায়।[১] বলরাম রাঢ়েরই সমস্ত দেবদেবীর নাম করিয়াছেন, এমন কি তিনি পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক ঘাটু-নামক দেবতারও নাম করিয়াছেন, ইহাতেই তিনি বর্দ্ধমান অঞ্চলের লোক বলিয়া মনে হয়; অতএব তিনি যদি ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী হইতেন তাহা হইলে তাঁহার প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেন না। বলরামের কাব্যে তাঁহার বিস্তৃত আত্মপরিচয় নাই, মাত্র এক স্থলে উল্লেখ আছে,—

"পিতামহ চৈতন্য লোকেতে বলয়ে ধন্য
জনক আচার্য্য দেবীদাস।
জননী কাঞ্চন নাম তার সুত বলরাম
কালিকা পূরিল যার আশ॥" —পৃঃ ১৩৪

বলরামের উপাধি ছিল কবিশেখর। ভণিতার অনেক স্থলেই তিনি নামের পরিবর্ত্তে উপাধিই ব্যবহার করিয়াছেন, "শ্রীকবিশেখর গায় কালিকার গীত।" কাব্যের কোন স্থলে তিনি 'বলরাম', কোন স্থানে 'চক্রবর্ত্তী বলরাম' বা 'দ্বিজ বলরাম' ভণিতাও ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতেই তাঁহার পূর্ণ নামটির পরিচয় পাওয়া যায়।

---

১ 'বিক্রমপুরের বন্দিলাম বিশাল-লোচনী'—অনাদি মঙ্গল (রামদাস) পৃঃ ৬, সা·প সংস্করণ।

বিদ্যা ও সুন্দরের গুপ্ত প্রণয় কাহিনী অপেক্ষা কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণনাতেই কবির অধিকতর আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য ইহাতে মঙ্গলকাব্যের নিষ্ঠা সম্পূর্ণ রক্ষা পাইয়াছে। আদিরস-বর্ণনায়ও কবি ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের মত যথেচ্ছা-চা-রিতার প্রশ্রয় দেন নাই, এই বিষয়ে তিনি সংযমের মর্য্যাদা যথাসম্ভব রক্ষা করিয়াছেন। বররুচির নামে প্রচলিত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সহিত তাঁহার কাহিনীর অনেকাংশেই ঐক্য আছে। কাহিনীর দিক দিয়া আরও কয়েকটি সামান্য বিষয়েও অন্যান্য বিদ্যাসুন্দরের সহিত তাঁহার পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

কাব্যের বৈশিষ্ট্য

বলরাম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচনা পাণ্ডিত্যে ভারাক্রান্ত নহে, তাঁহার রচনা অনেক স্থানেই সরল, উচ্চাঙ্গের কবিত্ব ইহাতে সুলভ না হইলেও ইহার অনাড়ম্বভাব সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে। সুন্দরের সহিত মালিনীর প্রথম সাক্ষাতেই বর্ণনাটি এই,—

"নগরে পশারি সব আছে সারি সারি।
আপন ইৎসায় সভে বেচা কিনি করি॥
দেখিল মালিনী বৃক্ষতলে ফুল বেচে।
পুষ্প না বিকায় সেই একাকিনী আছে॥
ধীরে ধীরে কুমার গেলেন বৃক্ষ তলে।
কৌতুকে মালিনী মাল্য দিল তার গলে॥"

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত হালি সহরের নিকটবর্ত্তী ভাগীরথী তীরস্থ কুমারহট্ট গ্রামে কুলীন বৈদ্য বংশে ধন্বন্তরী গোত্রে বাংলার সাধক কবি রামপ্রসাদের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। কবি তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে এই ভাবে তাঁহার বংশের পরিচয় দিয়াছেন,

রামপ্রসাদ

"ধন হেতু মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণান্বিত
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশে সমুদ্ভব পুরুষার্থ কত কব
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনতির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রাম রাম মহাকবি গুণধাম
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ' প্রসাদে কহে কালিকার পদে
কৃপাময়ি ময়ি কর দয়া॥"

কবির সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম অম্বিকা, সম্ভবতঃ অম্বিকা বালবিধবা ছিলেন, দ্বিতীয়া ভগিনীর নাম ভবানী, ভগ্নীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ। কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিশ্বনাথ। কবির রামদুলাল ও রামমোহন নামে দুই পুত্র ও পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কবির কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের বংশধর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন।

কুলপরিচয়

রামপ্রসাদ ১৭১৮—১৭২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, কিন্তু তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। উদ্ধৃত কবির বংশ-পরিচয় হইতে জানা যায় যে, কবির পরিবার দরিদ্র ছিলনা, রামপ্রসাদও শৈশব হইতেই স্বচ্ছল অবস্থার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। পিতৃ-বিয়োগের পর জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া সংসারের ভার তাঁহার উপরই পড়িল, তিনি কর্ম্মের সন্ধানে

বর্ত্তমান কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আসিয়া এক ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারের মুহুরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কেহ অনুমান করেন, দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট তিনি কর্ম্মগ্রহণ করেন আবার কেহ মনে করেন, নবরঙ্গ কুলাধিপতি দুর্গাচরণ মিত্র তাহার কর্ম্মদাতা।[১] কিন্তু এই সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিবার প্রমাণাভাব। সম্ভবতঃ পিতৃবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই রামপ্রসাদের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হইয়া পড়ে, বৃহৎ পরিবারের ভরণ-পোষণের চিন্তায় অল্পদিনের মধ্যেই কবি মানসিক স্থৈর্য্য হারাইয়া ফেলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার ভাব-তন্ময়তার সূত্রপাত হয়। তিনি তাঁহার হিসাব লিখিবার খাতায় কালীকীর্ত্তনের পদাবলীর পদ রচনা করিয়া লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। কথিত আছে, ইহাদেরই সঙ্গে তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ পদ, "আমায় দাওমা তহ্‌বিলদারী। অমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।" লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার উপরিস্থিত কর্ম্মচারী একদিন ইহা দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করেন, তারপর মনিবের নিকট সেই হিসাবের খাতাখানি লইয়া উপস্থিত করেন। কিন্তু তাঁহার মনিব রামপ্রসাদের এই অপূর্ব্ব ভক্তিরসসিক্ত রচনাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গৃহে যাইতে অনুমতি দেন। রামপ্রসাদও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একাগ্রমনে আধ্যাত্মিক চিন্তায় কালাতিপাত করিতে থাকেন; রামপ্রসাদ যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তাঁহার এই গুণগ্রাহী মনিব-প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

কবির জীবন

কুমারহট্ট নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই গ্রামে মহারাজের একটি কাছারীও ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে এখানে

১ রামপ্রসাদ (শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) পৃঃ ৪৩ পাদটীকা।

আসিয়া বাস করিতেন। একবার কৃষ্ণচন্দ্র কুমারহট্টে আসিয়া রামপ্রসাদের কথা শুনিলেন, তাঁহার অপূর্ব্ব ভক্তিরস-মিশ্রিত পদাবলীর কথা শুনিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। তাঁহার মুখ হইতে দুই একটি পদ-কীর্ত্তন শুনিয়া তিনি এতই আকৃষ্ট হইলেন যে, তাঁহাকে নিজের সঙ্গে রাজধানী নবদ্বীপে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিষয়-বিরাগী স্বাধীন-প্রাণ কবি ইহাতে সম্মত হইলেন না। গুণগ্রাহী রাজা রামপ্রসাদের এই অসম্মতিতে বিরক্ত না হইয়া বরং তাঁহাকে 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। তদুপরি তাঁহাকে একশত বিঘা জমি নিষ্কর ভোগাধিকার সত্ব দান করিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের সান্নিধ্যে

রামপ্রসাদ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার আরাধ্য দেবতা কালীর মাহাত্ম্য সূচক কাব্য 'বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী' রচনা করিয়া মহারাজের সম্মুখে নিজেই তাহা পাঠ করিয়া শ্রবণ করান, তাঁহার রচনায় প্রীত হইয়া মহারাজ তাঁহার কবিত্ব শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রামপ্রসাদ তন্ত্রোক্ত কৌলিক ধর্ম্মাচারী ছিলেন। সেইজন্য শক্তির রূপ-ভেদ কালিকাই তাঁহার আরাধ্যা ছিল। তিনি তন্ত্রের আচারে কালীর সাধনা করিতেন, আনুষঙ্গিক মদ্যপানেও তাঁহার অভ্যাস ছিল। সেইজন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আজু গোঁসাই নামক অন্য একজন কবি এই সম্বন্ধে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন, তিনিও স্বরচিত পদে তাহার প্রত্যুত্তর দান করিতেন। হালিসহরে শিবের গলিতে এখনও রামপ্রসাদের পঞ্চমুণ্ডী সাধনাসন বর্ত্তমান আছে। কুমারহট্ট বর্ত্তমানে হালিসহরেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

কবির ধর্ম্মমত

কিন্তু বাহ্যিক এই আচারের অন্তরালেও রামপ্রসাদের একটি বিশিষ্ট ধর্ম্মমত ছিল। তাহা বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ। কালীকে তিনি এক ব্রহ্মময়ীরূপে বিশ্বপ্রকৃতির সকল বৈষম্যের মধ্যেও অধিষ্ঠিতা দেখিয়াছেন।

অখণ্ড প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ-স্বরূপিণী যে শক্তি তাঁহার আরাধ্যা কালিকা তাঁহারই রূপময়ী। এই বিশ্বপ্রকৃতি সেই অদৃশ্য শক্তি-স্বরূপিণীর লীলা-স্থলী। পরবর্ত্তী যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ধর্ম্মমতের মধ্যে যে সর্ব্বমূলীভূত ঐক্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল রামপ্রসাদে তাহারই সূচনা দেখিতে পাই। রামপ্রসাদের জীবনে এই আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতার জন্য তিনি সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সমাজে খ্যাতি লাভ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই এই সূত্রে তাঁহার জীবনের সঙ্গে নানা অলৌকিক বৃত্তান্ত জড়িত হইয়া নানা কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হইয়া পড়িল। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধেও এক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে।

কবিরঞ্জন কোন সময়ে তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী রচনা করেন কাব্যমধ্যে তাহা উল্লেখ করেন নাই। কেহ অনুমান করেন, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের কাব্যের দুই এক বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা, কেহ আবার মনে করেন, ভারতচন্দ্রের রচনাই পূর্ব্ববর্ত্তী। অবশ্য ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গলের রচনা-কাল ১৬৭৪ শকাব্দ বা ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের রচনা ইহার দুই এক বৎসর অগ্র পশ্চাৎ হইতে পারে, এই বিষয়ে কিছুই নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। উভয়ের কাহিনীগতও যথেষ্ট ঐক্য লক্ষিত হয়। আদিরস বর্ণনায় উভয়েই সমান পটু।

রচনাকাল

রামপ্রসাদের কাব্যের নাম 'কবিরঞ্জন'। কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীই ইহার মূল লক্ষ্য। কথিত আছে, রামপ্রসাদের এই কবিরঞ্জন তাঁহার কালিকা-মঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত ছিল, কালক্রমে কাব্যের পূর্ব্বাপর অংশ বিনষ্ট হইয়াছে, একমাত্র বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীই রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পুথি

বিষয়-বস্তু

পাওয়া যায় না। তাঁহার কালীকীর্ত্তন বলিয়া যে কাব্যগ্রন্থ প্রচলিত আছে তাহাও খণ্ড গীতি-কবিতার সমষ্টি মাত্র, সমগ্র কাব্য একটি বিশেষ কোন কাহিনী-বদ্ধ নহে, অতএব তাঁহার সুদীর্ঘ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ইহার অন্তর্গত হওয়া অসম্ভব।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী-রচনায় রামপ্রসাদ বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, তাঁহার কালীকীর্ত্তন, ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের খণ্ড গীতি-কবিতাগুলির সহিত ইহা একাসনে স্থান পাইতে পারে না। খণ্ড গীতি-কবিতা রচনায় রামপ্রসাদের যে প্রকৃত কবি-প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে তাহা তাঁহার আগমনী-বিজয়াগান রচনার সার্থকতা হইতেই অনুমিত হইবে। রামপ্রসাদের প্রতিভা প্রকৃত এই খণ্ড গীতি-কবিতা রচনারই প্রতিভা। ভাব-প্রবণ কবির অন্তরের স্বাভাবিক কোন ভাব-প্রেরণার আকস্মিক ভাবজনিত সংক্ষিপ্ত স্ফূর্ত্তি যত সহজ, দীর্ঘ কাহিনীর অনিশ্চিত গতিতে তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না। কেহ কেহ অনুমান করেন, বিদ্যাসুন্দর তাঁহার প্রথম বয়সের রচনা, ইহা খুবই সম্ভব বলিয়া মনে হয়, একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রের বিদগ্ধ মনের পরিতুষ্টির জন্যই যে তিনি ইহা রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, ইহার সহিত তাঁহার প্রথম বয়সোচিত ভাব ও রুচির অসংযত বিলাসের নিদর্শনও হয় ত প্রকট হইয়া আছে।

কবি-প্রতিভা

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী-রচনায় রামপ্রসাদ অনেক স্থলেই অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা রচনায় সংস্কৃত শব্দ-প্রয়োগের কৌশল তখনও তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, সেইজন্য প্রায়ই তাহা তাঁহার রচনার ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য স্থানে স্থানে তাঁহার রচনা প্রায় দুর্ব্বোধ্যও হইয়া রহিয়াছে। অবাধে তিনি অনেক স্থলে সংস্কৃত ধাতু-বিভক্তি-নিষ্পন্ন পদ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, যেমন,—

পাণ্ডিত্য

"পূর্ণচন্দ্র শোভা যেন পিবতি চকোর।"

ক্ষেপ করে দশদিক্ষু লোষ্ট্র বিবর্দ্ধণে।"

কিন্তু মধ্যে মধ্যে এই শ্রেণীর পাণ্ডিত্য-পূর্ণ রচনায়ও তাঁহার অনুপ্রাস সৃষ্টির প্রয়াস কতক সার্থক হইয়াছে,

যেমন,

"ডুবিল কুরঙ্গ শিশু মুখেন্দু শোভায়।
লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দৃশ্য হয়॥
সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়।
তপ্ত তপনীর তনু তারাপতি প্রায়॥"—ইত্যাদি।

রামপ্রসাদ শিবায়নের কবি রামেশ্বরের সমসাময়িক কালে বর্ত্তমান ছিলেন, সেইজন্য যুগ-প্রভাব তাঁহাকে এই বিষয়ে স্বীকার করিতে হইয়াছে। যাই হউক, বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর উপর রামপ্রসাদের কবি-প্রতিভা প্রতিষ্ঠিত নহে, তাঁহার খণ্ড গীতিকাব্যগুলিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

রামপ্রসাদের সমসাময়িক কালেই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচিত হয়। একমাত্র নীতির দিক বাদ দিলে সমগ্র মধ্যযুগের বঙ্গ সাহিত্যে এই সৃষ্টির তুলনা হয় না। সমগ্র মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্য্য যুগের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার প্রচারও এত ব্যাপক হইয়াছিল যে, ইহার অংশ বিশেষ এখনও অনেকে অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারেন।

ভারতচন্দ্র

অন্নদামঙ্গলের আলোচনা সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্য সম্বন্ধে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলেরই অন্তর্ভুক্ত। মানসিংহের বাংলা আক্রমণের কাহিনী-বর্ণনা উপলক্ষ করিয়া কবি কৌশলে ইহা মূল কাব্য-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহা অন্নদামঙ্গলের কাহিনীতে অবান্তর অংশ মাত্র। সেইজন্য স্বতন্ত্র কাব্য-হিসাবেই ইহার বিচার করিতে হয়।

বিদ্যাসুন্দর

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যগুলিতে ধর্ম্মভাব অনেকটা হ্রাস পাইয়া আসিল, দেবতা ইহাতে উপলক্ষ মাত্র রহিল, কিন্তু এই উপলক্ষে সংস্কৃত অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রেরই অনুশীলন আরম্ভ হইল। বিশেষতঃ সমষ্টির প্রাঙ্গন হইতে গিয়া সাহিত্য তখন রাজসভায় প্রবেশ করিয়া ব্যষ্টির পরিতুষ্টির কার্য্যে নিয়োজিত হইল। পিতাপুত্রে মাতা কন্যায় একত্র বসিয়া যে সঙ্গীতের রসাস্বাদন করা হইত তাহা ব্যক্তি বিশেষের রুচির অনুগামী হইয়া পড়িল, রাজবাৎসল্য কবিপ্রতিভাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নৈতিক ত্রুটির জন্য ভারতচন্দ্রকে কোন ভাবেই দায়ী করা যায় না। কাহিনী-ভাগের গতানুগতিকার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গিয়া তিনি যে নূতন কোন পরিকল্পনা দ্বারা তাঁহার কাব্যের নৈতিক আবহাওয়া দূষিত করিয়াছেন তাহা নহে, বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী মাত্রেরই যাহা লক্ষ্য তাঁহার কাব্যেও তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র, তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কালিকামঙ্গল রচনা করিয়া দেবতার মনস্তুষ্টি সাধন করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিলনা, রসিক-শিরোমণি কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে গিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধমান রাজ পরিবারের প্রতি নিজের যে আক্রোশ ছিল তাহাও আংশিক মিটাইতে গিয়া তাঁহার কাব্য-মধ্যে কতকগুলি অতিরিক্ত উপকরণও আসিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ কতকগুলি উপকরণ বর্জ্জন করিলেও তাহার মূল

কাব্যের কোন হানি হইত না। অবশ্য ইহাতে নৈতিক আপত্তির কারণ থাকিলেও তাঁহার কাব্যের গুণ কোন অংশেই খর্ব্ব করে নাই; কারণ, সামাজিক নীতির বিচারে কাব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নৈতিক আবহাওয়া যে খুবই সুস্থ ছিল তাহাও বলিতে পারা যায় না। বিদ্যাসুন্দরের কোন চরিত্রই অষ্টাদশ শতাব্দীর আকস্মিক সৃষ্টি নহে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য আলোচনা-সম্পর্কে বলিয়াছি, বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্য হইতেই ইহার যাত্রা সুরু হইয়াছে। গোরক্ষ-বিজয়-মীনচেতনের যোগিনী, ধর্ম্মমঙ্গলের নয়ানী, কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের মালিনীতে আসিয়া স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিয়াছে মাত্র। ভারতচন্দ্র একটি জাতীয় প্রাচীন ধারারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। বিদ্যা ও সুন্দরের জীবনের গুপ্ত অভিসার বর্ণনার যে নির্লজ্জ কাহিনী পাঠ করিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লই, তাহাই জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মধ্য দিয়া সমগ্র পরবর্ত্তী বৈষ্ণব গীতি-সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহা হইতেই বাংলার রসিক সমাজের তাহা একেবারে মজ্জায় গিয়া স্থান লাভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ মঙ্গল কাব্যগুলির আদর্শ যে সংস্কৃত পুরাণ তাহাও এই ভাব হইতে মুক্ত ছিলনা। তদুপরি সংস্কৃত শিক্ষিত দেশের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে সংস্কৃত অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রের ব্যাপক অনুশীলনে নবরসের চর্চ্চাও ব্যাপক ভাবেই আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব ইহার এই ঐতিহাসিক দিক উপেক্ষা করিয়া বিংশতি শতাব্দীর মার্জ্জিত রুচি ও সংস্কার লইয়া বাংলার অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যের রস-বিচার সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক হইতে বাধ্য।

প্রাচীন সাহিত্যে নীতির স্থান

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ বিশেষ করিয়াই খণ্ড গীতি-কাব্যের যুগ। রামপ্রসাদের খণ্ড কাব্য রচনার সার্থকতাও তাঁহার সম্পূর্ণ যুগোচিত

বৈশিষ্ট্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত বলিতে হইবে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী খণ্ডগীতি কবিতার সমষ্টি না হইলেও ইহার সুর মূলতঃ গীতি-প্রধান। চরিত্র-সৃষ্টি কিম্বা কাহিনী পরিকল্পনায় মহাকাব্যের সমুচ্চ আদর্শ ইহাতে অনুসৃত হয় নাই। এই বিষয়ে ইহা প্রকৃত মঙ্গলকাব্য ও খণ্ড গীতি কবিতাগুলির মধ্যবর্ত্তী বলিতে পারা যায়। ভারতচন্দ্রও যুগোচিত প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য গীতি-ভাবাপন্ন কাব্য বিদ্যাসুন্দর রচনাতেই তাঁহার প্রতিভার সমধিক বিকাশ হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট আদর্শ হইতে এই বিষয়ে একটু স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী মঙ্গলকাব্যগুলি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের মত গীতি-প্রধান (lyric) নহে।

কাব্যগুণ

কথিত আছে, বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানি রচনা করিয়া ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট তাহা উপস্থিত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র তখন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন, পুঁথিখানি কবির হাত হইতে লইয়া তাহা না দেখিয়াই পার্শ্বস্থ উপাধানের উপর হেলান দিয়া রাখিয়া নিজের কার্য্য করিতেছিলেন। ভারতচন্দ্র কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "মহারাজ, পুঁথিখানি এইভাবে রাখিবেন না, ইহার রস গড়াইয়া পড়িবে।" শুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পুঁথিখানি খুলিয়া দুই একটি পাতা পড়িলেন, পড়িয়া হাস্যমুখে কবিকে বলিলেন, "বাস্তবিকই যে রস তুমি সৃষ্টি করিয়াছ তাহা গড়াইয়া পড়িবারই মত।"

রসসৃষ্টি

মধ্যযুগের বৈচিত্র্যহীন কাহিনীর জের টানিয়াও ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যে এমন এক ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা সেই যুগের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য থাকিলেই যে রচনা মার্জ্জিত হইবে এমন কোন কথা নাই। মধ্য যুগের বহু কবি সংস্কৃতে অশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন

করিয়াও ভাষা-রচনায় অনেক স্থলে গ্রাম্যতা-মুক্ত হইতে পারেন নাই।

ভাষা

কিন্তু ভারতচন্দ্র আপন প্রতিভাবলে কাব্যের উপযোগী করিয়া ভাষা নিজের হাতে সৃষ্টি করিলেন, ইহা তাঁহার অপূর্ব্ব সৃজনী শক্তিরই পরিচায়ক। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে একই নিয়মে গতানুগতিক বর্ণনায় যে সমস্ত আনুষঙ্গিক কাহিনী আমরা এতকাল পাঠ করিতেছিলাম তাহাই নবতর শব্দ-যোজনায় রচনা করিয়া ভারতচন্দ্র ইহাদের মধ্যেই অভিনবত্বের সৃষ্টি করিলেন, যাহা বৈচিত্র্য-হীনতার জন্য প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল তাহাই একমাত্র নূতন ভাষার সোনার কাঠির স্পর্শে যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। মঙ্গলকাব্যের নায়ক-দর্শনে নারীদিগের আক্ষেপোক্তি বর্ণনা প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই অপরিহার্য্য। অবশ্য ইহার মূল সংস্কৃত কাব্য হইতে আসিয়াছে, এমন কি বানভট্টের কাদম্বরীর মধ্যে পর্য্যন্ত চন্দ্রাপীড়কে দর্শন করিয়া নগরের নারীগণ আক্ষেপ করিতেছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মনে হয়, ভারতচন্দ্র এই একই অত্যন্ত পর্য্যুষিত বস্তু বর্ণনা করিতেও একমাত্র ভাষার গুণে ইহার মধ্যে যে অভিনবত্ব দান করিয়াছেন মূল সংস্কৃত কাব্যেও ইহার তুলনা হয় না,—

"কহে একজন,
লয় মোর মন,
এ নব রতন ভুবন মাঝে।
বিরহে জ্বলিয়া,
সোহাগে গলিয়া,
হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে॥

আর জন কয়,
এই মহাশয়,
চাঁপা ফুলময় খোঁপায় রাখি।
হলদি জিনিয়া,
তনু চিকনিয়া,
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি॥"

সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ভাব ও ভাষার এমন একটি সুন্দর সামঞ্জস্য বিধানের দৃষ্টান্ত সুলভ নহে। ইহা হইতেই ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের কতক অনুমান করা যাইবে।

ছন্দ ও মিল

• ভাষার উপর এতখানি অধিকার ছিল বলিয়াই ভারতচন্দ্র ভাব প্রকাশের অনুযায়ী নূতন নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। মঙ্গল-কাব্যে রচিত বাংলা ছন্দের গতানুগতিক রীতিকে সর্ব্বতোভাবে লঙ্ঘন করিয়া তিনি নিজের শক্তি অনুযায়ী ভাবের অনুকূল ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; ইহাও তাঁহার কাব্যের সার্থকতার অন্যতম কারণ। এই দিক দিয়াও বাংলাকাব্যের একটি স্বতন্ত্র নূতন দিক উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। পদের মিলের দিক দিয়াও ভারতচন্দ্র সর্ব্ব প্রথম নূতনত্ব দেখাইলেন, তিনিই বাংলা কাব্যে সর্ব্বপ্রথম উপান্ত স্বর হইতে মিলের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন, ইহার পূর্ব্বে এমনকি পরেও রবীন্দ্রনাথের সময় পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ এই নিয়মে কাব্য রচিত হয় নাই।

চরিত্র সৃষ্টি

এই সুগভীর রস-দৃষ্টি থাকার ফলেই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের চরিত্র সৃষ্টিও সার্থকতায় মণ্ডিত হইয়াছে। গভীর সামাজিক জ্ঞান ও ব্যক্তি-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হইতেই ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যোক্ত চরিত্রগুলিতে একটা সুসঙ্গত স্বাভাবিকতা দান করিতে পারিয়াছেন। এই বিষয়ে অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডের দেব-

চরিত্রের পরিকল্পনা এতখানি স্বাভাবিক হইতে পারে নাই। কারণ, দেবতার আদর্শ চরিত্র সুদূর কল্পনার বিষয়ীভূত, কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের চরিত্রগুলি প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। সেইজন্য আদর্শ অপেক্ষা বাস্তব চরিত্রের পরিকল্পনাই ভারতচন্দ্রের সৃষ্টিতে সর্ব্বতোভাবে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মালিনী ও বিদ্যার চরিত্রই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কালিকামঙ্গলের কোন কবিই এই দুইটি চরিত্র-সৃষ্টির বিষয়ে কোন বিশেষত্ব দেখাইতে পারেন নাই, গতানুগতিকতারই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র।

হীরার চরিত্রের পরিকল্পনার সহিত তাহার সম্বন্ধে এই বর্ণনাটি সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে,—

হীরা মালিনী

"কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি কড়ে রাড়ী কথা কয় ছলে॥
চূড়া বান্ধা চুল পরিধান সাদা সাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কোন্দলের দায়॥"

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর চরিত্র নূতন নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোরক্ষবিজয়ের যোগিনী, ধর্ম্মমঙ্গলের নয়ানী ও এই বিদ্যাসুন্দরের মালিনী অভিন্ন চরিত্র। এই বিশেষ প্রকৃতির স্ত্রী চরিত্রের পরিকল্পনা

বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজের এই একটি চরিত্রের বর্ণনা দ্বারাই যেন ভারতচন্দ্র সমগ্র সমাজটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন, এত প্রত্যক্ষ সুস্পষ্ট বর্ণনা এই শ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে ইহার পূর্ব্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরা সংস্কৃত আলঙ্কারিক বর্ণনায় এই শ্রেণীর চরিত্রগুলিকে কৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছেন। এমন কি ঘনরামের নয়ানী পর্য্যন্ত এই বিষয়ে অনেক হীনপ্রভ।

একটি গুপ্ত প্রণয়-কাহিনীর নায়িকার চরিত্র যে প্রকার হওয়া উচিত ভারতচন্দ্র বিদ্যাকে সম্পূর্ণ সেইরূপই চিত্রিত করিয়াছেন। বুদ্ধিমত্তায় তাঁহার তুলনা হয় না, কথা বার্ত্তা ও কার্য্য প্রণালীতে রাজকন্যার সমুচিত মর্য্যাদাও যে তাহা দ্বারা কোন অংশে খর্ব্ব হইয়াছে তাহাও নহে। বিদ্যা

বিদ্যা

বুদ্ধি ও বয়স থাকিলে রাজান্তঃপুরের বিলাস জীবন কুমারী রাজকন্যার পক্ষে যে প্রকার হইতে পারে এই চরিত্রটি হইতে তাহারই একটি সুন্দর এবং সঙ্গত আভাস পাই। তাহার নির্ভীক সাহসিকতার মূলেও রহিয়াছে তাহার জন্ম ও শিক্ষাগত সংস্কার। এই শিক্ষা দ্বারা মানসিক সংযমও যে তাহার আয়ত্ত না হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। রাণীর তিরস্কারেও সে অবিচলিতা, কোটাল সুন্দরকে ধরিয়া শ্মশানে লইয়া গেলেও প্রণয়ীর এই বিপন্মুহূর্ত্তেও তাহার অন্তরাবেগ কোথাও অসংযত হইয়া উঠে নাই। বিলাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আধ্যাত্মিক সম্পর্কহীন বিদ্যার্জ্জনের যে কুফল হইতে পারে বিদ্যা চরিত্রেও স্বভাবতঃই তাহাই হইয়াছিল, ইহার এই অত্যন্ত সঙ্গত এবং স্বাভাবিক বিষয়ের অতিরিক্ত আর কিছুই হয় নাই।

এই সমস্ত গুণেই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এত ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। কাব্যখানি মঙ্গলকাব্যের আকারে লিখিত হইলেও কালীর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য

নহে, একটি প্রণয় কাহিনীকেই আধ্যাত্মিক আভিজাত্য দিবার জন্য ইহাতে কালিকার নামের অবতারণা করা হইয়াছে মাত্র।

এই সমস্ত কবি ব্যতীতও কবীন্দ্র মধুসূদন, ক্ষেমানন্দ, বিশ্বেশ্বর দাস প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি প্রণীত কালিকামঙ্গলের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এই সমস্ত কবি সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

মধ্য যুগের সমগ্র কাব্য সাহিত্যের মধ্যে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের মত এমন আর কোন কাব্য প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। পারশী

কাব্যের পরিণতি

হরফে পর্য্যন্ত লেখা বাংলা বিদ্যাসুন্দরের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর উর্দ্দূতেও অনূদিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ভারতচন্দ্রের অনেকগুলি পদ বাংলার খনার বচনের মত প্রবচনের রূপে আজিও প্রচলিত আছে, অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ড হইতে ইহাতে এই শ্রেণীর পদের সংখ্যা অনেক অধিক। এই প্রচবনগুলির মধ্য দিয়া ভারতের বিদ্যাসুন্দর আজিও বাংলার সমাজে বাঁচিয়া আছে। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী লইয়া আজিও বাংলায় কাব্য ও নাটক রচিত হয়।

শীতলা-মঙ্গল

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিষ-চিকিৎসা প্রকরণে বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও রোগপ্রশমনকর্ত্রী বলিয়া শীতলা দেবীর উল্লেখ আছে। এই দেবীর পূজা শুধু বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ নহে। ভারতের বহু স্থানেই এই শ্রেণীর দেবতার পূজা প্রচলিত আছে। কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর এক অতি প্রাচীন শীতলা-মন্দির আছে। ময়ূরভঞ্জ Archaeological Surveyতে ও কয়েকটি শীতলা-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং অন্যত্রও ইহার যথেষ্ট প্রসার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

ভাব-প্রকাশের মসূরিকা চিকিৎসায় (২য় খণ্ড ৪র্থ ভাগ) যে স্থলে শীতলা দেবীর স্তব বর্ণনা করা আছে তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, স্কন্দ-পুরাণান্তর্গত 'কাশীখণ্ড' হইতে এই শীতলাস্তব গৃহীত হইল। কাশীখণ্ড কাশীর মাহাত্ম্য-সূচক পুরাণ, বিভিন্ন দেশে ইহার বিভিন্ন পাঠ-ভেদ দৃষ্ট হয়, সেইজন্য বাংলা দেশে প্রাপ্ত কাশীখণ্ডে এই শীতলাস্তোত্রটি পাওয়া যায় না, অবশ্য অন্যত্র কাশীখণ্ডের কোন পাঠান্তরেও এই শ্লোক কয়টি আছে কিনা তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। এমনও হইতে পারে যে, পরবর্ত্তী কালে লৌকিক শীতলা দেবীর পৌরাণিক আভিজাত্য স্থাপন করিবার জন্য এই শ্লোক কয়টি কেহ রচনা করিয়া কাশীখণ্ডের নামে চালাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছে।

যাই হউক, শীতলা-পূজারীদিগের বিশ্বাস, এই দেবীর বর্ত্তমান পূজা-বিধান পিচ্ছিলা-তন্ত্র হইতে সংকলিত ও তাঁহার ধ্যান স্কন্দপুরাণ হইতে গৃহীত। তন্ত্র ও পুরাণ স্বতন্ত্র বস্তু, তথাপি এই পিচ্ছিলাতন্ত্র ও স্কন্দ পুরাণ উভয়ের আদর্শে সামঞ্জস্য পরিকল্পনা করিয়া এই দেবতার বর্ত্তমান পূজাবিধি রচিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইনি লৌকিক স্থানীয় (local) দেবী, পরবর্ত্তী কালে হিন্দু পৌরাণিক অভিজাত্য লাভের প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র। তথাকথিত পিচ্ছিলা-তন্ত্রে দেবীর ধ্যান এই প্রকার,

"শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগলবিলসন্মার্জ্জনীপূর্ণকুম্ভম্।
মার্জ্জন্যা পূর্ণকুম্ভাদমৃতময়জলং তাপশান্তৈঃ ক্ষিপন্তীম্॥
দিগ্বস্ত্রাং মূর্দ্ধ্নি সূর্পাং কনকমণিগণৈর্ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রাম্।
বিস্ফোটাদ্যুগ্রতাপ-প্রশমনকরী শীতলা ত্বাং ভজামি॥"

শীতলা-স্তবে পাওয়া যায় যে, শিব যেমন মনসার পূজা করিয়াছিলেন, তেমনই শীতলারও পূজা করিয়াছিলেন। শিব বলিতেছেন,

"নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাম্ ত্বমেকামৃতবর্ষিণী॥
গলগণ্ডগ্রহরোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাং।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি তে ক্ষয়ম্॥
মৃণালতন্তু সদৃশীং নাভিহৃন্মধ্য সংস্থিতাম্।
যস্ত্বাং বিচিন্তয়েদ্দেবীং তস্য মৃত্যুর্নজায়তে॥
যস্ত্বামুদক মধ্যে তু কৃত্বা সংপূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটকং ভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে॥"

স্তবকবচমালাতেও শীতলার এই স্তব উদ্ধৃত আছে। শীতলা প্রকৃতপক্ষে লৌকিক দেবী, অতএব বৈদিক সাহিত্যে ইহার অনুসন্ধান বৃথা। ইহার পূজার আচার, মূর্ত্তি-পরিকল্পনা সমস্তই উন্নত আর্য্য-সমাজের দেবকল্পনার বিরোধী। বিশেষতঃ বসন্ত রোগ গ্রীষ্মপ্রধান দেশেরই ব্যাধি, অতএব প্রাচীন আর্য্যের সাহিত্যের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকা সম্ভব নহে।[১] কেহ কেহ শীতলার মূর্ত্তি ও পূর্ব্বোদ্ধৃত ধ্যান-মন্ত্রের এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া বৈদিক সাহিত্যের অপদেবীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক কল্পনা করিয়াছেন।[২] কিন্তু এই দেবী অনার্য্যের সমাজ হইতে যে উৎপন্ন হইয়াছে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১ বিশ্বকোষকার স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বৈদিক তক্মন্ ও শীতলা অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু 'শীতলা' অনার্য্য সমাজ হইতে উদ্ভূত, ইহার সহিত আর্য্যের সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নাই।

২ "শীতলা পূজা প্রকৃত কি ?" (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সমীরণ, ১৩০২ সাল, ১ম, ২য় খণ্ড। (স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্তৃক সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৫, পৃঃ ২৯, উদ্ধৃত)

বৌদ্ধ তন্ত্রে হারীতী নামে এক দেবী আছেন। বৌদ্ধ তন্ত্র-সাহিত্য ও পুরাণে তিনি যক্ষিণী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন,[১] তিনি কুবেরের পত্নী।

শীতলা ও হারীতী

কিন্তু হারীতী যক্ষিণী হইলেও কালক্রমে দেবীর মতই তিনি বৌদ্ধ সমাজে পূজা পাইতে থাকেন। কারণ, পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নেপালে বুদ্ধ বা ধর্ম্ম ঠাকুরের মন্দিরের পার্শ্বেই হারীতীর মন্দির অবস্থিত থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য কোন বুদ্ধ মন্দির কিম্বা বৌদ্ধ মঠের অভ্যন্তরে তাঁহার স্থান হয় নাই। তান্ত্রিক মতে এই দেবীর পূজা করিতে হয়,—

"যে চ যা বা মনুষ্যাশ্চ পঞ্চোপচারকৈরপি।
মগুধারাদিভিঃ পূজ্যে মাংসৈর্বলিভির্মীনকৈঃ॥"

বৃহৎ স্বয়ম্ভূপুরাণ, পৃঃ ৪২৮

বৌদ্ধ সমাজের এই হারীতী হইতেই পরবর্ত্তী বাংলার সমাজে লৌকিক দেবতা শীতলার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।[২] এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বৌদ্ধ সমাজে পূজিতা হারীতী দেবীর প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে হারীতী শব্দের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা এই, যিনি হরণ করেন তিনি হারীতী। এই হরণ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে চীনা বৌদ্ধদিগের

বৌদ্ধ সমাজে হারীতী

মধ্যে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্য হইতেই চীন দেশে গিয়াছে, কিন্তু

---

১ অত্রজা অন্যজা লোকাঃ শৈবাপি বৌদ্ধশৈবকাঃ। হারীত্যামপি যক্ষিণ্যাং সদা মুদা প্রপূজিতম্॥" স্বয়ম্ভূপুরাণ, পৃঃ ৪২৮

২ "It is difficult to ascertain whether Hindus have taken Sitala from the Buddhistic Hariti or the Buddhists from the Hindu Sitala. I am inclined to think that the Hindus are the borrowers" (Mm. H. P. Sastri) Discovery of Living Buddhism in Bengal, Pg. 20. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ ১৬৮

ভারতীয় সাহিত্যে আর তাহার অস্তিত্বের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। চীন দেশে প্রচলিত গল্পটি এইরূপ: রাজগৃহে এক যক্ষিণী বাস করিত। এই যক্ষিণী সমগ্র মগধের রক্ষয়িত্রী রূপে কল্পিতা হইত। কালক্রমে এই যক্ষিণী নগরের শিশুদিগকে অপহরণ করিয়া ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। নগরবাসিগণ এই জন্য তাহার নাম দেয়, হারীতী বা হরণকারিণী। বুদ্ধের নিকটে এই বিষয়ে তাহারা অভিযোগ করে। অতঃপর বুদ্ধের কৌশলে হারীতী তাহার জাতাপহরণবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্ত জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধও তাহাকে বৌদ্ধ মঠ মন্দিরের রক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত করেন।[১]

উদ্ধৃত কাহিনীর মধ্যে শীতলার যে বিশেষ গুণ অর্থাৎ তিনি যে বসন্ত রোগ নিবারণকারিণী, তাহার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে সংক্রামক কোন রোগদ্বারা ব্যাপক শিশুমৃত্যুর কারণ, তাহার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এই সংক্রামক ব্যাধি যে বসন্ত তাহার কোন প্রমাণ নাই। পরবর্ত্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে হারীতী সন্তানদাত্রী ও শিশুর রক্ষয়িত্রী রূপে কল্পিতা হইলেন। পুরাণের ষষ্ঠীদেবীর সহিত তখন তাঁহার আর কোন পার্থক্য নাই। অতএব বৌদ্ধ সমাজের এই মঠমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী, সন্তানদাত্রী ও তাহার রক্ষয়িত্রী হারীতীর সহিত বাংলার লৌকিক দেবতা বসন্তরোগনাশিনী শীতলার কোন সঙ্গত সম্পর্ক কল্পনা করা যাইতে পারে না। বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়, একমাত্র শিশুর সহিতই হারীতীর সম্পর্ক, কিন্তু বসন্তরোগ বালবৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে সমান ভয়াবহ। অথচ শীতলার শিশুর সহিত যে বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে তাহা নহে, সমাজের সকল বয়সের লোকের সহিতই তাহার সম্পর্ক সমান। সেইজন্য

---

১ On Yuan Chwang. (Watters) Vol. I Pg. 216

মনে হয়, পৌরাণিক ষষ্ঠীদেবী কিম্বা পৌরাণিক জাতাপহারিণীর সহিতই হারীতীর সম্পর্ক, শীতলার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে হারীতীর যে সমস্ত মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেও আধুনিক শীতলার ধ্যানোক্ত বর্ণনা কিম্বা তাহার প্রাপ্তমূর্ত্তির সহিত হারীতীর সুদূর পার্থক্য বিবেচিত হইবে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, হারীতী যক্ষিণী ও যক্ষপতি কুবেরের পত্নী। সেইজন্য কুবেরের মূর্ত্তির পার্শ্বে আসীনা হারীতীর মূর্ত্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] এতদ্ব্যতীত শিশুপরিবৃতা তাহার স্বতন্ত্র দণ্ডায়মানা মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তিগুলির গঠন-ভঙ্গি অনুপম এবং উন্নত শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁহার দুই স্কন্ধারূঢ় দুই শিশু, অঙ্কে স্তন্যপানরত এক শিশু, পাদনিম্নে ক্রীড়ারত আরও দুই একটি শিশু দেখিতে পাওয়া যায়। মুখে প্রসন্ন হাস্য। সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার সম্ভার ও বিচিত্র বসন পরিহিতা। ইহার সহিত রাসভস্থা, দিগ্বস্ত্রা, সূর্পমূর্দ্ধ্ন, সম্মার্জ্জনীহস্তা শীতলাদেবীর কি ভাবে সামঞ্জস্য কল্পনা করা যাইতে পারে তাহা বুঝিতে পারা যায় যায় না। অতএব মনে হয়, বৌদ্ধ হারীতী হইতেই পরবর্ত্তী হিন্দু পুরাণে জাতাপহারিণীর পরিকল্পনা হইয়া থাকিলেও লৌকিক শীতলার সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

শীতলা নামটি পৌরাণিক প্রভাব-জাত বলিয়া মনে হয়। বসন্ত রোগের দারুণ প্রদাহ-গুণ হইতেই ইহার উপশমকারিণী দেবীর নাম বিপরীতোক্তি (pejorative tendency` তে শীতলা হইয়াছে। ধ্যানেও তাঁহাকে 'বিস্ফোটাদ্ভুতাগ্রপ্রশমনকরী' বলা হইয়াছে। কিন্তু এই শীতলা শব্দটী অত্যন্ত অর্ব্বাচীন সংস্কৃত। দাক্ষিণাত্যেও শীতলম্মা বলিয়া এক গ্রাম্য

---

১ A History of Fine Art in India and Ceylone (V. A. Smith). Pg. 114, 115

দেবী আছেন।[১] কিন্তু তিনি জলের দেবতা (water-goddess)। অবশ্য এই দাক্ষিণাত্যের গ্রাম্য জলদেবতারাই বসন্তরোগ নাশিনী দেবী বলিয়া কোন কোন স্থানে কল্পিত হইয়া থাকেন। মস্‌লিপট্টম্ জিলায় জলদেবী গঙ্গম্মা এই বসন্ত রোগেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া কল্পিতা হ'ন।[২] পূর্ব্বোদ্ধৃত শীতলা স্তবেও বলা হইয়াছে যে, জলমধ্যেই শীতলার পূজা হয়, যথা," যস্তামুদকমধ্যে তু কৃত্বা সংপূজয়েন্নরঃ॥' অতএব দাক্ষিণাত্যের শীতলম্মা নামক জলদেবতার বৈশিষ্ট্য বাংলার শীতলার মধ্যেও বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। শীতলম্মাও যে বসন্ত রোগেরই দেবী এই বিষয়ে কোন ভুল নাই। দাক্ষিণাত্যের এই লৌকিক দেবী শীতলম্মা ও বাংলার লৌকিক দেবী শীতলা অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে এই বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বিভিন্ন আরও নাম পাওয়া যায়; যেমন, মহীশূর জেলায় হাম ও বসন্তের দেবীর নাম সুখজম্মা, আরকট জেলায় তাঁহার নাম কন্নিয়ম্মা, ইনি দাক্ষিণাত্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রাম্য দেবতা মরীঅম্মারই রূপান্তর মাত্র, কোথাও তাঁহার নাম মরম্মা বা মরম্মা-হেথনা। আদি মানবের সাধারণ রোগভীতি হইতে এই সমস্ত দেবতার পরিকল্পনা করা হইলেও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সম্পর্কও ছিল।বাংলার শীতলাও এই দাক্ষিণাত্য হইতেই সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পর বঙ্গদেশে আসিয়াছে। হারীতীও স্বতন্ত্র কোন সমাজকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধ তন্ত্র সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, অতএব হারীতী হইতে শীতলার উদ্ভব হইয়াছে তাহা বলা যায় না। পরবর্ত্তীকালে ইহাদের

শীতলম্মা ও শীতলা

শীতলা ও দাক্ষিণাত্যের গ্রাম্য দেবতা

১ The village gods of South India. (H. Whitehead) Pg 23.

২ ঐ

উপর সামান্য পৌরাণিক প্রভাব স্থাপিত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাও অত্যন্ত নগণ্য।

দাক্ষিণাত্যের যে সমস্ত বসন্তরোগনাশিনী লৌকিক দেবতার উল্লেখ করিলাম তাহাদের কাহারও কোন নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি নাই, অপরিণত-গঠন প্রস্তরখণ্ডেই তাহাদের পূজা হইয়া থাকে। পূজারীরা সেই প্রস্তরখণ্ডে সিন্দুর লিপ্ত করিয়া দেয়। বাংলার শীতলারও পূর্ব্বে কোন মূর্ত্তি ছিল না, এই অপরিণত গঠন প্রস্তরখণ্ডেই তাঁহারও পূজা হইত। মহামহোপাধ্যায় ৺ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতার যে ধর্ম্মমন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,[১] তাহার অভ্যন্তরস্থ ধর্ম্মমূর্ত্তির আসন-নিম্নে যে শীতলার মূর্ত্তি আছে, তাহার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "Below there is a stone with erruptions representing small-pox. This is Shitala" স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ও লিখিয়াছেন,[২] "শীতলা পণ্ডিতদিগের শীতলা করচরণহীনা, সিন্দুরলিপ্তাঙ্গী শঙ্খ বা ধাতুখচিত ব্রণ-চিহ্নাঙ্কিতা মুখমণ্ডল মাত্রাবশিষ্টা প্রতিমা মাত্র।" এই ক্ষুদ্র ব্রণচিহ্নাঙ্কিত শিলাখণ্ডই শীতলার প্রাচীনতম রূপ। ইহাও ধর্ম্মশিলার উপাসনার মত আদি মানবের প্রস্তরোপাসনার প্রবৃত্তি হইতে জাত, দাক্ষিণাত্যেও সেইজন্য অনুরূপ গঠন শিলাখণ্ডেই বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা হইয়া থাকে। তাহা হইলে পূর্ব্বোদ্ধৃত শীতলার ধ্যানমন্ত্রে তাহার যে নির্দ্দিষ্ট-গঠন একটি মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা যে বহু পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক প্রভাব-জাত এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ময়ূরভঞ্জ হইতে অনেকটা এই ধ্যানের অনুরূপ একটি শীতলা-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৩] এই মূর্ত্তি যে

---

১ Discovery of Living Buddhism in Bengal. Pg. 22.

২ "শীতলা-মঙ্গল" সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৫ সাল, ১ম সংখ্যা

৩ Archaeological Survey of Mayurbhanja. Vol. I Pg. XCVI

অত্যন্ত আধুনিক সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম্মের পূজারীরা যেমন ধর্ম্মপণ্ডিত, শীতলার পূজারীরাও তেমনই শীতলাপণ্ডিত নামে পরিচিত। গ্রহ-বিপ্রেরাই বসন্ত রোগের চিকিৎসা ও শীতলা পূজা করিয়া থাকেন। বর্ণহিন্দুর গৃহে এই দেবতার পূজা হয় না। শীতলার অনার্য্য সংশ্রবের ইহাও প্রমাণ।

শীতলামঙ্গলের বিশিষ্ট কোন একটি কাহিনী পাওয়া যায় না। ইহার বিভিন্ন পালায় বিভিন্ন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩০৫ সাল, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৩১) একখানি শীতলা-মঙ্গল কাব্যের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইহার চারিটি পালা চারিটি স্বতন্ত্র কাব্য। এই স্বতন্ত্র পালাগুলি আবার স্বতন্ত্র কবির ভণিতা-যুক্ত। মনে হয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শীতলা-পূজারী এই শীতলা মাহাত্ম্য সূচক বিভিন্ন কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে তাহা আসিয়া একত্র সংযুক্ত হইয়াছে।

শীতলা-মঙ্গলের গল্প

ইহাদের মধ্যে 'গোকুল পালা' নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী নামক কবির রচিত। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণবলরামের শরীরে বসন্ত দেখা দেয়, তাঁহারা শীতলা পূজা করিয়া পরে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইহার আর একটি পালার নাম 'বিরাট পালা'। ইহাতে বিরাটরাজ্যে ব্যাপক বসন্ত রোগের আবির্ভাব ও শীতলার পূজায় এই রোগের উপশমের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার আর একটি পালার নাম 'চন্দ্রকেতুর পালা', ইহাতেও চন্দ্রকেতুর রাজ্যে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ও শীতলা পূজায় তাহার শান্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আর একটি লৌকিক পালা আছে, তাহার নাম 'রঘুনাথ দত্তের পালা'। শেষোক্ত পালা দুইটির রচয়িতা দৈবকীনন্দন নামক একজন কবি, তাঁহার উপাধি কবিবল্লভ। পূর্ব্বোল্লিখিত বিরাট পালা আবার আরও কয়েকটি খণ্ড-

পালায় বিভক্ত, 'জাগরণ পালা', 'হেমঘট তোলা' পালা ও 'নিমাই জগাতির পালা'। নিম্নে চন্দ্রকেতুর পালাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া ইহার কাহিনীগত বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা যাইতেছে,—

শীতলাদেবী মর্ত্যে পূজা প্রচার করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার অনুচর জ্বরাসুরকে বলিলেন,

"সকল দেবেতে আছে মোর অধিকার।
মনুষ্য গৃহেতে পূজা না হয় আমার॥"

চন্দ্রকেতুর পালা

জ্বরাসুরের পরামর্শে শীতলা চৌষট্টি বসন্তকে ডাকাইলেন। সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, জ্বরাসুর আগে গিয়া মনুষ্যদেহে জ্বররূপে প্রবেশ করিবে, অতঃপর মাতা শীতলা তাহার অনুসরণ করিবেন। এই পরামর্শ মত সকলে চন্দ্রকেতুর রাজ্যে চলিলেন।

শীতলা অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিলেন। সমস্ত আভরণ ত্যাগ করিয়া এলোচুলে চৌষট্টি বসন্তের ঝুড়ি কক্ষে লইয়া হস্তে নড়ি ধারণ পূর্ব্বক লোলচর্ম্মা বৃদ্ধার বেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শীতলা চন্দ্রকেতুর রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, প্রথমেই তিনি নগরের কুলরমণী-দিগকে দেখিলেন। তাহারা ছদ্মবেশিনী দেবীকে দেখিয়া মুখ ফিরাইল। তিনি ইহাতে মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, মনে করিলেন, ইহার প্রতিশোধ লইবেন। অতঃপর তিনি পথে নগরের বালক-বালিকাদিগকে দেখিলেন। "কিন্তু নাহি দেখি কার মুখে বসন্তের চিন।" তখন "ছাওয়ালে দেখিয়া দয়া জন্মিল অন্তরে।" দয়া অর্থে রোগের আক্রমণ। প্রথমেই নগরের বালকগণ তাঁহার রোগের কবল-গ্রস্ত হইল।

শীতলা এইবার রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার বাড়ী শান্তিপুর।

সাতটি পুত্র তাঁহার বসন্ত রোগে মরিয়াছে। স্বামী শৈব, শীতলার পূজা করিতে স্বীকার করেন না, সেইজন্য তাঁহার পরিবারে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। শীতলা রাজাকে বলিলেন, 'তোমার রাজ্যেও বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে দেখিতেছি, তুমি অচিরে শীতলার পূজা না করিলে রাজ্য ছারখারে যাইবে। বিশেষতঃ তোমারও একশত পুত্র আছে। অতএব এই পুত্রদিগের কল্যাণে তোমার শীতলা পূজা করা কর্ত্তব্য।'

কিন্তু রাজা চন্দ্রকেতু পরম শৈব, তিনি বলিলেন,

"নৃপতি বলেন বুড়ী হয়্যাছ অজ্ঞান।
কেমনে ছাড়িব আমি প্রভু ত্রিনয়ান॥"

শীতলা শিবের নিন্দা করিলেন। শুনিয়া রাজা কানে হাত দিলেন, আরাধ্য দেবতার নিন্দা নিজ কর্ণে শ্রবণ করিলেন না। তিনি বলিলেন,

"কেবা কার পুত্রবধূ কেবা কার পিতা।
মরিলে সম্বন্ধ নাই শুন এই কথা॥"

অতএব পুত্রের কল্যাণের জন্য তিনি শীতলা পূজা করিয়া নিজের দেবতার অবমাননা করিবেন না,—

"জন্মেও না ছাড়িব মহেশ ঠাকুর।
শুনরে অজ্ঞান বুড়ী এথা হৈতে দূর॥"

শুনিয়া শীতলা ক্রোধে অন্ধ হইলেন। তাঁহার রাজ্য ছারখার করিতে জরাসুরকে আদেশ দিলেন। রাজপুত্রেরা একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে রাণী রাজার নিকট কাঁদিয়া বলিলেন, এখনও শীতলার পূজা করিয়া রাজ্যের অশান্তি দূর কর। কিন্তু শীতলার কার্য্যে রাজার আক্রোশ আরও বাড়িয়া গেল, তিনি বলিলেন,

"রাজা বলে শীতলা করেছে যদি বাদ।
কদাচিৎ আমি তার না লব প্রসাদ॥"

রাজা দিবারাত্র শিবের পূজা করিতে লাগিলেন। শিব ভক্তের বিপদে তাঁহার একজন অনুচর ভীমকে [১] রাজার রক্ষার্থ পাঠাইলেন। শিবও যুদ্ধে সাজিয়া আসিলেন, কিন্তু শীতলার হস্তে পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেলেন। রাজার উনসত্তরটি পুত্র বসন্তরোগে মরিল, তিনি কনিষ্ঠ পুত্রটিকে সূর্য্যের সাহায্যে নিয়া পদ্মবনে লুকাইয়া রাখিলেন। শীতলা তাহার সন্ধান করিতে লাগি‍লেন কিন্তু রাজপুত্র পদ্মের নাল বাহিয়া একেবারে গিয়া পাতালে উপস্থিত হইল। কিন্তু পাতালের রাজা বাসুকি সর্পকুলকে শীতলার ক্রোধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজপুত্রকে নিয়া এক পর্ব্বত গহ্বরে লুকাইয়া রাখিলেন। সেখানেই বসন্তরোগের আক্রমণে রাজপুত্র প্রাণত্যাগ করিল।

রাজকুমারের পত্নী চন্দ্রকলা পিতৃগৃহে থাকিয়া এই দুঃস্বপ্ন দেখিলেন। শীতলাও চন্দ্রকলাকে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ দিয়া আসিলেন। চন্দ্রকলা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। শীতলা জরতীবেশে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন,

"ব্রাহ্মণী দেখিয়া দণ্ডবত হৈল সতী।
ঈশ্বরী বলেন হও জনম এয়তি ॥"

চন্দ্রকলা বলিলেন, তিনি স্বামীর সহমৃতা হইতেছেন, এই অবস্থায় তাঁহার এই আশীর্ব্বাদ কি ভাবে সফল হইতে পারে? শীতলা বলিলেন, তাঁহার কথা মিথ্যা হইবার নহে। তিনি 'মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্রে' রাজকুমারের প্রাণদান করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি চন্দ্রকলাকেও এই মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্র শিক্ষা দিলেন। চন্দ্রকলা স্বামীকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং উনসত্তর ভাসুরকে জীবিত করিবে এইরূপ আশ্বাস দিয়া রাজাকে শীতলা পূজা করিতে বলিল, কিন্তু রাজা স্বীকৃত হইলেন না; বলিলেন,

১। রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যেও শিবের অনুচরের নাম ভীম।

"পুনর্ব্বার পুত্রবধূ মরুক দুজন।
জন্মে নাহি ছাড়িব প্রভু ত্রিলোচন॥"

কিন্তু এইবার প্রভু শিব নিজেই আসিয়া চন্দ্রকেতুকে শীতলার পূজা করিতে বলিলেন। নিজের আরাধ্য দেবতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নৃপতি অবশেষে বাধ্য হইয়া শীতলার পূজা করিলেন। রাজ্যে যে সমস্ত প্রজা বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল তাহারা সকলেই বাঁচিয়া উঠিল।

কাহিনীর বৈশিষ্ট্য

এই কাহিনীর রচনা যে আধুনিক ইহার বিষয়-বস্তু ও তাহার রচনা প্রণালী একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই কাহিনী-ভাগে কোনই মৌলিকতা নাই। পদ্মাপুরাণের কাহিনীর উপরই ইহার ভিত্তি মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত, মৌলিক অংশও কাব্যগুণ-বিবর্জ্জিত। এই কাহিনী রচনায় মঙ্গলকাব্য রচনার একটা ধারাবাহিক ও পর্য্যুষিত প্রথারই অনুকরণ করা হইয়াছে মাত্র। অতএব অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলি রচনার বহু পরে ইহাদেরই আদর্শে যে এই কাহিনী রচিত হইয়াছে এই বিষয়ে নিশ্চিত।

গোকুল পালা ও বিরাট পালা হইতেও জানা যায় যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম সাধারণ সমাজে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই এই সমস্ত কাহিনী রচিত হয়। কারণ, ইহাতে মঙ্গলকাব্যের নায়ক কোনও কল্পিত শাপভ্রষ্ট দেব-সন্তান নহে, একেবারে স্বয়ং কৃষ্ণ-বলরাম। কৃষ্ণ-বলরামকে নায়ক করিয়া মঙ্গলকাব্য রচনার প্রয়াসও এই প্রথম। অর্থাৎ চাঁদসদাগর, ধনপতি, লাউসেনের মত নির্দ্দিষ্ট কোন নায়কের অভাবে এই শ্রেণীর মঙ্গল-কাব্যগুলি প্রকৃত কাহাকে যে নায়ক করিয়া কাব্যরচনা করিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না, সেইজন্য শীতলামঙ্গল কাব্যে নির্দ্দিষ্ট কোন কাহিনী নাই, ঘটনাগুলিও সুগ্রথিত নহে, সর্ব্বোপরি কোন প্রথমশ্রেণীর

কবিও এই বিষয় লইয়া কাব্যরচনা করেন নাই। সেইজন্য ইহাদিগকে দ্বিতীয় স্তরের মঙ্গলকাব্য বলা যাইতে পারে।

শীতলা-মঙ্গলের কাহিনীর আদি রচয়িতা কে তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। বটতলায় মুদ্রিত নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তীর "বিরাট পালায়" গ্রন্থ-প্রকাশক ৺ত্রৈলোক্য নাথ দত্ত মহাশয় 'প্রকাশকের উক্তি' নামে কয়েকটি পদ রচনা করিয়া তাহাতে বলিয়া গিয়াছিলেন,

"শীতলার জাগরণ পালা বঙ্গভাষায়।
নাহি ছিল কোন দেশে সুশৃঙ্খলায়॥
অনেকের ইচ্ছা দেখে মনেতে ভাবিয়া।
উড়িষ্যা হইতে পুঁথি আনি মাঙ্গাইয়া॥
উড়িষ্যায় লিখেছিল দ্বিজ নিত্যানন্দ।
নানাবিধ কবিতায় করিয়া সুছন্দ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যয় করি অর্থ।
বাঙ্গালা ভাষায় দিলাম করিবারে অর্ঘ।
শিবনারায়ণ সিংহ উড়িষ্যায় নিপুণ।
গীতছন্দে এই পুঁথি করিল রচন।"

অবশ্য ইহাতে যে দ্বিজ নিত্যানন্দের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তিনি উড়িয়া নহেন, বাঙ্গালী কবি; বাঙ্গলা ভাষাতেই তাঁহার শীতলা মঙ্গল পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে পরে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এই নিত্যানন্দই এই শ্রেণীর কাব্যের আদি কবি বলিয়া একটা লোক-প্রবাদ প্রচলিত ছিল, উদ্ধৃত কাহিনী তাহা অবলম্বন করিয়াই রচিত।

নিত্যানন্দ

'গোকুল পালা'য় এই নিত্যানন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন,

"সৌতিসম সর্ব্বশাস্ত্র, শ্রীযুত ভবানী মিশ্র, তস্য সুত মিশ্র মনোহর।
তারপুত্র চিরঞ্জীব, কিগুণে তুলনা দিব, যার সখা প্রভু দামোদর॥
মহামিশ্র তস্যাত্মজ, শ্রীরাধাচরণাম্বুজ, চৈতন্য তাহার নন্দন।
তাহার মধ্যম ভ্রাত, নিত্যানন্দ নামযুত, গাহে ভেবে শীতলা চরণ॥"

অন্যত্র তিনি তাঁহার বাসস্থানের নামও উল্লেখ করিয়াছেন, "কাঁটাদের ডিণ্ডিসাঞি গোত্র ভরদ্বাজ।" তিনি নিজেকে চক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, "বিরচিল চক্রবর্ত্তী কবি নিত্যানন্দ।" ডিণ্ডিসাহীগ্রামী কাঁটাদিয়াবাসী কবির পূর্ব্বপুরুষ বল্লালের আমল হইতে কৌলীন্যহীন হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁহারা সিদ্ধ শ্রোত্রিয় নামে পরিচিত হন। কাঁটাদিয়া গ্রামে বল্লালী কুলীন বংশ অদ্যাপি কাঁটাদিয়া বাড়ুয্যা বলিয়া পরিচিত। কবি-বংশের সহিত তাহাদের কোন সংশ্রব নাই।

নিত্যানন্দ মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী কাশীযোড়ার রাজা রাজনারায়ণের সভাসদ্ ছিলেন; তিনি তাঁহার কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"কাশীজোড়া সৃষ্টিপাড়া অতি বিচক্ষণ.
রামতুল্য রাজা তথা রাজনারায়ণ॥
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার সভাসদ্।
শীতলা মঙ্গল রচে পান সুধামত॥"

এই রাজা রাজনারায়ণের সময় জানা যায় না। নিত্যানন্দের ভাষা সুমার্জ্জিত এবং একটু আধুনিকতার পরিচায়ক। ভাষা দেখিয়া

কবিত্ব

তাঁহাকে অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার লোক বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। সম্ভবতঃ তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেই বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার রচনা সরল, কোথাও পাণ্ডিত্যে ভারাক্রান্ত নহে। একটু নিদর্শন দেখাইতেছি।

কিভাবে পৃথিবীতে নিজের পূজা প্রচার হইতে পারে, দেবী জ্বরাসুরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে জ্বরাসুর বলিল,

"নাশিতে ক্ষিতির ভার দৈত্যের নিধনে।
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ নন্দের ভবনে॥
বাল্যবেশে ব্রজপুরে বিহরে গোপাল।
শ্রীদামের অংশ কলা দ্বাদশ রাখাল॥
ষোড়শ সহস্র গোপী স্বয়ং আদ্যা রাধা।
কলাবতী কেবল কৃষ্ণ অঙ্গ আধা॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি ত্যজি স্বর্গশালা।
ত্রিসন্ধ্যা গোকুলে আসি দেখে কৃষ্ণলীলা॥
ত্রিসর্গপ্রিয়া গঙ্গা কাশী বারাণস।
এসব এখন নয় গোকুল সদৃশ॥
এমন গোকুলে মাতা পূজা নেয় যদি।
ত্রিভুবনে যশ হয় জব্দ হয় ক্ষিতি॥"

গোকুলে শীতলা পূজা প্রতিষ্ঠিত হইলে সমস্ত পৃথিবী জব্দ হইবে এবং ত্রিভুবনবাসী তাঁহাকে পূজা করিতে বাধ্য হইবে। যাই হউক, উদ্ধৃত অংশের ভাষা হইতে কবিকে কিছুতেই প্রাচীন বলিয়া মনে হইতে পারে না।

দৈবকী নন্দন

দৈবকীনন্দনের শীতলামঙ্গলের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় অনুমান করিয়াছেন,[১] ইহা ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে রচিত। সম্ভবতঃ কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বর্ত্তমান ছিলেন। কাব্য-মধ্যে তাঁহার রচনা-কাল সম্বন্ধে তিনি কিছুই উল্লেখ করিয়া যান নাই। একমাত্র

১ 'দৈবকী নন্দনের শীতলা-মঙ্গল' সা-প-পঃ ১৩০৫ সাল, পৃষ্ঠা ৩২

ভাষার বিচার হইতে তাঁহার কাল-সম্বন্ধে অনুমান করা যায় মাত্র। তিনি এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,

"পিতামহ পুরুষোত্তম, জগতে ঈশ্বর নাম,
শ্রীচৈতন্য তাহার কুমারে।
তস্য সুত শ্রীশ্যাম, সকল গুণের ধাম,
কতকাল হস্তিনা নগরে॥
তস্য সুত শ্রীগোপাল, মান্দারণে কতকাল
নিবাস করিল বৈদ্যপুরে।
শ্রীবল্লভ তাহার সুত, গোবিন্দ পদেতে রত
হরি বল পাপ গেল দূরে॥"

এই শ্রীবল্লভ ও শ্রীকবি-বল্লভ কবির উপাধি, তিনি কাব্য মধ্যে বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন, "শ্রীকবি-বল্লভ গায় মধুর সঙ্গীত" "শ্রীকবি-বল্লভ রস গায়।" ইত্যাদি। কবি কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত লোক ছিলেন তাহা জানা যায় না, তবে তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না তাহা তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি লিখিয়াছেন,

"শ্রীকবি বল্লভে গায় সেবিয়া ঈশ্বর।
পাষণ্ড বৈষ্ণবার মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর॥"

কবি সম্ভবতঃ বসন্ত-চিকিৎসক গ্রহবিপ্র ছিলেন। কারণ, তিনি তাঁহার কাব্যে চৌষট্টি প্রকার বসন্ত রোগের যে প্রকার জলন্ত বর্ণনা দিয়াছেন তাহা তাঁহার এই রোগ-সম্পর্কে সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকিলে কিছুতেই সম্ভব হইত না। 'কাঁটাল্যা', 'মসূরিয়া', 'শিখর্যা', 'উনানিঞা', 'বেউচিয়া', 'চামদল', 'মগর্যা', 'গজগুঁড়া', 'আলকুশ্যা', 'আমবোয়া' ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বসন্ত রোগ ও তাহার চিকিৎসার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে তাঁহাকে বসন্ত চিকিৎসক শীতলা পণ্ডিত গ্রহবিপ্র বলিয়াই মনে হয়।

নিত্যানন্দের ভাষার মত দৈবকীর ভাষা এত মার্জ্জিত নহে, ইহা অনেকাংশে গ্রাম্যতা-দোষ-দুষ্ট। অবশ্য ইহা হইতেই দৈবকীনন্দনকে প্রাচীনতর কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। কারণ, নিত্যানন্দ উচ্চবর্ণের শিক্ষিত কবি ছিলেন, তাঁহার ভাষা সেজন্য স্বভাবতঃই মার্জ্জিত ছিল, কিন্তু দৈবকী-নন্দন তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কার-অনুযায়ী যে ভাষায় তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা মার্জ্জিত রুচি ও ভাষার পরিচায়ক হইতে পারে নাই। অবশ্য দৈবকীনন্দন নিত্যানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিও হইতে পারেন, কিন্তু এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিবার বিশেষ কিছু অবলম্বনও নাই। তবে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, নিত্যানন্দ সর্ব্বপ্রথম ওড়িয়া ভাষায় তাঁহার শীতলামঙ্গল কাব্য রচনা করেন, তাহাই এই বিষয়ের আদি রচনা। সেইজন্য নিত্যানন্দকেই প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়।

কবিত্ব

দৈবকীনন্দনের মধ্যে কবিত্ব ছিল। তাঁহার নিম্নলিখিত পদগুলি প্রায় প্রবচনের মত শোনায়,

"সুখের হাটে দাগা বিধি দিলা এত দিনে।"
"কেবা কার পুত্র বধূ কেবা কার পিতা।
মরিলে সম্বন্ধ নাই শুন এই কথা॥" ইত্যাদি।

ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "কৃষ্ণনাথ, রামপ্রসাদ (?) শঙ্করাচার্য্য ও রঘুনাথ দত্ত" নামক আরও কয়েকজন শীতলা-মঙ্গল রচয়িতার নাম করিয়াছেন, [১] কিন্তু তাহাদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, তিনিও তাহাদের কোন পরিচয় দিতে পারেন নাই।

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃ ১০৯

রায়মঙ্গল

আদিম মানব-সমাজের সহিত পশু-জগতের যে সম্পর্ক ছিল বর্ত্তমান সমাজের সেই সম্পর্ক নাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ ও পশু নিত্য প্রতিবেশী ছিল এবং পরস্পর আত্মরক্ষার জন্য সমভাবে সচেষ্ট থাকিত। জাগতিক পরিবর্ত্তনের নিয়মে মানুষ আত্মরক্ষায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, অথচ অরণ্য-বেষ্টিত বাসভূমির মধ্যে অবস্থান করিয়া পশু জগতের সান্নিধ্য হইতেও অধিক দূরে সরিয়া আসিতে পারিতেছে না, তখনই নানা দৈব উপায়ে মানুষ এই হিংস্র পশুকুলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় সন্ধান করিয়াছে। তাহারই ফলে বিশেষ বিশেষ পশুর অধিষ্ঠাতা এক একজন দেবতা কল্পনা করিয়া তাহার পূজা দ্বারা অত্যাচারী পশুদিগকে প্রসন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। এইভাবেই মানব-সমাজে পশু পূজার উৎপত্তি হইয়াছে। ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণরায়ের পূজাও এই পশু-পূজারই অন্তর্গত।

আদিম সমাজে ব্যাঘ্র-দেবতা

ভারতীয় প্রাক্-আর্য্যসমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্যাঘ্রের পূজা প্রচলিত ছিল। মহেঞ্জো-দড়োতে যে প্রাচীন শিবলিঙ্গ পাওয়া যায় তাহার পার্শ্বেই ব্যাঘ্রের আকৃতি কতকগুলি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ভারতের প্রাচীন অনার্য্য সমাজের দেবতা শিব বাঘাম্বর বা কৃত্তিবাস এবং ব্যাঘ্রচর্ম্মই তাঁহার আসন। সম্ভবতঃ ব্যাঘ্রই প্রাচীনতম শিবের বাহন ছিল, তারপর সমাজে গো-পূজা আরম্ভ হইলে পর তাঁহাকে বৃষভবাহন করিয়া তাহার পরিধেয় বসন ও আসনে ব্যাঘ্র চর্ম্মটি রক্ষা করা হইয়াছে। শিব দেবতার সহিত এই একটি বিশেষ পশুর সংশ্রব হইতে ইহাই মনে হয়, প্রাচীনতম সমাজের ব্যাঘ্রোপাসনা শৈব ধর্ম্মের মধ্যে পরবর্ত্তী কালে আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে। উত্তর ভারতে আর্য্য-সমাজের বহির্ভূত অংশে এই ব্যাঘ্র পূজা যে বিশেষ প্রচলিত ছিল তাহার

প্রাচীন ভারতে ব্যাঘ্র পূজা

আর একটি প্রমাণ এই যে, রাজপুতানায় "বাঘেল রাজপুত" বলিয়া একটি সম্প্রদায় আছে।[১] সম্ভবতঃ তাহারা প্রাচীনতম কোন ব্যাঘ্রোপাসক সম্প্রদায়েরই বংশধর। মধ্য ভারতেও ব্যাঘ্রোপাসক এক সম্প্রদায় আছে।[২] তাহারা ব্যাঘ্রের পূজা করে এবং কখনও ব্যাঘ্র শিকার করে না। সাহেবরা যদি বাঘ ধরিবার জন্য কোন ফাঁদ তৈয়ার করে, তাহা হইলে তাহারা রাত্রিকালে সেই ফাঁদের নিকটে গিয়া অরণ্য মধ্যে বাঘের উদ্দেশ্যে বলিতে থাকে যে এই ফাঁদ তাহারা নির্ম্মাণ করে নাই, কিম্বা তাহাদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াও নির্ম্মিত হয় নাই, অতএব এইজন্য তাহাদিগের কোন অপরাধ নাই। রাজপুতানার ভীলেরা নিজেদেরে ব্যাঘ্র বংশজ বলিয়া মনে করে।[৩] নেপালেও 'বাঘ যাত্রা' বলিয়া এক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাও একপ্রকার ব্যাঘ্রেরই পূজা, ব্যাঘ্রের মুখোস্ পরিয়া তাহাতে পূজারীরা নৃত্য করিয়া থাকে। নেপালে বাঘের দেবতার নাম 'বাঘ ভৈরব'। যুক্ত প্রদেশের মির্জ্জাপুর অঞ্চলে বাঘেশ্বর নামে এক ব্যাঘ্র-দেবতা নিম্নশ্রেণীর সমাজ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। ছোট নাগপুরের সাঁওতাল-দিগের মধ্যেও ব্যাঘ্রের পূজা প্রচলিত আছে। বিহারের কিষাণেরাও কোন কোন স্থানে 'বনরাজা' বলিয়া এক ব্যাঘ্র দেবতার পূজা করিয়া থাকে। মধ্যপ্রদেশে হোসাঙ্গাবাদের কুর্কু জাতি 'বাঘ দেও' বলিয়া এক বাঘের দেবতার পূজা করে, বেরারেও এই বাঘদেওর পূজা প্রচলিত আছে। হোসাঙ্গাবাদের ব্যাঘ্রের পূজারীদিগকে ভোম্‌কা বলে, তাহারা নিম্নশ্রেণীর

উত্তর ভারতে ব্যাঘ্র পূজা

---

১ The Popular Religion and Folklore of Northern India, (W. Crooke) Vol. II Pg. 211

২ ঐ

৩ Annals of Rajasthan (Tod) Pg. 660.

লোক, গ্রামে বাঘ আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিলে এই ভোম্‌কারা গিয়া বাঘদেওর নিকট পূজা দেয়। [১]

দাক্ষিণাত্যেও প্রায় অনুরূপ ব্যাঘ্র পূজার প্রচলন আছে। ত্রিচিনপল্লী জিলায় এক গ্রামে ব্যাঘ্র মূর্ত্তির উপর আসীন তিনটি পুরুষ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। [২] তাঁহারা প্রাচীন কোন ব্যাঘ্র দেবতা হইবেন। দাক্ষিণাত্যে বিশেষতঃ কর্ণাট অঞ্চলে এই প্রকার আরও ব্যাঘ্র দেবতার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়।

দাক্ষিণাত্যে ব্যাঘ্র পূজা

উপরের উল্লেখ হইতেই জানা যায় যে, অরণ্যচারী জাতির মধ্যেই ব্যাঘ্র পূজা সবিশেষ প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই পশু পূজার প্রবৃত্তি মূলতঃ নিম্নশ্রেণীর সমাজ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে এবং ইহা উন্নত আর্য্য দেব-পরিকল্পনার বিরোধী। বঙ্গদেশও বহুকালাবধিই অরণ্যাকীর্ণ; বিশেষতঃ বঙ্গদেশের গৌরব সুন্দরবনের প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্র এই দেশের অতি আদিম অধিবাসী। সেইজন্য ব্যাঘ্র-পূজা বঙ্গদেশেও বহুকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। [৩] মধ্য-ভারতে সাধারণতঃ কোন কোন স্থানে যে প্রণালীতে ব্যাঘ্র পূজা অনুষ্ঠিত হয় তাহার সঙ্গে বাংলায় অনুষ্ঠিত প্রাচীন ব্যাঘ্র পূজার বিশেষ কোন সঙ্গতি নাই। ইহা হইতেই মনে হয়, এই পূজার বিশিষ্ট কোন পদ্ধতি বাংলার বাহির হইতে এই দেশে আনীত হয় নাই। নাগরিক জীবনের

বাংলায় ব্যাঘ্র পূজা

১ The Popular Religion and Folklore of Northern India (W. Crooke) Vol. II. Pg. 213.

২ The Village gods of South India. (H. Whitehead) Pg. 98.

৩ "On some curious cults of Southern and Western Bengal." (S. C. Mitra) The Journal of the Anthropological Society of Bombay, Vol. XI Pg. 438—454

প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্র-ভীতি এই দেশের সমাজে আর নাই বলিলেই চলে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের বসতি ঘনসন্নিবিষ্ট ; সুন্দর বনের অরণ্য ব্যতীত অরণ্যও এইদেশে নাই, সুন্দরবনও অনেকদিন হইতেই লোকালয়ে পূর্ণ হইতেছে, সেইজন্য ব্যাঘ্র পূজা এই দেশে বিশেষ প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। নাগরিক জীবনের প্রসারের পূর্ব্বে সাময়িক ও স্থানীয় এই বিশিষ্ট পশু-পূজা সমাজে সম্ভবতঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন ইহার অনুষ্ঠানের কথা বিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না।

বঙ্গদেশের ব্যাঘ্রের অধিকারী দেবতা বলিয়া একটি দেবতাকে কল্পনা করা হইয়া থাকে, তাঁহার নাম দক্ষিণ রায়। বাংলার দক্ষিণদিকের অধিকারী দেবতা বলিয়া তাঁহার নাম দক্ষিণ রাজ বা দক্ষিণ রায়। বাংলার দক্ষিণেই প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রের বাসভূমি সুন্দরবন অবস্থিত, সেইজন্যই তাহার দেবতাকেও দক্ষিণদিকের অধিকারী বলিয়াই কল্পনা করা হইয়া থাকে। কেহ অনুমান করেন, দক্ষিণ রায় সুন্দর বনের একজন প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন, তিনি বহু ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর ধনুর্ব্বাণে শীকার করেন, ক্রমে এই চরিত্রটিই দেবত্বে পরিণত হয়। এই দক্ষিণ রায় নাকি যশোহর জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি ছিলেন, তিনি নিম্নবঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপাধি ছিল ভাটীশ্বর [১] বা আঠার ভাটি বা বিভাগের অধীশ্বর। অবশ্য এই সমস্ত কাহিনীর মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই। এই দক্ষিণ রায়কে লইয়া যে দুই একটি মঙ্গলকাব্য রচিত হয় তাহাই রায়মঙ্গল নামে পরিচিত। দক্ষিণ রায় বাংলার নিজস্ব লৌকিক দেবতা, সংস্কৃত পুরাণাদিতে তাঁহার কোন উল্লেখ নাই। বাংলার

দক্ষিণ রায়

১ "On a Musalmani Legend" (S. C. Mitra) Journal of the Department of letters Vol. X. Pg. 167

নিজস্ব লৌকিক দেবতাদিগের মধ্যে তিনিই একমাত্র পুরুষ। অবশ্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বাঘের দেবতা সর্ব্বত্রই পুরুষ। তাঁহার পরিকল্পনা উন্নত সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি দিব্য কান্তি-বিশিষ্ট, হস্তে ধনুঃশর ও ব্যাঘ্রাসীন।[১] দেবতার এই সুন্দর পরিকল্পনা আদিম প্রস্তরোপাসক সমাজের দেব-কল্পনা হইতে অনেক মার্জ্জিত, সেইজন্য মনে হয়, ইহার উদ্ভব অনেক পরবর্ত্তী এবং পৌরাণিক প্রভাব-মুক্ত।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে ব্যাঘ্র-কল্প চরিত্র কামদলের সহিত নায়ক লাউসেনের এক যুদ্ধের কাহিনী বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত ব্যাঘ্রের জন্ম বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার জীবনের সমস্ত কাহিনী মানুষের চরিত্রের মত করিয়া বর্ণিত আছে। কিন্তু তাহাতে ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণ রায়ের কোন নামোল্লেখ নাই, অতএব এই কাহিনীটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্থানান্তরেই ইহার উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছিল। রায়মঙ্গলের কাহিনীতে মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাব বশতঃ ক্রমে ইহার চরিত্রের মধ্যে কয়েকজন স্থানীয় শ্রেষ্ঠ মুসলমান পীর ও সাধু পুরুষের নাম আসিয়া সন্নিবিষ্ট হয়। সম্ভবতঃ তাহারা ব্যাঘ্র শীকারে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া ক্রমে সমাজে পীরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহারই ফলে এই কাহিনী লইয়া মুসলমান সমাজেও কোন কোন মুসলমান কবি কর্ত্তৃক কাব্য রচিত হয়।

প্রাচীন সাহিত্যে ব্যাঘ্রের কাহিনী

ব্যাঘ্রের উপদ্রব হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সমান ভয়াবহ, সেইজন্য উভয় সম্প্রদায় একই উপায়ে এই উপদ্রবের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় সন্ধান করিয়াছে। নিম্নবঙ্গের বিশেষতঃ

মুসলমান সমাজে বনবিবি

১ Journal of the Anthropological Society of Bombay. Vol. III. Pg 105 এ দক্ষিণরায়ের একটি সুন্দর চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

চব্বিশ পরগণা জিলার মুসলমান সমাজে প্রায় রায়মঙ্গলের অনুরূপ এক কাহিনী প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ উভয়ের মূল এক। মুন্সী বয়নদ্দীন সাহেব রচিত বনবিবি জহুরা নামা [১] নামক একখানি কাব্যে হিন্দু সমাজের কল্পিত দক্ষিণ রায় ও মুসলমান সমাজের কল্পিত বনবিবির একটি মিশ্র কাহিনী পাওয়া যায়। ইহাই প্রাচীন রায়মঙ্গলের কাহিনীর আধুনিক সংস্করণ। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই,

দক্ষিণরায়ের গল্প

কলিঙ্গ নগরে এক সদাগর বাস করিত। একবার সে সুন্দরবনে মধু ও মোম সংগ্রহ করিবার জন্য নৌকা লইয়া যাত্রা করিল, সঙ্গে করিয়া তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে লইয়া গেল। তাহার নাম দুখে। দুখে তাহার দরিদ্রা বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান। একমাত্র পুত্রকে গভীর অরণ্যে পাঠাইয়া দুখের মাতা কাঁদিয়া বনবিবিকে ডাকিল,—

"কাঙ্গালের মাতা তুমি বিপদ নাশিনী।
আমার দুখেরে মাগো তরাবে আপনি॥"

দলবল সহ সদাগর গিয়া গভীর বনে প্রবেশ করিল। দক্ষিণরায়ের পূজা করিয়া সদাগর নৌকা হইতে অবতরণ করিল, দুখে নৌকার মধ্যেই রহিল, সদাগর ও তাহার লোকজন মধু আহরণের জন্য বনের অভ্যন্তরে চলিয়া গেল। সমস্ত দিন অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিয়া এক বিন্দুও মধু পাইল না, দক্ষিণরায় ছলনা করিয়া বনের সমস্ত মধু গোপন করিয়া ফেলিলেন।

অসীম নৈরাশ্যে সদাগর সন্ধ্যায় নৌকায় ফিরিয়া আসিল, অবসন্ন দেহে অল্পকাল মধ্যেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল, দক্ষিণরায় স্বপ্নে আবির্ভূত

১ পুঁথিখানি সর্ব্বপ্রথম ১২৮৪ সালে মুদ্রিত হইয়া ৩৩৭।২ আপার চিৎপুর রোড, আফাজদ্দীন আহ্মদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সদাগর নিজের দুরবস্থার কথা জানাইল,

"মোম মধু দিয়া মোর রাখহ বচন।
নতুবা তোমার আগে তেজিব জীবন॥"

দক্ষিণরায় বলিলেন, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে দুখেকে আমার নিকট বলি দিতে হইবে। সদাগর প্রথমতঃ ইহাতে অস্বীকৃত হইল কিন্তু পরে মনে মনে তাহাকে দক্ষিণরায়ের পায়ে বলি দিবে বলিয়া স্থির করিল। দক্ষিণরায় প্রসন্ন হইয়া তাহার নৌকা বোঝাই করিয়া মোম ও মধু দিয়া দিলেন। দেশে রওয়ানা হইবার সময় দুখেকে সকলে মিলিয়া ঠেলিয়া নৌকা হইতে জলে ফেলিয়া দিয়া গেল।

দুখে কোনমতে নদীর তীরে আসিল, অমনি দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রের রূপ ধরিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। দুখে চক্ষু মুদিয়া বনবিবিকে স্মরণ করিল, বনবিবি আসিয়া তাহাকে কোলে লইলেন. ব্যাঘ্ররূপী দক্ষিণরায় পলাইয়া গেলেন। বনদেবীর আদেশে তাহার ভ্রাতা জঙ্গলী দক্ষিণরায়কে বন হইতে তাড়াইয়া দিতে গেল। দক্ষিণরায় তাড়িত হইয়া জেন্দা গাজী (বা বড় গাজী খাঁ)র শরণাপন্ন হইল। জেন্দাগাজী তাঁহাকে অভয় দিলেন। বনবিবিও দক্ষিণরায়কে ক্ষমা করিলেন।

এই কাহিনীতে যেমন দক্ষিণরায়ের উপর বনবিবিরই মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, রায়মঙ্গলের পরিণামে দক্ষিণরায়েরই প্রতিষ্ঠা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আদিকবি মাধবাচার্য্য

রায়মঙ্গল কাব্যের একজন পরবর্ত্তী কবি কৃষ্ণরাম এই কাব্যের আদি কবি বলিয়া মাধবাচার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এই ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণরায় মাধবাচার্য্যের রচিত কাব্যে সন্তুষ্ট না হইয়া পরবর্ত্তী আর একজন কবিকে তাহা রচনায় স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন,—

"পূর্ব্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য্য॥
মশান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা।
চাসা ভুলাইয়া সেই গীত হৈল ভাষা॥"

এই মাধব আচার্য্য প্রসিদ্ধ চণ্ডীকাব্যের কবি মাধবাচার্য্য বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মাধবাচার্য্যের রায়মঙ্গলের পুঁথি পাওয়া যায় না। চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাঁহার একখানি গঙ্গামঙ্গলের পুঁথি প্রচলিত আছে, কিন্তু রায়মঙ্গল নামে তাঁহার কোন পুঁথির উল্লেখ আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। হয়ত ইহা তাঁহার অপরিণত বয়সের রচনা ছিল বলিয়া উদ্দিষ্ট দেবতা যেমন সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই তেমনই পাঠকের স্মৃতি হইতেও সহজেই তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

ইহার পরই কবি কৃষ্ণরাম তাঁহার রায়মঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

কৃষ্ণরামের গ্রন্থোৎপত্তি

মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক নিয়মানুসারে কবি কৃষ্ণরামও তাঁহার গ্রন্থোৎপত্তির একটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

'শুনহ সকল ধীর অপূর্ব্ব কথন।
যেমতে হইল এই কবিতা রচন॥
খানপুর পরগণা নামে মনোহর।
বড়িস্যা তাহার এক তপ বিশ্বাম্বর॥ (?)
তথায় গেলাম ভাদ্র মাস সোমবারে।
নিশিতে শুইলাম গোয়ালার গোল ঘরে॥
রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপীঠে আরোহণ এক মহাজন॥

করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায়॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠার ভাটীর মধ্যে হইবে প্রচার॥
মোর গীত না জানিয়া যতেক গায়ন।
অন্য গীত করাইয়া গায় জাগরণ॥
কাকুটি নাকুটি করে আর রঙ্গি ভঙ্গি।
পরম কৌতুকে শুনে মউল্যাম লঙ্গি॥"

দক্ষিণরায় কবিকে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত করিবার জন্য আর একটু বিশেষ ক্ষমতা তাঁহার হাতে দিয়া গেলেন, তাহা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় একটু অভিনব। তিনি বলিয়া দিলেন,

"তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে।
সংবশে তাহারে তবে সংহারিবা বাঘে॥"

যে তাঁহার কাব্যকে অনাদর করিবে তাহাকে বাঘ দিয়া ধরিয়া খাওয়াইবার ক্ষমতা তিনি কবির হাতে দিয়া দিলেন। তথাপি কবি নিজেকে 'শিশু' বলিয়া গীত-রচনার অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, দেবতা তখন নিজের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া কবিকে শুনাইলেন, ইহাতেই—

"রায়ের চরণ-চারু অরবিন্দ ভাবি।
রচিল পাঁচালী ছন্দ কৃষ্ণরাম কবি॥"

কবি তাঁহার কাব্য রচনার কাল-সম্বন্ধেও গ্রন্থমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।
বসু শূন্য ঋতুচয় শকের বৎসর॥"

ইহা হইতেই দেখা যায় যে, ১৬০৮ শক বা ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল কাব্য রচিত হয়। কবির আত্ম-পরিচয় সম্বন্ধে গ্রন্থ-মধ্যে উল্লেখ আছে,—

কৃষ্ণরামের পরিচয়

"নিমিত গ্রামেতে বাস, নাম ভগবতী দাস,
কায়েস্থ কুলেতে উৎপত্তি।
হইয়ে একচিত, রচিয়া রায়ের গীত
কৃষ্ণরাম তাঁহার সন্ততি।"

কবির বাসস্থান নিমিতা। অতএব এই কৃষ্ণরাম ও কালিকামঙ্গলের কবি কৃষ্ণরাম অভিন্ন ব্যক্তি। এই নিমিতা সম্বন্ধে স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় লিখিয়াছেন,—"কলিকাতা হইতে চারি ক্রোশের মধ্যে, বেলঘরিয়া ষ্টেশনের অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে, নিমিতায় কৃষ্ণরামের বাড়ী। তিনি যখন জীবিত ছিলেন, তখন কবি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। কারণ, এখনও নিমিতা গ্রামে দুই একজন লোক কবি কৃষ্ণরামের নাম করে, এবং তাঁহার ভিটা দেখাইয়া দেয়। সে ভিটায় একশত বৎসরেরও অধিক কাল কেহ বাস করেনা, অথচ প্রাচীন লোকেরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন—উহা কৃষ্ণরামের ভিটা। কৃষ্ণরামের বংশ নাই, কিন্তু তিনি নিজে নিঃসন্তান ছিলেন কিনা, কেহ বলিতে পারে না।" [১]

কৃষ্ণরাম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কালিকামঙ্গল রচনায়ও তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তিনি পণ্ডিত হইলেও তাঁহার রচনা সরল, তাঁহার কালিকামঙ্গলের আলোচনায়ও তাহা উল্লেখ করিয়াছি। রায়মঙ্গল কালিকামঙ্গলের পরবর্ত্তী রচনা, ইহার রচনায়ও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। রচনার একটু নিদর্শন উল্লেখ করা যাইতেছে, কাব্যের শেষে সদাগর কর্ত্তৃক দক্ষিণরায়ের এই স্তব বর্ণিত আছে,—

১ 'কবি কৃষ্ণরাম'—সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ সাল, পৃঃ ১১২—১১৩।

"স্তব করে সদাগর হইয়া কাতর।
ভকত বৎসল তুমি গুণের সাগর॥
অপরাধ ক্ষমা কর বলি যোড় পাণি।
কৃপার সাগর প্রভু রায় গুণমণি॥
ইন্দু হেন বদন মদন জিনি রূপ।
তোমা বিনে দক্ষিণের কেবা আছে ভূপ॥"

রায়মঙ্গল কাব্যখানি সুবৃহৎ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ইহার পুঁথি সংগৃহীত আছে,[১] কিন্তু আজিও তাহা মুদ্রিত হয় নাই।

কৃষ্ণরামের পর আর কেহ রায়মঙ্গল কাব্য লিখিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। রায়-মঙ্গলের দেবতাও একটি স্থানীয় (local) লৌকিক দেবতা মাত্র।[২] নিম্নবঙ্গেই ব্যাঘ্রের অত্যাচার অধিক বলিয়া সেইখানেই এই কাব্য ও দেবতার পরিকল্পনা উদ্ভূত হইয়াছিল, অন্যত্র ইহার প্রসার সম্ভব হয় নাই। প্রাচীন হিন্দু পুরাণ কিম্বা হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে ব্যাঘ্র-বাহন কোন দেবতার সন্ধান পাওয়া যায় না। অতএব একান্ত ভাবে এই কাব্য ও দেবতা বাংলার বিশেষ একটি অঞ্চলের কবির নিজস্ব কল্পনা-প্রসূত। নিম্নবঙ্গের মুসলমান সমাজকে আশ্রয় করিয়া বড় গাজিখাঁ, কালু গাজীখাঁ, বনবিবি প্রভৃতির সঙ্গে দক্ষিণরায় আজিও নামে মাত্র বাঁচিয়া আছেন। হিন্দু সমাজেও বড় গাজীখাঁ ও কালু গাজীখাঁর যেমন প্রতিপত্তি, তদ্দেশীয় মুসলমান সমাজে দক্ষিণরায়েরও তেমনই প্রতিপত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সমগ্র চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুরের দক্ষিণ ভাগে বড় গাজি, কালু গাজি ও দক্ষিণ রায় বাঘের

দক্ষিণরায় স্থানীয় দেবতা

---

[১] সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৬ সাল, প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, পুঁথি সংখ্যা ৩১৫।

[২] The cult of Dakshina Roy in Southern Bengal (S. C. Mitra) Hindusthan Review (Calcutta) Jan. 1923, pp. 167—171

দেবতা বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান সমাজে সমভাবে শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছেন। সেইজন্য এই দেবতার সম্পর্কিত সাহিত্যও এই উভয় সমাজেরই উপাদানে গঠিত হইয়াছে।

বাসুলী মঙ্গল

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ তৃতীয় অধ্যায়ে মঙ্গল চণ্ডীর দেবত্বের ইতিহাস আলোচনা-সম্পর্কে বাসুলী দেবীর নাম ও পরিচয়-সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উল্লেখ করিয়াছি। তাহাতে দেখাইয়াছি যে, বাসুলী একটি লৌকিক দেবী, পরবর্ত্তী কালে তিনি পুরাণের চণ্ডীর সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। চণ্ডীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে সমাজে যে বাসুলীর অত্যন্ত ব্যাপক প্রভাব বর্ত্তমান ছিল বাংলার প্রাচীন সাহিত্য হইতে তাহার যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দেবীর প্রকৃত পরিচয় কি? এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। কারণ, ধর্ম্মপূজা-বিধান হইতে তাঁহার যে ধ্যান উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা নিশ্চিতই পরবর্ত্তী কালের রচনা, বিশেষতঃ এই ধ্যানের অনুরূপ কোন বাসুলী মূর্ত্তি আজ পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই। চণ্ডীদাসের বাসুলী বলিয়া নান্নুরে যে দেবীর এখনও পূজা হইয়া থাকে তাহার সহিত ধর্ম্মপূজা বিধানোক্ত ধ্যানের কোন মিল নাই। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, বোধ হয় প্রকৃত মূর্ত্তি লুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার এই অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ বিশালাক্ষী ও বাসুলীকে অভিন্ন কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ধর্ম্মপূজা বিধানেও দেখা যায় বাসুলী ও বিশালাক্ষী স্বতন্ত্র দেবতা, তাঁহাদের ধ্যান ও আবাহন মন্ত্র স্বতন্ত্র এবং তাঁহারা ধর্ম্মপূজার স্বতন্ত্র দুইটি আবরণ দেবতা, অতএব তাঁহারা এক নহেন, কিম্বা এক দেবতা হইতে অপরের

বাসুলীর পরিচয়

উদ্ভবও হয় নাই। তাহা হইলে বাসুলীর উদ্ভব ও পরিচয় সম্বন্ধে একটু গোলযোগ দেখা যাইতেছে।

দাক্ষিণাত্যের মহীশূর ও কর্ণাট অঞ্চলে বিসলমরী বা বিসল মরীঅম্মা নামে এক অতি প্রতাপশালিনী গ্রাম্য-দেবতা আছেন।[১] মরী অথবা মরীঅম্মা বাংলা দেশের চণ্ডী কথাটির মত দাক্ষিণাত্যের বহু গ্রাম্য স্ত্রীদেবতার নামের পরেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব, উক্ত গ্রাম্য দেবতাটির প্রকৃত নাম বিসল, বাংলায় স্ত্রী-দেবতা বুঝাইতে হইয়াছে বিসলী, অতঃপর বিসুলী, বাসুলী। ধ্বনিতত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মেই এই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে তাহা বিসল মরী বলিয়া উক্ত হয়। উড়িষ্যাতেও এই দেবী বাসুলী বলিয়াই পরিচিত। ইনিও প্রকৃত পক্ষে একটি প্রস্তর খণ্ড মাত্র, তবে তাঁহার অনেকটা নির্দ্দিষ্ট গঠন পাওয়া যায়। প্রস্তরটি ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া ঊর্দ্ধের দিকে উঠিয়াছে।[২] দাক্ষিণাত্যের এই বিসল মরীই যে বাংলার বাসুলী এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই লৌকিক দেবতার পূজাও আদিম সমাজের প্রস্তরোপাসনার প্রবৃত্তি হইতেই জাত। পৌরাণিক আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে এই দেশেও প্রস্তর খণ্ড রূপেই এই দেবতার পূজা হইত। দাক্ষিণাত্যের নিম্ন শ্রেণীর সমাজ ও উচ্চতর বর্ণের হিন্দু সমাজের সুদূর পার্থক্য হেতু নিম্ন শ্রেণীর সমাজে এই দেবতাটির অক্ষত স্বরূপটি আজিও রক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু বাংলার সকল স্তরের সমাজেই পৌরাণিক চণ্ডীর প্রভাবের ফলে চণ্ডীর পরিকল্পনায় এই লৌকিক দেবতাটি একেবারে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মপূজা

বিসল মরী
বাসুলী

১ The Village gods of South India, pp' 29. 80. 81. 83.

২ The Village gods of South India, (H. Whitehead) Plate XV. XVI, Pg. 82, 83,

বিধানের বাসুলীর ধ্যানের সঙ্গে যে চণ্ডীদাসের নান্নুরের বাসুলীর মিল নাই, ইহার অর্থই এই যে, ধর্ম্মপূজা বিধানের ধ্যান যেমন এই দেবীর মূল প্রকৃতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া রচিত হয় নাই, তেমনই নান্নুরে পূজিত চণ্ডীদাসের তথাকথিত বাসুলী মূর্ত্তিও পরবর্ত্তী কালে চণ্ডীদাসের প্রকৃত বাসুলীর স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন মাত্র। বাংলার লৌকিক দেবী বাসুলী ও দাক্ষিণাত্যের লৌকিক দেবী বিসল মরীর অভিন্নতা হইতেও বাংলায় দ্রাবিড় সংস্কারের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। উড়িষ্যায় বাসুলীর অস্তিত্ব তদ্দেশেও দ্রাবিড় সংস্কারেরই নিদর্শন।

বাসুলী-মঙ্গল নামে দুই এক খানি মঙ্গল কাব্য পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ ইঙ্গিত দিয়াছেন।[১] কিন্তু তাহাদের বিস্তৃত পরিচয় কেহ কোথাও প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। মনে হয়, চণ্ডীর সহিত যখন বাসুলী আসিয়া অভিন্না হইয়া গেলেন তখন কোন কোন চণ্ডীমঙ্গলই বাসুলী-মঙ্গল নামে অভিহিত হইয়াছে, ইহা ছাড়া স্বতন্ত্র কোন উপাখ্যান লইয়া বাসুলী-মঙ্গল নামে স্বতন্ত্র কোন কাব্য রচিত হয় নাই।

তীর্থমঙ্গল

আর একখানি একটু অভিনব প্রকৃতির মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া এই পুস্তকের উপসংহার করিব। ইহা পৌরাণিক বৈষ্ণব কিম্বা লৌকিক কোন মঙ্গল কাব্যেরই অন্তর্গত নহে। ইহার বিষয়-বস্তু স্বতন্ত্র ও অভিনব। কাব্যখানির নাম তীর্থমঙ্গল। ক্রমে 'মঙ্গল' শব্দটি এত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল যে, যে কোন বিষয়ক মাহাত্ম্যপূর্ণ কাব্য হইলেই তাহা মঙ্গল কাব্য নামে অভিহিত হইত। তীর্থ মঙ্গলও এই জাতীয় মঙ্গল

স্বতন্ত্র বিষয়ক মঙ্গল কাব্য

১ শিবায়ন (ভূমিকা) বঙ্গবাসী সংস্করণ।

কাব্য। ইহা প্রকৃত পক্ষে একখানি তীর্থভ্রমণ কাহিনী এবং এই প্রসঙ্গেই ইহাতে তীর্থের মাহাত্ম্যাদিও বর্ণনা করা হইয়াছে। এই জন্যই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে তীর্থমঙ্গল।

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যেও যে ভ্রমণ কাহিনী কাব্যাকারে লিখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা চৈতন্য চরিতকারদিগের চৈতন্যের বিস্তৃত ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা হইতেই জানা যায়। অবশ্য তীর্থ যাত্রা ব্যতীত পূর্ব্বে কেহ দেশান্তর ভ্রমণে বাহির হইত না। সেই জন্য এই ভ্রমণ ব্যাপদেশে দেশ দেশান্তরের রীতি নীতির যে রকম বর্ণনা করা হইয়াছে তেমনই তীর্থের দেবতাদিগেরও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশ্য দেব-মাহাত্ম্যই ছিল তাহার মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয়।

ভ্রমণ কাব্য

এই তীর্থমঙ্গল রচয়িতার নাম বিজয়রাম সেন। তাঁহার নিবাস ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত ভাজন ঘাট। তিনি জাতিতে বৈদ্য ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল বিশারদ। পলাশীর যুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক কালে চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত খিদিরপুরে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল নামে এক অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। কাশী যাত্রার মানসে তিনি বহু লোকজন সহ নৌকা সাজাইয়া গঙ্গাপথে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে পুঁটিমারীতে তাঁহার নৌকা আসিয়া লাগিল। এখান হইতে দুইজন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচন্দ্রের সহযাত্রী হইলেন। কবি বিজয়রাম সেনও আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহানুগমনের প্রার্থনা জানাইলেন। সঙ্গে একজন চিকিৎসক লওয়া ভাল বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ইহাতে আর আপত্তি করিলেন না। কবি সেখান হইতেই তাঁহার সঙ্গী হইলেন। অতঃপর নবদ্বীপ, হাঁড়রা, ঝিনুকঘাটা, টুঙ্গিবালী, জলঙ্গী, রাজমহল, মুঙ্গের, গয়া, রামনগর, কাশী, প্রয়াগ, বিন্ধ্যগিরি হইয়া পুনরায় কাশীর পথে মুঙ্গের মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ

রচয়িতা

হইয়া ১১৭৭ সন ভাদ্র মাসে তাঁহারা সকলে খিদিরপুর প্রত্যাবর্ত্তন করেন,

"সাতাত্তরি সনেতে আর ভাদ্রপদ মাসে।
বিশারদে কহে পুঁথি কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে॥"
শিবনিবাস সন্নিধানে ভাজন ঘাট ধাম।
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে কহে সেন বিজয়রাম॥
শুন শুন মহাশয় বলিগো তোমারে।
মহাশয়ে আজ্ঞা দিলাম বিদায় কর মোরে॥"

তীর্থযাত্রীদিগের মধ্যে একবার মারাত্মক বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হয়, বিজয়রামের চিকিৎসায় অনেকেই আরোগ্য লাভ করে, এই কারণে বাটি ফিরিয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন।

অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বিজয়রাম প্রত্যেকটি স্থানের বর্ণনা দিয়াছেন। বিন্ধ্যগিরি দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে তাঁহারা মির্জ্জাপুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মির্জ্জাপুরের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন,

"গঙ্গার তীরেতে গ্রাম বড়ই সহর।
জাহা চাহে তাহা মিলে সামগ্রী বিস্তর।
স্নান পূজা ভোজন করিয়া মহাশয়।
আনন্দে সামগ্রী লয়েন জাহা মনে লয়॥
দুলিচা গালিচা আদি শতরঞ্চি শীল।
নানাবর্ণে ছিট লয়েন হয়্যা হৃষ্ট দিল্॥
অল্প কর্য়া দিব্য কৈল জার কিছু নাই।
শীল জাঁতা লয়্যা কৈল নৌকার বোঝাই।"

কবি তাঁহার পুস্তককে তীর্থমঙ্গল বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন,—

"তীর্থ মঙ্গল গানে, মনোযোগে যেই শুনে
তাঁহাকে সদয় হন শিব।"

কবির রচনা লালিত্যহীন, কিন্তু তাঁহার বর্ণনাগুলি সর্ব্বত্র স্পষ্ট ও যথাযথ। পুস্তকখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

উপসংহার

সাম্প্রদায়িক বিশিষ্ট বিষয়-বস্তু লইয়া মধ্যযুগে যে সমস্ত উচ্চাঙ্গের কাব্য বা মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল গ্রন্থভাগে তাহাই বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করা গেল। কিন্তু এতদ্ব্যতীতও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচালীর আকারে সেই যুগে অসংখ্য দেবতার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পদ্য রচনা আবির্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অধিকাংশই মঙ্গলকাব্যের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। দেবতার লোকপ্রীতির উপরেই যে সকল সময় কাব্যেব প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিত তাহা নহে। দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মঠাকুরের মত একটি স্থানীয় দেবতা লইয়া এত উচ্চাঙ্গের কাব্য রচিত হইল, অথচ ষষ্ঠীদেবীর মত একটি ব্যাপক প্রচারিত দেবতার মাহাত্ম্যও সামান্য কয়েকটি পাঁচালী রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে, পুরাণে ষষ্ঠীদেবীর যথেষ্ঠ গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে, পুরাণে যে সমস্ত দেবতার স্থান হয় নাই, মঙ্গলকাব্য তাঁহাদেরই জন্য লিখিত হইত। ইহা হইতেই দেখা যায় যে, দেবতাই মঙ্গল কাব্যগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, কোন কোন দেবতাকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া এই সমস্ত কাব্যে বাংলার বিশিষ্ট লোক-চরিত্রের মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইয়াছে। অনেক সময় লোক-চরিত্রের মহিমা বর্ণনা হইতেই কাব্যগুলির সূচনা হইয়াছিল পরবর্ত্তী কালে হয়ত দেবতার নাম আসিয়া তাহাতে যুক্ত হইয়াছে, সেইজন্য একাধারে বাস্তব জাতীয় কাব্য রসের পিপাসা ইহাতে যেমন চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে, তেমনই ইহা হইতে জাতির আদর্শ পূজা ও কিয়ৎ পরিমাণে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই

জাতীয় কাব্যের পর্য্যায়ে যাহা উন্নীত হইতে পারে নাই তাহা সর্ব্বতোভাবে সাম্প্রদায়িকতার পঙ্কিলাবর্ত্তে আবদ্ধগতি হইয়া পর্য্যুষিত হইয়া রহিয়াছে। পাঁচালীগুলি বিশেষ করিয়াই এই শ্রেণীর বস্তু। মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে এই জাতীয় অসংখ্য পাঁচালী রচিত হইয়াছিল, যে কোন পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতাকে লইয়াই এই জাতীয় পাঁচালী রচনা করা হইত। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেও একবার আলোচনা করিয়াছি। প্রচলিত অসংখ্য পাঁচালীর মধ্যে মাত্র কয়েকটির নামোল্লেখ করিতেছি, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী, সূর্য্যের পাঁচালী, মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী, ষষ্ঠীর পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী, ত্রিনাথের পাঁচালী, সুবচনীর পাঁচালী, মনসার পাঁচালী, জন্মষষ্ঠীর পাঁচালী ইত্যাদি।

পাঁচালী

এই পাঁচালীরই প্রাচীনতম রূপ ব্রতকথা। বিভিন্ন লৌকিক দেবতার কাহিনী লইয়া ইহা গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত করিয়া চম্পূকাব্যের মত রচিত হইত, অতঃপর তাহা মৌখিক প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। স্ত্রী সমাজই ইহার রচয়িতা এবং প্রতিপালক, প্রাচীনতম রূপকথাগুলিই সাম্প্রদায়িক প্রেরণায় ব্রতকথার রূপ ধারণ করিয়াছে। মেয়েলি ব্রতকথা বলিয়া অনেক স্থল হইতে তাহা সংকলিত হইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পাঁচালীতে উক্ত দেবতাদিগের নূতন এক রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষের হাতে পড়িয়া এই শ্রেণীর অনেক ব্রতকথা পাঁচালীর রূপ ধারণ করিয়াছে। অবশ্য তৎসত্ত্বেও স্ত্রী-সমাজে ব্রত কথার লোকপ্রীতি কোন অংশেই হ্রাস পায় নাই, আজিও কোন কোন লৌকিক দেবদেবীর ব্রতপূজায় স্ত্রীলোকের মুখ হইতে এই সমস্ত ব্রতকথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সহিতও মঙ্গলকাব্যের এই বহু সুদূর সম্পর্ক বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ব্রতকথা

পরিশিষ্ট

(ক)

দ্বিতীয় ভাগ

তৃতীয় অধ্যায়

বলরাম কবিকঙ্কণ

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর আলোচনা প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলরাম নামক অপর এক কবির কথা উল্লেখ মাত্র করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার কাব্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রামাণ্য তথ্য জানা যায় না বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক আলোচনা করিতে পারি নাই। বলরামের কোন পুঁথি কিম্বা অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন পদও পাওয়া যায় না, কিম্বা তাঁহার কোন পরিচয়ও নাই। কিন্তু 'বিশ্বকোষ' ও 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'[১] এই বলরাম কবিকঙ্কণকে মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি ও তাঁহার সঙ্গীতগুরু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইতেই চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী'তে এই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন। মুকুন্দরামের কাব্যের বন্দনা-ভাগে একটি চরণ আছে, "বন্দিনু গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ।" কিন্তু ইহাতে বলরামের নাম নাই, তাঁহার কাব্য-মধ্যে কোথাও বলরাম নামে কাহারও উল্লেখ মাত্র নাই। তাহা হইলে উক্ত পদে "গীতের গুরু" বলিতে কবি কাহাকে বুঝাইয়াছেন? অনেকে মনে করেন, গীতের গুরু বলিতে কবিকঙ্কণ উপাধিধারী বলরামকে বুঝাইতেছে। কিন্তু উদ্ধৃত পদটির এমনও অর্থ হয়, আমি শ্রীকবিকঙ্কণ আমার গীতের যিনি গুরু তাঁহাকে বন্দনা করিলাম। তাঁহার গীত শিক্ষক (ওস্তাদ) হয় ত কেহ ছিলেন, তিনি তাঁহার নাম করেন নাই, শুধু গীতের গুরু বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। যে উপকরণ হইতে বিশ্বকোষ ও বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে বলরাম কবিকঙ্কণের তথ্য সংকলিত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেই বুঝা যাইবে, যে ইহা কত অনিশ্চিত।

---

১ পৃঃ ৩৭১, ৩৭২ (ষষ্ঠ সংস্করণ)

১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসের সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত 'মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ' নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে লেখক প্রসঙ্গতঃ বলরাম কবিকঙ্কণের কথা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়া বলেন যে, বলরামই মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের পরবর্ত্তী লোক এবং তিনি মুকুন্দরামের শিষ্য। এই প্রবন্ধটি হইতেই উপকরণ গ্রহণ করিয়াও উক্ত দুই গ্রন্থের গ্রন্থকার ইহার বিপরীত মতটিই গ্রহণ করিয়াছেন, উক্ত সংখ্যা সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা অধুনা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। অতএব তাহা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে, ইহা হইতে দেখা যাইবে, বলরাম কবিকঙ্কণের বৃত্তান্তের মূলে কোন ভিত্তি নাই,—"একদিন কথা-প্রসঙ্গে সাহিত্য-পরিষদ্-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সংবাদ পাইলাম, শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ হইতে পৃথক্ অপর কবিকঙ্কণের কৃত অপর এক চণ্ডীর প্রতিলিপি রহিয়াছে। দেখিলাম, তাঁহার নিকট কয়েক পৃষ্ঠা পরিমিত প্রতিলিপি আছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রতিলিপি বা আদর্শ তাঁহার নাই। সেই প্রতিলিপির কিয়দংশ মাত্র অত্র উদ্ধৃত হইতেছে,

"অভয়ার অভয় চরণ করি ধ্যান।
বলরাম শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥"

"বলরাম কবিকঙ্কণের এই ভণিতাযুক্ত কবিতায়, আর মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর ভণিতায় বিশেষ পার্থক্য নাই। তুলনার অনুরোধে মুকুন্দরামের কতিপয় লিপি উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইল,

১। "অভয়া চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥"

২। "শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।"

"সেই "অভয়া" "চরণে"—সেই "রস"—"সেই গান" উভয়ত্র সমান। এখন কথা হইতে পারে, কে কাহার অনুকারী? বলরাম অন্যত্র বলিতেছেন,

"দক্ষমুখে সরস্বতী নিন্দন শুনিয়া অতি
সদানন্দ শিবের মহিমা।
শিবনিন্দা শুনি কোপে, নন্দীশ্বর ধায় দাপে,
বিরচিল কবি বলরামা॥"

"এখানে ছন্দের অনুরোধে উপরের ছত্রের "মহিমা" শব্দের সহিত মিলনের নিমিত্ত আকারান্ত বলরামা ব্যবহৃত হইয়াছে। "বলরাম" তাঁহার যে প্রকৃত নাম, তাহা প্রথম উদ্ধৃতাংশের প্রতি লক্ষ্য করিলে অনুধাবন করা যায়। প্রমাণান্তর দেখুন,

"অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
দ্বিজ বলরাম গান মধুর সঙ্গীত ॥"

"অন্যস্থান হইতে যথেচ্ছ অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি, বলরাম কবিকঙ্কণের কবিত্বে কিছু গুণশালিত্ব আছে কি না। আমাদের এ' প্রকার করিবার একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে। একটা কথা উঠিয়াছে, একজন অন্যজনের শিষ্য। তুলনার পক্ষে বিস্তর সুযোগ ঘটিবে বলিয়া কিঞ্চিৎ সমুদ্ধৃত করিতে হইল।

"শুন সতী পশুপতি ছাড়িয়া কৈলাসে।
কোন্ গুণে অপমানে যাবে পিতৃবাসে ॥
ত্রিনয়ন নিবেদন শুন গুণবতী।
দেবনিন্দা শিববৃন্দে দক্ষ প্রজাপতি ॥" ১

"ঈশানচন্দ্র বাবুর নিকট দক্ষযজ্ঞ পর্য্যন্ত প্রতিলিপি আছে। তাহাতেই ডিমাই কাগজের (ছোট আকারের) খাতার ২৬ পৃষ্ঠা অধিকৃত। মেদিনীপুরের লোকদিগের সংস্কার, এই বলরাম কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের শিক্ষাগুরু। (কিন্তু এই সংস্কারের মুল কি ?—গ্রন্থকার) আমাদের এ বিষয়ে বক্তব্য এই, যদি গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ ধরিতে হয়, তবে মুকুন্দরামই গুরু, বলরাম তদীয় শিষ্য।"

বিশেষতঃ 'ডিমাই কাগজের' খাতায় লেখা অতি আধুনিক আদর্শহীন কোন প্রতিলিপি হইতে সম্পূর্ণ পরিচয়হীন একজন কবির সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছান যাইতে পারে না।

---

১ এই ছন্দ মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা হইতে পারে না, মনে হয়, ইহা ভারতচন্দ্রেরও পরবর্ত্তী [illegible] রচনা।—গ্রন্থকার।

(খ)

মঙ্গল কাব্যে প্রচলিত বিশিষ্ট কতকগুলি শব্দ ও তাহাদের ব্যাখ্যা

অষ্ট মঙ্গলা—মঙ্গল কাব্যের উপসংহারে যে ফলশ্রুতির বর্ণনা করা হইয়া থাকে তাহাই অষ্ট মঙ্গলা। প্রথমতঃ চণ্ডীমঙ্গল হইতেই শব্দটির উৎপত্তি হয়, কারণ চণ্ডীমঙ্গল আট দিনে গীত হইত, আট দিনের গীতের পর শ্রোতৃবর্গের মঙ্গল কামনা করিয়া যে পদ রচিত হইত তাহাই অষ্ট মঙ্গলা। ক্রমে ধর্ম্মমঙ্গলেও কথাটি গৃহীত হইয়াছে, ধর্ম্মমঙ্গল দ্বাদশ দিনে গীত হইলেও তাহার উপসংহারের ফলশ্রুতিকেও অষ্ট মঙ্গলা বলে।

নায়ক বা নায়েক—যাঁহার গৃহে মঙ্গলকাব্য গীত হয় তিনিই নায়ক বা নায়েক, প্রায় মঙ্গল কাব্যেই নায়েকের জন্য কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে।

গায়েন দোহার ও পাইল—পায়ে নূপুর ও হাতে চামর লইয়া আসরে দাঁড়াইয়া যে নাচিয়া গান গায় সেই গায়েন। যাহারা পিছনে বসিয়া ধূয়া ধরে তাহারা দোহার বা পাইল। যাহারা মন্দিরা বা মৃদঙ্গ বাজায় তাহারা বায়েন।

চৌতিশা—কাব্যের বিপন্ন নায়ক কর্ত্তৃক বর্ণানুক্রমিক পদে দেবতা-স্তব। 'অ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'হ' পর্য্যন্ত পদের আদ্য চৌত্রিশটি অক্ষর দ্বারা এই স্তব রচিত হয় বলিয়া ইহার নাম চৌতিশা।

বারমাস্যা—অগ্রহায়ণ (মার্গ শীর্ষ) হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক পর্য্যন্ত নায়িকার বার মাসের সুখ দুঃখ বর্ণনা। ইহা মঙ্গল-কাব্যের একটি অপরিহার্য্য বিষয়।

পালা—প্রত্যেক দিনের গীত দুই অংশে বিভক্ত, দিবা ও রাত্রি, এক এক অংশকে পালা বলে, দিবা পালা ও রাত্রি পালা। দিবা পালা সকাল হইতে আরম্ভ হইয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ও রাত্রি পালা সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত চলে।

জাগরণ—যে সমস্ত কাব্য একমাত্র রাত্রেই গীত হয়, দিনে হয় না তাহাদের নাম জাগরণ। মঙ্গল-চণ্ডীর গীত সাধারণতঃ রাত্রেই দুই পালা সম্পন্ন হইত বলিয়া ইহার নাম জাগরণের পুঁথি। তুলনীয়, 'মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে'—চৈ, ভা, আদি খণ্ড।

বার্মতি—ধর্মপূজার নাম বারমতি, তাহা হইতে সংস্কৃত প্রভাবে বার্মতি বা ব্রহ্মতি। বার সংখ্যক বহুদ্রব্যে ধর্মের পূজা হয় বলিয়া কিম্বা 'বার' অর্থাৎ বহু লোকের সম্মতি-ক্রমে পূজা বলিয়া ধর্মপূজার নাম বারমতি। 'বারোয়ারী' শব্দটি ইহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

শ্বেতমক্ষী—নায়ক বিপন্ন হইলে তাহার চৌতিশাস্তব শুনিয়া উদ্ধারকর্তা দেবতা শ্বেতমক্ষীর রূপ ধরিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হ'ন, প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই ইহা দৃষ্ট হয়।

জরতী—মঙ্গলকাব্যের স্ত্রীদেবতার ছদ্ম বেশিনী জরাগ্রস্তা বৃদ্ধার রূপ, এই রূপ ধারণ করিয়াই তাঁহারা সাধারণকে ছলনা করিয়া থাকেন।

ডোমচিল—যাত্রাকালে অশুভ নিমিত্ত-সূচক পক্ষিবিশেষ। মঙ্গলকাব্যে কুসংস্কার বর্ণনার ইহা একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।

নগর-পত্তন—কাব্যের নায়ক দেবতার অনুগ্রহে সম্পদ বৃদ্ধির প্রথম নিদর্শন স্বরূপ বন-জঙ্গল কাটিয়া নগর স্থাপন করিতে দেখা যায়। ইহা হইতেই অনুমিত হয়, নাগরিক সভ্যতার বাহিরে আরণ্য জাতির মধ্যেই মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের আশীর্বাদ বর্ষিত হইত।

পাক-প্রণালী—কোন ভোজনের আয়োজন উপলক্ষ করিয়া বিস্তৃত রান্নাবান্নার বর্ণনা মঙ্গলকাব্যগুলির অত্যন্ত সাধারণ বস্তু।

প্রহেলিকা—কাব্যের নায়ককে বিপন্ন করিবার জন্য কোন খল চরিত্র তাহাকে কতকগুলি দুর্বোধ্য হেয়ালীর অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, কাব্যের নায়ক তাহার আরাধ্য দেবতার অনুগ্রহে তাহাদের উত্তর দিয়া থাকে। নাথ-সাহিত্য হইতে ইহা মঙ্গলকাব্যে আসিয়া প্রবেশলাভ করিয়াছে।

নৃপতি-লক্ষণ—মঙ্গলকাব্যের প্রত্যেক নায়ক সাধারণতঃ বত্রিশ রাজ-লক্ষণযুক্ত ও নায়িকা পদ্মিনী জাতীয়া কন্যা হইয়া থাকে। ইহা সংস্কৃত অলঙ্কারের অনুকরণজাত।

কমলা-বিলাস, মেঘডুম্বুর—রমণীর সর্বোৎকৃষ্ট পরিধেয় বসন।

খুঞা—দুঃখের দিনে নায়িকার পরিধেয় অত্যন্ত সাধারণ বস্ত্র বিশেষ।

কাণড় খোঁপা—কর্ণাট অঞ্চলের নারীদিগের সৌখীন খোঁপা।

পাটন—নগর বা বন্দর।

সমাপ্ত